

# কাঁটায়-কাঁটায়

২

নারায়ণ সান্যাল

পাথের  
কাঁটা



নারায়ণ সান্যাল

দারমের গোল্ডেন  
কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

অ-আ  
ক-খ

নারায়ণ সান্যাল

নারায়ণ  
সান্যাল

উলের কাঁটা

মাছের কাঁটা  
পাথের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

বুকের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

কাঁটার কাঁটা  
নারায়ণ সান্যাল





॥ কৈফিয়ৎ ॥

যে-কথা বারে-বারে স্বীকারোক্তি দিতে-দিতে ক্লান্ত, সে-কথা আবার বলি এই এন্-এথবার :  
পি. কে. বাসুর কাঁটা-সিরিজের গোয়েন্দাকাহিনীর বিন্যাসে মৌলিকতার কোন দাবী লেখকের নেই।  
উলের কাঁটার পঞ্চাদশটে আছে স্ট্যানলি গার্ডনার-এর "The Case of the Perjured Parrot;  
জ-জ-ক-খুনের কাঁটা-শ্রসঙ্গে শরদিস্থর 'ঝিন্মের বন্দী'র ভাষায় বলা চলে : 'নামকরণ দ্বারাই বংশপরিচয়  
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।' সে কাহিনীটি আগাথা ক্রিস্টির A.B.C Murders-এর  
পেনাম্রাবলম্বনে। এটি 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয় আবির্ভাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত  
হয়েছিল। তৃতীয় কাহিনী সারমের গেলুকের কাঁটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাপ্তাহিক  
বর্তমান' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে। সে কাহিনীটি আগাথা ক্রিস্টির Dumb Witness অবলম্বনে।  
আশা ছিল দু-খণ্ডে কাঁটা-সিরিজকে কব্জা করতে পারব। আশঙ্কা হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। একই সঙ্গে  
প্রকাশিত হয়েছে কাঁটা-সিরিজ-এর নবম গ্রন্থটি : রিস্তেদারের কাঁটা।  
আরও গোটা দুই লিখতে পারলে তিন-নম্বর কষ্টকগুচ্ছ আপনাদের উপহার দিতে পারব।

শ্রীশ্রীপঙ্কমী ১৩৯৭, 21.1.91





উলের কাটা	13
অ-আ-ক-খুনের কাটা	103
সারমেয় গেথুকের কাটা	185

স্বাধীনতা





## উলের কাঁটা

রচনাকাল : 1978

প্রথম প্রকাশ : মে 1980

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীগৌতম রায়

উৎসর্গ : শ্রীমতী শীলা ও

শ্রীগৌরদাস বসুমল্লিক

“কৃপা কর সুনিয়ে...অব হামারা হাওয়াই জাহাজ...”

বাকিটা শুনবার প্রয়োজন হল না। কৌশিক স্ত্রীকে বললে, মাজার পেটিটা বেঁধে নাও। আমরা শ্রীনগরে পৌঁছে গেছি। এখনই ল্যান্ড করবে।

সুজাতা জানলা দিয়ে তুষারমৌলী পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর কথায় কোমরের বেল্টটা কষতে কষতে বললে, শেষ পর্যন্ত কী সাব্যস্ত হল? হোটেল না হাউসবোট?

কৌশিক ততক্ষণে নিজের বেল্টটা বেঁধে ফেলেছে। জবাবে বললে, দুটোর একটাও নয়। গাথাবোট !

—গাথাবোট? তার মানে?

—কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম। বড়-কর্তা কী রায় দেন দেখ।

সুজাতা আড়চোখে সামনের-সীটে-বসা ব্যারিস্টার সাহেবকে এক নজর দেখে নেয়। ঘুমোচ্ছেন কি না বোঝার উপায় নেই। কোলের উপর বিছানো আছে একখণ্ড দৈনিক পত্রিকা। চোখ দুটি বোজা। ঝাঁহাতে ধরা আছে চশমাটা।

কৌশিক সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, ঘুমোচ্ছেন নাকি বাসু মামু? প্লেন শ্রীনগরে ল্যান্ড করছে কিন্তু।

বাসু-সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। বলেন, না জেগেই আছি। থিংক করছিলাম।

রানী দেবী বসেছেন ওঁর পাশের সীটে। ‘আইল’-এর দিকে। একটু ধমকের সুরে বলেন, সারাটা পথই তো তুমি কাগজ পড়লে আর ‘থিংক’ করলে! তাহলে জানলার ধারে বসা কেন বাপু?

—আয়াম সরি। তা বললেই পারতে। জানলার ধারের সীটটা তোমাকেই ছেড়ে দিতাম।

—কিন্তু কী এত ভাবছ তখন থেকে?

## কাটায়-কাটায়-২

অমাধিক হাসলেন বাসু-সাহেব। বলেন, তুমি শুনলে রাগ করবে রানু। আমি ভূষণে এসেও ধান ভাণ্ডি।

—ধান ভানছ? মানে?

—‘কাল্পেবলু হোমিসাইড’ না ‘ডেলিবারেট মার্ডার’?

খবরের কাগজটা বাড়িয়ে ধরেন উনি। রানী দেবী হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। সে যাই হোক কাগজটা দেখবার সময় হল না। ইতিমধ্যে আকাশযান ভূমিস্পর্শ করেছে।

এয়ার হস্টেঙ্কে বলাই ছিল। ঠরা অপেক্ষা করলেন। শেষ যাত্রীটি নেমে যাবার পর এয়ার হস্টেঙ্ক এসে জানালো, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসু-সাহেব আর কৌশিক ধরাধরি করে রানী দেবীকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনলেন। ততক্ষণে হুইল-চেয়ারটা সিঁড়ির নিচে লাগানো হয়েছে। রানী দেবীকে তাতে বসিয়ে ঠরা চারজনই তারমিনাল বিল্ডিং-এর দিকে চলতে থাকেন। কৌশিক বলে, মামু, আপনি লাগেজগুলো সংগ্রহ করুন। আমি ততক্ষণে বরং খোঁজ নিয়ে দেখি কোথায় থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

রানী বলেন, এখানে কী খোঁজ নেবে? তুমি বরং একটা ট্যাক্সি ধর। চল সবাই মিলে টুরিস্ট রিসেপশান সেন্টারে যাই। আমি আর সূজাতা সেখানে মালপত্র পাহারা দেব। আর তোমরা দুজনে হোটেল কিংবা হাউসবোট ঠিক করে আসবে।

সূজাতা আসছিল পিছন পিছন। বলে, হোটেল নয়, রানুমামী। হাউসবোট। মামু কী বলেন? ত্রীনগরে এসেও হোটেল?

বাসু-সাহেব বলেন, আমার মতামত যদি জানতে চাও সূজাতা, তাহলে আমি বলব হাউসবোটও নয়, হোটেলও নয়। এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সো-জা চলে যাব কোনও নির্জন জায়গায়। যাকে বলে, ‘ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড’।

—পহলগাঁও কিংবা গুলমার্গ?—কৌশিক তার ভূগোলের জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

বাসু মাথা নাড়েন, উহু। ওসব জায়গাতেও ট্যুরিস্টদের গাদাগাদি। আমি চাইছিলাম—নিতান্ত নির্জন একটা পরিবেশ। পাইন-বার্চ-ওকের মাঝখানে, কাছেই নদী, সলিটারী লগ-কেবিন বলতে বা খোথায়। যেমন ধর, ‘ট্রাউট-প্যারাডাইস’!

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, ‘ট্রাউট-প্যারাডাইস’! সেটা আবার কোথায়? নামও তো শুনিনি কখনও।

—কাল রাত পর্যন্ত নামটা আমিও জানতাম না। আজ সকালে জেনেছি। ‘ট্রাউট-প্যারাডাইস’ হচ্ছে লীডার নদীর ধারে একটা গ্রাম। বিটুইন অচাবল অ্যান্ড কোকরনাগ। সেখানে ছোট ছোট লগ-কেবিন ভাড়া পাওয়া যায়। ফার্নিশড কেবিন। ইলেকট্রিসিটি আছে, টেলিফোন আছে। ‘অ্যাংলার’রা এই সিজনে সেখানে যায় ট্রাউট মাছ ধরতে। গ্র্যান্ড আইডিয়া, ‘মাছ মারব খাব ভাত!’ বাসু!

—কিন্তু এত সব তথ্য কোথায় সংগ্রহ করলেন রাতারাতি?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। ইতিমধ্যে ঠরা পায়ে পায়ে টার্মিনাল বিল্ডিং-এ এসে পৌঁচেছেন। মালপত্র এখনও প্লেনের গর্ভ থেকে খালস হয়ে আসেনি। যাত্রীরা ‘কেপ্ট-কেরিয়ার’ ঘিরে একসার জিরোফে পরিণত। কৌশিক হঠাৎ বললে, এ কী! আপনার নাম অ্যানাউন্স করছে না?

তিনজনেই উৎকর্ষ হয়ে ওঠেন। না, ভুল শোনেনি কৌশিক। লাউড-স্পিকারে ঘোষিত হচ্ছে, ইংরাজীতে: অ্যাটেনশান! প্লিজ! মিস্টার পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-স। আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি যেখানেই থাকুন ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স কাউন্টারে চলে আসুন। সেখানে মিস্টার এস. পি. খায়া আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। থ্যাঙ্কু!

কৌশিক একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, এস. পি. খায়া? চেনেন?

বাসু বলছেন, চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তবে নামটা জানি। আর লং-লেগ বাউন্ডারীতে লোকটা কেন দাঁড়িয়ে আছে তা-ও আন্দাজ করতে পারছি...

—লং-বাউন্ডারী মানে?

—রানু একটা ওভার বাউন্ডারী হাঁকড়েছে—পূজোব ছুটিতে আমার গ্যোয়েন্সগিরি বন্ধ! আর ঐ বাইশ বছরের ছোকরা বাউন্ডারী ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে কপাৎ করে লুফে নেবে বলে! কৌশিক না বুঝলেও রানু দেবী ধরতাইটা ঠিকই ধরেছেন। বলেন, তার মানে তোমার ক্রায়েন্ট? তাই এক কথাতেই শ্রীনগরে আসতে রাজী হয়ে গেলে! নয়?

বাসু পাইপ ধরাবার উপক্রম করছিলেন। হঠাৎ ঝুকে পড়ে বলেন, বিশ্বাস কর রানু, ঐ পাইপ ছুঁয়ে বলছি—লোকটা আমার ক্রায়েন্ট নয়। তাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি, কথাবার্তাও হয়নি কখনও। বস্তুত কাল রাত পর্যন্ত তার নামই জানতাম না।

রানু দেবী ঝাঝিয়ে ওঠেন, মায়ের কাছে মাসির গল্পো! তোমাকে চিনতে বাকি আছে নাকি আমার? যাকে দেখনি, যার সঙ্গে জীবনে কথা বলনি, যার নামটা পর্যন্ত জানো না, তার বয়স 'বাইশ' তুমি কেমন করে জানলে?

—পিওর ডিডাকশান! বুঝিয়ে বললে সহজেই বুঝবে। তবে একটু অপেক্ষা কর। লোকটাকে বিদায় করে আসি। ডয় নেই রানু, কথা যখন দিয়েছি তখন এ ছুটির মধ্যে ওসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াব না।

অন্যমনস্কের মতো পাউচ থেকে টোব্যাকো নিয়ে পাইপে ভরতে ভরতে বাসু-সাহেব ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন-এর কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এলেন।

দূর থেকেই নজর হল কাউন্টার খোঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক। বয়স সম্বন্ধে বাসু-সাহেব যা আন্দাজ করেছিলেন, দেখা গেল তা নির্ভুল। বছর বাইশ-তেইশ বলেই মনে হয়। ব্রি-পিস্ ডার্ক-গ্রে সুট। গলায় একটা কালো টাই। মাঝারি গড়ন, স্বাস্থ্যবান। গ্যোফ-মাড়ি কামানো। ঝা-হাতের অনামিকায় ওটা বোধ হয় পোখরাজ নয়, হীরে। নিখুঁত সাজ-পোশাক সম্বন্ধেও সে কেমন যেন নিশ্চিন্ত। একটা আন্তর-বিশ্রুতা যেন ঢেকে রেখেছে তার আপাত চাকচিক্য।

বাসু-সাহেব আর একটু অগ্রসর হতেই ছেলটি এগিয়ে আসে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সপ্রতিভ ভাবে বলে, মিস্টার পি. কে. বাসু?

বাসু ওর করগ্রহণ করে বলেন, ইয়েস, মিস্টার খান্না। বাট হাউ অন আর্থ কুড যু নো দ্যাট অ্যান্ডাম কামিং বাই পিস্ ফ্লাইট?

ছেলটি ইংরেজীতে বললে, একটা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে কাল রাতে ক'লকাতায় আপনার চেয়ারে ট্রাঙ্ক-কল করেছিলাম। সেই সূত্রেই জেনেছি, আপনি এই ফ্লাইটে দিল্লি থেকে আসছেন। এয়ারপোর্টে আপনাকে ধরতে না পারলে খুব মুশকিল হত। কারণ যিনি টেলিফোন ধরেছিলেন তিনি বলতে পারলেন না—আপনি এখানে কোথায় উঠছেন। তা আগে বরং সেই কথাটাই জেনে নিই। কোথায় উঠছেন আপনারা? হোটলে না হাউসবোটে?

বাসু-সাহেবের জবাব দিতে একটু দেরি হল। পাইপটা ধরিয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগে আর কি। তারপর বললেন, আপনি আমাকে মাপ করবেন মিস্টার খান্না। আমি এখানে সপরিবারে বেড়াতে এসেছি। আপনার কেসটা আমি নিতে পারছি না।

খান্না স্নান হাসল। বলল, চান্সুষ আপনাকে কখনও না দেখলেও আপনার অনেক কীর্তি-কাহিনী আমার জানা। সুতরাং আমি অবাক হইনি। আপনি ঠিকই ধরেছেন। একটা জটিল কেস্-এ আপনার সাহায্যপ্রার্থী হতে চাই বলেই আমি ট্রাঙ্ক-কলে আপনাকে ধরতে চেয়েছিলাম। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেসটা কী জাতের শোনার পর আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, ওটাও আপনার ডুল ধারণা। কেসটা আমার অজানা নয়। 'ট্রাউট-প্যারাডাইস'-এর রহস্য তো?

এবার বিস্মিত হবার পালা ও-পক্ষের। বাসু-সাহেবের প্রথম প্রশ্নটি এতক্ষণে সে এ-কোর্টে ফিরিয়ে দিল। হাউ অন আর্থ কুড যু নো দ্যাট, স্যার?

—খুব সহজে। আজ সকালের 'কান্ট্রী টাইমস্'-এ আপনার পিতৃদেবের হত্যার খবরটা ছাপা

## কাটায়-কাটায়-২

হয়েছে। আপনার নামটাও কাগজে আছে। স্নেনে সেই বিবরণটা পড়তে পড়তে এসেছি। ইয়েস, আই অ্যাডমিট—ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং—এক্সিডিংলি ইন্টারেস্টিং কেস! কিছু—আমাকে মাপ করতে হবে, এই মুহূর্তে আমি মানসিক ভাবে প্রকৃত নই।

খান্না সবিনয়ে বললে, স্যার, কাগজে যেটুকু বার হয়েছে তাতেই যদি আপনার মনে হয়ে থাকে কেসটা অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তাহলে আমি সুনিশ্চিত যে, কেসটা আপনাকে নিতে হবে। কারণ দু-দুটি অবিশ্বাস্য রকমের 'ক্লু'-র সন্ধান আমি রাখি, যা কাগজে ছাপা হয়নি। সে দুটি শোনার পর... অল রাইট, স্যার। ওসব কথা পরে হবে। আপাতত বলুন, কোথায় উঠবেন?

বাসু বলেন, ঠিক করা নেই কিছু। হঠাৎ পূজার ছুটিতে সকলে মিলে চলে এসেছি। এবং মিসেস বাসুকে কথা দিয়েছি—ছুটির এই কটা দিন আমি কোনও কেস নেব না।

—আই সি! আপনারা কজন আছেন?

—আমাকে নিয়ে চারজন। কেন?

খান্না একটু ভেবে নিয়ে বললে, অলরাইট স্যার। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। দেখুন, আপনি তাতে রাজী হতে পারেন কি না।

—কী প্রস্তাব?

—আমাদের একটা হাউসবোট আছে। 'বিলাম কুইন'। ডিলাক্স ক্লাস। দুটো ডব্ল-বেড রুম, ড্রইং অ্যান্ড ডাইনিং। আপনারদের অসুবিধা হবে না। ঠাণ্ডা-গরম জল পাবেন, অ্যাটাচড বাথ, ইলেকট্রিসিটি আছে, টেলিফোন আছে। কুক আছে, বেয়ারা আছে।

—দৈনিক ভাড়া কত?

স্নান হাসল ছেলেটি। বললে, স্যার, ওটা আমরা কখনও ভাড়া দিইনি। বস্তুত ওটা আমাদের বাড়ির গেস্ট রুম। আমাদের পরিবারের বন্ধুরা এলে ওখানেই ওঠেন। আপনার সন্ধ্যা করার কিছুই নেই।

মাথা নাড়েন বাসু-সাহেব। বলেন, তা হয়না। আমি আপনার হাউসবোটটা নিতে চাই, এবং কেসটা নেব না। এ-ক্ষেত্রে আপনি যদি ন্যায্য ভাড়া না নেন, তাহলে আমি কেমন করে রাজী হই?

এক কথায় ফয়সালা করে দিল ছেলেটা—বেশ তো, ভাড়া দেবেন। বাজার দর অনুযায়ী যা ন্যায্য ভাড়া হওয়া উচিত তাই দেবেন আমাকে। আমি মাথা পেতে নিয়ে নেব।

—আপনি তাতে স্ক্রু হবেন না?

—বিন্দুমাত্র না। কারণ আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট শ্যিওর কেসটা আপনি নিতে বাধ্য হবেন... আপনি ওখানে উঠুন। গুছিয়ে নিয়ে বসুন। ঘণ্টাদুয়েক পরে আমি আসব। আমার কেসটা শোনাব—হ্যাঁ, মিসেস বাসুকেও। তারপর যদি কেসটা না নিতে চান, নেবেন না। ন্যায্য ভাড়া দিয়ে ছুটির শেষে কলকাতায় ফিরে যাবেন। এগ্রীড?

—এগ্রীড!

—থ্যাঙ্কু স্যার। মালপত্র নিয়ে বাইরে আসুন। আমার গাড়িতে পৌঁছে দেব।

বাসু-সাহেব ফিরে এসে দেখলেন ইতিমধ্যে কৌশিক মালপত্র সন্ধান করে ছাড়িয়েছে। ঠর জ্ঞানে অপেক্ষা করছিল সকলে। কৌশিক বলে, তাহলে কী স্থির হল? এখান থেকে সোজা টুরিস্ট রিসপশন সেন্টারে যাবো তো?

—না। আমি ইতিমধ্যে হাউসবোট বুক করে ফেলেছি। 'বিলাম কুইন'। দুটো ডব্ল-বেডের রুম আছে। অসুবিধা হবে না কিছু।

কৌশিক বলে, একবার না দেখেই অ্যাডভান্স করে দিলেন? শুনছি, এখানে দরদাম করলে ভাড়া অনেক কমে যায়।

—তা হয়তো যায়। কিন্তু এটা একটা শৌখিন হাউসবোট। ভাড়া দেওয়া হয় না। আমরা হয়তো গেস্ট হিসাবে—

রানী দেবী শুকে মাঝপথে থামিয়ে দেন, থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমরা বুঝেছি। হাউসবোটের মালিক ঐ মিস্টার খান্না তো?

বাসু-সাহেব হেসে ওঠেন, সবাই গোয়েন্দা হলে আমরা যাই কোথায়? একটা সুটকেস উঠিয়ে নিয়ে বললেন, চল যাওয়া যাক। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

বেরিয়ে আসতেই খান্না এগিয়ে এসে নমস্কার করল। বাসু-সাহেব তার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মালপত্র উঠিয়ে দেওয়া হল পাড়িতে। প্রকাণ্ড স্টেশান-ওয়াগন। পিছনের ডালাটা খুলে দেবার পর রানী দেবীর হুইল চেয়ারটা অনায়াসে স্থান পেল কেরিয়ায়ে।

হাউসবোটটা চমৎকার। অপছন্দ হবার কথা নয়। আসবাব-পত্র অবশ্য একটু সেকেলে ধরনের—মিড-ভিক্টোরিয়া যুগের। তা হ'ক, আধুনিক জীবনযাত্রার যাবতীয় উপকরণই উপস্থিত। ড্রইংরুমে প্রকাণ্ড একটা আয়না। সোফা-সেট, সেন্টার-ট্যেবল্। তারপর ডাইনিং রুম। সেটা পার হলে একটা চওড়া গলিপথ। রানী দেবীর হুইল চেয়ারটা সে গলিপথে অনায়াসে চলবে। তার দুদিকে দুটি বেড-রুম। সংলগ্ন স্নানাগার। হাউসবোটের পিছনে বাঁধা আছে আর একটি ছোট নৌকা। সেটা রান্নাঘর ও ঠাকুর চাকরদের বাসস্থান। স্কিলাম নদী যেখানে ডাল লেক-এ গিয়ে মিশেছে প্রায় তার কাছাকাছি হাউসবোটটা নোঙর করা।

আড়মি নত হয়ে আদাব জানালো 'কেয়ার-টেকার-কাম-কুক' খোদাবক্স। ধবধবে সাদা দাড়ি। মাথায় কাজকরা সাদা গোল টুপি। পরনে একটা জোকা মত পোশাক। মনে হল, যেন মোঘল-পেটিং-এর কোন ম্যুয়াল থেকে হাউসবোটে নেমে এসেছে। ওর পিছনেই দাঁড়িয়েছিল একটি অল্পবয়সী ছোকরা—ওরই নাতি। সেও সেলাম করল আগন্তুকদের দেখে।

খান্না ওদের জিম্মাদারী বুঝিয়ে দিল কেয়ারটেকারকে। বললে, খোদাবক্স, ঐরা কলকাতা থেকে আসছেন। আমার মেহমান। ঠিকমত দেখভাল কর। যেন তোমার হাউসবোটের বদনাম না হয়ে যায়।

খোদাবক্স পুনরায় মোঘলই কায়দায় আদাব জানিয়ে বললে, বে-ফিকর রহিয়ে সাব!

তারপর একটু ইতস্তত করে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করল, কাল সব মিটেছে কত রাত হল হুজুর?

—রাত প্রায় কাবার হয়ে গিয়েছিল।

খোদাবক্স পুনরায় মাথা নেড়ে সখেদে বললে, আজ্ঞব এ দুনিয়া! কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল!

খান্না আর কথা না বাড়িয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি ঘণ্টাদুয়েক পরে আবার আসব।

ফিরতে গিয়েও আবার খেমে পড়ে বলে, মিস্টার বাসু, মানসিক প্রভুতি আমারও এখন নেই। কিছু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। যা করার তাড়াতাড়িই তো করতে হবে?

বাসু-সাহেব শুকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তা তো বটেই। কিন্তু খোদাবক্স আপনাকে কী জিজ্ঞাসা করল বলুন তো? কাল রাতে কোথা থেকে ফিরতে অত রাত হল আপনার?

স্নান হাসল খান্না। অশ্রুটে বললে, শ্মশান থেকে। এমনতেই এক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছিল। পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল আর কি—

বাসু শুকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, থাক ওসব কথা। আপনি ঘণ্টাদুয়েক পরেই আসবেন। কেসটা নিই বা না নিই, কিছু পরামর্শ আপনাকে দিতে পারব নিশ্চয়ই।

খান্না চলে যেতেই সকলে শুকে ঘিরে ধরে: ব্যাপারটা কী?

বাসু বললেন, তোমরা বিশ্রাম করবে না? কাহিনীটা বলতে অনেক সময় লাগবে।

সুজাতা বলল, বিশ্রাম করার আবার কী আছে? এলাম তো এনে। তুলতে তুলতে। আপনি এখনই শুরু করুন। আমি বরং খোদাবক্সকে বলি চার কাপ কফি বানাতো।

বাসু বলেন, বল। তবে আমারটা ব্ল্যাক-কফি। ওকে বলে দিও। আর জিজ্ঞাসা করে দেখ তো, হাউসবোটে খবরের কাগজ রাখা হয় কিনা? আজকের 'কান্ট্রি টাইমস্' পাওয়া যাবে?

তেরই সেকেন্ডের, অর্থাৎ সেদিনের সংবাদপত্র সহজেই সংগ্রহ করা গেল। তার প্রথম পৃষ্ঠাতে খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে—কারণ সূর্যপ্রসাদ খান্নার স্বর্ণগত পিতৃদেব এ শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। ঠাঁর কোনও ছবি ছাপা হয়নি বটে তবে যে লগ-কেবিনে ঠাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি আলোকচিত্র আছে। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে সংবাদটা পঞ্চম পৃষ্ঠায় উপচিয়ে পড়েছে। তাছাড়া পঞ্চম পৃষ্ঠায় সূর্যপ্রসাদের একটা ইন্টারভিউও ছাপা হয়েছে। পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা দুঃসংবাদটা এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে একটা মানবিকতার আবেদন ফুটে উঠেছে। সংবাদের চূষকসার এই রকম:

নিহত মহাদেও প্রসাদ খান্না এ অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'কান্ট্রি-ডালী ট্রাঙ্কপোর্ট অ্যান্ড অটোমোবাইলস্'-এর স্বত্বাধিকারী। তিনি প্রাক্তন এম. পি.ও. বটে। ইদানীং তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পর পর দুটি ইলেকশনে নির্বাচনপ্রার্থী হননি। অথচ সাধারণ লোকের ধারণা তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হলে অনায়াসেই নির্বাচিত হতে পারতেন। বহুত বছর দুই হল তাঁর চরিত্রে একটা বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে। ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম তিনি ইদানীং বড় একটা দেখতেন না। পুত্র সূর্যপ্রসাদ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সব দায়বদ্ধি তার স্বন্ধেই অর্পণ করেছিলেন। অথচ অবসর নেবার মত এমন কিছু বয়সও তাঁর হয়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছেচল্লিশ, যে বয়সে অনেকেই নতুন উদ্যমে নতুন ব্যবসায় নামে।

বছর দুই হল খেয়ালী শ্রৌত মানুষটি শুমু হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে যাননি, ভারতের বাইরেও নয়। শুমু মাত্র হিমালয়ের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে পরিক্রমা করেছেন। তাঁর চিঠিপত্র মাঝে মাঝে আসত—কখনও কুলু-মানালী থেকে, কখনও হোদারবদীর বিভিন্ন চাট থেকে, কখনও বা সান্ডাকপু-ফালুট অঞ্চল থেকে। তিব্বত এবং নেপালের বহু অঞ্চলে তিনি এই দু'বছরে ঘুরেছেন। যখন যে অঞ্চলে যেতেন তখন সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করতেন। সাধারণ পোশাকে; যাতে কেউ না বুঝতে পারে তিনি লক্ষপতি! ওদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনতেন—ছবি আকতেন, ওদের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করতেন। কখনও বা নির্জন পাহিন বনে বনে থাকতেন বাইনোকুলার হাতে। ছড়িয়ে দিতেন শাঁউকটি অথবা বিস্কুটের টুকরো। দেখতেন আরণ্যক প্রাণীদের—কাঠবড়ালী, খরগোশ আর বিচিত্র পাখিদের সম্ভ্রান্ত আহার-সংগ্রহের প্রচেষ্টা।

পুত্র সূর্যপ্রসাদ খান্না পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতাকে বলেছিলেন, মহাদেবের এই চারিত্রিক বিবর্তনের মূলে আছে নাকি তাঁর ছোট ভাই শ্রীতমপ্রসাদ খান্না। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করেন। সম্ভ্রাস নেননি—কিন্তু ভবঘুরের জীবন যাপন করে এসেছেন এতদিন। শ্রীতমপ্রসাদ যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখনও ঠাঁদের পিতৃদেব জীবিত। তিনি তাঁর দুটি সম্ভ্রানকেই সম্মানভাবে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে যান; কিন্তু শ্রীতম বন্ধনমুক্ত থাকার প্রেরণায় সব কিছু পুনরায় জ্যোত্স্নাতাকেই লিখে দেন, সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে। প্রথম দিকে মাঝে মাঝে তিনি ঠাঁদের সংসারে আসতেন, দু-চারদিন থেকে আবার ফিরে যেতেন তাঁর অজ্ঞাত আবাসে। হয়তো মহাদেওয়ের সংগে তাঁর একটা যোগাযোগ ছিল, পাত্র বিনিময়ে, সূর্য সে খবর জানত না।

সংবাদে প্রকাশ, এ বছর 'ট্রাউট-প্যারাইডিস্'-এর সিজন শুরু হয়েছে মঙ্গলবার ছয়ই সেক্টেম্বর। 'মৎস্য ও বন্যপ্রাণী মন্ত্রক' প্রতি বছরই ঘোষণা করেন কবে থেকে ট্রাউট মাছ ধরা যাবে। জুলাই-অগস্টে মাছেরা ডিম পাড়ে—তাই সে সময় মাছ ধরা বে-আইনি। প্রতি বছরের মত এ বছরও মহাদেওপ্রসাদ পনেরই অগস্ট থেকে একটি লগ-কেবিন বুক করেন; যাতে সিজনের উদ্বোধন দিবস থেকেই তিনি ঐ নির্জনাবাসে থাকতে পারেন। মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে পুলিশ 'সারকাম্‌স্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স' থেকে



সিদ্ধান্তে এসেছেন, মহাদেওপ্রসাদ সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর বিকালে ঐ লগ-কেবিনে আসেন। সকাল-সকাল স্বপাক আহার সেসে শয্যাগ্রহণ করেন। পরদিন অর্থাৎ উদ্বোধনের দিন যাতে সূর্যোদয় মুহূর্ত থেকেই মাছ ধরা শুরু করা যায়, তাই তিনি 'অ্যালার্ম ক্লক' সাড়ে পাঁচটায় দম দিয়ে শূন্যে পড়েন। পরদিন তিনি শয্যাভ্যাগ করে, প্রাতঃকৃত্য সেসে প্রাতঃরাশ তৈরী করেন এবং আহার করেন। তারপর মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে নদীর ধারে চলে যান। দৈনিক যতটা মাছ ধরার অনুমতি আছে দুপুরের আগেই সেই পরিমাণ মাছ ধরে তিনি কেবিনে ফিরে আসেন। তার কিছু পরেই—ঠিক কতটা পরে সেটাও পুলিশ বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে আশ্বাজ করতে পারছে—আততায়ীর গুলিতে মহাদেও নিহত হন। অর্থলোভ হত্যার কারণ হতে পারে না—কারণ মহাদেও-এর মানিব্যাগে প্রায় শ-তিনেক টাকা ছিল এবং স্টেকেসে ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। অনুমান করা যায়, মাত্র তিন-চার ফুট দূরত্ব থেকে আততায়ী একসঙ্গে দুটি গুলি করে—কারণ মৃতদেহে পাশাপাশি দুটি ক্ষতচিহ্ন প্রমাণ দিচ্ছে কী ভাবে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়েছিল। পিস্তলটা মৃতদেহের অন্তরে আবিস্কৃত হয়েছে।

রক্তক্ষার কক্ষ মহাদেওপ্রসাদের আদরের পাহাড়ী ময়নাটিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মহাদেও যখনই যেখানে যেতেন এই পোষা ময়নাটিকে নিয়ে যেতেন।

লগ-কেবিনটা বেশ নির্জনে। যে পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথটা পাহাড়কে বেঁটন করে চলে গেছে, তার থেকে অন্তত তিনশ' মিটার দূরে। ঐ রাস্তায় মটোর গাড়ি যেতে পারে, তবে সারাদিনে খুব বেশি গাড়িযোড়া ও-পথে যায় না। নিকটতম লগ-কেবিনটিও এতদূরে যে পিস্তলের শব্দ সেখানে পৌঁছাবে না।

দিনের পর দিন ঐ পাকদণ্ডী পথ বেয়ে মানুষজন চলাফেরা করেছে, অন্যান্য লগ-কেবিনের বাসিন্দাও হয় তো ঐ রক্তক্ষার কামরার সামনে দিয়ে চলাফেরা করেছে। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, অর্গলবদ্ধ গৃহের ভিতর পড়ে আছে একটি মৃতদেহ।

প্রায় পাঁচদিন পরে—এতদিনে প্রায় প্রতিরূপটি কেবিনই ভর্তি হয়ে গেছে—একজনের খেয়াল হল, ঐ ঘরটা থেকে একটা পাহাড়ী ময়না ক্রমাগত কর্কশ স্বরে ডাকছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি সদর দরজায় 'নক' করলেন, দেখলেন সেটা ডান্ডাবদ্ধ। ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। দরজায় গা-তাল্লা আছে, ইয়েল-লক। দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায়। ঠর মনে হল, এই কেবিনের গৃহস্থানী হয়তো শহরে গিয়ে কোনও কারণে আটকা পড়েছেন—তাই অভুক্ত ময়নাটা অমন তারস্বরে প্রতিবাদ করছে। কৌতূহলী হয়ে উনি জানলা দিয়ে ভিতরে উকি দিলেন। শুধু ময়নাটিকেই নয়, তিনি ঐ কেবিনের মেঝেতে এমন কিছু দেখলেন যাতে তৎক্ষণাৎ ছুটতে ছুটতে ফিরে গেলেন পুলিশ খবরটা জানাতেন।

হত্যাকারী যতই নিষ্ঠুর হ'ক তার অন্তরের একটি প্রান্তে ছিল কিছু শূভবুদ্ধি। নিজস্ব সংবাদদাতা এখানে একটু কাব্য করে লিখেছেন : 'লেডি ম্যাকবেথের মত পিশাচীর অন্তরে যদি একটি কন্যা-হৃদয় লুকিয়ে থাকতে পারে, তাহলে হত্যাকারীর অন্তরেও একটি প্রাণী-দরদী থাকতে পারবে না কেন?' সে যাই হোক, দেখা গেল—যাবার আগে লোকটা ঐ ময়নার খাচার দরজাটা খুলে রেখে গেছে। একটি পাতে কিছু জল এবং যথেষ্ট পরিমাণ খিন এ্যারাকট বিস্কুট মেঝেতে ফেলে রেখে গেছে।

দীর্ঘ বিবৃতিটা পাঠ করে বাসু-সাহেব বললেন, এই সংবাদটাই প্রেনে পড়তে পড়তে এসেছি। তাই লাউড-স্পিকারে যেইমাত্র শুনলাম আমার সঙ্গে জৈনেক এস. পি. খান্না দেখা করতে চান, তখনই কুশলাম তার উদ্দেশ্যটা কী। এখন তোমরা বল, কেসটা আমি নেব, না নেব না?

তিনজনের কেউই জবাব দিচ্ছেন না দেখে বাসু-সাহেব বললেন, তাহলে আর একটি বিশ্লেষণ করে বলি—কেসটা নিলে আমি ওত্তঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ব—গুলমার্গ-পহেলগাঁও-উলার লেক বাদ যাবে। অবশ্য তোমরা তিনজনে ঘুরে আসতে পার।

রানী দেবী বললেন, বেশ তো, আগে শুনই দেখ না সূর্যপ্রসাদ কী বলে। সবটা শূনে আরপর আমরা রায় দেব, কী বল সুজাতা?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—আমি একমত।—সুজাতা বললে।

অনতিবিলম্বেই ফিরে এল সূর্যপ্রসাদ। গুছিয়ে নিয়ে বসল একটা সোফায়। রানী দেবী বললেন, তোমরা কথা বল, আমরা ভিতরে গিয়ে বসছি।

সূর্য চট করে ঠাড়িয়ে উঠল। হাত দুটি জোড় করে বলল, তার কোন প্রয়োজন নেই। মিস্টার বাসু যদি কেসটা নেন তাহলে হয়তো 'সুকৌশলী'কেও কাজে নেমে পড়তে হবে। তাছাড়া আমি এমন কিছু গোপন কথা বলছি না যাতে আপনাদের উঠে যেতে হয়।

বাসু-সাহেব পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করে বলেন, ঠিক আছে, শুরু করুন।

—'করুন' নয়, 'কর'। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

—ঠিক আছে। শুরু কর।

—ঠিক কোথা থেকে শুরু করব বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদটা তো পড়েছেন। সুতরাং আপনি প্রশ্ন করুন, আমি একে একে জবাব দিয়ে যাই।

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার প্রথম প্রশ্ন, তুমি আমার কাছে কী জাতের সাহায্য চাইছ?

—অনেক কিছুই। প্রথম কথা, আমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে হবে। কে—কেন কী-ভাবে এটা করল আমাকে জানতে হবে। দ্বিতীয় কথা, হত্যাকারী আমার স্বর্গত পিতৃদেবের চরিত্রহনন কেন করতে চাইল সেটা আমাকে বুঝে নিতে হবে! তৃতীয় কথা, আমি চাই—আপনি আমার বিমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। এমন ব্যবস্থা করুন যাতে তিনি আমাদের 'কাশ্মীর ভ্যালী ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড অটোমোবাইলস'-টাকে ডকে তুলে দিতে না পারেন। আমার দুঢ় ধারণা, পিতৃদেব সম্প্রতি একটি উইল করেছিলেন—আমাকে তিনি স্বমুখেই সে কথা বলেছিলেন, যদিও আমি জানি না, উইলে তিনি কাকে কী দিয়ে গেছেন; তবু আমার দুঢ় ধারণা কোম্পানীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব, দেনা-পাওনা আমাকেই দিয়ে গেছেন। এই উইলটি আমি এখনও খুঁজে পাইনি। আমাদের যিনি সলিসিটর তাঁর কাছে নেই। বাড়িতেও খুঁজে পাইনি। অবশ্য দুটি জায়গা এখনও খুঁজে দেখতে পারিনি—বাড়িতে একটা সিন্দুকে উনি দরকারী কাগজপত্র রাখতেন, তার একটি চাবি তাঁর কাছে ছিল, ডুল্লিকেট থাকে ঠুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে। সেটি দেখা হয়নি। দ্বিতীয়ত ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে বাবার ও আমার অ্যাকাউন্ট আছে, ঐ ব্যাঙ্কের ভলিউমে তিনি স্বনামে একটি লকারও রেখেছেন। সেটাও দেখা হয়নি। এ দু-জায়গায় যদি না থাকে, তবে আমার আশঙ্কা—আমার বিমাতা সেটা হস্তগত করেছেন এবং নষ্ট করে ফেলেছেন।

বাসু বললেন, তুমি তোমার বিমাতাকে পছন্দ কর না, নয়?

—'পছন্দ করি না' বললে সত্যের অপলাপ হয়। ঘৃণা করি।

—কী নাম তোমার বিমাতার, কোথায় আছেন তিনি?

—গুর নাম 'সুরমা দেবী'। শ্রীনগরেই আছেন। একটি হোটেলে। বস্তুত ছয় অথবা সাত তারিখে তিনি এবং জগদীশ দিল্লী থেকে এখানে এসেছেন, কিন্তু ইন্দানীও ঠুরা এ বাড়িতে ওঠেন না; শ্রীনগরে যে কদিন থাকেন হোটেলেই থাকেন। শ্রীনগরে পৌছেই তিনি আমাকে ফোন করেন, পিতাজী এবং চাচাজীরা খোঁজ করেন, প্রাকটিক্যালি প্রতিদিনই খোঁজ করে চলেছেন। তাঁকে দুর্ঘটনার কথা বলেছি, আঙ্গকালের মধ্যেই তিনি আমাদের বাড়িতে আসবেন।

—কী আশ্চর্য! এখনও তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

—না। এই খবর পেয়েও তিনি আসেননি। আমারও রুচি হয়নি হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার।

—কতদিন হল তিনি মহাদেওপ্রসাদকে বিবাহ করেন?

—বছর তিনেক। আমার মা ছিলেন চিরকল্পা। দীর্ঘদিন ভুগে তিনি মশ' যান। সুরমা দেবী পাশ করা

নার্স। বিধবা। আমার মায়ের শ্রুশ্রু করা জনাই তিনি এ বাড়িতে আসেন। তাঁর একটি সন্তানও আছে। আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়—তারই নাম জগদীশ মাথুর।

—তোমার বিমাতার এইবারের বিবাহ সুখের হয়নি, নয়?

সূর্য মাথা নিচু করে বলল, তাঁর পক্ষে নিশ্চয় সুখের হয়েছে। ইতিপূর্বে নার্সগিরি করে অন্নসংস্থান করতেন; এখন দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছেন। বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু টাকার। বিবাহের পর থেকেই বাবা বস্তৃত গৃহত্যাগী—বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন।

বাসু একটু ইতস্তত করে বলেন, বিষয়টা অপ্রিয়, বিশেষ তোমার পক্ষে, তবু প্রশ্নটা করতে বাধ্য হচ্ছি: তোমার কি ধারণা মহাদেওপ্রসাদ কোনও কারণে এই বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

সূর্য কোনও সন্তোষ করল না। বললে, হ্যাঁ। আমার ধারণা তিনি ঈর্ষা পড়ে এ কাজ করতে বাধ্য হন। আর তারপর থেকেই পিতাজী সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান—ঠিক চাচাজীির মতো।

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন ঠিক আছে, ও অপ্রিয় প্রশ্ন থাক। তুমি বরং খোলাখুলি বল—তুমি আমার কাছে ঠিক কী চাইছ?

—আমি খোলাখুলিই বলছি। আমার বিজ্ঞেন্স-এর সলিসিটর হচ্ছেন 'মেসার্স সাক্সেনা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'। আমি চাই আপনি ঠুন্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করুন—

—মানে সম্পত্তিতে তোমার 'প্রোবট' পাওয়ার বিষয়ে?

—অজ্ঞে হ্যাঁ। দ্বিতীয়ত আমার বাবা স্বাভাবিকভাবে দেহ রাখেননি। আমি চাই, আপনি পুলিশের সঙ্গেও সহযোগিতা করে আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করুন। কে জানে, দুটো ব্যাপার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত কিনা—

—অর্থাৎ তোমার বাবার মৃত্যু এবং তোমার বিমাতার সম্পত্তি লাভ?

—হ্যাঁ। সেটাও আমি জানতে চাই।

বাসু-সাহেব এবার অন্য দিক থেকে প্রশ্ন করেন—তুমি একটু আগে তোমার শিড়দেবের চরিত্রহননের কথা বলছিলেন—সেটা কী? তাছাড়া এয়ারোড্রামে তুমি বলেছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি এমন দুটি খবর...

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুটি কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি আমারই অনুরোধে। তার একটা পুলিশ জানে, দ্বিতীয়টা জানে না। শুধুমাত্র আমিই জানি।

—সে দুটি কী?

—প্রথম খবরটা হচ্ছে এই: পুলিশ গিয়ে যখন ঘরটা সার্চ করে তখন অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তারা দুটি জিনিস উদ্ধার করে যা ওখানে খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। একটা মেয়েদের ব্র্যাসিয়ার এবং একজোড়া উলের কাঁটা, আধাবোনা একটা সোয়েটার ও কিছু উল। আমার বিশ্বাস, হত্যাকারী উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে ওগুলি রেখে গেছে।

—দ্বিতীয়টা? যেটা পুলিশও জানে না?

—আপনি নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন, আমার বাবার একটা পোষা ময়না ছিল। সেটা আমার চাচাজী বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। চাচাজী বস্তৃত এক জাতের পক্ষী-বিশারদ। সালাম আলীর বই এবং বাইনোকুলার তাঁর নিত্য সাথী। তিনি একজন 'বার্ড-ওয়াচার'। পাখির ছবিও ঠেকেছেন অসংখ্য। মোট কথা এই পাখিটা বাবার খুব প্রিয়। তার নাম 'মুন্না'। বাবা যখন দুর্গম কোন অঞ্চলে যান তখন মুন্না আমাদের এই শ্রীনগরের বাড়িতেই থাকে। আর যখন সহজগম্য কোনও জায়গায় যান, তখন ওকে নিয়ে যান। এবার ঐ লগ-কেবিনে ওটাকে নিয়ে গিয়েছিলেন... আশ্চর্যের কথা, পুলিশ ঠুন্ডের কেবিন থেকে যে পাখাডী ময়নাটাকে উদ্ধার করেছে, সেটা মুন্না নয়! ঠিক একই রকম দেখতে আর একটা ময়না।

## কাটায়-কাটায়-২

কৌশিক এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিল। আর যেন ধৈর্য রাখতে পারল না। বলে বসল, আপনি নিঃসন্দেহ?

—সন্দেহাতীতভাবে!

—কেমন করে জানলেন?

—প্রথম কথা, মুন্না যে বোলগুলো পড়ত—‘হ্যালো’, ‘রাম-রাম’, ‘আইয়ে—বৈঠিয়ে—চায়ে পিজিয়ে’, ‘সীতারাম’—তার একটাও এ ময়নাটা বলতে পারে না। পুলিশের অনুমতি নিয়ে ওটাকে আমি বাড়ি নিয়ে এসেছি। এ দুদিনে সে তার অভ্যস্ত ‘বোল’-এর একটাও বলতে পারেনি।

বাসু-সাহেব বলেন, পোষা জন্তু-জানোয়ার তার মালিকের অভাবটা অদ্ভুত ভাবে বুঝতে পারে। আমরা সেটা বুঝতে পারি না, কিন্তু সব রকম পোষমানা জন্তুর মধ্যেই দেখা গেছে—তার সত্যিকারের ‘মাস্টার’-এর অনুপস্থিতিটা...

ওকে রাখাপথে খামিয়ে দিয়ে সুর্যপ্রসাদ বলে ওঠে, পার্ডন মি ফর ইটারাপশান, স্যার—আমার দ্বিতীয় যুক্তিটাও শুনুন—মুন্নার ডান পায়ের মাঝের আঙুলটা অনেকদিন আগে কাটা গিয়েছিল—কেবিন থেকে যে ময়নাটাকে আমরা এনেছি তার দুটি পায়ের সব কটা আঙুলই আছে!

বাসু-সাহেবের ব্রুক্‌লনটা দুটি এড়ালো না কারও। উনি বলে ওঠেন, কিন্তু কেন? হত্যাকারীই হোক বা যেই হোক, ময়নাটাকে বদলে দিয়ে যাবে কেন?

সুর্যপ্রসাদ বলল, আমি স্যার এ জিনিসটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমার মনে একটা সন্তাবনার কথা জেগেছে। হয়তো শুনতে উদ্ভট লাগবে তবু আমার যুক্তিটাও শুনুন। ‘মুন্না’ ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত তাড়াহাড়ি কোনও ‘বোল’ শিখে ফেলত। আমার মনে আছে, একবার রাস্তা দিয়ে একদল শববাহী যাচ্ছিল। আমাদের বাড়ির সামনে তারা একবার মাত্র হুংকার দিয়েছিল ‘রাম নাম সং হ্যায়’। মুন্নার খাচাটা ছিল বারান্দায়। একবার মাত্র শুনেই সে বলে উঠল ‘রাম নাম সং হ্যায়’।

—তাতে কী হল?

—আমার বিশ্বাস—মৃত্যু-সময়ে বাবা হয়তো চীৎকার করে উঠেছিলেন আততায়ীর নাম ধরে। এবং হত্যাকাণ্ডের পরেই হয়তো মুন্না ঠিক একই ধরে হত্যাকারীর নামটা বলে ওঠে। এজন্যই...

এবার বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলে ওঠেন—উহু! মিলছে না! সেক্ষেত্রে হত্যাকারী মুন্নাকেও শেষ করে দিয়ে যেত! ঠিক একই রকম দেখতে আর একটা ময়না যোগাড় করে ঐ ধরে দ্বিতীয়বার পদাৰ্পণ সে কখনই করত না।

সুর্যপ্রসাদ হার স্বীকার করল। বলল, তা ঠিক।

মিনিটখানেক চোখ বুজে কী ভেবে নিয়ে বাসু বলেন, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে—ঐ পাহাড়ী ময়নাটার পথ ধরেই আসল হত্যাকারীকে বুজে পাওয়া যেতে পারে। পাড়াও, মুন্নার ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিছি। তুমি নিশ্চিতভাবে জান যে, মুন্নাই ছিল ওঁর কেবিনে?

—সেটাই একমাত্র সন্তাবনা। এ বছর অগস্ট মাসে পিতাজী অমরনাথ তীর্থে যান। সেখানে যাবার আগেই উনি চিঠি লিখে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর উনি ত্রীনগরে আসবেন। এবং ঐদিনই বিকালে ট্রাউট-প্যারাডাইসে চলে যাবেন। লিখেছিলেন, ব্যাক অব ইন্ডিয়াতে ওঁর কী একটা জরুরী কাজ আছে। আর ওঁর সেক্রেটারী গঙ্গারামজীকেও জানিয়েছিলেন—তিনি যেন অতি অবশ্যই পাঁচ তারিখ ত্রীনগরে থাকেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, উনি দিনতিনেক আগেই এসে উপস্থিত হন—অর্থাৎ তার আগের শুক্রবার, দোশরা সেপ্টেম্বর, সকালে। পিতাজী বাড়িতে এসেই গঙ্গারামজীকে নিয়ে ব্যাঞ্চে চলে যান। বারোটা নাগাদ দুজনেই একসঙ্গে ফিরে আসেন; এবং তারপরই একটা সুটকেস আর মুন্নাকে নিয়ে তিনি চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন, বিন দুই পহেলাগাওয়ে থেকে মৎস্য মরশুমের আগেই পাঁচ তারিখ বিকালের মধ্যে তিনি ট্রাউট-প্যারাডাইসে চলে

যাবেন। বহুত অগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে একটা লগ্-কেবিন ঠুর নামে বুক করা ছিল। ঠিক কোনটা আমি অবশ্য জানতাম না।

বাসু প্রশ্ন করেন, কী কারণে পাঁচ তারিখ সকালে আসবেন জানিয়েও তিনি দিনতিনেক আগে চলে এসেছিলেন আদ্যাক করতে পার?

—তা বোধ হয় পারি। অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে, তারিখটা আমার মনে নেই, দিল্লী থেকে জগদীশ আমাকে টেলিফোন করে জানানয়, সেক্টরের ছয় তারিখে মনিং ফ্লাইটে সে তার মাকে নিয়ে এখানে আসছে। আমাকে সে অনুরোধ করে, আট তারিখ সকালের ফ্লাইটে ওদের দুজনের জন্য দিল্লীর দুখানি টিকিট কেটে রাখতে। সম্ভবত পিতাজী তাঁর সেক্রেটারীর কাছ থেকে এ খবরটা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর প্রোগ্রামটা বদলে ফেলেন। মানে, তিনি আমার বিমাতার সম্মুখীন হতে চাইছিলেন না।

—কিন্তু মুন্না যে বদল হয়ে গেছে এ খবরটা তুমি পুলিশকে জানাওনি কেন?

স্বয়ংপ্রসাদ একটু অশান্তভাবে মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বেশ বোঝা যায় লোকটা নিতান্ত ক্লান্ত। সেহে ও মনে। আবার সোজা হয়ে বসে বলল, আপনি যাই বলুন বাসু সাহেব, আমার ধারণা পুলিশ এ রহস্যের কিনারা কিছুতেই করতে পারবে না। পুলিশের কতকগুলো বাধাধরা ছক আছে। ঘটনা যদি সেই খাতে না চলে ওরা নিতান্ত নাচার। এজন্যই আমি আপনাকে কলকাতায় ট্রান্সকল করেছিলাম। আমার ধারণা, এই হত্যা রহস্যের উদ্ঘাটন আপনার মত লোকের পক্ষেই করা সম্ভব। আপনি নেবেন সে দায়িত্ব?

বাসু-সাহেব আড়চোখে উপস্থিত তিনজনের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন, ঘটনাখনেক সময় নিশ্চি। তুমি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছ তো? আমি টেলিফোন করে জানাব।

রানী দেবী বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, মিছি মিছি সময় নষ্ট করে কী লাভ? আমরা সবাই স্বয়ংপ্রসাদের হয়ে সুপারিশ করছি।

বাসু আবার একবার সকলের উপর নজরটা চালিয়ে নিয়ে বললেন, অলরাইট, আই অ্যাক্সেস্ট! তৎক্ষণাৎ স্বয়ংপ্রসাদ তার পকেট থেকে একটা বন্ধ খাম বার করে টেবিলের উপর রাখল। বললে, থ্যাঙ্ক স্যার।

—ওটা কী?

—আপনার ‘রিটেইনার’ এবং আমার তরফে আপনার নিয়োগপত্র, যাতে পুলিশ আপনাকে সাহায্য করে।

বাসু হেসে বলেন, তুমি তো খুব সিস্টেম্যাটিক?

—তা বলতে পারেন। আচ্ছা চলি নমস্কার।

দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায়। বলে, ও! দুটো কথা বলার আছে আরও। প্রথম কথা, আমার বিমাতা ও জগদীশ প্রসাদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আপনাকে টেলিফোন করব এবং গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার ইচ্ছা, তাঁর সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হবে তা আপনার উপস্থিতিতে হওয়া চাই। দ্বিতীয় কথা, পহেলাগাঁওয়ের ও. সি. যোগীন্দর সিংজী একটু আগে আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন—দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থার অর্থাৎ সি. বি. আই.—এর একজন সিনিয়ার অফিসার সরেজমিনে তদন্ত করতে আসছেন। আজ বিকালেই যোগীন্দর সিংজী তাঁকে নিয়ে লগ্-কেবিনটা দেখতে যাবেন। আপনি কি যাবেন?

বাসু বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও! এর মধ্যে সি. বি. আই. চুকল কেমন করে?

—আগেই বলেছি, পিতাজী একজন প্রাক্তন এম. পি.। তাঁর একটা পোলিটিকাল কেরিয়ার আছে। যদিও তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তবু এটা রাজনৈতিক-কারণে হত্যা হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই—

বাসু বলেন, বুঝলাম। ঠুরা কখন যাচ্ছেন?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—যোগীন্দ্র তো বললেন পহেলগাঁও থেকে বেলা চারটে নাগাদ রওনা হবেন। তাহলে সাড়ে চারটে নাগাদ ঐ লগ্ কেবিনে পৌঁছে যাবেন।

—ঠিক আছে। তুমি বেলা একটা নাগাদ আমাকে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিও।

সূর্য বলে, আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হত; কিন্তু এদিকে আমার অনেক কাজ জমে গেছে। সন্ধ্যার পর জগদীশ্বর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে জানিয়েছে। চাচাজীও যে-কোন মুহুর্তে এসে পৌঁছাতে পারেন।

—চাচাজী; মানে প্রীতমপ্রসাদ? তিনি কোথায় আছেন?

—না, না। প্রীতমপ্রসাদজী কোথায় আছেন আমরা কেউ খবরই রাখি না। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখে তিনি যদি নিজে থেকে যোগাযোগ করেন তবেই হয়তো ব্রাহ্মবাসরে তাঁকে পাব। কিন্তু তিনি বোধহয় ইদানীং খবরের কাগজও পড়েন না। 'চাচাজী' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি শ্রীগঙ্গারাম যাদবকে। তিনি আমার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী। পুরানো আমলের লোক, বাবারই বয়সী। তাঁকেই আমি 'চাচাজী' ডাকি। কী একটা জরুরী কাজে তিনি ঐ ছয় তারিখের মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লী গেছেন। ট্রান্স-লাইনে খবরটা তাঁকে জানিয়েছি। আশা করছি, আজই তিনি এসে পড়বেন।

—দোসরা তারিখে তোমার বাবা ব্যাঙ্ক এসে কী-জাতের ট্রানজ্যাকশান করেন তা জানো না? গঙ্গারাম কিছু বলতে পারেননি?

—ট্রান্স-টেলিকোনে অত কথা কিছু হয়নি। তাছাড়া হঠাৎ খবরটা শুনে উনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পিতাজীর অধীনস্থ কর্মচারী হলেও তাঁর সঙ্গে ঠার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, প্রায় বন্ধুস্থানীয়। বয়সটা সমান হওয়াতেই বোধ হয়। উনি শূণ্য বললেন, এখনই আমি যাচ্ছি! অ্যাভেইলবল্ নেজ্‌ট ফ্লাইটে।

—এখানকার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে তোমার বাবার এ্যাকাউন্ট আছে, ভাণ্টে লকানও আছে। সেখানকার ম্যানেজার কিছু বলতে পারছেন না?

—আমি খোঁজ নিইনি।

—তাহলে এখনই চল। পোলিটিক্যাল মার্ডার যদি না হয়, তাহলে দোসরা তারিখের ঐ ব্যাঙ্কের জরুরী কাজ এবং ছয়ই তাঁর জীবনাবসানের মধ্যে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট। দশটা বেজে গেছে। চল, প্রথমেই ব্যাঙ্ক দিয়ে, শূন্য করি।

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজার মিস্টার অশোক সোঙ্কী তাঁর ক্লায়েন্ট সূর্যপ্রসাদকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন। ঠগের আপ্যায়ন করে বসিয়ে প্রথমেই সূর্যের পিতৃবিয়োগের জন্য অনুশোচনা ও সাহায্য-বাক্য শোনালেন। বললেন, শহরে একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল!

সূর্য তাঁর সঙ্গে ব্যারিস্টার-সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিল এবং জানালো, তার পিতৃদেবের রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়ে উনি তদন্ত করছেন।

সোঙ্কী সবিনয়ে জানায়, বলুন স্যার? আমি সর্বাঙ্গিকরণে আপনাকে সাহায্য করব। মানে, যেক্টু আমার সাধ্য।

বাসু বললেন, মিস্টার সোঙ্কী, আমি ঐ দোশরা তারিখের ট্রানজ্যাকশানের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই। ঠিক কী ঘটেছিল, যতটা আপনার মনে আছে আনুপূর্বিক বলে যান।

—আমি খুব ডিটেলস্-এ আপনাকে বলতে পারব। কারণ সেটাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। সংবাদপত্রে খবরটা পড়ে আমি সেদিনের ঘটনাটা আনুপূর্বিক মনে মনে আলোচনা করেছিলাম। শুনুন: দোশরা শূক্রবার ঠিক ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই উনি আর মিস্টার যাদব আমার ঘরে আসেন। উনি বলেন—

—জাস্ট এ মিনিট। আমি আরও ডিটেইল-এ শুনতে চাই। তখন ঠর পরনে কী পোশাক ছিল, হাতে কী ছিল, ঠেকে উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল কি না—

—ঠর পরিধানে কী ছিল, আমার ঠিক মনে নেই। হাতে ছিল একটা ফোলিও ব্যাগ। না, ঠকে প্রথমবার মোটেই উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল না—

—প্রথমবার মানে?

—আমাকে বলতে দিন, স্যার। পর পর ঘটনাগুলো বলে যাই। তারপর আপনি প্রশ্ন করবেন।

—অলরাইট।—বাসু পাইপ ধরালেন।

—ঠরই সেদিন আমার প্রথম ক্রায়েন্ট। সকাল দশটা পাচ, কি দশটা দশ হবে। ঠরা দুজনে একসঙ্গেই এলেন। দু'একটা মামুলী সৌজন্য বিনিময়ের পরেই মিস্টার খান্না ঠার ফোলিও-ব্যাগ খুলে এক ব্যক্তি ফিল্ড ডিপসিট-এর সার্টিফিকেট বার করলেন। কতগুলো তা আমার মনে নেই, কিন্তু সব কটা সার্টিফিকেট মিলিয়ে ফিল্ড-ডিপসিটের অঙ্কটা পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ বাদে। সবগুলিই ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার, কনোট সার্কার্স, দিল্লী ব্রাঙ্কের। উনি সেগুলি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এগুলি আমানত হিসাবে জমা দিয়ে উনি পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্ত্ত করতে চান। আমি জবাবে বললাম, যেহেতু এগুলি অন্য ব্রাঙ্কের ফিল্ড ডিপসিট তাই আমার পক্ষে সেগুলি সিকিউরিটি হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। উনি বললেন, 'কেন, এ তো আপনাদেরই ব্যাঙ্কের, এগুলি তো আমি গচ্ছিত রাখছি।' আমি জবাবে বললাম, 'স্যার, এটাই সব ব্যাঙ্কের নিয়ম। ধরুন আপনি তো দিল্লী ব্রাঙ্কে জানাতে পারেন যে, এই সার্টিফিকেটগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তখন ইভেমিনিটি-বন্ড দিয়ে আপনি সেখান থেকে টাকা তুলে নিতে পারেন।' তখন উনি বললেন, 'এই সার্টিফিকেটগুলি যদি আপনি দিল্লী ব্রাঙ্কে পাঠিয়ে দেন?' তারা কনফার্ম করলে নিশ্চয়ই আপনি লোনটা দিতে পারেন?' তার জবাবে আমি বললাম, 'তাতে স্যার দিন দশ-পনের দেরি হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি মিস্টার যাদবকে এগুলি দিয়ে দিল্লী পাঠিয়ে দেন, মিস্টার যাদব তো আপনার জেনারেল পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নি হোল্ডার। এগুলি জমা দিয়ে তিনি আপনার তরফে পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বণ নিতে পারেন। দিল্লী ব্রাঙ্ক এই ব্রাঙ্কের উপর আপনার নামে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পেমেন্ট করবে, এবং আমি নগদে টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব। তাহলে আপনি তিন চার-দিনের মধ্যেই টাকাটা নগদে এখানে বসেই পেয়ে যাবেন। উনি শূনে কিছু বললেন না, মনে হল উনি তাতেই রাজি হলেন। ফিল্ড-ডিপসিট সার্টিফিকেটগুলি ঠর ফোলিও ব্যাগে ভরে এরপর ঠর ভন্টে গেলেন। মিস্টার যাদব এ ঘরেই বসে রইলেন। আমি আর মিস্টার খান্না আন্ডার-গ্রাউন্ড ভন্টে গেলাম। ঠর হাতে তখনও সেই ফোলিও ব্যাগটা ছিল। আমি আমার চাবি দিয়ে ঠর লকার খুলে দিয়ে চলে এলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে উনি ফিরে এলেন। এবং দুজনে চলে গেলেন। তখন বেলা দশটা পঁচিশ-ত্রিশ হবে।

—তারপর?

—তারপর উনি দ্বিতীয়বার আসেন, এবার একা—ঐ দিনই বেলা ঠিক দুটোর সময়। সময়টা আমার মনে আছে, কারণ ঠকে দেখেই আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, ব্যাঙ্কের আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। এখন উনি কোনও চেক ভাঙতে চাইলে আমি বিরক্ত হয়ে পড়ব। সেবার ঠর হাতে ছিল একটা মাঝারি-সাইজ স্ট্রেকশ আর একটা ঠাচার একটা ময়না। এইবার ঠকে উদ্ভ্রান্ত মনে হল। এসেই বললেন, 'মিস্টার সোম্বী, আমার লকারটা জয়েন্ট-নামে করতে চাই। আমার ছেলের সঙ্গে।' আমি বললাম, 'সেটা কিছু শক্ত নয়, মিস্টার সুর্যপ্রসাদকে নিয়ে আসুন। আমার খাতায় একটা এন্ট্রি করতে হবে, ঠার স্পেসিমেন সিগনেচারটাও লাগবে।' তাতে উনি বললেন, 'আমার একটা ভাড়াভাড়া আছে। আমি যদি একটা চিঠি দিই আপনাকে—আমার পুরকে জয়েন্ট হোল্ডার হিসাবে, তাহলে হয় না? ওর নিজস্ব অ্যাকাউন্ট তো আছে আপনার এই ব্রাঙ্কে। সেই খান্নরই ডায়াল্ড হবে। হয় না?' আমি তাঁকে বললাম, 'সাধারণ ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে আপনাকে এবং আপনার পুরকে আমি

## কটায়-কটায়-২

ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এক্ষেত্রে আপনার চিঠি আমি সাময়িকভাবে মেনে নেব। তবে, যত শীঘ্র সম্ভব আপনি একদিন মিস্টার সূর্যপ্রসাদকে নিয়ে এসে ফর্মালিটিগুলি সেয়ে যাবেন।’ উনি রাজী হলেন। সূটকেস খুলে একটি লেটার হেড প্যাড বার করে ঐ মর্মে আমাকে একটি চিঠি লিখে দিলেন।

মিস্টার সোঙ্কী সেই চিঠিখানি বার করে দেখালেন। বাসু সেটি পরীক্ষা করে ফেরত দেবার সময় বললেন, তাহলে আমার ক্লায়েন্ট এখনই ঐ ভল্টটা খুলে দেখতে পারেন?

—পারেন, যদি চাবিটা তাঁর কাছে থাকে। আছে কি?

সূর্য মাথা নেড়ে জানালো, সে জানে না, চাবিটা কোথায়।

বাসু বললেন, আপনি দয়া করে দেখবেন, ঠর অ্যাকাউন্ট থেকে সম্প্রতি কোনও বড় রকমের উইথড্রয়াল হয়েছে কিনা?

সোঙ্কী তৎক্ষণাৎ লেজারটা চেয়ে পাঠালেন। দেখে বললেন, শেষ উইথড্রয়াল হয়েছে অগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে, হাজার টাকা। ঐ অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স আছে ৪,৭৩৫.১৫ টাকা।

বাসু ঠুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

সূর্য ঠুকে হাউসবোটে পৌছে দিয়ে বিদায় নিল। বাসু বললেন, তাহলে ঠিক দেড়টার সময় একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি পহেলগাঁও যাব। আর ঐ সঙ্গে তোমার বাড়িতে যে বোবা ময়নাটা আছে সেটাকেও আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

সূর্য প্রস্থান করলে বাসু-সাহেব বললেন, আমার দোষ নেই রানু, কাজটা তুমিই আমার ঘাড়ে চাপালে। সে যা হোক, তোমরা দুজনে তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে আজ পহেলগাঁও অঞ্চলটা বেড়িয়ে আসবে। দেড়টার সময় গাড়ি আসবে।

রানু বললেন, দুজন মানে? বাদ যাচ্ছে কে?

—কৌশিক। তাকে শ্রীনগরেই থাকতে হবে: কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন কৌশিক, আগেই বলেছি—আমার ইন্টুইশান বলছে, ঐ পাহাড়ী ময়নাটাকে ঘিরেই রহস্য-সমাধানের মূল চাবিটা রয়েছে। যে কোন কারণেই হোক আভ্যাতময়ী ময়নাটাকে বদলে দিয়েছে। সময় সে খুব বেশী পায়নি। সুতরাং হয় পহেলগাঁও অথবা শ্রীনগরের বাজার থেকে সে ঐ দ্বিতীয় ময়নাটাকে কিনেছে। তুমি ওবেলা শ্রীনগরের বাজারটাকে চবে ফেল। দেখ, এখানে এমন কোনও দোকান আছে কিনা—যারা টিয়া, ময়না, বদরিকা ইত্যাদি বেচে।

কৌশিক কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললে, ভাল কাজ দিলেন যা হোক—

—আর শোন ঐ সঙ্গে বাজারে গিয়ে খোঁজ নিও উলের দোকান কটা আছে।

—উল?

—হ্যাঁ, উল। লগ্ন-কবিনে যে আধবোনা সোয়েটারটা পাওয়া গেছে তার রঙ ঘটনাচক্রে যদি একটু বেগুট ধরনের হয় তাহলে আমরা ঐ নমুনা দেখিয়ে খোঁজ নিতে পারব এমন উল সম্প্রতি কে কিনেছে। ঐ উলের কাঁটাটাও আমাকে খোঁচাচ্ছে।

কৌশিক বলে, কিছু শ্রীনগরের বাজারেই কেনা হয়েছে কেমন করে জানলেন?

—জানি না। পহেলগাঁয়েও হয়ে থাকতে পারে; কিছু সেখানে তো আমরাই যাচ্ছি। খোঁজ নেব। তুমি শ্রীনগরটা দেখ।

—এটা রীতিমত ‘ওয়াইল্ড-গুজ-স্ট্র’ হয়ে যাচ্ছে না বাসু মামা?

বাসু বললেন, যাচ্ছে। কোন একটা দিক থেকে শুরু তো করতে হবে। তাছাড়া যাকে আমরা ঝুঁজছি সে ঠিক ‘ডোমেস্টিক গুজ’ নয়। এটাই আমার বিশ্বাস।





দুই

পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথ দিয়ে অ্যাশ্বাসাড়ার গাড়িটা বিসর্পিল পথে ক্রমশঃ উপরে উঠছে। পিছনের সীটে বসেছেন রানু আর সুজাতা, ড্রাইভারের পাশে বাসু-সাহেব। খোদাবল্ল দুটি বড় টিফিন-ক্যারিয়ারে বৈকালিক জলযোগ এবং বড় ফ্রাঙ্কো কফি দিয়েছে। কোকরনাগ থেকে আচ্চাবলের দিকে যে পাকা রাজপথটা গিয়েছে সেই পথেই কোকরনাগ থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে একটা কাঁচা সড়ক। পাঁচ নেই বটে, তবে সব রকম গাড়িই চলে। এ পথটা ঘুরে গিয়ে মিশেছে পহেলগাঁও। ঐ পথের ধারে 'লীডার' নদীর কিনারে 'ট্রাউট-প্যারাডাইস'। কোকরনাগ এবং পহেলগাঁওয়ের মাঝামাঝি দূরত্বে। ড্রাইভার কিলোমিটারের হিসাব এড়িয়ে জানালো ষাঁচিশ মিনিট ড্রাইভিং দূরত্বে। এ-পথে দিনে একখানি বাস যায়, একখানি ফেরে। তবে ট্রাউট সিঙ্কনে— সেন্টেশ্বর-অক্টোবর মাসে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গ্রাইভেট গাড়ি এবং ট্যান্ডিও।

কোকরনাগ ছাড়বার পরেই সমস্ত লীডার উপত্যকাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রানী দেবী বললেন, তোমার যদি তাড়া না থাকত, তাহলে আমরা এখানে একটু বসতাম। কিন্তু তুমি তো—

কথাটা শেষ হল না। বাসু-সাহেব ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন গাড়িটা থামাতে। রানী দেবীর দিকে ফিরে বললেন, কল্যাণ বেচতে এসেছি বলে রথ দেখব না কেন? দু-দশ মিনিট দেবী হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। নাম সুজাতা।

গাড়িটা পথের পাশে দাঁড় করিয়ে সুজাতা আর বাসু-সাহেব নামলেন। রানী দেবীর নামার উপায় নেই। হুইল চেয়ারটা আনা হয়নি। উনি গাড়ির কাচটা নামিয়ে দিয়ে কলত্রোতা 'লীডার' নদীর উপলবন্ধুর নৃত্যচ্ছন্দ তুচ্ছ ভরে দেখতে থাকেন। বাসু-সাহেব হঠাৎ বললেন, দেখি সুজাতা বাইনোকুলারটা দাও তো। ওই নিচে যে গাড়িটা আসছে, মনে হচ্ছে ওটা পুলিশ-ভ্যান। নয়?

সুজাতা যন্ত্রটা গুর হাতে দেয়। দেখে নিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, ই্যা, যা ভেবেছি ঠিক তাই। যোগীন্দ্র সিং সেই সি. বি. আই.য়ের অফিসারটিকে নিয়ে আসছে।

অনতিবিলম্বে বিসর্পিল পথে পাক খেতে খেতে গাড়িটা এসে উপনীত হল। ওঁদের অতিক্রম করে এগিয়ে গেল না কিছু। একটু দূরে গিয়েই থামল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিনজন। পুলিশের পোশাকে থানা-অফিসার যোগীন্দ্র সিংকে চিনতে অসুবিধা হল না—আকালি শিখ তিনি— গৌফ-দাঁড়ি-পাগড়ি-কড়ায় তিনি চিহ্নিত। অপর দুজনেই স্মুট পরেছেন। একজনকে হঠাৎ চিনতে পারলেন বাসু-সাহেব। সতীশ বর্মণ। অনেকবার অনেক কেস-এ দুজনের মোলাকাং হয়েছে। সতীশ হাড়ে হাড়ে চেনে বাসু-সাহেবকে।

সতীশ করমর্দনের জন্য হাতটাও বাড়িয়ে দিল না, নমস্কারও করল না। বিশ্বয় বিস্ময়াক্রান্ত চক্ষে শুধু বলল, আপনি? এখানে? কী ব্যাপার?

বাসু হেসে বললেন, আদ্যর্ঘ্য কাকতালীয় ঘটনা। ঠিক ঐ প্রক্সটাই যে আমি পেশ করতে চাই: আপনি? এখানে? কী ব্যাপার?

সতীশ বলল, আমি এখন ডেপুটেশানে সি. বি. আই.-তে আছি। একটা তদন্তের ব্যাপারে এসেছি। কিছু আপনি? ছুটিতে?

বাসু তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অপর দুজনের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার নাম সি. কে. বাসু, আপনাকে অবশ্য আমি আন্দাজে চিনতে পারছি যোগীন্দ্র সিংজী; কিছু বর্মণ তৎক্ষণাৎ নিজের ক্রটি

## কাটায়-কাটায়-২

সংশোধন করে বলে, আয়াম সরি, আমরাই ইন্ট্রোডিউস করে দেবার কথা। হ্যাঁ, উনি মিস্টার যোগীন্দর সিং, ও. সি. পহেলগাঁও; ইনি মিঃ জে. কে. শর্মা এখানকার সিভিল এস. ডি. ও.। আর ইনি মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল।

বাসু-সাহেব ওদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বর্মনের সঙ্গেও।

শর্মা বললেন, মিস্টার পি. কে. বাসু? ব্যারিস্টার? আপনিই কি...

বাসু-সাহেব ঠুঁকে মাঝপথে থামিয়ে বললেন, আর এ হচ্ছে সুজাতা, মিসেস সুজাতা মিত্র।

সুজাতা হাত তুলে সমবেত ভাবে সকলকে নমস্কার করল।

শর্মা তার অসমাপ্ত প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করার পূর্বেই সতীশ বর্মন পুনরায় বলে, আপনি কিছু আমার প্রশ্নটার জবাব দেননি। ছুটিতে?

এবারও বাসু-সাহেব সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না। পকেট থেকে একটি খাম বার করে তার থেকে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দেন শর্মাজীর দিকে, যেন তাঁর অসমাপ্ত প্রশ্নের জবাব হিসাবেই।

শর্মা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন, ঠিকই ধরেছি তাহলে।

—কী ওটা? দেখি দেখি—বর্মন কাগজখানা নিয়ে দেখে। বলে, সূর্যপ্রসাদ আপনাকে নিয়োগ করছে?

—চিঠিটা কি তাই বলছে না?

—হুম্। কিন্তু কেন? কী চায় সে আপনার কাছে? কী বলেছে?

—চায়—দোখীর শাস্তি হ'ক। বলেছে—পুলিসের সঙ্গে যেন আমি সহযোগিতা করি।

কোথাও কিছু নেই অট্টহাস্য ফেটে পড়ে সতীশ বর্মন। কোন রকমে হাসির দমক সামলে বলে, বাসু-সাহেব, আপনার এই 'জোকটা এ বছরের শ্রেষ্ঠ জোক। পি. কে. বাসু— বার-অ্যাট-ল—'দ্য গ্যারী ম্যাসন অব দ্য ট্রস্ট' পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন! ভাবতেই আমার হাসি আসছে। এ যেন বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে! ওফ্।

আবার হাসির দমকে ভেঙে পড়ে বর্মন।

বাসু-সাহেব এস. ডি. ও. শর্মা সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, যেহেতু কোন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার নির্দোষ অভিযুক্তের হয়ে সওয়াল করে তাই সে আরক্ষাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবে না?

বর্মন হাসি থামিয়ে বলে, মায়ের কাছে আর মাসির গল্পো শোনাবেন না ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনি আজীবন পুলিসের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন! যাননি?

বাসু বললেন, বরং উন্টোটাই। পুলিসের কাজ প্রকৃত অপরাধীকে ধরা। সে কাজে আমি আজীবন পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছি। করিনি?

—সেটাকে সহযোগিতা বলে না। আপনি শুধু আপনার 'ক্লায়েন্ট'দের নির্দোষ প্রমাণ করে গেছেন। অস্বীকার করতে পারেন?

বাসু হেসে বলেন, কী আশ্চর্য! তার জন্য কি আমি দায়ী? আপনারা যে ক্রমাগত নিরপরাধীদের ধরে ধরে এনে কাঠগড়ায় তুলেছেন!

সতীশ বর্মন জবাবে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে শর্মা বলে ওঠেন, এনাথ অব ইট। শুনুন আপনারা। এ নিয়ে ঝগড়া করার কোন মানে হয় না। আমি এই সাবডিভিশনের এস. ডি. ও.। কালেকটরের নির্দেশে আমি যাবতীয় ব্যবস্থা করছি। হ্যাঁ, স্বীকার করছি—ব্যাপারটা এমনই রহস্যময় যে, এখানকার স্থানীয় পুলিশ প্রকৃত 'এক্সপার্ট'দের সাহায্য চায়। কালেকটর-সাহেব সি. বি. আই.-এর কাছে আবেদন করেছিলেন—বর্মনসাহেব স্বয়ং এসেছেন, তাতে আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। দেখা যাচ্ছে—অ্যাড্‌ভিড পার্টি, আই মীন, নিহত মহাদেওপ্রসাদের পুত্র ঐকে নিয়োগ

করেছেন এ রহস্যজ্ঞান ভেদ করতে। মিস্টার পি. কে. বাসুকে যদিও আজ আমি প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম, কিন্তু ঠুর অনেক কীর্তি-কাহিনী আমার জানা। এ-ক্ষেত্রে কালেক্টরের তরফে আমি বলব, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে চাই—তার নিজস্ব কায়দায় সমাধানে পৌছাতে। আমি তো বুঝি—যদি কোন আইনজীবী নিরপরাধীকে নির্দোষ প্রমাণ করে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করেন, তবে তিনি সমাজের উপকারই করেন। মিস্টার বাসু, আপনাকে সর্বতোভাবে আমরা সাহায্য করব।

সতীশ বর্মণ গুম খেয়ে গেল। তিন্ত হাসির সঙ্গে মিশিয়ে বলে ঠিক আছে মিস্টার শর্মা। এটা আপনারই কেসনের আসর—আপনিই মূল-গায়ন। যদি খ্যামটার সুরে আসর জমাতে চান, সেই সুরেই কেসন গাইব!

শর্মার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কথাটা চাপা দিতে বাসু-সাহেব শর্মা'কে বলেন, আপনার গাড়ির পিছন পিছনই আসছি আমি। আপনি কি লগ-কেবিনটা চেনেন?

জবাব দিলেন যোগীন্দ্র সিং। বলেন, আসুন আপনি। আমি ভাল রকমই চিনি। কাল প্রায় সারাটা দিনই ওখানে ছিলাম আমি।

বাসু প্রশ্ন করেন, মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে ঘরে কি বেশি কিছু নাড়াচাড়া করা হয়েছে?

—কিছুমাত্র না। আমরা শুধু মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছি, আর পিস্তলটা। না ভুল বললাম—ময়না পাখিটাকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর মাছের পলোটা। পচে দুর্গন্ধ উঠছিল তা থেকে। যাই হোক, চলুন। আলো থাকতে থাকতে সব কিছু সারতে পারলেই ভালো।

আগু-পিছু দুখানি গাড়ি রওনা দিল।

মিনিট পনেরো পাহাড়ী পথে ড্রাইভ করার পর সামনের গাড়ির ডান দিকের ব্যাক-লাইটটা রক্তাভ এক-চোখে পিটপিট করে জানান দিল এবার ডাইনে মোড় নিতে হবে। পীচের সড়ক ছেড়ে পাথর-বাঁধানো কাঁচা রাস্তায়। দু-ধারে ঘন পাইনের গাছ কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বনপথের উপর ঝুঁকে পড়েছে। ফলে বনপথ পাইন ফলে আকীর্ণ। মাঝে মাঝে দু-একটা কাঠের বাড়ি। লীডার নদীকে গাড়িতে বসে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা সাইন-বোর্ড: 'ট্রাউট প্যারাডাইস'—তার তলায় ছোট হরফে কী যেন লেখা, বোধ হয় বিনা অনুমতিতে মাছ ধরা যে বে-আইনী তারই বিজ্ঞপ্তি। দ্রুতগতিতে গাড়িটা অতিক্রম করায় বিজ্ঞপ্তিটা পড়া গেল না। একটু পরেই সামনের গাড়িটা থামল। আগু-পিছু দুখানি গাড়ি পার্ক করা হল। সামনের গাড়ির আরোহীরা নামলেন। বাসু-সাহেবও।

যোগীন্দ্র সিং এগিয়ে এসে বললেন, বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। বেশিদূর নয়, তিন-চার শ' গজ, ঐ দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁক দিয়ে।

রানী দেবী বাহিনোকুলায়টা তুলে নিয়ে দেখলেন। পাইনকাঠের লগ-কেবিনটা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে গেছে। মনে হয় না ওটা মানুষের তৈরী। যেন পাইন গাছগুলোর মতই ওর শিকড় গাড়া আছে উপলব্ধির মাটির গভীরে। একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ।

যোগীন্দ্র সিং বললেন, ওরা বরং এখানেই অপেক্ষা করুন। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। চারজনে পাইনফলের কাপেট-বিছানো পথে অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পরে উপনীত হলেন লগ-কেবিনটার দ্বারদেশে। একজন কনস্টেবল বসেছিল ঐ কুটিরের বারান্দায়। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

যোগীন্দ্র বললেন, সব ঠিক হ্যাঁয় না বাহাদুর?

শোকটা বললে, জী সাব!—পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে দিল।

শর্মা'জী বলেন, আসুন আপনারা।

সতীশ বর্মণ ছিল ঠিক পিছনেই। দরজাটা আগলে বলে, দেখুন শর্মা'জী, প্রয়োজনের বেশি আমরা

## কাটায়-কাটায়-২

ঘরটার ভিতরে থাকব না। হয়তো অনেক কিছু 'ক্ল' এখনও ছড়ানো আছে ঘরটার ভিতর। আনাড়ি হাতে আপনারা সব তখনই করে দেবেন না। সবর আগে বলুন—ফিসারপ্রিন্ট কিছু পাওয়া কিছু গেছে?'

যোগীন্দর বলেন, হ্যাঁ অনেকগুলি। অধিকাংশই মহাদেও প্রসাদের। মৃতদেহ অপসারণের আগে অনেকগুলি ফটোও নেওয়া হয়েছে। শর্মাজী যা বললেন—অর্থাৎ মৃতদেহ, শিশু, ময়না ও পাচা মাছ ছাড়া এ ঘর থেকে আর কিছুই অপসারিত হয়নি। যেখানে যা ছিল তাই আছে।

সতীশ বর্মণ গম্ভীর হয়ে বলেন, দাটস্ গুড। আমি বলি কি শর্মাজী—প্রথমে মিস্টার বাসুকে ঘরটা পরীক্ষা করতে দিন। কোন কিছু না ছুঁয়ে উনি সব কিছু দেখে নিন। আমরা এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। ঠর দেখা হয়ে গেলে উনি চলে যাবেন। আমরা তারপর তদন্ত শুরু করব।

শর্মাজী বলেন, কেন?

—কারণ উনি যতক্ষণ উপস্থিত আছেন, আমরা ততক্ষণ তদন্ত করতে পারব না।

শর্মাজীর ভুরুকান আরও পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। বলেন, তার কারণটাই তো আমি জানতে চাইছি। কেন?

সতীশ বর্মণও একটু রুদ্ধস্বরে বলে, সেটাই তো আমি প্রথম থেকে আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। মিস্টার বাসু হচ্ছেন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। ঠর উদ্দেশ্য একটাই—আমরা আততায়ীকে চিহ্নিত করা মাত্র উনি তার পক্ষ অবলম্বন করবেন। উঠে পড়ে লেগে যাবেন তাকে খালাশ করতে। আমরা তদন্ত করে যেসব সূত্র আবিষ্কার করব সেগুলি আগেভাগে জানা থাকলে উনি আদালতে ততই সুবিধা পাবেন। ক্রস-এগ্জামিনেশনে আমাদের সাক্ষীদের উনি নয়-হয় করে ছাড়বেন। আপনি ঠকে চেনেন না শর্মাজী, আমি ঠকে হাড়ে-হাড়ে চিনি।

শর্মাজী ঘুরে দাঁড়ালেন। স্পষ্টভাবে বললেন, মিস্টার বর্মণ, আমি খোলা কথাই মানুষ, এবং সোজা পথে চলতে ভালবাসি। প্রথম কথা, এখানে আপনি, আমি এবং মিস্টার বাসু তিনজনেই বাতুল্য...

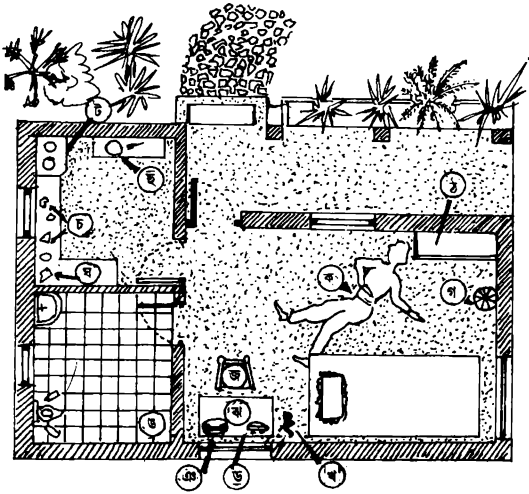
—বাতুল্য? মানে? ক'থায় ওঠে বর্মণ।

—ভেবে দেখুন। এটা নিতান্তই একটা খুনের কেস। যত রহস্যজনকই হোক সেটা, একটা 'মার্ডার কেস' ছাড়া কিছু নয়। এখানে স্বাভাবিকভাবে শুধু যোগীন্দর সিংজীরই তদন্ত করার কথা। কিন্তু যেহেতু মৃত খামাজীর একটা রাজনৈতিক পটভূমি আছে তাই সিভিল এস. ডি. ষ্ট.-কে এখানে আসতে হয়েছে, দিল্লী থেকে আপনি এসেছেন এবং মৃত ব্যক্তির পুত্রের তরফে একজন প্রখ্যাত আইনজীবী উপস্থিত হয়েছেন। এই হত্যারহস্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোনও দায়রা আদালতে নেওয়া হলেও এ নিয়ে লোকসভায় 'স্টার্ড কোর্সেন' উঠতে পারে। আমি চাই না, সেখানে মিস্টার বাসু একথা বলবার সুযোগ পান যে, অর্থরিট ঠর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেনি। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি বললেন যে, আমরা যাকে অভিযুক্ত করব উনি ক্রস-এগ্জামিনেশনে প্রমাণ করবেন সে নিরপরাধী। এই বিষয়ে আমার একটাই বক্তব্য—আপনি এক্সপার্ট, আপনি দয়া করে এমন লোককেই অভিযুক্ত করুন যে-লোকটা সত্যিকারের অপরাধী।

সতীশ বর্মণের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

বাসু তৎক্ষণাৎ বললেন, মেঝেতে ঐ যে চকের দাগ দেওয়া আছে এটাই বোধ হয় মৃতদেহের অবস্থানসূচক?

যোগীন্দর সিং বলে, জী হ্যাঁ। মৃতদেহ অপসারণের আগে আমি মর্দার আউটলাইনটা চক দিয়ে দাগিয়ে ছিলাম। আপনারাও সুবিধা হবে বলে আমি এই বাড়ির একটা নক্সাও তৈরি করেছি—চার-পাঁচ কপি অ্যামোনিয়া প্রিন্টও নিয়ে এসেছি। তাতে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি লিখে বুঝিয়ে দিয়েছি হত্যামুহুর্তে কোন জিনিসটা কোথায় ছিল।



क—मृतदेह

ঘ—ব্রিটানিয়া বিস্কুটের টিন

ছ—অর্ধভুক্ত এটো বাসন

এ—টেলিফোন

### ড—অ্যালার্ম ঘড়ি

প্রত্যেককে সে এক কপি করে ধ্যান দিয়ে দিল।

বাসু বলেন, হত্যামুহূর্তে নয়। বরং বলতে পারেন মৃতদেহ আবিষ্কার মুহূর্তে।

যোগীন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে, আশ্রয় হ্যাঁ, তাই। এবং এ কথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, হত্যাযজ্ঞে না হলেও আততায়ী যখন ঘটনাস্থল ত্যাগ করে যায় তখন এই অবস্থা ছিল।

বাসু যোগীন্দরকে প্রশ্ন করেন, এটা কি আত্মহত্যার কেস হতে পারে?

—আমি তো মনে করি সেটা নিতান্ত অসম্ভব। প্রথম কথা, আত্মহত্যা করলে পিস্তলটা অত দূরে যেতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, পিস্তলে কোনও ফিয়ার-ট্রিক পাইনি আমরা। অথচ খাম্বাজীর হাতে দস্তানা পরা ছিল না। আত্মহত্যা হলে খাম্বাজীর আঙুলের ছাপ অনিবার্যভাবে পাওয়ার কথা।

বাসু বলেন, তাহলে ঐ সঙ্গে আরও একটি অনুসিদ্ধান্তে আসা যায়: হত্যাকারী এটাকে 'আত্মহত্যার ক্রম' বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। সে যেন সোচ্চার ভঙ্গিতে বলে গেছে: 'তোমরা শোন, এটা হত্যা!'

—কেন? এ কথা বলছেন কেন?—শর্মাজী জানতে চান।

४—पिशुन

### ৬—মাছের পলো

## জ—চেয়ার

ট—উনান

## গ—পাখির খাচা

### চ—আনাজপাতি

খ—টেবিল

### ঠ—আলমারি

## কাটায়-কাটায়-২

—হত্যাকারী যদি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এটাকে আত্মহত্যার কেস বলে চালাতে চাইত তাহলে পিন্ডলটা থেকে নিজের ফিস্কার-প্রিন্ট মুছে দিয়ে রুমাল-জড়ানো হাতে সেটা মৃত খান্নাজীর মুঠোয় ধরিয়ে দিত। নয় কি?

—ঠিক কথা। এদিক দিয়ে আমরা ভাবিনি। ধনীবাদ মিস্টার বাসু।

—এবং হত্যাকারী চেয়েছিল পুলিশ ঐ ‘মার্ডার-ওয়েপনটা’ খুঁজে পাক।

সতীশ বর্মনের আর সহ্য হল না। সে হেসে ওঠে। বলে, হত্যাকারী শুধু চেয়েছে হত্যার সময়ে পিন্ডলটা যে তার নিজের হাতে ছিল না এটাই প্রতিষ্ঠা করতে। সব চালাক-চতুর হত্যাকারীই তাই করে। রুমাল দিয়ে ফিস্কার প্রিন্ট মুছে নিয়ে অকুস্থলেই পিন্ডলটা ছুঁড়ে ফেলে যায়। ওটা তার পকেটে নিয়ে ঘোরা বিপদজনক। ক্রিমিনোলজি তাই বলে।

বাসু গভীরভাবে বলেন, হবেও বা। হয়তো অপরাধ বিজ্ঞান তাই বলে।

যোগীন্দর নূতন প্রসঙ্গে আসে, ময়নার খাঁচাটা ধ্রুনে গ-চিহ্নিত অবস্থানে মেঝেতে রাখা ছিল। খাঁচার দরজাটা খোলা ছিল, যাতে পাখিটা ইচ্ছামত ঢুকতে বেরুতে পারে। যেহেতু জানলাগুলোয় মশক-নিবারণ জালতি দেওয়া ও দরজাগুলো বন্ধ তাই ময়নাটা পালাতে পারেনি। ওর খাঁচার ভিতর যথেষ্ট খাবার তখনও অভুক্ত ছিল, এবং বাথরুমের মগটা এঘরে এনে আধমগ জলও রাখা ছিল।

বাসু জানতে চান—কী খাবার ছিল খাঁচার ভিতর?

—খান ছয়েক মিইয়ে যাওয়া থিন-অ্যারাকট বিস্কুট এবং তারই ভাঙা টুকরো।

বাসু পুনরায় প্রশ্ন করেন, খবরের কাগজে লিখেছে দেখলাম মৃত্যুর সময় ছয়ই সেপ্টেম্বর বেলা এগারোট। এই সময়টা কীভাবে চিহ্নিত হল? অবশ্য এটা যদি পুলিশের ‘গোপন তথ্য’ হয়...

বাধা দিয়ে শর্মাজী বললেন, বিলক্ষণ। না, আপনি যখন সহযোগিতা করছেন তখন পুলিশের কোনও তথ্যই আপনার কাছে গোপন নয়—

সতীশ বর্মনকে দেখলে মনে হয় উনি বুঝি এইমাত্র একগ্লাস চিরতারা-জল খেয়েছেন। শর্মাজীকে সেদিকে নজর নেই। তিনি বলে চলেন, মৎস্য এবং বন্যপ্রাণী মন্ত্রকের নির্দেশে এ বছর এই সাবডিভিশনে সিল্কথ সেপ্টেম্বর থেকে মাছ-ধরার মরশুম শুরু হয়। মহাদেও খান্না—আপনি নিশ্চয় শুনছেন, গত দুবছর ধরে প্রায় আধা-ডবলঘরের মত হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াছিলেন। তাঁর এই চারিত্রিক পরিবর্তনের আগে থেকেই—আমার বিশ্বাস গত দশ-বারো বছর ধরেই তিনি এইখানে বাৎসরিক মৎস্যশিকারের উৎসবে যোগদান করে আসছেন। আগেভাগেই একটি কেবিন তিনি ‘বুক’ করেন, নির্জনে মাছ ধরেন, রেডিও শোনেন, ছবি আঁকেন, পাখি দেখেন এবং তারপর সভাজগতে ফিরে যান। অবশ্য গত দু-বছর ধরে তিনি সাধারণ মানুষের বেশে, আত্মগোপন করে—

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, সেসব আমি সূর্যপ্রসাদের কাছে শুনছি। কাগজেও পড়েছি। আপনি শুধু এ বছরের কথাই বলুন।

—এ বছর এখানে আসার আগে উনি গিয়েছিলেন অমরনাথে। সেই তীর্থে যাবার আগেই উনি ঠর সেফ্টেরী গঙ্গারামজীকে একটি চিঠি লিখে জানান যে, উনি সোমবার, পাঁচই জীনগরে আসবেন এবং কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এখনকার লগ-কেবিনে চলে আসবেন। যে কোন কারণেই হোক প্রত্যাশিত সোমবারের বদলে, দিন-তিনেক আগে, শুক্রবার, দোশরা সেপ্টেম্বর সকালে তিনি জীনগরে এসে পৌঁছান। গঙ্গারামজীকে তিনি বলেন, পহেলগাওয়ে তাঁর কী কাজ আছে। দু-একদিন সেখানে থেকে উনি মৎস্যশিকার মরশুমের উদ্বোধনের আগেই এই লগ-কেবিনে চলে আসবেন। মোট কথা, উনি কিছু জামা-কাপড় ও ময়নাটাকে নিয়ে ঐ দোশরা তারিখেই জীনগর থেকে রওনা হন। ইতিমধ্যে আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। মহাদেওপ্রসাদজী কী একটা জরুরী কাজে তাঁর সেফ্টেরীকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। লগ-কেবিন থেকে তিনি ঐ মর্মে নির্দেশ দেন, এবং গঙ্গারামজী দিল্লী চলে যান।

—লগ-কেবিন থেকে উনি কখন নির্দেশটা দিয়েছিলেন?

—গঙ্গারামজী সোমবার রাত আটটা নাগাদ টেলিফোন পান এবং পরদিন ছয় তারিখ সকালের প্লেন ধরে দিল্লী চলে যান।

—তার মানে মহাদেও খান্নাজী এই কেবিন থেকে সোমবার রাত আটটার সময় একটা টেলিফোন করেছিলেন?

—না, এই কেবিন থেকে নয়। খান্নাজী তাঁর সেক্রেটারীকে বলেন যে, কেবিনের টেলিফোনটা ডেড হয়ে গেছে। তিনি অন্য জায়গা থেকে ফোন করছেন। কোথা থেকে তা তিনি বলেননি, গঙ্গারামও জিজ্ঞাসা করেনি। সেটা তখন নিতান্ত অবাস্তর প্রশ্ন ছিল।

—আপনি এ বিষয়ে গঙ্গারামজীর সঙ্গে কথা বলেছেন?

—হ্যাঁ। টাঙ্ক-লাইনে। গঙ্গারামজী এখনও দিল্লীতেই আছেন। আজ তাঁর শ্রীনগরে আসার কথা। এশেই তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

—কী জাতের জরুরী কাজ নিয়ে গঙ্গারাম দিল্লী চলে যান তা বলেননি?

—না। টেলিফোনে শুধু বলেছিলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

—গঙ্গারাম কি নিঃসন্দেহ যে, সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত আটটায় মহাদেওপ্রসাদই ফোন করেছিলেন? কেউ তাঁর কণ্ঠের নকল করে...

—বাসুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শর্মাজী বলেন, গঙ্গারামজী নিঃসন্দেহ। তিনি গত দশ বছর ধরে ঐ সেক্রেটারীর কাজ করছেন। অন্য কেউ খান্নাজীর কণ্ঠের নকল করে ঠকে ঠকাতে পারবে না। তাছাড়া যে বিষয়ে ওঁদের কথাবার্তা হয় সেটা নাকি অত্যন্ত গোপনীয়—তৃতীয় ব্যক্তির তা জানার কথা নয়।

—বাসু বললেন, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো খতিয়ে দেখা যাক। সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত খান্নাজী যে জীবিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। ভাল কথা, তারপর, অর্থাৎ সোমবার রাত্রি আটটার পর কি কেউ তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে?

—না। ঐ সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটার পর থেকে বাকিটা অনুমাননির্ভর। টেবিলের উপর একটা ঘড়ি ছিল। সেটা দুটো সাত মিনিটে দমের অভাবে থেমে গেছে। দেখা যাচ্ছে অ্যালার্ম-কাঁটাটা আছে সাড়ে পাঁচটায়। সেটারও দম ফুরিয়ে থেমেছে।

ঠিক ঐ সময়েই লগ-কেবিনের টেলিফোনটা ঝনঝন করে উঠল। যোগীন্দর সিং ছিল টেবিলের কাছে। তুলে নিয়ে শুনল। টেলিফোনের কথা-মুখে চাপা দিয়ে বলল, মিস্টার বাসু—ইয়ে হ্যায় আপকো লিয়ে।

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা নিয়ে সাড়া দিতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আমি কৌশিক বলছি। লগ-কেবিন থেকে আপনি কি এখন আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারবেন!

—না। অসুবিধা আছে।—বললেন বাসু।

—তাহলে এক-তরফা শুনে যান। সম্ভবত আমি হত্যাকারীকে খুঁজে পেয়েছি। শ্রীনগরে সেফ্টল মার্কেটে একটা দোকান আছে, যেখানে পুষবার জন্য পাখি কিনতে পাওয়া যায়। দোকানের মালিক স্বীকার করেছে কিছুদিন আগে সে একজনকে একটি পাহাড়ী ময়না বেচেছে। ক্রেতার চেহারাও ওর পরিচায়ক মনে আছে।

—ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় কাজটা?

—উলের দোকান? অসংখ্য আছে। নামঠিকানার লিস্ট তৈরী করছি।

—দ্যাটস্ ফাইন। পরে কথা হবে।

টেলিফোনটা স্বস্থানে বসিয়েই বাসু-সাহেবের নজর হল সতীশ বর্মন প্রতিটা কথা উদ্গ্রীব হয়ে শুনছিল। শর্মাজী কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করলেন না, যেন তাঁর কোন কৌতূহলই নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ শূক করেন, পুলিশ খবর পাওয়া মাত্র যোগীন্দর আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে—খান্নাজীর

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

একটা পোলিটিক্যাল ইমেজ আছে, হয়তো সে জনাই যোগীন্দর আমাকে জানায়। আমরা দুজনেই চলে আসি। ড্রপিকট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি...

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, কবে? কখন?

—এগারো তারিখ, বেলা দশটায়। ঘরে ঢুকতেই একটা দুর্গন্ধ পেলাম। না, মৃতদেহ থেকে নয়, পাচা মাছগুলো থেকে। সেগুলো বাস্কবন্দী করে থানায় পাঠিয়ে দিলাম। অনুসন্ধান করে পরে জানা গেছে ট্রাউট মাছগুলোর সমবেত ওজন দেড় কে. জি. অর্থাৎ দৈনিক যতটা মাছ খরার অনুমতি আছে তার সমান। মাছগুলো কিন্তু কাদামাখা ছিল অর্থাৎ খান্নাজী সেগুলি ধুয়ে সাফা করার সময় পাননি। বামাঘরের সিংক-এ একটা প্লেটে প্রাতরাশের কিছু অভুক্ত অংশ ছিল—পাঁউরটির টুকরো, ডিমের চিহ্ন। ওয়েস্ট-পেপার বাস্কете দুটো ডিমের খোলাও ছিল। মৃতদেহের পরনে ছিল পায়জামা, উর্ধ্বাঙ্গে একটা পুরোহাতা শার্ট ও একটা হাফ-হাতা সোয়েটার। কোটটা টাঙানো ছিল এ চোয়ারের গায়ে। তার পকেটে হাত-দস্তানা ছিল একজোড়া। এ ছাড়া ছিল মানিব্যাগ, শ-তিনেক টাকা সমেত, রুমাল এবং সিগ্রেট-দেশলাই। দরজার পাশে একজোড়া গামবুট, কাদামাখা। ওপাশে দাঁড় করানো হুইল-ছিপ। খাটের নিচে ছিল সুটকেস। তালা-খোলা। তাতে জামা-কাপড়, মুখ ধোওয়ার সরঞ্জাম, শেভিং সেট ছাড়াও ছিল নগদে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা—একশ টাকার নোট। একটা গোদরেজের নম্বরী চাবি।

বাসু বলেন, কিন্তু হত্যার সময়টা আপনারা কীভাবে নির্ধারণ করছেন?

শর্মাজী বলতে থাকেন, যোগীন্দরের ধারণা—এবং আমিও তাঁর সঙ্গে একমত—খান্নাজী হত হয়েছেন ছয়ই সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটা নাগাদ। আমাদের যুক্তিটা এই রকম:

খান্নাজী পাঁচ তারিখ রাত্রি অটটা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তার প্রমাণ আছে। দেখা যাচ্ছে ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজেছে সকাল সাড়ে পাঁচটায়। তাহলে ধরে নিতে পারি, উনি খুব ভোরে উঠে পড়েন। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নেন এবং একজোড়া পোচ ভৈরী করে, রুট টোস্ট করে এবং কফি বানিয়ে প্রাতরাশ সেরে নেন। ঘণ্টা-দেড়েক তাতেই কেটে যায়। সুতরাং সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ উনি ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে যান। লক্ষণীয়, উনি এঁটো বাসন ধুয়ে যাননি—অর্থাৎ তাড়াতাড়িই বের হতে চেয়েছিলেন। তখনও মেছুড়ের ভিড় হয়নি। ফলে বেলা দশটার মধ্যেই তিনি নির্দিষ্ট সীমারেখায় পৌঁছে যান এবং মাছ ধরায় ফাস্ত দেন। ঘরে ফিরে আসেন। লক্ষণীয়, মাছগুলি তিনি ধুয়ে রাখার সময় পান না। উনি বুট-জোড়া খুলে ফেলেন, কোটটাও খুলে চোয়ারে টাঙিয়ে দেন। প্যান্ট বদলে পাজামা পরেন। ঠিক এই সময়েই হঠাৎ হত্যাকারীর আবির্ভাব ঘটে এবং অনতিবিলম্বেই তিনি হত হন। তখন বেলা এগারোটা।

—কেন এগারোটা কেন? এমনও তো হতে পারে প্রাতরাশ তিনি করেছিলেন ক্রিম-জ্যাকার বিস্কুট—যার খোলা টিনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—এবং কফি দিয়ে। ফিরে এসেই ডিমের পোচ ও রুট টোস্ট করে খান। দুপুরে বনের মধ্যে বসে কাঠবিড়ালীদের ছবি আঁকেন এবং বিকালে হত হন।

শর্মা বলেন, না দুপুর পার হয়নি। তার কারণটা এই—এই লগ্-কেবিনটা সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। এগারোটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত এ কেবিনের ছাদে সরাসরি রোদ পড়ে। করোগেট দিনের ছাদ। সেটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘরটা বেশ গরম হয়ে যায়। বিকাল চারটে নাগাদ আবার বেশ ঠাণ্ডা হতে থাকে। রাত্রে তো খুবই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ জন্য ঘরে একটি ফায়ার-প্লেস আছে। ঐ দেখুন, তাতে কাঠ সজ্জানো রয়েছে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত: ঘটনাটা বেলা সাড়ে দশটার পর ঘটে, যখন ঘরটা বেশ গরম। তাই কোট ও গরম প্যান্টটা খুলে রাখা হয়েছে। এবং ঘটনা তিনটার পরেও নয়। তাহলে কোটটা ঝুঁর গায়ে থাকত। আবার বেলা বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে হলে হয়তো উনি সোয়েটারটাও খুলে ফেলতেন। সুতরাং মৃত্যুর সময়—হয় এগারোটা থেকে বারোটা অথবা বেলা তিনটে থেকে বিকাল চারটা। শেষোক্ত সম্ভাবনাটা এইজন্য বাদ দিচ্ছি যে, বিছানাটা দেখুন পরিপাটি করে পাতা আছে।সকালবেলা শয্যাভ্যাগ করে তিনি যেমন পরিপাটি করে পেতে গিয়েছিলেন ঠিক



তেমনই আছে। মধ্যাহ্ন আহার করলে তিনি নিশ্চয়ই বিছানাটায় একটু শূতেন। তাছাড়া ট্রাউট মাছগুলোও রান্না করে খেতেন।

বাসু বললেন, সুন্দর যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত। আচ্ছা ঐ ঘড়িটা দম দেবার পর কতক্ষণ চলে সেটা আপনারা পরীক্ষা করে দেখেছেন?

যোগীন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, বত্রিশ ঘণ্টা। যেহেতু ওটা বন্ধ হয়েছে দুটো সাত মিনিটে তাই ধরে নেওয়া যায় যে শেষবার যখন দম দেওয়া হয়েছে তখন ঘড়িতে বেজেছিল ছয়টা-কুড়ি। সকালই হোক বা রাতই হোক।

বাসু বললেন, ধন্যবাদ, এবার আমি ঘরটা এক নজর দেখে নিয়েই বিদায় নেব।

ঘর, রান্নাঘর এবং বাথরুমটা দেখে ফিরে এসে উনি বললেন, রান্নাঘরে ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটের একটা টিন, কফি, চিনি, কন্ডেলড মিল্ক, একটা জ্যামের শিশি আর কিছু টিনড খাবার ছাড়া যা আছে তা আনাজপাতি। এখান থেকে আর কোনও খাদ্যদ্রব্য কি অপসারিত হয়েছে? যেমন মাখন, চায়ের কৌটা, কোনও টিনড খাবার অথবা বিস্কুটের টিন?

যোগীন্দ্র সিং দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, না!

শর্মাজী বললেন, কেন বলুন তো?

—কারণ এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে হত্যাকারী জানত এখানে একটি পাখি আছে, তাকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। থিন অ্যারার্কট বিস্কুট ছয়খানা সে পকেটে করেই নিয়ে আসে। যেহেতু খাম্বাজীর ডাঁড়ারে ছিল শুধুমাত্র ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট।

শর্মাজী কিছু বলার আগেই সতীশ বর্মন বলে ওঠেন, আপনার সিদ্ধান্তগুলি আপনার নিজের মনেই রাখুন বাসু-সাহেব। আমরা তাতে উৎসাহী নই। আমি তো মনে করি—খাম্বাজীর টেবিলে দশ-পনেরো খানা—মাইন্ড যু ছয়খানা নয়—থিন অ্যারার্কট বিস্কুট ছিল, এবং আততায়ী গোটা ঠোঙটাই তুলে নিয়ে পাখিটার ঠাচার কাছে নামিয়ে দিয়ে যায়। তার খানকতক পাখিটা খেয়েছে এবং মাত্র ছয়খানা অভূক্ত পড়ে আছে। এনি ওয়ে, আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে কি?

বাসু বললেন, হয়েছে। শুধু আর একটি প্রশ্ন আছে। মিস্টার শর্মা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি—আমার ক্রয়েন্ট বলেছিলেন, এ ঘরে মেয়েদের একটি ব্র্যাসিয়ের, একজোড়া উলের কাঁটা, একটা আধাবোনা সোয়েটার ও কিছু উল পাওয়া গিয়েছিল। সে কথা সত্য?

বর্মন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শর্মাজী বলে ওঠেন, হ্যাঁ সত্য। সুরম্যপ্রসাদ সে তথ্যটা গোপন রাখতে চায় বলে এতক্ষণ বলিনি। সেগুলি থানায় জমা দেওয়া আছে। আপনি দেখতে চান?

সতীশ বর্মন দুম দুম করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসু বললেন, হ্যাঁ চাই। আপনাদের আপত্তি নেই তো?

—নিশ্চয় নয়। এ কথা তো আমি বারে বারেই বলেছি।

—ধন্যবাদ। তাহলে ফেরার পথে আমি থানাতে যাব। জিনিসগুলি দেখব, আবার একই কথা বলি, আপনার আপত্তি না থাকলে ঐ উলের কিছু নমুনা আমি নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে, পাবেন।

বাসু-সাহেব বের হয়ে আসছিলেন, হঠাৎ নজর হল দরজার বাইরে শুধু সতীশ বর্মনই নয়, আরও একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রৌড়, সুট পরা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। শর্মাজীও বেরিয়ে এসেছিলেন। দ্বাধাগতকে দেখে বলে ওঠেন, গঙ্গারামজী?

—ইয়েস স্যার। আমি আজই জীনগরে পৌঁচেছি। এসেই শুনলাম আপনারা সবাই এখানে এসেছেন। আপনি টেলিফোনে বলেছিলেন, জীনগরে ফিরেই যাতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাই তৎক্ষণাৎ এখানে চলে এসেছি।

—কিসে এলেন আপনি?

## কাটায়-কাটায়-২

—মোটর বাইকে।

শর্মা বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। যোগীন্দ্রকে তো আপনি চেনেনই। ইনি হলেন সি. বি. আই.য়ের অফিসার মিস্টার সতীশ বর্মন। আর উনি—

বাধা দিয়ে গঙ্গারাম বললেন, ঠুকে আমি চিনি স্যার। সূর্যপ্রসাদ আমাকে বলেছে এখানে হয়তো ব্যারিস্টার সাহেবের দেখাও পেয়ে যাব আমি।

গঙ্গারাম বাসু-সাহেবকে করজোড়ে নমস্কার করে শর্মাজীির দিকে ফেরেন। বলেন, আপনি টেলিফোনে যা যা বলেছিলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। প্রথমত—

—জাস্ট এ মিনিট! বাধা দিয়ে সতীশ বর্মন বলে ওঠে, আপনার জবানবন্দি আমরা একটু পরে নেব। মিস্টার বাসুর তাড়া আছে। উনি চলে যাচ্ছেন—

গঙ্গারাম বিহ্বলভাবে বলেন, কিছু আমার যা বলার আছে—

আবার বাধা দিয়ে বর্মন বলে, তা শুধু পুলিশকে জানানবেন। তৃতীয় ব্যক্তিকে নয়। বুঝেছেন? গঙ্গারাম কী বলবেন ভেবে পান না।

বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, কী হল? বুঝতে পারলেন না? আপনার যা বলার আছে তা আপনার এম্বলয়ারকে এবং তাঁর নিয়োজিত উকিলকে বলবেন না। এটা তো সোজা কথা!

গঙ্গারামের সব কিছু একেবারেই গুলিয়ে গেল।

বাসু যোগীন্দ্রকে বললেন—আমরা একটু ঘুরে বেড়াবো। ঘন্টা দুই পরে থানায় গেলে আপনার দেখা পাব কি?

—নিশ্চয়ই। আমি অপেক্ষা করব।

বাসু তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে শর্মাজীির দিকে ফিরে বললেন, আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আমি আমার সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে—যাতে পুলিশ কোনও নিরপরাধীকে ডকে তুলে আমার বদনাম আরও বৃদ্ধি করতে না পারে। নমস্কার।

সতীশ বর্মনকে তিনি কোনও সম্বোধন না করেই পথে নামলেন।



তিনি

পরদিন সকালে হাউসবোর্ডের ডাইনিং রুমে সবাই সমবেত হবার পর কৌশিক বলল, কাল আপনাদের ফিরতে এত দেরী হল কেন? আমি ইয়াকুবের দোকানে চুপচাপ বসে বসে ইপিণ্ডিয়ে উঠেছিলাম। ও ঝাপ বন্ধ করার পর হাউসবোর্ডে ফিরে এলাম।

বাসু বললেন, ফেরার পরে পহেলাগাঁও থানাতে যেতে হল যে।

পকেট থেকে এক টুকরো উলের নমুনা বার করে সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, এটাকে কী রঙ বলবে সুজাতা?

সুজাতা সেটা হাতে নিয়ে পরখ করে দেখে বলল, 'পেল লাইলাক'।

রানী দেবীর দিকে সে নমুনাটা বাড়িয়ে ধরে। তিনি বললেন, না শুধু লাইলাক নয়, একটু নীলের ছোঁয়াচ আছে—যাতে রঙটা ভায়োলেট খেঁষা লাইলাক বলা যায়।

বাসু বললেন, রঙটা কি 'কমন'? সহজেই উলের দোকানে পাব?

সুজাতা এবং রানী দেবী দুজনেই স্বীকার করলে,—না।

বাসু বললেন, তাহলে সুবিধাই হল আমাদের। কৌশিক, আজ তোমার ডিউটি হল এই নমুনা নিয়ে জীনাগরের সব কয়টা উলের দোকানে যাচাই করে দেখা—কোনও দোকানদার মনে করতে পারে কিনা এই রঙের উল সে সম্প্রতি কাউকে বিক্রি করেছে কিনা। করে থাকলে ক্রেতার কথা তার মনে আছে কিনা—সে পুরুষ, না স্ত্রীলোক, কত বয়স, কী রকম দেখতে।

কৌশিক বলে, এভাবে সন্ধান পাওয়ার আশা খুবই কম।  
বাসু বলেন, কেন? তুমি তো একবেলার মধ্যেই ইয়াকুবের কাছে ময়নাক্রেতার সংবাদটা পেয়েছ।  
ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে উলের খদ্দেরকেও হয়তো আমরা খুঁজে পাব। মোট কথা, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

সূজাতা প্রশ্ন করে, আমি আর রানীমাসী সারাদিন কী করব?

—একটা শিকারা ভাড়া করে ডাল লেকে চকর দিতে পার। চশমশাহী, মোঘল-গার্ডেন, নিশাতবাগ দেখে আসতে পার।

রানী দেবী টিপটের লিকারটা পরীক্ষা করতে করতে বলেন, আর তুমি সারাদিন কী করবে?

—আমি আর কৌশিক প্রথমে যাঁহ ইয়াকুবের দোকানে। ময়না-ক্রেতার খোঁজে। তারপর খুঁজতে বের হব সেই ময়না-ক্রেতাকে। হয়তো একবার পহেলগাঁও যাব। ঠিক বলতে পারছি না।

এই সময়ে ছোকরা চাকরটা প্রাত্রাশের টেবিলে এনে দিল সেদিনের সংবাদপত্র। কৌশিক সেটা তুলে নিয়ে বলল, আজকের কাগজে মহাদেওপ্রসাদের একটা ছবি বেরিয়েছে দেখছি। কাগজে লিখেছিল ঠুর বয়স ছেচল্লিশ, কিন্তু ফটো দেখে আরও কম মনে হয়। চল্লিশের কাছাকাছি। নয়?

সূজাতা ছবিটা দেখে বলে, হ্যাঁ, তাই মনে হয় বটে। হয়তো বয়সের তুলনায় তিনি অতটা বুড়িয়ে যাননি।

বাসু পকেট থেকে একটা চাবির রিঙ বার করেন। তাতে আটকানো পেঙ্গিল-কাঁটা ছুরি দিয়ে নিখুঁতভাবে ছবিটা কাটতে কাটতে বলেন, অথবা ছবিটা বছর পাঁচ-সাত আগে তোলা। যখন তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রী জীবিত।

রানী বলেন, তুমি সাততাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা কাটছ কেন? কেউই তো পড়েনি ওটা।

—ওর উটো দিকে একটা বিজ্ঞাপন। ওটা কেউ পড়বে না।

ছবিটা উনি বুকপকেটে ভরে নিলেন।

রানী বলেন, পনের দিনের মেয়াদ আমাদের। তোমার কি মনে হয়, এর মধ্যেই ব্যাপারটা মিটেবে?

—মনে হয় না। কেসটা যোরােলো। মার্ডারারের সম্বন্ধে কোনও ক্লুই তো এখনও পাইনি আমরা।

সূজাতা বলে, কেন? অনেক কিছুই তো জানা গেছে—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, 175 থেকে 180 সেণ্টিমিটার লম্বা, গাফ-দাড়ি কামানো, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

বাসু বলেন, তাহলে অবশ্য মার্ডারার সূচিহিত—গলারাম যাদব! লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দৈর্ঘ্যও ঐ রকম, গাফ-দাড়ি কামানো, এবং যদিও তার চশমা রোন্ডগোন্ড ফ্রেমের তবু কালোফ্রেমের চশমা পরাটা খুব কিছু কঠিন নয়। দুর্ভাগ্যবশত লোকটার মোক্ষম আলোবাই আছে। ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টার ফ্লাইটে সে দিল্লি চলে যায়, এবং খুন হয়েছে ঐদিন বেলা এগারোটায় পহেলগাঁওয়ের কাছাকাছি। কিন্তু হত্যাকারীর ঐ সব স্ট্যাটিসটিক্স তুমি কোথায় পেলে সূজাতা?

—কেন? ও তো বলল, ইয়াকুবের দোকান থেকে যে লোকটা ময়না পাঠাটা কিনেছে তার...

—কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে লোকটা ময়না কিনেছে, সেই খুন করেছে মহাদেও প্রসাদকে?

—সেটাই কি আপনাদের হাইপোথিসিস্ নয়?

—‘আমাদের’ কিনা জানি না, অন্তত ‘আমার’ নয়।

কৌশিক কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, তাহলে আমাকে ওভাবে নাকে দড়ি দিয়ে কাল ঘোরালেন কেন?

—আমি একথা বলিনি, যে ঐ লোকটা হত্যাকারী নয়। আমি শূণ্য বলেছি—এমন কোনও সূত্র আমরা পাইনি যাতে ময়না-ক্রেতাকে হত্যাকারী বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। আর আগেই তো বলেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসল ‘ক্লু’টা আমরা খুঁজে পাব ঐ ‘মুদ্রা’র মাধ্যমেই—কে-কেন-কখন তাকে বদলিয়ে দিল। আর সবচেয়ে বড় কথা আসল ‘মুদ্রা’ কোথায় আছে?

## কঁটায়-কঁটায়-২

ঘণ্টাখানেক পরে অ্যাবাসাডার গাড়িটা এসে দাঁড়ালো কান্নীরের সেট্রাল মার্কেটের সামনে। সূর্যপ্রসাদ এ গাড়িটা ঠেকে সর্বক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছে।

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ওরা দুজনে মার্কেটে ঢুকলেন। এটা একটা নতুন বাজার। পাশাপাশি টুরিস্ট-নিধন দোকান। কান্নীরী শাল, কাঠের কাজ, নানান রকম কিউরিওর দোকান প্রচুর। এত সকালে দোকানে ভিড় নেই। প্রথম চত্বরটা পার হয়ে কৌশিক বাজারের শিহ্নদিকে ঠেকে নিয়ে এল ইয়াকুব মিঞার দোকানে। ইয়াকুব ঠন্দের আপ্যায়ন করে বসালো। আদাব জানালো। কৌশিক বললে, মিঞা-সাহেব ঐর কথা আপনাকে বলেছিলাম, কলকাতার ব্যারিস্টার সাহেব।

ইয়াকুব পুনরায় আদাব জানিয়ে শুধু বলল, বহুৎ খুব!

বাসু প্রশ্ন করেন, এ দোকান কতদিন হল হয়েছে মিঞাসাহেব?

ইয়াকুব বললে, এ দোকান মাত্র পাঁচ বছরের, কারণ এ বাজারটারই বয়স তাই। তবে আমি এ কারবারে আছি অন্তত 'বিশ-তিশ'-সাল।

বাসু-সাহেব দোকানটার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিচির-মিচির শব্দে কান ঝালাপালা। নানান জাতের টিয়া, ময়না, কবুতর, ল্যাড-বার্ড, গ্রাশ, বজ্রিকা মায় দাঁড়ে বসা একটা ধনেশও। আছে খাঁচাবন্দী খরগোশ, গিনিপিগ, সাদা ইদুর ইত্যাদিও।

বাসু-সাহেব বলেন, কাল আমার ভাইয়ের কাছে আপনি বলেছেন যে, কিছু দিন আগে একটা পাহাড়ী ময়না একজনকে বিক্রি করেছেন, তাই নয়?

ইয়াকুব বিমুগ্ধ উর্দুতে বললে, হুজুর, আমি সব কথা আপনাকে খোলাখুলি বলব, কিন্তু তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন—।

—বলুন?

—আপনি কি আমাকে আদালতে সাক্ষী হতে বলবেন? তাহলে হুজুর আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। আদালতকে আমি ভীষণ डরাই।

বাসু হেসে বলেন, ঠিক আছে ইয়াকুবমিঞা। আপনাকে আমি সাক্ষী হিসাবে সমন ধরাবো না। এবার বলুন!

—জী হা। সাদা বাৎ। আমি কিছুদিন আগে—না, তাই বা বলি কেন, ঐ বাবুজী চলে যাবার পরে আমি আমার হিসাবের খাতা ঘেঁটে দেখেছি, তাই আজ বলতে পারছি দোশরা সেন্টেবর, জুন্মাবারে আমি মাঝারি সাইজের একটা পাহাড়ী-ময়না এক সাহেবকে বিক্রি করেছি।

—সাহেবের চেহারা আপনার মনে আছে?

—জী সাব। উমর হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। আপনারই মতন লম্বা। গৌর-বাড়ি কামানো। ঠুর পরনে ছিল পাংলুন আর ওভারকোট। ঠুর চোখে ছিল কালো-ফ্রেমের চশমা।

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, কালো ফ্রেম? ঠিক মনে আছে আপনার? রোন্ডগোল্ড নয়?

—জী না। অন্তত তখন তাঁর চোখে ছিল কালো ফ্রেমের চশমা।

—লোকটাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?

—খুব সম্ভবত পারব। চেহারাটা আমার বেশ মনে আছে।

বাসু বলেন, ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, আপনার যতদূর মনে আছে বলে যান দিকি?

—সেদিন ছিল জুন্মাবার। দুপুরে আমি নমাজ করতে গিয়েছিলাম, সামনের ঐ মসজিদে। পাশের দোকানের ছবীরলালকে বলেছিলাম দোকানটা দেখতে। ছবীরলাল সম্মত ব্যক্তি। ওর দোকান তো দেখতেই পাচ্ছেন হুজুর, কান্নীরী শালের। কোনও প্রয়োজন হলে ও যদি দোকান ছেড়ে যায়, আমি সেখানাল করি; আবার আমি বাইরে গেলে ও আমার দোকানটা দেখে। সেদিন নমাজ শেষে ফিরে এসে দেখি ঐ বাবুটি দোকানের সামনে বসে আছেন। আমি তাঁকে আদাব জানিয়ে বললাম, ক্যা চাহিয়ে

সাবুজী? উনি বললেন, একটা পাহাড়ী ময়না। আমার দোকানে তখন চারটে ময়না ছিল। টেবিলের উপর তাদের সাজিয়ে দিলাম। উনি তার ভিতর একটিকে পসন্দ করে বললেন, 'এটা নেব। কত দাম দিতে হবে?' আমি ঠুঁকে বললাম, 'হুজুর এটার যথেষ্ট ব্যয়স হয়েছে, বেশিদিন বাঁচবে না। তখন আপনি আমাকে দুষবেন। তার চেয়ে এই ছোটটাকে কিনুন, এটা অনেক 'বোল' শিখেছে। ঐ খাড়ি ময়নাটা কিছুই বোল শেখেনি।' উনি আমার কথার জবাবে বললেন, 'না আমি ঐ খাড়িটাকেই নেব। কত দাম দেব?' আমি আবার বললাম, 'এটার দাম দুশ টাকা; কিন্তু ঐ ছোট ময়নাটাকে আমি দেড়শ টাকায় দেব। আপনি এটাকেই নিন।' বলেই আমি পাখিটাকে দিয়ে শিষ্ দেওয়ালাম, 'বোল' শোনালাম, নানাভাবে ছোট ময়নাটাকে গছবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু উনি কিছুতে শুনলেন না। ঐ খাড়ি ময়নাকে বিনা দরদামে দুশ টাকা দিয়ে কিনে নিলেন।

বাসু বললেন, কিন্তু খাড়ি ময়নাটাকে বেচতে আপনার অত আপত্তিই বা ছিল কেন?

—তার কারণ এটা খুব পয়মস্ত ময়না। ওটাকে দোকানে নিয়ে আসার পর থেকেই আমার দোকানে লাভ বেড়ে যায়। আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল ঐ ময়নাটার উপর। ওর এতটা ব্যয় হয়েছে, এবং যেহেতু ও একটাও 'বোল' শেখেনি তাই ওর বাজারদর টাকা পঞ্চাশ হয় কি না হয়। উনি নগদ দুশ টাকা দেওয়ায় আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি। উনি কেন যে দেড়শ টাকা দিয়ে বোল-পড়া কমব্যয়ী ময়নাকে নিলেন না তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। আর সেজন্যই ঐ ক্রেতার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

বাসু-সাহেব বললেন, স্পষ্ট মনে আছে? বেশ, দেখুন তো এই লোকটা কিনা?

বুক পকেট থেকে উজ্জ-করা একখণ্ড কাগজ বার করে দেখান।

ইয়াকুব দর্শনমাত্র চিনে ফেলল, জী হাঁ হুজুর। এই তো সেই লোক!

তারপর এদিক ওদিক দেখে নিয়ে প্রদ্র করে, লোকটা কি ফেরারী আসামী? কাগজে ওর ছবি ছাপা হয়েছে কেন?

বাসু বললেন, ইয়াকুব-মিঞা, আমি যে দোকানে এসে আপনাকে এই ছবি দেখিয়েছি, এতসব প্রশ্ন করছি, তা স্রেফ ভুলে যান। তৃতীয় ব্যক্তি জ্ঞানতে পারলে থানা-পুলিসের হাঙ্গামায় পড়ে যাবেন।

ইয়াকুব ছা-পোষা মানুষ। দৃ-হ্যত কানে ঠেকিয়ে বললে, আমি কাউকে কিছু বলব না হুজুর।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কৌশিক বলল, আপনি কেমন করে আন্দাজ করলেন মহাদেও প্রসাদ ওটা নিজেই কিনেছেন?

—সেখলে না, সূর্যের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী দোশরা শূক্রবার দুপুরে মহাদেও জীনগরে ছিলেন। আর ক্রেতার যে বর্ণনা লোকটা দিল তার সঙ্গে মহাদেওর যথেষ্ট সাদৃশ্য।

কৌশিক আবার বলে—আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না। মহাদেও প্রসাদ নিজেই ঐ ময়নাটা কিনেছেন? তাহলে আসল 'মুন্না' কোথায় গেল? আর কেনই বা তিনি নিজে ময়নাটা বদলে দিলেন?

বাসু বললেন, ম্যাটস্ দ্য মিলিয়ান-ডলার কোন্টেন!



চার

পহেলগাওয়ে গাড়িটা এসে পৌছালে কৌশিক প্রদ্র করে, প্রথমে কোথায় যাবেন? থানায়?

—না, প্রথমে আমরা একটা স্ন্যাক-বারে ঢুকব, আমার শীত-শীত করছে, গরম এক পেয়লা কফি পান সেরে কাজে নেমে পড়ব।

সূর্যপ্রসাদের ড্রাইভার নির্দেশমত ট্যারিস্ট-অফিসের পাশে কাফেটেরিয়ার গাড়িটা পার্ক করল।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

বাসু-সাহেব সোয়েটারের উপর কোটা চড়িয়ে নেমে এলেন। ওরা দু'জনে ঢুকে পড়ল রেস্টোরাঁটায়। বেশ ভিড় আছে। দূরের একটি টেবিল বেছে নিয়ে দুজনে বসলেন। বয় মেনু-কার্ড নিয়ে হাজির হল। বাসু বললেন, এক প্লেট চিকেন স্যাণ্ডুইচ আর একপট কফি দাও। দুধ-চিনি মিশিও না। আর দরজার সামনে একটা সিনেমন-ওঙের আত্মসাদার আছে, তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে এস—কী খাবে। যা চাইবে তা দিও।

ছোকরা চলে যেতেই কৌশিক বলে, আপনি তখন বললেন, আমার কাজ হচ্ছে শ্রীনগরের যাবতীয় উলের দোকানে সন্ধান করা, তাহলে মত বদলিয়ে আবার আমাকে এখানে নিয়ে এলেন যে?

বাসু বললেন, ভেবে দেখলাম, শ্রীনগরের চেয়ে এখানকার কোন উলের দোকানেই সূত্রটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানে উলের দোকান দু-তিনটির বেশি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এখানে আজ তালিম নিয়ে নেবে। কাল সারাদিন শ্রীনগরে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করে 'অ্যারিয়াডেনজ প্রেড' খুঁজবে।

—'অ্যারিয়াডেনজ প্রেড' মানে?

—'লিজেন্ডস অব গ্রীস অ্যান্ড রোম' পড়নি? মিনটর-কে খুঁজে পেতে স্বয়ং থেসিয়াস্ অ্যারিয়াডেনের সূতো ধরে গুটি গুটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছিলেন।

—এখানকার থানা অফিসে যাবেন নাকি?

—যেতে হতে পারে। যোগীন্দর সিং যদি একা থাকে তাহলে ইতিমধ্যে পুলিশ কতটা এগিয়েছে জানতে পারব। আর সেখানে যদি শ্রীমান বর্মন বহাল তব্বিতে হাজির থাকেন, তাহলে কোন আশা নেই।

স্যাণ্ডুইচ-কফি পানাঙ্গে দু'জনে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে-বসা ক্যাশিয়ারকে বাসু-সাহেব প্রণাম করেন—কিছু উল কিনতে চাই। এখানে কোথায় পাব বলতে পারেন?

—উল? নিউ' উল?

—হ্যাঁ, এই নমুনা আছে।—পকেট থেকে অ্যারিয়াডেনের সূতোটা বার করে দেখান।

সেদিকে নজর না দিয়েই ছোটটি বললে, ঠিক উল্টো ফুটপাথে একটা বড় দোকান আছে, 'পহালগাঁও ভ্যারাইটি স্টোরস্'। ওখানে খোঁজ করুন। না পেলে স্টেট ব্যাঙ্কের উল্টো দিকে 'নিউ উলেন স্টোরসে' পেতে পারেন।

ভ্যারাইটি স্টোরসের দোকানদার বলল, হ্যাঁ উল ওরা বেচে কিছু এই নমুনার উল ওদের স্টকে নেই। অর্ডার দিলে সাতদিনের মধ্যে আনিয়ে দিতে পারে।

বাসু-সাহেব বলেন, দিন-শেষে আগে কিছু আপনার দোকান থেকেই আমি চার আউন্স কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই নমুনার!

লোকটি আবার ওঁর হাত থেকে নমুনাটা নিয়ে যাচাই করল। বলল, মনে হচ্ছে আপনি গুণ্ডিত করছেন। আপনি নিজে এসেছিলেন?

—না, আমার বোন এসেছিল।

—তাহলে আমাদের দোকান নয়। 'নিউ উলেন স্টোরস্' থেকে হয়তো তিনি কিনেছিলেন। ওখানে খোঁজ করুন। নেহাৎ না পেলে আমাদের অর্ডার দিতে পারেন; দিন-সাতেক পরে পাবেন।

বাসু বলেন, সাত দিন তো আমি এখানে থাকব না। শ্রীনগরে সব চেয়ে বড় দোকান কোনটা? আপনারা যেখান থেকে 'হোলসেল' মাল আনেন?

—আপনি খামোকা দৌঁদৌঁড়ি করবেন না। শ্রীনগরের সেন্ট্রাল মার্কেটে 'নিউ কাম্বার এস্পোরিয়ামে' খোঁজ করবেন। সেখানে না পেলে বুঝবেন এ নমুনার মাল এ ভল্লটে মিলবে না। দিল্লি থেকে আনাতে হবে।

বহুৎ সুক্রিয়া জানিয়ে বাসু পথে নামলেন।

‘নিউ উলেন স্টোরসের’ সেল্‌স্‌ম্যান নমুনা দেখেই বলল, জী হাঁ, পাবেন। তবে কতটা চাই? আমার কাছে একটা পেটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। অবশ্য আপনি অর্ডার দিলে আমি আনিয়ে দিতে পারি। হুগ্‌থানেক দেরি হবে।

বাসু বললেন, সাতদিন তো আমরা এখানে থাকব না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে দিন পনের আগে আপনার দোকানে এই নমুনার উলের অনেকগুলো পেটি দেখেছিলাম।

লোকটি বলল, হিসাবে আপনার গল্‌ডি হল দাদা, পনের দিন নয়, দিনসাতেক আগে ঐ নমুনার চার-ছয় পেটি ছিল। সে মাল বিক্রি হয়ে গেছে।

বাসু বললেন, আচ্ছা আপনার দোকানে আর একজন বসেন না? ফর্সা মতন দেখতে?

—জী হাঁ, যমুনাপ্রসাদ, কেন কী হয়েছে?

—আমি তো তাকে বলে গিয়েছিলাম, ঐ ছয় পেটিও আমি কিনব। তখন আমার কাছে টাকা ছিল না।

—আডডাল দিয়ে গিয়েছিলেন? স্লিপ দেখান?

—না। আডডাল দিইনি; কিছু...

—‘কিন্তু’ কিছু নেই দাদা। ওটা অর্ডারি মাল ছিল। যমুনাপ্রসাদ অমন কথা বলতেই পারে না।

—অর্ডারী মাল? কে অর্ডার দিয়েছিল বলুন তো?

ইতিমধ্যে আর একজন খন্দের আসায় সেল্‌স্‌ম্যান তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাসু নীরবে পাইপ টেনে চলেন। ভদ্রলোক দু-তিন রকম উলের নমুনা দেখে, দরদাম করে, কিছু না কিনেই চলে গেলেন।

সেল্‌স্‌ম্যান ঠর দিকে ফিরে বলল, ইয়েস স্যার, আর কোনও মাল দেখবেন? ঐ শেডের কাছাকাছি?

বাসু বলেন, দেখব। কিন্তু তার আগে বলুন তো অর্ডারটা কে দিয়েছিলেন?

লোকটা পিছন ফিরে মাল বার করছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ উর্দুতে যা বলল, বাঙলায় তার নিগলিতার্থ: এ-সব খেজুরে আলাপ করে কি পেট ভরবে দাদা? সে মাল তো এতদিনে বোন শেষ হয়ে গেছে।

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, না, আমার বোনের জন্যই কিনতে এসেছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি আমার বোনই মালটা কিনেছে কি না। তাহলে হয়তো আর উলের দরকারই হবে না।

লোকটা এর জবাবে যা বলল তা অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞাসা করল: ক্যা আপ্‌ বাংগালি ইয় সার?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আর আপনার ঐ বহিনজী সামনের স্টেট ব্যাঞ্চে চাকরি করেন?

—বাসু উল্লসিত হয়ে বলেন, একজ্যাঙ্কিলি! তাহলে সেই কিনেছে?

সেল্‌স্‌ম্যান উলের পেটিগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে উর্দু ছেড়ে এতক্ষণে বাঙলা বলবার চেষ্টা করে: পহিলে তো বহিনকে পুছ করবেন, তব্‌না খরিদ করতে আসবেন?

বাসু একগাল হেসে বলেন, তা ঠিক। তা হোক ঐ এক পেটি যেটা আছে ওটা আমি নিয়ে যাব। কী জানি যদি কম পড়ে।

এক পেটি উলের দাম মিটিয়ে বহুৎ ধন্যবাদ দিয়ে বাসু পাখে নামতেই কৌশিক বলে, ভদ্রমহিলার নামটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বাসু গভীর ভাবে বললেন, তাহলে ঠেঙানি খেতে হত। বোন উক্ত কিনেছে কিনা সেই স্বরটা না জানাতেই লোকটা আমাকে পাঁচ কথা শোনালো, তারপর কোন আক্সেলে জিজ্ঞাসা করব—আমার বোনের নাম কী?

—না একটু ঘুমিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেত।

বাসু ধমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, বেশ তো, আমি অপেক্ষা করছি। তুমি জেনে এস। মসির

## কাঁটার-কাঁটার-২

সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে তথ্যটা জানা আছে তা হচ্ছে তার 'ব্রা'-র মাপ বত্রিশ। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ না—আগে যিনি উল কিনেছেন তাঁর ব্র্যাসিয়ারের মাপ কি বত্রিশ ইঞ্চি?

কৌশিক হাত দুটি জোড় করে বলে, ঘাট হয়েছে মামু! মাপ চাইছি। অতঃ কিম্ব?

—স্টেট ব্যান্ডে গিয়ে বোনের তত্ত্ব তালিশ নেওয়া।

—কিন্তু আপনার বোন মানে আমার সেই অজ্ঞাত মাসিমার সম্বন্ধে মাত্র দুটি তথ্যই তো শুধু আমরা জানি—তিনি হুগুখানেক আগে চার পেটি উল কিনেছিলেন এবং তাঁর ব্র্যাসিয়ারের মাপ মাত্র বত্রিশ। খোজটা নেবেন কেমন করে?

বাসু বলেন, আমারই ভুল হয়েছে। তোমাকে রানুর সঙ্গে দিয়ে সূজাতাকে নিয়ে এলে কাজটা সহজ হত। এস, দেখ কিভাবে বোনের নাড়ি-নক্ষত্র বার করি।

স্টেট ব্যান্ডে ঢুকে বাসু-সাহেব একটি কাউন্টারে এগিয়ে গেলেন। ওয়ালেট থেকে একখানা 'পাচশ' টাকার ট্রাডেলার্স চেক বার করে বললেন, ক্যাশ করব।

কাউন্টারে-বসা অল্পবয়সী ছেলেরি বলল, তারিখ বসিয়ে সই করে দিন।

তারিখ বসিয়ে, সই করে ট্রাডেলার্স চেকটা দিয়ে বাসু বলেন, পাচখানা একশ টাকার।

ছোকরা যতক্ষণ এন্ট্রি করতে ব্যস্ত ততক্ষণে বাসু-সাহেব মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। মহিলা কর্মী না-হোক জনা-পাচেক। সকলের বয়সই ষ্টিশ থেকে পঞ্চাশ। একজনকে বাদ দেওয়া যেতে পারে—তিনি নিঃসন্দেহে অবাঙালিনি। আরও একজন ছাড়াই হল—তাঁর ব্রা-র মাপ অন্তত আটত্রিশ, সম্ভবত চল্লিশ। বাকি রইল জনা তিনেক। এর মধ্যে কে হতে পারে?

কাচের খোপের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। তাতে পাচখানা করকরে একশ টাকার নোট।

বাসু ইরোজীতে বলেন, মাপ করবেন, আপনাদের এখানে একজন বাঙালী মহিলা কর্মচারী আছেন। তাই না?

ভদ্রলোকের ভ্রুকুণ্ডন হল। বলেন, কেন বলুন তো?

—না, মানে দিন পাচেক আগে ভদ্রমহিলার সঙ্গে এখানেই আলাপ হয়। নামটা ভুলে গেছি। আমিও বাঙালী কি না। তাই অনেক কথা হয়েছিল। আমি শ্রীনগর যাচ্ছি শুনে উনি একটি উলের নমুনা দিয়ে বলেছিলেন এক পেটি উল কিনে আনতে।

বাসু-সাহেব উলের পেটিটা ভুলে দেখান।

ভদ্রলোক বলেন, আই সী। আপনি তাহলে রমা দাসগুপ্তার কথা বলছেন। হ্যাঁ মিস্ দাসগুপ্তার উল-বোনার বাতিক আছে বটে। কিন্তু তিনি তো ছুটিতে আছেন।

—ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা যদি কাইডলি—

—কিন্তু বাড়িতে তো ওঁকে পাবেন না। উনি স্টেশন-সীড করার অনুমতিসহ ছুটি নিয়েছেন দিন সাতেকের। আজ থেকেই। তবে আপনার অসুবিধা কিছু নেই। প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে যেতে পারেন। মিস্ দাসগুপ্তা ফিরে এলে দিয়ে দেব।

—না, সেজন্য নয়। মিস্ দাসগুপ্তা বলেছিলেন, ক'লকাতা ফেরার পথে ওঁর বাড়ি থেকে একটা প্যাকেট উঠিয়ে নিতে। ওঁর কোন ক'লকাতাবাসী আত্মীয়ের জন্য পাঠাতে চান। ওঁর বাড়ির লেপ্ট-জনের কাছে নিশ্চয়ই প্যাকেটটা রেখে গেছেন।

—না, তারও সম্ভাবনা নেই। বাড়িতে উনি একাই থাকেন। মিস্ দাসগুপ্তা একজন 'কনফার্মড-স্পিলটার'। তবে হ্যাঁ, ওঁর প্রতিবেশিনী মিসেস্ কৃষ্ণমাচারীর কাছে রেখে যেতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন। এই রাত্তা ধরে কিছু দূর গেলেই দেখতে পাবেন একটা মস্ত বাড়ি তৈরী হচ্ছে—একটা নতুন সিনেমা 'হল'। সেটাকে ঝাঁয়ে রেখে আরও একটু আগিয়ে গেলে পাবেন একটা মেথডিস্ট চার্চ। তার পিছনেই পর পর তিনখানা বাড়ি। মাঝেরটা মিস্ দাসগুপ্তার। শেষ বাড়িটা মিস্টার কৃষ্ণমাচারীর।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বাসু-সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন ম্যানেজারের ঘরের সুইং ডোরটা



খুলে গেল এবং বের হয়ে এলেন সি. বি. আই. কুলতিলক সতীশ বর্মন। ঠুকে দেখেই থেমে পড়েন।

—গুডমর্নিং বাসু-সাহেব! আপনি এখানে?

হাতেই ধরা ছিল পাঁচকেতা একশ টাকার নোট। সেটা দেখিয়ে বললেন, ট্রাভলার্স চেক ভাঙতে। আর আপনি?

—বহাল তবিয়েতেই আছি। আঙ্কা চলি, নমস্কার।

সতীশ বর্মন একটু দ্রুতগতিই স্থানত্যাগ করলেন। যে ছেলেটি ট্রাভলার্স চেক ভাঙিয়ে দিয়েছিল তাকেই প্রশ্ন করলেন বাসু, পুলিশ কেন? চুরি-ডাকাতি হয়েছে নাকি কিছু?

—ছেলেটি ভুরু ঝুটকে বললে, পুলিশ? উনি কি পুলিশের লোক?

—হ্যাঁ, তাই তো জানি।

—আশ্চর্য। আমাকে উনি বললেন, লাইফ ইন্সিওরেন্স-এর অফিসার!

—তাই নাকি? কী জিন্দাসা করছিল আপনাকে?

—আমাদের দারোয়ান মন-বাহাদুরের ঠিকানা। বললে, মন-বাহাদুরের একটা ইন্সিওরেন্স পলিসির ব্যাপারে তার হোম অফিসে চায়। একে তাই ম্যানেজার-সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

বাসু অত্যন্ত এগিয়ে গেলেন ম্যানেজারের ঘরের দিকে। সুইং ডোরের উপর দিয়ে দেখলেন, ম্যানেজার একাই বসে কাজ করছেন।

—আসতে পারি ভিতরে?

—ইয়েস, কাম ইন প্লীজ। টেক য়োর সীট।

বাসু আসন গ্রহণ করেই নিজের ভিজিটিং কার্ডখানা বার করে দিয়ে ইংরাজীতে বললেন, আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

ম্যানেজার কী জানি কেন চটে উঠলেন। বললেন, প্রশ্নগুলো কি আমাদের দারোয়ান মন-বাহাদুর সংক্রান্ত?

—একজ্যাক্টলি!

ভদ্রলোক তিক্তবিরক্ত স্বরে বললেন, একই কথা আমি কতবার বলব মশাই? মন-বাহাদুরের হোম-অফিসে দিয়েছি, তার রিভলভারটা তার নিজস্ব, সরকারী নয়। তার নম্বর কত তা আমি জানি না, আমার জানার কথাও নয়; সে রিভলভার নিয়ে দেশে গেছে না এখানে কারও কাছে রেখে গেছে তা আমি জানি না। আমাদের খাতায় সে ছুটিতে আছে। আর কী বলতে হবে? বলুন?

বাসু ধীরেসুস্থে বললেন, ধন্যবাদ। কিন্তু এ কথাগুলি কি আপনি আমাকে ইতিপূর্বে বলেছেন? এবং আমি একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করছি?

—আপনাকে বলিনি, কিন্তু এস. ডি. সাহেবকে বলেছি, কী নাম যেন ঐ পাঞ্জাবী ও. সি.-কে বলেছি, এইমাত্র যে ভদ্রলোক এজাহার নিয়ে গেলেন তাঁকে বলেছি!

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনাকে কি বলা হয়েছে—এস-এম. পি. লেট মহাদেওপ্রসাদ খান্না যে রিভলভারের গুলিতে হত হয়েছেন সেটা আপনার দারোয়ান মন-বাহাদুরের?

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন: বলেন কী মশাই?

বাসু গম্ভীরভাবে বলেন, আমি গ্র্যাটিস লীগাল অ্যাডভাইস কাউকে দিই না; কিন্তু এক্ষেত্রে দিচ্ছি, কারণ আপনি আমার প্রশ্নে বিরক্ত হয়েছেন। আপনার দারোয়ানের রিভলভার তার নিজস্ব সম্পদ হলেও সেই অস্ত্রটা দিয়েই সে ব্যাক্সের নিরাপত্তা রক্ষা করে। ফলে সেই রিভলভারের নম্বর না-জানা ব্যাক্স-ম্যানেজারের একটা ত্রুটি। আপনার ডিপার্টমেন্ট কী বলবে জানি না, কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় যখন সে কথা স্বীকার করবেন...

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, সাক্ষী! আমি কেন সাক্ষী দিতে যাব?

—যেহেতু আমি আপনাকে ‘সমন’ ধরাবো।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

ভদ্রলোক আবার বসে পড়েন। বলেন, কিছু মনে করবেন না, একই কথা বারে বারে বলতে কার ভালো লাগে বলুন। তাছাড়া কেসটার সত্যিকারের গুরুত্বের বিষয়ে কেউই আমাকে কিছু জানাননি। আর যু শিওর, স্যার? মন-বাহাদুর মহাদেও প্রসাদকে খুন করেছে?

—ডিড আই সে দ্যাট?

—না, মানে তার রিভলভারের গুলিতেই...

বাসু বলেন, মিস্টার সুরমপ্রসাদ খান্না আমার ক্লায়েন্ট। ঐ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করছি। এবার কি আপনি জানাবেন আমি যা জানতে চাই?

—কেন জানাব না? বলুন, কী জানতে চান? চা খাবেন?

—মন-বাহাদুর কবে থেকে ছুটিতে আছে?

—সাতই অগস্ট থেকে। যতদূর জানি সে দেশে আছ, মানে নেপালে। হোম অ্যাড্রেসটা চাই?

—হ্যাঁ চাই। আচ্ছা, মন-বাহাদুর তার রিভলভারটা নিয়ে দেশে গেছে অথবা এখানে রেখে গেছে তা জানতে পারেন না?

—কেমন করে জানব বলুন? মন-বাহাদুর এক্স-আর্মি ম্যান। একজন ব্রিগেডিয়ারের দেহরক্ষী ছিল। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তাঁরই সুপারিশে ব্যাঙ্কে ওর চাকরি হয়েছিল। এবং এও জানি তাঁরই সুপারিশে ও একটি রিভলভারের লাইসেন্স পায়। অস্ত্রটা ওর নিজের। নশ্বরটা আমার টুকে রাখা উচিত ছিল, নয়?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করেন, মন-বাহাদুর এখানে কোথায় থাকত? তার লোক্যাল অ্যাড্রেসটাও চাই।

—মন-বাহাদুর এখানে সপরিবারে থাকত না। আমাদের একজন এমপ্লয়ীর সঙ্গে থাকত।

—আই সী। তাঁর কী নাম?

—শ্রীরমা দাসগুপ্তা। তিনিও ছুটিতে আছেন।

—ও! তিনি কতদিন এখানে পোস্টেড আছেন?

—বছর তিনেক। কেন বলুন তো?

এ কথারও জবাব না দিয়ে নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন বাসু-সাহেব।

বাইরে আসতেই কৌশিক বলে, মন-বাহাদুরের রিভলভারটাই যে মার্ভার-ওয়েপন তা কেমন করে বুঝলেন?

—নিশ্চিতভাবে জানি না। সম্ভাবনা নিরানব্বই পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট। যেহেতু শর্মা, যোগীন্দ্র এবং বর্মণ মন-বাহাদুরের খোঁজ নিচ্ছে এবং ম্যানেজার কথাপ্রসঙ্গে নিজেই স্বীকার করে বসল বর্মণ ঐ রিভলভারের বিষয় প্রশ্ন করেছিল। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট—ঐ ‘অ্যারিয়াডনেজ থ্রেড’।

—আবার ‘অ্যারিয়াডনেজ থ্রেড’?

—নয়? লগকেবিনে যে রিভলভারটা পাওয়া গেল তার মালিক মন-বাহাদুর। এবং সে বাস করে স্টেট ব্যাঙ্কের এমন একজন কর্মচারীর বাড়িতে যেখানে বন্ধী হয়ে আছেন অ্যারিয়াডনে!

পথে বেরিয়ে কৌশিক বলল, আচ্ছা, অমন বে-মক্কা মিথ্যা কথা বলতে আপনার বাধে না?

—মিথ্যা কথা আবার কখন বললাম?

—বললেন না? এক এক জায়গায় এক এক খুঁড়ি বলেছেন। নিউ উল হাউসে ক’লেছেন, যমুনাপ্রসাদকে—

—জাস্ট এ মিনিট। ‘যমুনাপ্রসাদ’ নামটা আমি বলিনি। বলেছি ‘ফর্সা মতন আর একজন লোক’ তো কান্ট্রীর কোন সোকারে তোমার মত কালা বিক্রেতা বসে থাকে? আর ব্যাপারটা... জানো—এস্টেটিফাইজ দ্য মীনস। উদ্দেশ্য সৎ হলে,—হলপ যখন নেওয়া নেই তখন অর্থ দূ-চারটে মিথ্যে কথায় দোষ ধরতে নেই। ‘দ্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন’—বুঝলে না? আমরা তো উলের কাঁটায় জড়ানো অ্যারিয়াডনের সুতোয় ঝাঁপা পুতুল। তিনি যেমন নাচাচ্ছেন তেমন নাচছি।

পাড়িটা যখন মেথডিস্ট চার্চের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল তখন উলের প্যাকেট হাতে এগিয়ে চললেন বাসু-সাহেব। পিছন পিছন কৌশিক। প্রথম বাড়িটা অতিক্রম করে দ্বিতীয় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালেন ওরা। ছোট একতলা বাড়ি। সামনের দরজায় তালি ঝুলছে। দেওয়ালের পাশে একটা ছোট্ট নমপ্লেট: রমা দাসগুপ্তা।

দরজায় যখন তালি মারা তখন খবরটা ঠিকই। ভদ্রমহিলা পহেলগাওয়াই নেই; অন্তত বাড়িতে বাটার কর্মস্থলে নেই। বাসু-সাহেব অগত্যা শেষ বাড়িটায় হানা দিলেন। এটাও ছোট একতলা বাড়ি। এরোগেটেড টিনের ছাদ। সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ; তা হোক চিমনি দিয়ে ধোয়া বার হচ্ছে। এখানেও অনুরূপ নেম প্লেট: এ.জে. কৃষ্ণমাচারী।

বাসু-সাহেব কলিং বেল বাজালেন। দরজা খুলে গেল। একজন মাদ্রাজী ভদ্রমহিলা দরজা অল্প একটু ঝাঁক করে মুখ বাড়িয়ে ইংরাজীতে বললেন, কাকে চাই?

বাসু-সাহেব বললেন, রমা দাসগুপ্তাকে।

দরজায় ল্যাচ-কী লাগানো আছে। ঝাঁক দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, পাশের বাড়ি; কিন্তু সে তো নেই।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, তালি-মারা দেখলাম। সে পহেলগাওয়াই আছে তো?

—না নেই। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে। মাপ করবেন, এক গ্রাস জল পাব?

—ও শ্যিওর। আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট বসার ঘর; কিন্তু শৌখিন ভাবে সাজানো। আড়ম্বর নেই, রুচির পরিচয় আছে। ভদ্রমহিলা কাচের গ্রাসে দু-গ্রাস জল নিয়ে এলেন ট্রে-তে করে। সামনের টি-পয়ে নামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি কি রমার কোনও আত্মীয়?

—না, আত্মীয় ঠিক নয়, তবে আমিও বাঙালী। একটা বিশেষ প্রয়োজনে মিস্ দাসগুপ্তাকে খুঁজছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার একটু ভুল হল। রমা এখন মিস্ নয়, মিসেস্।

—তাই নাকি? ওর বিয়ে হয়ে গেছে? কতদিন?

—সপ্তাহখানেক। খবরটা এখনও জ্ঞানাজ্ঞানি হয়নি। বেশি বয়সের বিয়ে তো। তাই ওর নেমপ্লেটটাও এখনও বদলানো হয়নি; ওর নাম এখন মিসেস রমা কাপুর।

কৌশিকের মনে পড়ল স্টেট-ব্যান্ধের সকলেই ওকে মিস্ দাসগুপ্তা বলে উল্লেখ করেছিল। নিতান্ত পাশের বাড়ি বলেই এ ভদ্রমহিলা খবরটুকু জেনেছেন।

বাসু প্রশ্ন করেন, ওর স্বামীর নাম কী?

—জে. পি. কাপুর।

—তিনিই বা কোথায়?

—তিনি এখন এখানে থাকেন না। কোথায় থাকেন, তাও জানি না। আপনি কি মিসেস্ কাপুরের জন্য কোনও চিঠি রেখে যাবেন?

—চিঠি নয়, একটা উলের প্যাকেট।

সেটা হাতে নিয়ে মিসেস্ কৃষ্ণমাচারী বলেন, হ্যাঁ, এই রঙেরই একটা সোয়েটার ও বুনছিল বটে। আপনাকে আনতে বলেছিল বুঝি?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু বলেন, মিসেস্ কাপুর কখন বেরিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে?

—এই তো আধঘণ্টা আগে। সকালবেলা অফিস গেল। তারপরই হস্তশিল্প হয়ে ফিরে এল। আমাকে বললে, আমাকে এক্ষণি যেতে হবে। আড়াইটার বাসটা হয় তো এখনও গেলে পাব। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

—আড়াইটার বাসটা এখন থেকে কোথায় যায়?

—শ্রীনগর।

## কাটায়-কাটায়-২

ঠিক তখনই ভিতর বাড়ি থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আইয়ে বৈঠিয়ে চায়ে পিজিয়ে।'

মিসেস্ কৃষ্ণমাচারী হেসে বললেন, চা খাবেন নাকি?

বাসু-সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ভিতর থেকে কে ও কথা বলল?

—ও কিছু নয়। একটা পাহাড়ী ময়না। রমার। যাবার সময় পাখিটা আমার বাড়িতে রেখে গেছে। চা খাবেন?

—গরজ বড় বলাই। বাসু বললেন, চা তেঁটা পেয়েছে বটে তবে শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করা।

—কিছুমাত্র না। আমি চায়ের জল বসাতেই যাচ্ছিলাম। এক কাপের বদলে কেংলিতে তিনকাপ জল নেওয়া বই তো নয়।

ভদ্রমহিলা প্রস্থানোদ্যত হতেই বাসু বলেন, পাখিটাকে একটু নিয়ে আসবেন? দারুণ কৌতূহল হচ্ছে। এমন সুন্দর 'বোল' পড়ল যে, আমি ভাবলাম মানুষ কথা বলছে।

মিসেস্ কৃষ্ণমাচারী ভিতর থেকে কালো-কাপড়ে ঢাকা একটা ঝাঁচা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখলেন। ভিতর থেকে পাখিটা বলল, 'হ্যালো।'

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বলল, 'রাম-রাম।'

ঝাঁচার ভিতর থেকে প্রতিধ্বনি হল: রাম রাম!

ভদ্রমহিলা চায়ের জল বসাতে চলে গেলেন। বাসু-সাহেব ঝুঁকে পড়ে অশ্রুতে বললেন: রাম নাম সং হয়!

পাখিটা শুধু বলল: রাম নাম!

—রাম নাম সং হয়!

—রাম নাম সং হয়!

কৌশিক বললে, সবই যখন হল তখন ফিস্কার-প্রিন্ট ভেরিফিকেশনটাও হয়ে যাক। সম্ভবপে সে কালো কাপড়টা সরিয়ে দিল। দুজোড়া চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল যেখানে ময়নাটার ডান পায়ের অনুপস্থিত মধ্যমাটা থাকার কথা।

বাসু অশ্রুতে বললেন, মুন্না! তোর চূড়ান্ত সনাক্তকরণটা হয়ে গেল।

ময়নাটা ঘাড় কাৎ করে অপরিচিত মানুষ দুটোকে দেখে নিল। তারপর সে যে দীর্ঘ বোলটা পড়ল তাতে দুজনেই বজ্রাহত হয়ে গেলেন। পাখিটা স্পষ্টভাবে বলল:

—রমা! মং মারো...পিস্তল নামাও!...ক্রম!...হায় রাম!

কৌশিক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে! বাসু দু-হাতে ওর ঝাঁচটাকে চেপে ধরে বললেন, কী? কী বললি? ফের বল!

যেন বুঝতে পারল ওর কথা। একই 'বোল' আবার পড়ল ময়নাটা।

—রমা! মং মারো...পিস্তল নামাও!...ক্রম!...হায় রাম!

মাঝের ঐ 'ক্রম' অবিকল পিস্তলের শব্দ!

একটু পরেই মিসেস্ কৃষ্ণমাচারী চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলেন। বাসু বললেন, এ পাখিটা রমা দেবী কতদিন পুষছেন?

—এটা ওকে ওর স্বামী উপহার দিয়েছে। দিনসাতেক আগে। এটাকে ভিতরে রেখে আসি। না হলে টেবিল নোঙরা করবে।

ভদ্রমহিলা প্রস্থান করতেই কৌশিক বলে, মামু! কিছু বুঝতে পারছেন?

বাসু বলেন: চূপ!

একটু পরেই ভদ্রমহিলা ফিরে এসে চা বানাতে বসলেন।

বাসু বললেন, আমারটা দুধ-চিনি বাসে।

তিনজনে তিন কাপ চা টেনে নেবার পর বাসু বলেন, মিসেস কৃষ্ণমাচারী, আমার পরিচয়টা আপনাকে দেওয়া হয়নি।

পকেট থেকে একটি নামাঙ্কিত কার্ড বার করে টেবিলে রাখলেন।

মিসেস কৃষ্ণমাচারী সেটা দেখলেন। পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল'র কোন কীর্তি-কাহিনী সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতীয় ঐ মহিলা যে অবহিত নন তা বেশ বোঝা গেল। উনি শুধু বললেন, সে গ্যাড টু মীট যু মিস্টার বাসু।

—আর এ আমার সহকারী কৌশিক মিত্র।

ভদ্রমহিলা এদিকে ফিরে নড় করলেন।

বাসু বলেন, মিস্টার কাপুরকে আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি বইকি। কেন?

—ওদের বিয়েটা কোথায় হল? কী মতে?

—রেজিস্ট্রি বিয়ে, শ্রীনগরে। আমার স্বামী উইটনেস ছিলেন। কিন্তু কেন বলুন তো?

বাসু বলেন, বাই এনি চান্স এই ফটোটা কি মিস্টার কাপুরের? পকেট থেকে ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ তিনি বাড়িয়ে ধরেন।

ভদ্রমহিলা দেখেই চমকে ওঠেন, ইয়েস! অফকোর্স! এই তো যশোদা কাপুর! ওর ছবি আপনি কোথায় পেলেন?

—এখনই তা আপনাকে জানাতে পারছি না। তবে এটুকু আপনাকে বলি, মিস্টার কাপুর বিবাহিত। রমাকে যদি তিনি বিবাহ করে থাকেন, তাহলে 'বাইগামি'র চার্জে তিনি অভিযুক্ত হবেন!

ভদ্রমহিলা শুধু বললেন: মাই গড!

—আপনার প্রতিবেশিনীকে এখনই কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। সে যে বিবাহ করেছে এটা তার অফিসও জানে না দেখলাম। আমি চেষ্টা করব যাতে ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই 'অ্যামিক্বেবলি সেটল' করা যায়। আশা করি আপনার সাহচর্য পাব?

—সার্ভেন্টি। রমার মতো মেয়ে হয় না। খবরটা শুনলে সে একেবারে মুষড়ে পড়বে।

—আচ্ছা আপনি বলতে পারেন মিস্ দাসগুপ্তা কেন এমন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বিবাহ করল?

—রমাও কিছু কচি খুকি নয়। তার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হবেই। আর কেন পছন্দ করল? ওটা বলা কঠিন: যার যাতে মজে মন। তবে কাপুরও আকর্ষণীয় পুরুষ। সুন্দর স্বাস্থ্য, দিলদরাজ মানুষ। যদিও বেকার।

কৌশিক আর বাসু উঠে দাঁড়ালেন। চা-পান শেষ হয়েছিল তাঁদের। বাসু শেষ প্রশ্ন পেশ করেন, আপনার কাছে আজকের 'কাস্মীর টাইমস্'টা আছে?

—না নেই। আমরা 'হিন্দুস্থান টাইমস্' রাখি। তবে আপনার বিশেষ প্রয়োজন থাকলে আমি—

—না, না তার দরকার হবে না। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

গাড়িতে ফিরে এসেই বাসু ড্রাইভারকে বলেন, বাস-স্ট্যান্ডে চল।

অনতিবিলম্বেই বাস-স্ট্যান্ডে এসে খবর পেলেন শ্রীনগরগামী যে বাসটা বেলা আড়াইটায় ছেড়েছে সেটা শ্রীনগরে পৌছাবে বিকাল সওয়া ছয়টায়। সেটা এক্সপ্রেস বাস নয়। বাসু হাতঘড়িতে দেখলেন তখন তিনটে চল্লিশ। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সওয়া ছটার আগে শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডে পৌছাতে পারবে?

—জরুর!

—তাহলে সোজা চল শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ড। সওয়া ছটার আগে পৌছানো চাই।

—বে-ফিকর রহিয়ে সাব।



পাচ

ওদের অ্যাথাস্যডার গাড়িটা যখন শ্রীনগর বাস স্ট্যাণ্ডে এসে ঢুকছে তখনও 'পহেলগাঁও শ্রীনগর' সার্ভিসের বাসটা থেকে লোক নামতে শুরু করেনি। বোধ হয় আধমিনিট আগে সেটা ঐ গোলাকৃতি বাস স্ট্যাণ্ডে প্রবেশ করেছে। কন্ডাক্টর পা-দানি থেকে বুলে পড়ে পিছনটা দেখছে ও ক্রমাগত টিং-টিং বাজিয়ে চলেছে: 'ঠিক হয়, ঠিক হয়, ওর যাইয়ে।'

দুটি যাত্রীহীন বাসের মাঝখানের ফাঁকে ব্যাক-গিয়ারে বাসটা নৈশ-বিশ্রামের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। যাত্রীরা অনেকেই নিজ নিজ সীটে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, কুলিরা হেঁকাবান করে ঘিরে ধরেছে; একজন উপরে উঠে দড়ি দিয়ে ত্রিপল ঢাকাটা ছাদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দোকানে, পথে আলো জ্বলে উঠছে।

কৌশিক ও বাসু-সাহেব দ্রুতগতি বাসটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সন্ধানসূত্রের ঊর্জা তো কয়েক তিনটি: বাঙালী মহিলা, বয়স পঁয়ত্রিশ ও মাঝারি গড়ন। বাসু-সাহেব মহিলা যাত্রীদের উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। কৌশিকও। জনা দশেক মহিলা যাত্রী আছেন। জনা চারেক বৃদ্ধা, ছোট অল্পবয়সী; একজন নিসেন্দেহ পাঞ্জাবিনী ও দুজন পিছনে কাছা-সাঁটা গুজরাটিনী। বাকি দুজন সন্দেহজনক। একজন আছেন পিছনের সীটে অপরজন একেবারে সামনের দিকে। দুজনেরই বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, আধুনিক সাজ-পোশাক, মাঝারি গড়ন। শাড়ি পরায় ধরন উত্তর এবং পূর্ব ভারতীয়—যাকে বলে হাবলস করে পরা। পিছনের সীটে যিনি বসেছেন তাঁর বব-হ্যাঁটা চুল, নীলচে রঙের সিঙ্গেটিক শাড়ি, ম্যাচ করা ব্লাউস, ম্যাজেস্টা রঙের টিপ। হাতে ড্যানিটি ব্যাগ। ড্রাইভারের ঠিক পিছনেই যিনি বসেছেন তাঁর চুল ঝোঁপা ঝাঁপা, পরনে একটা মাস্টার্ড রঙের সিকের শাড়ি—কাঁধে একটা এয়ারব্যাগ, এক হাতে দু-গাছি চুড়ি, আর হাতে সরু রিস্টওয়াচ।

কৌশিক বাসু-সাহেবের কানে কানে বলল—আপনি একজনকে ট্রাই করুন, আমি দ্বিতীয়াকে।

বাসু বলেন, আমার ইন্টুইশান বলছে সামনের দিকের মুর্শিদাবাদিনীই আমাদের টার্গেট; তুমি বব-হেয়ারিনীকেই ফলো কর।

গাড়িটা পার্ক করার পর প্রথমেই নেমে এলেন বব-চুলো মহিলাটি এবং ঠিক তার পিছনেই একজন মধ্যবয়সী পুরুষ। পুরুষটির কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু। তিনি বাজাটিকে কোলাস্ত্রিত করে বললেন, বহু বারান্দা প্যে চলি যাও, মায় সামান লাভা হু।

বাসু! হারাধনের দশটি মেয়ের রইল বাকি এক।

বাসু-সাহেব বাসের পিছনদিকে সুরে গিয়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করেন শর্ট-ফাইন লেগের যুক্তকর ফিল্ডারের মত।

অধিকাংশ যাত্রী নেমে যাবার পর মেয়েটি নামল, খোলা-বাগ সমেত। গাড়ির ছাদের দিকে দৃকপাত মাত্র করল না—অর্থাৎ ওর কোনও ভারী লাগেজ নেই। ইতিউতি চাইতে থাকে ট্যাক্সির খোঁজে। শর্ট-ফাইন-লেগের ফিল্ডার এক-পা এগিয়ে এসে হঠাৎ ওর পিছন থেকে ডেকে ওঠেন: রমা! বিদ্যুৎপৃষ্ঠার মত মেয়েটি চকিতে পিছনে ফেরে। বাসু-সাহেবকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, ডিড যু মে' এ সাউন্ড?

বাসু উত্তরে বঙ্গভাষায় জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমিই। তুমিই তো রমা দাসগুপ্তা?

মেয়েটি সামলে নিয়েছে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে বলে, নো!

—বাঃ বাঙলা বলতে না পারলেও ভাষাটা ভালনি দেখছি এ তিন বছরে, কাশ্মীরে এসে! বুঝজো পার ঠিকই! নয়?

মেয়েটি জবাব দেয় না। কী যেন ভাবছে সে।

বাসু বলেন, ঠিক আছে! তুমি রমা দাসগুপ্তা নও। মিসেস্ রমা কাপুর। এবার তো স্বীকার করবে? কুঞ্চিত ভূভঙ্গে মেয়েটি ইংরাজীতেই জবাব দেয়, আপনি কে? এবং কেনই বা আমাকে বিরক্ত করছেন?

বাসু পুনরায় বঙ্গভাষেই বলেন, সাদা বাঙলায় কথা বল রমা, তাহলে অন্য কেউ বুঝবে না। আমার নাম পি. কে. বাসু। আমি ব্যারিস্টার। সুরযপ্রসাদ খান্নার তরফে সলিসিটর। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

মেয়েটি আবার বাসু-সাহেবকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিল। এবার বঙ্গভাষে বলল, আপনি যে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু তার প্রমাণ দিতে পারেন?

বাসু পকেট থেকে একটি নামাঙ্কিত ভিজিটিং কার্ড ওর হাতে দিয়ে বললেন, এটা অবশ্য চূড়ান্ত আইডেন্টিফিকেশন নয়। তোমার সন্দেহ পুরোপুরি না ঘুচলে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও দেখতে পার। বাই দ্য ওয়ে, তুমি কি আমার নাম জানতে?

—জানতাম। আপনার উপর লেখা অনেকগুলো কাহিনী আমি পড়েছি। কিছু এক্ষেত্রে আপনি আমার সঙ্গে কী বিষয়ে আলোচনা করতে চান?

—স্বর্গত মহাদেও প্রসাদ খান্নার বিষয়ে।

মেয়েটি স্পষ্টতই নিজেছে গুটিয়ে নিল। বললে, সে বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য আছে বলে তো আমি মনে করি না।

—বোকার মত কথা বল না। তুমি জান না, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে আর সেটা সম্পূর্ণ তোমার নাগালের বাইরে।

—আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

—আমি বলতে চাইছি হয়তো পুলিশ ইতিমধ্যেই জেনে গেছে নিহত মহাদেও প্রসাদ খান্না যশোদা কাপুরের ছদ্মনামে তোমাকে বিবাহ করেছেন। এটুকু সূত্র আবিষ্কার করলেই তারা তোমার বাড়িতে হানা দেবে আর ‘মুন্না’-কে আবিষ্কার করবে। মিসেস্ কৃষ্ণামাচারী তাদের জানিয়ে দেবেন, যে ‘মুন্না’ হচ্ছে কাপুর তথা খান্নারই একটি প্রণয়োপহার। সেই মুহূর্তেই পুলিশ এবং সাংবাদিকের দল গোটা কান্দীর উপত্যকায় তোমাকে আতিপাতি করে ঝুঁকবে। এই বাসস্ট্যান্ডে এবং এয়ারোড্রাফে, বানিহাল পাস-এর নামায় তোমার জন্য তারা প্রতীক্ষা করবে। তারপর যে মুহূর্তে ওরা শুনবে মুন্নার ঐ মারাত্মক ‘বোলটা—ঐ: রমা...

মেয়েটি মাঝপথে ঠেকে থামিয়ে দিয়ে বলে, চূপ করুন।

—একজ্যাক্টলি! এখানে এসব আলোচনা করা মারাত্মক। কে জানে ইতিমধ্যেই বাস স্ট্যান্ডে পুলিশের চর এসেছে কি না।

মেয়েটি পুনরায় বলে, আপনি এত সব কথা কী করে জানলেন?

—ঠিক যেভাবে আমার চেয়ে ষষ্ঠা দশ-বারো পিছনে পুলিশ ও সাংবাদিকেরা জানবে। বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় আমি ওদের চেয়ে করেক কদম এগিয়ে আছি বলেই তুমি এখনও অ্যারেস্টেড হওনি। তুমি যদি গৌরার্ভূমি করে আরও কিছু সময় এখানে নষ্ট কর তাহলে সেই সময়ের ব্যবধানটা আরও কিছুটা কমে আসবে। এই আর কি।

দু-এক সেকেন্ড মেয়েটি নতনেই কী যেন চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে বলে, ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজী। কী জানতে চান আপনি?

—সব কথা। আদ্যন্ত।

—কোথায় শুনবেন? কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকবেন?

—না। কোনও পাবলিক প্লেসে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে না। আমার গাড়িতে।

কৌশিক কোনও কথা বলেনি এ পর্যন্ত। এখন বলল, আসুন।

## কাটায়-কাটায়-২

ওরা তিনজনে ফিরে এলেন ওদের গাড়িতে। বাসু আর মেয়েটি বসল পিছনের সীটে। কৌশিক ড্রাইভারের পাশে। বাসু-সাহেব তাঁর নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিড়ে নিয়ে কী যেন লিখলেন। তারপর ড্রাইভারকে সেই হাতচিঠি আর একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, গাড়ি এখানেই থাক, গাড়ির চাবিটা রেখে যাও। এই চিঠিটা হাউসবোটে গিয়ে সুজাতাকে দেবে এবং তাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। যাও।

ড্রাইভার রওনা হতেই বাসু বলেন, এ হচ্ছে কৌশিক মিত্র, এর সামনে...

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল, জানি। সুকৌশলীর কৌশিকবাবু।

বাসু বলেন, নাউ স্টার্ট টকিং!

মেয়েটি বলল, প্রথমেই বলে নিই, আমি অন্যায় কিছুই করিনি, অপরাধ তো দূরের কথা। আমি এমন কিছু করিনি যাতে আমাকে লজ্জিত হতে হয়।

—বুঝলাম। বলে যাও।

গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। বাইরে আলো। গাড়ির কাচগুলো ওঠানো। মেয়েটিকে ভালো? দেখা যাচ্ছে না সেই আধা-অন্ধকারে। শুধু উজ্জ্বল সার্সির পশ্চাদপটে একটি নারীমূর্তির সিলুয়েট। রমার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা আছে; কিন্তু বাচনভঙ্গিতে কোনও নাটকীয়তা নেই। কিছুটা নিরাসক্ত হবার প্রচেষ্টা আছে। তবু যেহেতু অনেকগুলি অনুভূতি—বেদনা, ভয়, উত্তেজনা ওকে আচ্ছন্ন করে আছে তাই তার অনাসক্তিতা বার বার ব্যাহত হয়ে যাচ্ছিল। ও বলতে থাকে:

—আমি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একজন কর্মী। বর্তমানে পহলগাঁওয়ে পোস্টেড। সংসারে আমার আর কেউ নেই—বাবা-মা-ভাই-বোন। আমার বর্তমান বয়স ঠয়ত্রিশ। নানা কারণে আমি বিবাহ করিনি। নাঃ যখন বলতে বসেছি তখন সব কথাই খুলে বলি। তাহলে আমার ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন। প্রায় দশবারো বছর আগেকার কথা। আমি তখন কলকাতায় এম. এ. পড়ি। বাবা-মা দুজনেই ঝেঁচে। ঐ সময় এক সহপাঠীর প্রেমে পড়ি। ছেলেটি বড়লোকের ঘরের; আমার বাবা ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানী। আমরা দুজনেই পাশ করে বেরিয়ে আসার পর ছেলেটি উচ্চশিক্ষার্থে স্টেটসে যায়। আমরা দুজনেই প্রতিশ্রুত হই পরস্পরের জন্য প্রতীক্ষা করব। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ডাক-বিভাগে আমরা দুজনেই বহু অর্থব্যয় করি। তারপর যখন সে দেশে ফিরে আসে তখন জানতে পারি সে বিবাহিত এবং তার একটি তিন বছরের শিশু আছে। এরপরও আমার জীবনে পুরুষ যে না এসেছে তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই আমি অনিমেধের,...আই মীন সেই ছেলেটির ছবি ফুটে উঠতে দেখতাম। এটা আমার অবিবাহিত থাকার কারণ।

—আমার স্বামীর সঙ্গে, আই মীন, মহাদেওপ্রসাদ বাহার সঙ্গে আমার আলাপ হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। নিতান্ত ঘটনাক্রমে। সেদিন ছিল রবিবার। আমি সারাদিনের মতো কিছু খাবার আর ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে নিয়ে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলাম। এরকম প্রায়ই আমি পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যেতাম।

বাসু বলে ওঠেন, একা?

—হ্যাঁ, একাও কখনও কখনও গিয়েছি, কখনও বা দু' একজন সহকর্মীর সঙ্গে। বেশির ভাগই সঙ্গে থাকত মন-বাহাদুর। যে রোববারের কথা বলছি, সেদিনও মন-বাহাদুর ছিল আমার সঙ্গে।

—মন-বাহাদুর কে?—জানতে চান বাসু-সাহেব।

—আমাদের ব্যাঙ্কের দারোগ্যান। রিটার্ড মিলিটারী ম্যান। ও আমার বাড়িতেই থাকত বাইরের ঘরে। আমার বাজার-হাট করে দিত; আমি দু-বেলা ওকে ঝেঁখে খাওয়াতাম। তাতে বাহাদুরের ঘরভাড়াটা ঠাঁচত, আমারও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। সে যাই হোক, সেদিন শহর থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছি আমরা, হঠাৎ নজর হল একজন ভদ্রলোক নিতান্ত নির্জনে বসে জলরঙে একখানা নৈসর্গিক দৃশ্য আঁকছেন। ভদ্রলোকের পোশাক-পরিচ্ছদে কোনও আড়ম্বর বা বিলাসিতার লেশ ছিল না। একবার চোখ তুলে আমাদের দেখেই আবার ছবির দিকে নজর দিলেন। আমার দৃশ্যে কৌতূহল হচ্ছিল দেখতে



ছবিটা কেমন হচ্ছে। কিন্তু আর্টিস্ট নিশ্চয়ই আমার মতো কৌতূহলী মানুষদের এড়িয়ে যাবার জন্য পহেলগাঁও থেকে এতদূরে এসেছেন ছবি আঁকতে। হঠাৎ ভদ্রলোক নিজে থেকেই হিন্দিতে বললেন, 'তোমার ফ্রান্সে জল আছে?' একটু অবাক হলাম; নিতান্ত অপরিচিতাকে—আর বয়সও আমার কিছু কম নয়—উনি 'আপনি' না বলে 'তুমহারি' বললেন কেন? যা হোক, আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না, কফি আছে। কেন?'

বললেন, আমার জলটা নাংরা হয়ে গেছে। তাই।

উনি উঠবার উপক্রম করতই মন-বাহাদুর বলল, ম্যায় লা দেতা হুঁ।

ওর মগটা উঠিয়ে নিয়ে সে খাড়া পাড় ভেঙে লীডার থেকে জল আনতে গেল। অগত্যা আমার কৌতূহল মিটল। ছবিখানা দেখলাম। দারুণ সুন্দর হয়েছে। প্রশংসা করলাম, ছবিখানার। দু-চারটে কথা হল। শুনলাম, ওর নাম যশোদাপ্রসাদ কাপুর। একা মানুষ, বিয়ে-থা করেননি। পাহাড় পর্বতেই ঘুরে বেড়ান। আমিও আমার নাম বললাম, স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করি সে কথাও বললাম। আমি শুকে কফি তফার করলাম। উনি এককথায় রাজি হলেন। দুজনে কফি খেলাম। তারপর আমি ফিরে এলাম।

প্রথম দিন এই পর্যন্তই। পরদিন সোমবার বিকালে—কিসের অমোঘ আকর্ষণে আমি আবার সেই নির্জন স্থানটায় ফিরে এলাম। এবার একাই। কিন্তু ওর দেখা পেলাম না। উনি পহেলগাঁওয়ের কোথায় উঠেছেন জিজ্ঞাসা করিনি। ফলে যোগসূত্র হারিয়ে গেল।

দিন-তিনেক পরে একদিন অফিসে যেতেই আমার একজন সহকর্মী বলল, 'এক ভদ্রলোক তোমার জন্য এই ছবিখানা রেখে গেছেন।' অবাক হয়ে দেখি সেই ছবিখানাই। ঝাধানো হয়নি। গোল করে কাগজে মুড়ে দিয়ে গেছেন।

এরপর দীর্ঘ এক বছর আমি তাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু তাঁর কথা ভুলতেও পারিনি। দুটি কারণে। প্রথমত তাঁর সেই ছবিখানা ঝাধিয়ে আমার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। আর দ্বিতীয়ত আমি ক্রমাগত তাঁর চিঠি পেতাম। আশ্চর্য, উনি নিজের ঠিকানা জানাতেন না। ফলে উত্তর লেখার কোনও সুযোগই আমি পাইনি। তারপর হঠাৎ এ বছরে অগস্টের পয়লা অথবা দশরা তারিখে আবার তাঁকে দেখলাম। উনি নিজে থেকেই দেখা দিলেন। অফিস ছুটির পর বেরিয়ে আসছি, দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন। অসঙ্কোচে বললেন, ভালো আছ তোমরা?

জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিতে ঠিকানা দিতেন না কেন? জবাবে বললেন, বে-ঠিক মানুষের আবার ঠিকানা কী? সমস্ত কাজই ফলাফলফলা বর্জিতভাবে করতে হয়; জবাব পাবার প্রত্যাশা নিয়ে তো চিঠি লিখতাম না।

আমি আবার বললাম, 'প্রশংসা করেছি বলেই ছবিখানা আমাকে দিয়ে দিলেন?' সে-কথার উত্তরে বললেন, 'আমি ভবঘুরে মানুষ, ছবি রাখব কোথায়? আঁকি আর বিলিয়ে দিই।' 'আমি জানতে চাইলাম, এবার পহেলগাঁওয়ে উনি কোথায় উঠেছেন। উনি বললেন, সেদিনই এসেছেন, কোথাও ওঠেননি; মাথা ঠোঁজার একটা আশ্রয় খুঁজে নেবেন কোথাও। প্রশ্ন করলাম, 'আপনার মালপত্র কোথায় রেখেছেন?' বললেন, 'মালপত্র বলতে তো একজোড়া কম্বল আর ঝোলা। বাস স্ট্যান্ডের কাছে এক সোকানদারের কাছে জমা রেখেছি।'

আমি শুকে অনুরোধ করলাম সে-রাত্রে আমার অতিথি হতে। এককথায় রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, এক শর্তে। আমি ঘরভাড়া দিতে পারব না। তার বদলে তোমার একখানা পোট্রেট ঐকে দেব।

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি থামে। তদ্বয় হয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, প্রথম দিন-সাতকে কোন অসুবিধা হয়নি, কারণ বাহাদুর ছিল। সাত তারিখে বাহাদুর যখন দেশে গেল তখনই বিপদে পড়লাম। কোন মুখে বলি, এখন আমাদের দুজনের এভাবে থাকাটা ভাল দেখায় না। অথচ উনি যেন সে সমস্যা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন।

আবার মেয়েটি থেমে গেল। ম্লান হেসে বলল, বিস্তারিত বলতে আমারও সঙ্কোচ হচ্ছে, শুনতে

## কাটার কাটার-২

আপনাদেরও। মোট কথা গত সাতাশে অগস্ট, শনিবার আমরা শ্রীনগরে এসে রেজিস্ট্রি মতে নিয়ে করি।

বাসু বলেন, তার মানে তুমি বলতে চাও যে, গোটা অগস্ট মাসটা তিনি তোমার বাড়িতে ছিলেন?—হ্যাঁ।

—অসম্ভব! কারণ সাতাশে অগস্ট যেদিন তোমাদের বিবাহ হয় সেদিন ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। সেদিন মহাদেওপ্রসাদ ছিলেন অমরনাথ তীর্থে।

—না। অমরনাথ দর্শনে যাবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাননি।

—তোমার কোনদিন সন্দেহ হয়নি যে, যশোদা কাপুর একজন ধনীব্যক্তি, ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে বাস করছে?

—না, সর্বকম সন্দেহ হয়নি। যদিও মাঝে মাঝে অবাক লাগত, যখন দেখতাম ঠুঁর কলমটা লাইফ-টাইম শেফার্স; ঠুঁর তুলিগুলো উইন্ডসর নিউটনের সেবল-হেয়ার ব্রাশ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে কথা। বলেছিলেন, ঠুঁর এক আত্মীয় খুব বড়লোক। এগুলো তারই উপহার।

—তুমি আন্দাজ করতে পার কেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন করেছিলেন?

—বোধ হয় পারি। অর্থাৎ এখন পারি। উনি বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গ বর্জিত। আর খবরে কাগজকে উনি এড়িয়ে চলতেন।

—কিন্তু এভাবে নিজের পরিচয় গোপন করে তোমাকে বিবাহ করাটা তো অপরাধ? আইনত এবং তোমার প্রতি?

—আইনত কি না জানি না; আমার কাছে তিনি কোনও অপরাধ করেননি।

—তুমি মন থেকে তাঁকে ক্ষমা করতে পারছ?

—কিসের ক্ষমা? আমার দুজনে দুজনকে ভালবেসেছিলাম। এটা কি অপরাধ? উনি আমার পোর্ট্রেট একেছেন, আমি ঠুঁকে গান শুনিয়েছি—এটা কি অপরাধ?

বাসু বুঝে উঠতে পারেন না—একজন আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিতা মহিলা কেন বুঝতে পারছে না মহাদেও প্রসাদ অপরাধী—আইনের চোখে, সমাজের চোখে, এবং যে উত্তীর্ণযৌবনা মেয়েটির জীবন তিনি পঙ্কিল করে দিয়ে গেছেন তার প্রতি।

—নিরাসক্তভাবে প্রশ্ন করেন, তুমি কখন জানতে পারলে যে, যশোদা কাপুর হচ্ছে মহাদেও খান্না?

—আজ অফিসে খবরের কাগজে ঠুঁর ছবি দেখে। তখনই বুঝতে পারলাম, কেন ঠুঁর কলমটা অত দামী, কেন উনি নিজের পূর্বপরিচয় আমাকে দিতেন না—বাল্য-কৈশোরের কোন গল্প করতেন না। আমি এখনও বিশ্বাস করত পারছি না যে, তিনি...তিনি...

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি। বাসু সজ্ঞপণে ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন। বললেন, ভেঙে পড়লে তো চলবে না রমা। মনকে শক্ত কর। আমাকে যে আরও অনেক কিছু জানতে হবে।

মেয়েটি চোখ মুছে আবার সোজা হয়ে বলল: বলুন?

—এবার বলো তোমার বাড়ির ঐ পাহাড়ী ময়নাটার কথা। তার নাম কী, তাকে কবে পেয়েছ, কয় কাছ থেকে পেয়েছ?

—আপনি তো জানেনই ওর নাম 'মুন্না', আমার স্বামী ওটা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন—সেটা শ্রুৎবার, মানে দোশরা সেপ্টেম্বর।

—তুমি কি খবরের কাগজে দেখেছ যে...

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, হ্যাঁ দেখেছি! আর একটা পাহাড়ী ময়নার কথা তো? এটা কেমন করে হল আমি জানি না।

—তাহলে তুমি বলতে চাইছ, আজ সকালে খবরের কাগজ দেখেই তুমি প্রথম জানতে পারলে যে. তোমার স্বামীর নাম মহাদেওপ্রসাদ খান্না? কালকের কাগজ থেকে তোমার কোন সন্দেহ হয়নি?

এবার জবাব দিতে ওর দেরি হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, না হয়েছিল। একটা প্রিমিনিশান! প্রথম

কারণ ঐ পাহাড়ী ময়নাটা, আর দ্বিতীয় কারণ লগ্-কেবিনের ফটোটা।

—লগ্-কেবিন! তুমি সেটা দেখেছ?

—হ্যাঁ, শুধু দেখেছি নয়, বাস করেছি। ওখানেই আমাদের...মানে, বিয়ের পর ওখানেই আমরা দু-সাতটি বাস করি। সাতাশে শ্রীনগরে আমাদের বিয়ে হল। পরদিন আমরা ফিরে আসি। উনত্রিশ আর ত্রিশ তারিখে আমরা ঐ লগ্-কেবিনে ছিলাম।

—লগ্-কেবিনের ভাড়াটা মেটালো কে? তুমি না তিনি?

—না, উনি বললেন ঠুর এক আত্মীয় কেবিনের ভাড়াটা মিটিয়ে দেবেন। আমাদের ভাড়া লাগবে না। এখন মনে হচ্ছে, আমি কেমন করে সরল বিশ্বাসে এসব মনে নিয়েছিলাম!

—উনত্রিশ ও ত্রিশ অগস্ট তোমরা দুজনে ওখানে ছিলে। তারপর?

—তারপর আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল। আমি পহেলগাঁও ফিরে এসে কাজে জয়েন করলাম। উনি বললেন, উনি দিন-দশ বারের জন্য শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছেন। সেখানে ঠুর একটা ঘর আছে—বিয়ের সময় যে ঘরখানায় আমরা উঠেছিলাম—সেখানেই উনি উঠবেন প্রথমে। তারপর অন্য কোথাও যাবেন।

—এ ঘরখানাতেও উনি থাকতেন না, অথচ ভাড়া গুনতেন?

—তাই তো বলেছিলেন।

—তবু তোমার সন্দেহ হল না যে, লোকটা ভবঘুরে বেকার নয়?

—হয়তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার হয়নি, বিশ্বাস করুন।

—তোমরা যে দুদিন ঐ লগ্-কেবিনে ছিলে তার মধ্যে তোমার স্বামী কি কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, বার দুই বলেছিলেন।

—তুমি নিশ্চয়ই কান করে শোননি?

—না শুনিনি।

—রমা, তুমি আমারই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছ না, কাঠগড়ায় উঠলে তোমার কী দশা হবে! তোমার স্বামী বেকার, ভবঘুরে—অথচ সে লগ্-কেবিনের ভাড়া মেটায়, শ্রীনগরের ফাঁকা ঘরের ভাড়া মেটায়। তুমি বলেছ, সে তার অতীতের কথা কিছু বলেনি তবু তুমি তাকে বিয়ে করলে এবং তবু সে যখন টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে তখন তোমার নিভান্ত মেয়েলি কৌতূহলও হল না?

—এর কী জবাব বলুন? আমি শুনিনি, টেলিফোনে কার সঙ্গে কী কথা তিনি বলেছেন।

—লগ্-কেবিনে গিয়ে তোমার কি মনে হয়েছিল তোমার স্বামীর কাছে জায়গাটা নতুন লাগছে?

—না। বরং উষ্টো। উনি বলেও ছিলেন—ওখানে উনি এর আগেও এসেছেন।

—আর ঠুর সেই বড়লোক আত্মীয় সেবারও ঠুর হয়ে ভাড়া মিটিয়েছিল নিশ্চয়?

—সেটা আমি ভিজ্জাসা করিনি।

—যে রিভলভারটাতে উনি খুন হয়েছেন সেটার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই কিছু জান না, নয়?

—না, জানি। ওটা মন-বাহাদুরের রিভলভার। সে দেশে বাবার সময় আমার কাছে ওটা গচ্ছিত রেখে যায়। সেটা আমিই ঠুরকে দিয়েছিলাম।

—কেন?

—উনি আমার কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়েছিলেন।

—কেন?

—মেয়েটি কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, ও-কথা থাক। ওর জবাব আমি দেব না।

—বাসুও কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ বলেন, মহাদেওপ্রসাদ খান্নার মৃত্যুতে তোমার আর্থিক লাভ কী হল?

## কাটায়-কাটায়-২

অন্ধকারে মেয়েটির মুখ দেখা গেল না। কণ্ঠস্বরে বিশ্বয়ের চিহ্ন। বললে, মানে?

—উনি কি কোনও উইল করেছেন? অথবা তোমাকে নমিনি করে কোনও ইন্সট্রাকশন?

—কী বলছেন আপনি? বিয়ের পর তো সাতটা দিনও তাঁর সঙ্গে বাস করিনি। আর তাছাড়া আমার জ্ঞানমতে তো তিনি নিঃশ্ব। উইল বা ইনসট্রাকশনের প্রশ্নই তো ওঠে না।

এই সময়েই ওদের গাড়ির কাছাকাছি একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে সুজাতা এগিয়ে এল এই গাড়িটার কাছে। বাসু বললেন, কৌশিক, তুমি সুজাতাকে নিয়ে ঐ চায়ের দোকানে একটু বস। আমার সওয়াল হয়ে গেছে। একটু পরেই তোমাদের ডাকব।

কৌশিক বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেল।

বাসু বললেন, এখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। খোলাখুলি একটা কথা বল রমা! এমন তো হয়নি যে, তুমি হঠাৎ জানতে পেরে গেলে যে, তোমার স্বামী বিবাহিত, নাম ভাঁড়িয়ে তোমাকে বিয়ে করেছে, তারপর তর্কাতর্কি রাগরাগির মধ্যে হঠাৎ...

—আমি ঠুকে গুলি করে মেরে ফেললাম?

—হতেও তো পারে?

—আপনি বন্ধ উদ্ভাদ! আমি নিজ হাতে...কী বলছেন আপনি!

বাসু বললেন, আর একটা কথা। মিসেস কৃষ্ণমাচারী তোমার হত্যাকারের সঙ্গে পরিচিত?

—না বোধ হয়। কেন?

—আমি চাইছি তোমাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিতে। যাতে উনি 'মুন্না'কে আর খান্নাজীর চিঠির বাণ্ডিল যে বাস্কে আছে সেইটা আমাকে দিয়ে দেন।

রমা বলল, চিঠিগুলো কোনও বাস্কে নেই। আছে আমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। তার চাবিটা আপনি নিয়ে গেলে আমার হাতচিঠিতে ঠর অবিশ্বাস হবে না। কিছু কথা দিন, চিঠিগুলো আপনি পড়বেন না?

—পড়ব না মানে? আলবৎ পড়ব। পুলিশ সেগুলো 'সীজ' করার আগে আদ্যন্ত পড়ে নোট নেব।

রমা বলল, তাহলে চাবি আমি দেব না।

—কী আশ্চর্য! কেন? দেবে না কেন?

—না! সে আমার নিজস্ব জিনিস। আপনাদের পড়তে দেব কেন?

—দিতে তুমি বাধ্য হবে রমা। বুঝতে পারছ না—তুমি খুনের আসামী হতে চলেছ! ও চিঠি পুলিশে দেখবেই!

—না। দেখবে না। আমি শুধু 'মুন্না'কে নিয়ে আসার কথা লিখে দিছি।

—বেশ ভাই দাও। কিছু চিঠিগুলো তোমার 'সীজ' হবেই।

রমা কলম বার করে মিসেস কৃষ্ণমাচারীকে একটা হাতচিঠি লিখে দিল। বাসু-সাহেবকে পাখিটা দিয়ে দেবার জন্য।

বাসু বললেন, তুমি শ্রীনগরে এসেছিলে কেন? আমার দেখা না পেলে কোথায় যেতে?

—একবার সেই ঘরটা দেখতে যেতাম। উনি যেখানে থাকবেন বলেছিলেন।

—শুধু সেই জনোই ছুটে এসেছ এমন করে? সে ঘর তো এখন তালাবদ্ধ।

—না। শুধু সেজন্য নয়। তারপর আমি সূর্যপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করতেই আর সব কথা খুলে বলতাম।

—তুমি কি জান যে, মহাদেওপ্রসাদের স্ত্রী এখন ও বাড়িতে আছেন? এবং মহিলা অত্যন্ত দুর্মুখ? রমা চুপ করে কী ভাবতে থাকে।

—কী হল? যাবে সেই মহিলার সামনে?

—আপনি কী পরামর্শ দেন?

—আমার পরামর্শ তুমি শুনবে?

—শুনব।

বাসু-সাহেব সূজাতাকে ডেকে আনলেন। বললেন, এ হচ্ছে রমা দাশগুপ্তা। আমি চাই সংবাদপত্রের অতি-উৎসাহী সংবাদদাতাদের হাত থেকে একে বাঁচাতে। আশা করি তুমি বুঝতে পারছ। আমি কী বলতে চাই। যে জন্য লিখেছিলাম, একটা গুভারনাইট ব্যাগ নিয়ে এস।

সূজাতা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

রমা বৈকে বসল। বলল, না, আমি কোথাও যাব না।

—তার মানে সুরমা খামার সামনেই তুমি দাঁড়াতে চাও?

—না। নিশ্চয় নয়।

বাসু বলেন, রমা, তুমি কেন বুঝতে পারছ না? মন-বাহাদুর রিভলভারটা কার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল জানার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তোমাকে খুঁজবে। তুমি ঐ লগ্-কেবিনে গিয়েছিলে জানতে পারার পর তোমাকে সরাসরি অভিযুক্ত করবে?

—মার্ডার চার্জ?

—হ্যাঁ।

—আপনি আমাকে আত্মগোপন করতে বলছেন?

—আদৌ নয়। মাত্র চব্বিশ কি ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য তুমি সহজলভ্য থাকবে না। বাসু!

রমা একটু ভেবে নিয়ে বলল, বেশ, কোথায় যেতে হবে বলুন?

সূজাতা কথোপকথনের সূত্রটা ভুলে নিয়ে বলল, আসুন। আমার সঙ্গে। বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলল, হোটেলের উঠে কি আপনাকে ফোন করব?

বাসু একটু ধমকের সুরে বলেন, তুমিও যে কৌশিকের মতো নিরেট হয়ে উঠছ সূজাতা! আমি যখন কোনও রহস্য সমাধান করতে বসি তখন কতকগুলো তথ্যের বিষয়ে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেইলস খুঁজতে থাকি; আর অপর একজাতের তথ্য সম্বন্ধে আমার স্ট্যান্ড হচ্ছে: হোয়্যার ইগ্নরেন্স ইজ ব্রিস্ ইটস্ ফলি টুবি ওয়াইজ্। কিছু বুঝলে?

সূজাতা হেসে বললে: জলের মত।



ছয়

সূজাতা রমাকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ার পর কৌশিক বলে, এর পর? আজকের মত কি খেল খতম?

বাসু ব্যঙ্গের স্বরে বলেন, আজ্ঞে না! সার্কাসের শেষ খেলা হচ্ছে 'বাধিনী'র!

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন—সূর্যপ্রসাদের প্রাসাদে গাড়ি নিয়ে যেতে।

প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়ি। গেটে বন্দুকধারী গুর্খা গ্রহরী। গাড়ি গিয়ে পোর্টে থামতেই বেরিয়ে এলেন এক ডব্রলোক। বাসু দেখলেন, গঙ্গারামজী। এগিয়ে এসে বললেন, আসুন স্যার, সূর্য আপনাকে প্রতি পনের মিনিট পর পর হাউসবোটে ফোন করে চলেছে।

—নতুন কোন খামেলা বেধেছে নাকি?

—বিশেষ কিছু নয়, গৃহকর্ত্তী এসে পৌঁচেছেন। ঐ শুনুন না—

ইতিমধ্যে ওরা সোপান অতিক্রম করে প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে প্রবেশ করেছেন। ড্রইংরুমের পিছনেই দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি। উপর থেকে ভেসে আসছে একটি মহিলাকণ্ঠ—রীতিমতো ক্লাউ ও কর্কশ। গঙ্গারামজী বলেন, ঠাৱা দুজন আর সূর্য একা। পারবে কেন?

## কাটার-কাটার-২

—কেন? আপনি তো সূর্যকে মদৎ দিতে পারতেন?

—কী করে দেব স্যার? আমি তো এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না—কে আমার মনিব। সদ্যোবিধবা, না সূর্য?

—তাহলে আমি বরং সূর্যের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

কৌশিক বলে, আমিও আসব?

—না। তুমি হাউসবোটে ফিরে যাও। রানু একা পড়ে গেছে।

—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বাসু বলেন, ভদ্রমহিলার তরফে কোনও উকিল নিয়োজিত হয়েছেন কি?

—আজ্ঞে না। উনি বলছেন, ঠর উকিল দরকার হবে না। অনেক উকিলের উনি নাক কাটতে পারেন!

বাসু-সাহেব ক্রমাল দিয়ে নিজের নাকটা মুছলেন।

দুজনে চুকতেই সূর্যপ্রসাদ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। বললে, গুড ইভনিং স্যার। আপনাকেই ঝুঁজছিলাম। আসুন।

মায়ের দিকে ফিরে বললে, মিসেস খান্না, ইনিই হচ্ছেন আমার সলিসিটর, মিস্টার পি. কে. বাসু। আর ও হচ্ছে জগদীশ মাথুর।

বাসু-সাহেবের লক্ষ্য হল—সূর্য মহিলাকে মাতৃসম্বোধন করেনি। বাসু মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হল্যাম মিসেস খান্না।

ভদ্রমহিলা শাণিত দৃষ্টিতে একবার বাসু-সাহেবকে দেখে নিয়ে অঙ্কুটে একটি মাত্র শব্দে কী যেন স্বগতোক্তি করলেন। বঙ্গভাষে বোধ করি সেটা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: আদিখ্যাত!

জগদীশ কিছু সোৎসাহে এগিয়ে এল। বাসু-সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে বললে, আপনার সব কেসগুলো হিন্দি বা ইংরাজীতে অনুবাদ করাচ্ছেন না কেন? আমি মাত্র দুটি কাহিনী...

হঠাৎ মাঝখানে ওর মা ধমক দিয়ে ওঠেন: জগু! বস চুপ করে। এখন আমাদের খোশগল্প করার সময় নয়।

বাসু মহিলার দিকে ফিরে বললেন, তাহলে কিভাবে আমরা সময়টা কাটাবো?

—জরুরী ব্যাপারটার আশু ফয়সালা করে। সূর্য আপনাকে টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছে খোশগল্প করার জন্য নয়। আমাকে আমার স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে। ক্ষমতা থাকে আপনি চেষ্টা করে দেখুন। বলুন, আপনার কী বলার আছে?

বাসু বলেন, সব চেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি একজন এটর্নি নিযুক্ত করেন, যিনি আপনার স্বার্থ দেখবেন। আইনঘটিত ব্যাপার তো—

মহিলা খন্থনে গলায় বলেন, আমাকে আইন দেখাতে আসবেন না মশাই। দরকার হলে দশ-বিশটা উকিল আমি আমার ভ্যানিটি-ব্যাগে পুরে ফেলতে পারি। ব্যুয়েছেন? বলুন, কী বলতে চান?

বাসু বলেন, বিবয়টা কী আগে শুনি। নিচে থেকেই আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। সে আলোচনাটাই শুক হক না আবার?

—বেশ। শুনুন মশাই। সূর্যকে বলেছি। আপনাকেও বলি। আমার বিয়ে হওয়া ইত্তক সূর্য আমাকে বিব-নজরে দেখে। নানাভাবে আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে এসেছে। সেসব কথা যদি আমি খোলাখুলি ওর বাপকে বলতাম তাহলে এতদিনে সে ওকে ত্যাজ্যপূত্র করে ছাড়ত। আমি বলিনি। কী দরকার ওসব নোংরামির মধ্যে যাবার? কিন্তু সূর্যের অত্যাচারে এ সংসারে টিকতেও পারিনি। গত এক বছর ধরেই তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি জানতাম ও সুবিধা পেলে আমাকে বিব খাওয়াতো—তাই শ্রীনগরে এলেও আমি বরাবর হোটেলের উঠেছি। এ-বাড়ির ছায়া মাড়িনি। কিন্তু সে খেলা শেষ হয়ে গেছে। এখন সব কিছু বর্তেছে আমাতে। সব কিছু আমাকে বুঝে নিতে হবে। দেখতে

হবে, কোম্পানির কত লাখ টাকা ও ইতিমধ্যে হাতিয়েছে। ওকে বলেছি, খাতা-পত্র সব নিয়ে আসতে। ও শুধু টিলিমিশি করছে।

বাসু বলেন, ব্যবসায়ের খাতাপত্র দেখতে চাওয়ার আগে আপনিই যে মালকিন্ এটা প্রমাণ হওয়া চাই তো? সেটার কতদূর কী হয়েছে?

—বেশ। সে-কথাই বলি। আমি যদূর জানি—মহাদেও আমাকে বলেও ছিল—সে একটা উইল করেছে। সব কিছু স্বাবর-অস্বাবর স্বত্ত্ব আমাকেই দিয়ে গেছে। সূর্য বোধ হয় একটা কী-যেন মাসোহারা পাবে।

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, উইলটা আছে আপনার কাছে?

—আপনি কি আমাকে সেইরকম মেয়েহলে ডেবেছেন? জ্যাক্সহামীর উইল ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবো? উইলটা এখানেই, এ বাড়িতেই ছিল এবং আছে। যদি না সূর্য সেটা ইতিমধ্যে পুড়িয়ে ফেলে থাকে। ও যেমন ছেলে—ও সব পারে!

বাসু ধীরকণ্ঠে বলেন, ব্যক্তিগত চরিত্রাণহরণ না করেও কি আমরা আলোচনাটা করতে পারি না মিসেস্ খান্না?

এক কথায় ফয়সালা করে দিলেন উনি: না!

গঙ্গারামজী কী একটা কথা বলতে গেলেন—ঠিক সেই সময়ই জ্বলন্ত এক জোড়া চোখ তুলে মহিলা তাঁর দিকে তাকালেন। গঙ্গারামের সব কিছু গুলিয়ে গেল। ঢোক গিলে তিনি স্ট্যান্ডু মেয়ে যান।

বাসু বলেন, মিসেস্ খান্না, আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যে এক বছর ধরে তীর্থে-তীর্থে ঘুরছিলেন আর মহাদেওপ্রসাদও যে ঐ এক বছর হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তার কারণটা কি এই নয় যে, আপনারদের ‘সেপারেশন’ চলছিল?

—নিশ্চয়ই নয়! এসব ঐ সূর্যের রটনা!

—আপনারা কি দুজনে এটাই স্থির করেননি যে, ঐ ‘সেপারেশন’ শিরিয়ড শেষ হলে বিবাহ-বিচ্ছেদটা কার্যকরী করা হবে?

—এক কথা কতবার আপনাকে বলব মশাই? তেমন কোনও কথাই ওঠেনি! সূর্য যাই ভাবুক না কেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম মনকষাকষি কোনদিন হয়নি।

সূর্য এই সময় বলে ওঠে, মিস্টার বাসু, আমি এখানে একটি তথ্য পেশ করতে চাই। আমি ব্যাঙ্কে যোজ্ঞ নিয়ে জেনেছি, গত দশাশ্রা সেটেশ্বর পিতাজী এবং চাচাজী ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন এবং পিতাজী কিছু ফিল্ড-ডিপজিট জমা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন চেয়েছিলেন। চাচাজী আমার কাছে স্বীকার করেছেন, এই ব্রাঞ্চ থেকে লোন না পেয়ে পিতাজী তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। চাচাজী মশ তারিখে দিল্লী ব্রাঞ্চে সেই ফিল্ড-ডিপজিট দাখিল করে দুখানি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট করিয়ে আনেন।

মহিলা বলেন, তাতে কী হল?

সে কথার কান না দিয়ে সূর্য বলে, চাচাজী আমার কাছে আরও স্বীকার করেছেন, পিতাজী ঐ টাকাটা একটা মানি সেটলমেন্ট কেসে খরচ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কে সেই পাটি তিনি আমাকে বলছেন না।

মহিলা পুনরায় প্রতিবাদ করেন, এসব ‘খেঁজুরে গল্প’ কেন শোনানো হচ্ছে?

সূর্য তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, বারে বারে আমাকে বাধা দেনেন না। আমার বক্তব্য শেষ হলে, আপনি কথা বলবেন।

মহিলা সোফায় এলিয়ে পড়ে বলেন, বেশ বল। শুধু ‘খেঁজুরে’ নয়, ‘আবাড়ে’ গল্প।

সূর্য সুদৃঢ়া তুলে নিয়ে বলে, আমার বিশ্বাস, আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন—ঐ সেপারেশনের কথা, তার সঙ্গে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার যোগাযোগ আছে। চাচাজী এ বিষয়ে কী জানেন, তা জানা দরকার।

বাসু-সাহেব বলেন, ঠিক কথা। মহাদেওপ্রসাদ জীবিত থাকলে একমাত্র তাঁর কাছেই আপনার

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

কেঁফিয়াং দেবার কথা হত। তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের কাছে সব কথা আপনাকে খুলে বলতে হবে। বিশেষ এ একটা মার্জার কেস।

গঙ্গারাম মিসেস্ খান্নার দিকে তাকাচ্ছেন না। বললেন, আজে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওঁদের সেপারেশনই চলছিল। মিসেস্ খান্না ডিভোর্সে রাজী হয়েছিলেন, নগদ—

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মহিলা চাপা গর্জন করে ওঠেন, গঙ্গারাম! আমি তোমাকে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু—

হঠাৎ গঙ্গারামজী সাহস ফিরে পান। সুরমার চোখে চোখ রেখে বলেন, আমাকে বুখাই ভয় দেখাচ্ছেন, মিসেস্ খান্না। কী করবেন আপনি? সম্পত্তির অধিকার পেলে আমাকে বরখাস্ত করবেন, এই তো? তা আপনিই যদি এ কারবারের মালিক হয়ে বসেন, তাহলে আমি নিজে থেকেই পশ্চাত্তাপ করব! আর আমার ভয়টা কিসের?

মিসেস্ খান্না কালনাগিনীর মত হিস্‌হিসিয়ে ওঠেন, তুমি আমাকে চেন না!

চোখ দুটো জ্বলে উঠল গঙ্গারামের। বললে, চিনি, খুব চিনি। কিন্তু আমি তো আধা-সম্মাসী মহাদেওপ্রসাদ খান্না নই, আমাকে গুলি করে মারা অত সহজ নয়!

যেন জ্যাক-ইন-দ্য-বক্স পুতুল। ভড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন মিসেস্ খান্না। চীৎকার করে ওঠেন, কী! কী বললে? আমি মানহানির মকদ্দমা করব।

বাসু তাঁকে থামিয়ে দেন: বসুন, বসুন। মানহানির মকদ্দমা যখন হবে তখন ওসব কথা উঠবে। আপাতত আমরা সম্পত্তির মালিক কে সেটারই ফয়সালা করছি। বলুন, গঙ্গারামজী। আপনি কী যেন বলছিলেন?

মিসেস্ খান্না গোঁজ হয়ে বসে থাকেন। গঙ্গারামজী বলে চলেন, মিসেস্ খান্না ডিভোর্সে রাজী হয়েছিলেন, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্তে। আমার মালিক সে শর্ত মেনে নেন। স্থির হয়েছিল, মিসেস্ খান্না দিল্লি আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আর্জি পেশ করবেন এবং খান্নাজী তা কনটেন্ট করবেন না। ঠিক এক বছর আগে মিসেস্ খান্না আর্জি পেশ করেন। আদালত এক কথায় সে আর্জি মেনে নেন না, ওঁদের এক বছর সেপারেশনে থাকবার নির্দেশ দেন। এ বছর পাঁচই সেপ্টেম্বর মিসেস্ খান্না দলিলটা পাবেন এমন কথা ছিল। আদালত থেকে তিনি নির্দেশ পান সোমবার পাঁচই সেপ্টেম্বর আদালত থেকে দলিলটা ডেলিভারি নিয়ে যেতে। মিসেস্ খান্না আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন। ছয়ই সকালের ফ্লাইটে তিনি ত্রীনগরে আসবেন এবং নগদে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা হস্তান্তরিত করবেন। সে-কথা আমি যখন আমার মালিককে জানালাম তখন উনি লিখলেন, সোমবার পাঁচই উনি এসে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে আমাকে দিয়ে যাবেন। পরদিন আমি ঐ টাকা মিসেস্ খান্নাকে দেব এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা নিয়ে সিন্দুক রাখব। যেকোন কারণেই হোক মালিক শুব্বার দোশরা সকাল সাড়ে নটা নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির সিন্দুক থেকে এক বাঙালি ফিল্ড-ডিপজিট সার্টিফিকেট নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে ব্যাঙ্কে যান। সেখানে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল যে, এ টাকা পেতে হলে হয় তাঁকে অথবা আমাকে দিল্লি যেতে হবে। উনি সার্টিফিকেটগুলি আমাকে দিয়ে বলেন সেগুলি বাড়িতে রাখতে। আরও বলেন, তিনি অন্য কোনও সূত্র থেকে টাকাটা যোগাড় করা যায় কিনা দেখবেন। নেহাৎ না পারলে উনি টেলিফোন করে আমাকে জানাবেন, যাতে আমি ঐগুলি জামানৎ দিয়ে দিল্লি থেকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট করিয়ে আনতে পারি। এর পর উনি আড়াইটার বাসে পয়েলগাঁওয়ের দিকে চলে যান।

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, বাসে? পাবলিক বাসে? গাড়িতে নয়?

—আজে না। পাবলিক বাসে। যদিও তাঁর দুখানা অ্যাস্বাসাড়র, একটা স্টেশন-ওয়াগন, একটা ল্যাভরোভার আর একত্রিশখানা ট্রাক আছে। যা হোক, যে-কথা বলছিলাম, পাঁচই রাত আটটা নাগাদ



তিনি ঐ টাউট-প্যারাডাইস থেকে আমাকে ফোন করে বললেন দিল্লি থেকে ব্যাঙ্ক ড্রাফটটা করিয়ে আনতে।

বাসু বললেন, উনি কি ঐ লগ-কেবিন থেকেই ফোন করেন?

—না। ঐ লগ-কেবিন থেকে নয়। উনি বললেন, লগ-কেবিনের টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে। তিনি অন্য কোনও জায়গা থেকে ফোন করছেন। কোথা থেকে তা উনি বলেননি। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। সে যাই হোক, আমি তৎক্ষণাৎ এয়ার-অফিসে ফোন করি। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন মর্নিং ফ্লাইটে একটা টিকিট পেয়ে যাই। ছয়ই ভোরের প্লেনে দিল্লি চলে যাই। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। দু-তিন দিন আমি হোটেল ছেড়ে বেরুতে পারিনি। দশ তারিখে ব্যাঙ্কে গিয়ে ড্রাফটটা তৈরী করি। পরদিনই অর্থাৎ এগারোই সূর্য আমাকে টেলিফোন করে দুঃসংবাদটা জানায়। আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসি। ড্রাফট দুটি এখনও আমার কাছে আছে।

সূর্য ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, কী আশ্চর্য! এসব কথা তো আপনি আমাকে ঘৃণাকরেও জানাননি চাচাভী?

—না জানাইনি। কারণ মালিকের নির্দেশ ছিল সব কিছু গোপন রাখতে,—হ্যাঁ, এমনকি তোমার কাছ থেকেও। নির্দেশ ছিল, ঐ দলিলটি সংগ্রহ করে শুধু তাঁরই হাতে দেওয়ার। সে সৌভাগ্য আমার হল না, তার আগেই তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে—

গলাটা ধরে এল প্রভুভক্ত একান্ত-সচিবের। রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মুছে নিয়ে বললেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম মিস্টার বাসুর জন্য। এখন আমার বুক থেকে একটা পাষণ্ডভার নেমে গেল।

বাসু মিসেস খান্নার দিকে ফিরে বললেন, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

মিসেস খান্না বলেন, নাটক মঞ্চস্থ করছেন আপনারা, আমি তো দর্শকমাত্র। আমি কী বলব? একটা কথাই বলতে পারি: এনকোর! এনকোর!

বাসু গম্ভীরভাবে বলেন, মিসেস খান্না, ব্যাপারটা আশু ফয়সালা হয়ে যাক এটা নিশ্চয় আপনিও চাইছেন। দিল্লি-আদালত আপনারদের বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছেন কি না এটা আমরা ঠিকই জানতে পারব। কিছুটা সময় লাগবে, এই যা। এক্ষেত্রে আপনি কি জানাবেন, দিল্লি আদালত সেটা মঞ্জুর করেছেন কি না?

—হ্যাঁ করেছেন।

—সেটা নিয়েই আপনি এসেছেন শ্রীনগরে? সাত তারিখে?

—সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে যাব কেন?

সূর্য বলে, বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকাই তাঁর প্রাপ্য, কেমন তো? এক্ষেত্রে উনি আমার বিমাতা নন? তার মানে বাকি সম্পত্তির কিছুই উনি দাবী করতে পারেন, না?

কোথাও কিছু নেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন মহিলা। হাসির দমক সামলে বলেন, তুমি বড় তাড়াহুড়া করে ফেলছ সূর্য। একদিন পরে কাজটা হাঁসিল করলে সব কিছুই তোমাতে বর্তাতো!

—কোন কাজ?

—বাপকে খুন করা, আবার কী?

—শাট আপ!—গর্জে ওঠে সূর্য।

জগদীশ এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার বললে, মা, কী বলছ ভেবেচিন্তে বল!

—আমি জানি, জগু আমি কী বলছি। এই দেখুন ব্যারিস্টার-সাহেব সেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা।

সূর্য বললে, মিস্টার বাসু, আমার প্রশ্নটার জবাব পাইনি। বিবাহ-বিচ্ছেদ যখন হয়ে গেছে তখন—মাকপথেই সে থেমে যায়। দেখে, বাসু-সাহেব মন দিয়ে দলিলটা দেখছেন।

মিসেস খান্নার কিছু তর সয় না। বলেন, কই ব্যারিস্টার-সাহেব? এবার নাটকে আপনার ডায়ালগ্‌ যে? আপনার ক্লায়েন্টকে শুনিয়ে দিন কেন ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদ দলিলটা সিদ্ধ নয়?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

বাসু বললেন, হ্যাঁ, বিবাহ-বিচ্ছেদের এ দলিলটা সিদ্ধ কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা অনুমোদন করেছেন ছয়ই সেপ্টেম্বর। ঠিক কটার সময়—এমন কি ‘ফোরনুন’ না ‘আফটারনুন’ তারও উল্লেখ নেই। অপরপক্ষে মহাদেও প্রসাদ খুন হয়েছেন ঐ ছয় তারিখেই সকাল এগারোটা নাগাদ। বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটি সিদ্ধ হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরমুহূর্ত থেকে। যদি প্রমাণিত হয়, তিনি বেলা এগারোটোর পর সই করেছেন, তাহলে এ ডিভোর্স-সার্টিফিকেট সিদ্ধ নয়। কারণ মৃত্যুবন্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে না, কাউকে ওকালত-নামা দেওয়া থাকলেও।

মিসেস খান্না বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট বিকালবেলা সইটা করেন, এবং আমার তরফে আর্টর্নি সেটা ডেলিভারি নেন বিকাল চারটায়। প্রয়োজন হলে আমার অ্যাডভোকেট সেই মর্মে এফিডেবিট করবেন।

বাসু বলেন, তারপর? আপনারা দুজন সাত তারিখের ফ্লাইটে শ্রীনগরে চলে আসেন?

—একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো?

—কারণ এমনও হতে পারে যে আপনি ছয় তারিখ মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লি থেকে এসেছেন,—এবং আপনার পুত্র পরদিন ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদ দলিলটা নিয়ে এসেছে?

—তাতে কী হল?

—হয়নি কিছুই। আমি জানতে চাইছি আপনি কবে শ্রীনগরে এসেছেন?

—আমি তো বারে বারই বলছি, সে কথা ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট্যান্ট। ছয় তারিখ সকালে আমি কোথায় ছিলাম, তার সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানার কোন সম্পর্ক নেই। আপনিই না একটু আগে বললেন, আমাদের বর্তমান মামলাটা শুধু সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে?

—তার মানে ছয়ই সকালে আপনার কোন ‘অ্যালিবাই’ নেই!

—লুক হিয়ার মিস্টার ব্যারিস্টার। এটা আদালত নয়। আপনার অবাস্তব প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন—ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদের কাগজখানা নিতান্ত মূল্যহীন।

বাধা দিয়ে সূর্য বলল ওঠে, একটু আগে আপনি বলছিলেন, আমিই বাবাকে খুন করেছি। অথচ দেখা যাচ্ছে ছয়ই সকালে আপনি কোথায় ছিলেন তার সঙ্কোচজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারছেন না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আপনি হোটেল চেক-ইন করেছেন সাত তারিখ সকালে। অথচ এয়ারলাইন্স বলছে, ছয়-সাত দু-দিনের প্যাসেঞ্জার লিস্টেই আপনার নাম নেই! তার মানে...

—বাস ব্যাস! ঐ পর্যন্তই থাক। তোমার ব্লাড-প্রেসার বেশি, ডাক্তারে বলেছেন, উত্তেজিত না হতে, তাই না? আচ্ছা চলি ব্যারিস্টার-সাহেব—

পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাটি কক্ষত্যাগ করবার জন্য উঠে দাঁড়ান। বাসু বলেন, বসুন, যাবেন না। আমার আরও একটা কথা বলার আছে—

—আবার কি?—মিসেস খান্না বসে পড়েন।

—খবরটা এখনও জানাজানি হয়নি, কিন্তু পুলিশে এটা শীঘ্রই জানতে পারবে। মহাদেও প্রসাদ সাতাশে অগস্ট তারিখে একটা মহিলাকে বিবাহ করেন।

সূর্য চমকে ওঠে। গঙ্গারামও। কিন্তু মিসেস খান্নাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না। বললেন, কী দুর্ভাগ্য, আমাদের নিমন্ত্রণ হল না! মহাদেও যে চরিত্রের লোক তাতে আমি অবাক হইনি। লোকটা মরে গেছে, তাই ‘বাইগমির’ মামলা আনা যাবে না। তা সে যাই হোক, আমার সঙ্গে ষতদিন না বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন সেই মাগির কোনও দাবী আইনত দাঁড়ায় না। মেয়েটি কে তা জানবার আমার বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই। আয় জগু, আমরা যাই। অনেক কাজ এখনও বাকি।

মিসেস খান্না চলে যাবার পর বাসু দেখলেন, দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সূর্য। তারপর মুখ তুলে বললে, এ তথ্য কী করে পেলেন?

—ঐ উল্লের কাঁটা আর ব্র্যাসিয়ারের সূত্র ধরে। মেয়েটির দোষ নেই, সে জানত না উনি বিবাহিত।

সূর্য বলে, ইতিমধ্যে আর কিছু জেনেছেন?

—জেনেছি। লগ-কেবিন যে ময়নাটাকে পাওয়া গেছে সে মুন্না নয়। যে কোনো কারণেই হোক তোমার বাবা মুন্না'কে কোনও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে ঠিক ঐ রকম দেখতে আর একটি ময়নাকে ঐ লগ-কেবিনে নিয়ে এসেছিলেন।

সূর্য চমকে উঠে বলে, তিনি নিজেই? কেন?

—কেন তা এখনও বুঝতে পারিনি। তবে তিনি নিজেই ঐ দ্বিতীয় ময়নাটিকে খরিদ করেন দোশরা সেন্টেশ্বর শ্রীনগরের বাজারে।

তারপর উনি গঙ্গারামের দিকে ফিরে বলেন, দোশরা বেলা দেড়টার বাসে আপনি কি তাঁকে তুলে দিয়ে এসেছিলেন? তাঁর সঙ্গে কি আর একটা ময়না ছিল?

গঙ্গারাম বললেন, আজ্ঞে না। বাসে আমি নিজে তাঁকে তুলে দিতে যাইনি। তাঁর সঙ্গে আর একটা ময়না ছিল কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু তিনি কেন আবার একটা ময়না কিনবেন? আর সেই দ্বিতীয় পাখিটাই বা কোথায়?

বাসু বললেন, দ্বিতীয় পাখি নয় গঙ্গারামজী, সেটাই প্রথম পাখি। তার নাম মুন্না। তার দেখা পেলেই বোঝা যাবে কী কারণে খান্নাজী তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

গঙ্গারাম বললেন, নিরাপদ দূরত্বে মানে? আততায়ী তো ময়নাটার কোন ক্ষতি করেনি। মালিক কেন আশঙ্কা করলেন যে, মুন্নার কোন বিপদ আছে?

বাসু বলেন, যতক্ষণ না 'মুন্না'কে খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, ঘটনার সময়ে ঠাঁর লগ-কেবিনে মুন্না আদৌ ছিল না।



## সাত

সমস্ত দিনের ধকল তো বড় কম যায়নি। রাত প্রায় দশটার সময় ক্লান্ত শরীরে হাউসবোটে ফিরে এসে বাসু-সাহেব কিন্তু আবার একটি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। হাউসবোটের ড্রইংরুমে বসে আছেন এস. ডি. ও. শর্মা, সতীশ বর্মন, যোগীন্দ্র সিং আর একজন অফিসার। আর কৌশিক।

বাসু ঠুন্দের দেখে বললেন, গুড-ইভনিং জেন্টলমেন। আপনারা আমার প্রতীক্ষাতেই আছেন মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার? জরুরী কিছু?

অপরিস্রব ভদ্রলোকটি নিজে থেকেই আত্মপরিচয় দেন—আমার নাম প্রকাশ সাকসেনা, আমি হচ্ছি এখানকার পাবলিক প্রসিকিউটর।

বাসু করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে বললেন, থ্যাড টু নো য়ু।

—আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু জরুরী কথা আছে।

—সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কী বিষয়ে?

—রমা দাসগুপ্তার বিষয়ে।

—তার বিষয়ে কী কথা?

—সে বর্তমানে কোথায় আছে?

—তা তো জানি না।

সতীশ বর্মন শর্মাজীর দিকে ফিরে বললে, হ'ল? আমি বলিনি?

বাসু ধীরেসুস্থে সোফায় বসে বললেন, ব্যাপারটা কী?

প্রকাশ সাকসেনা বললেন, আমি জানতে চাই রমা দাসগুপ্তাকে আপনি কোথায় নামিয়ে দিয়ে এলেন?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—আমি তাকে কোথাও নামিয়ে দিইনি।

—আমাদের খবর অন্য রকম।

—নাকি?

—আপনি অস্বীকার করতে পারেন যে, আজ সন্ধ্যা ছটার সময় আপনার সঙ্গে ঐ মেয়েটার দেখা হয়নি? শ্রীনগর বাস স্ট্যাণ্ডে?

—না। অস্বীকার করব কেন? দেখা হয়েছিল, কথাবার্তাও হয়েছিল। তারপর সে কোথায় গেছে জানি না।

সতীশ বর্মন একটি স্বগতোক্তি করে, সেই চিরাচরিত খেলা!

তারপর শর্মাজী দিকে ফিরে বলে, গরিবের কথা বাসি না হলে তো চৈতন্য হয় না। এখন দেখছেন তো?

শর্মাজী এবার কথোপকথনে যোগ দেন। বলেন, মিস্টার বাসু, আপনি তো এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতাই করছিলেন—

—এখনও করছি। বেশ, আপনাদের খোলাখুলিই জানাচ্ছি—শুধু সূর্যপ্রসাদ নয়, রমাও আমার ক্লায়েন্ট। আমি মহাদেওপ্রসাদ খান্নার মৃত্যু রহস্যটা সমাধান করতে পেরেছি। এবং সেটা আমার নিজের পদ্ধতিতে করব। আপনারা যেমন আপনাদের পদ্ধতিতে করছেন।

প্রকাশ বললে, আমরা আপনার সেই ক্লায়েন্ট রমা দাসগুপ্তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—খুব ভালো কথা। যান, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন!

—সে কোথায়?

বাসু বলেন, এক কথা কতবার বলব মশাই? আমি জানি না সে কোথায়।

প্রকাশ সাকসেনা উদ্ভত ভঙ্গিতে বললে, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু! আপনি অস্বীকার করলে আমরা আপনাকে 'অ্যাক্সেসারি'র চার্জ ফেলতে পারি, সেটা খোয়াল করে দেখেছেন?

বাসু বলেন, লুক হিয়ার মিস্টার পি. পি.! আপনি আমার বিরুদ্ধে কী চার্জ আনবেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তবে আইনের প্রসঙ্গ যদি তোলেন তবে ঐ ধারাটা আবার আপনাকে শেখতে বলব। যতক্ষণ না আমার ক্লায়েন্টকে হত্যাকারীরূপে আপনি চিহ্নিত করছেন, ততক্ষণ আমার বিরুদ্ধে ও জাতীয় চার্জ উঠতেই পারে না। আপনারা কি বলতে চান রমা দাসগুপ্তাই খুনটা করেছে?

—প্রকাশ দৃপ্তস্বরে বলেন, ই্যা তাই! এবার?

শর্মাজী বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, ওয়েট এ মিনিট সাকসেনা!—তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন; কিন্তু—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, তাই তো করতে চাই মিস্টার শর্মা! একই লক্ষ্যে আমরা পৌছাতে চাই—মহাদেও প্রসাদ খান্নার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। কিন্তু পথটা বিভিন্ন হয়ে পড়ছে—আপনারা এক পথে চলেছেন, আমি ভিন্ন পথে।

শর্মা বলেন, তাতে আমার আপত্তি হত না, যদি আপনি আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি না করতেন। আপনি তাই করছেন এখন।

সতীশ বর্মন বলে ওঠে, উনি চিরটা কাল তাই করে এসেছেন।

বাসু সে কথায় কান না দিয়ে শর্মাজীকেই উদ্দেশ্য করে বলেন, তার কারণ চিরটা কাল সেখান আসছি পুলিশ নিরপরাধীকে কাঠগড়ায় তুলে আসছে।

শর্মাজী বলে ওঠেন, আপনি জানেন মার্ডার-ওয়েপনটা কার তা আমরা খুঁজে বার করেছি?

—জানি, স্টেট ব্যাঙ্কের দারোয়ান মন-বাহাদুরের। দেশে যাবার সময় সে সেটা ঐ রমা দাসগুপ্তার কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। শুধু তাই নয়, ঐ রমা দাসগুপ্তার বাড়িতেই আছে 'মুন্না', যাকে খুঁজছেন আপনারা।

শর্মাজী অবাক হয়ে বলেন, আপনি সে কথাও জানেন?

—এবং জানি ঐ ময়নাটা যে অজুত 'বোলটা পড়ে: 'রমা! মৎ মারো...পিস্তল নামাও...ফ্রম...হায় রাম!'

প্রকাশ সাকসেনা গম্ভীর হয়ে বলেন, মিস্টার বাসু, এর পরেও যদি আপনি আমাদের না জানান সেই মেয়েটি কোথায় আছে, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমি 'অ্যাকসেসারি'র চার্জ আনতে বাধ্য হব। বাসু বললেন, একথা আপনি আগেও বলেছেন একবার। আপনি যা খুশী করতে পারেন। শর্মাও গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনার স্ট্যান্ডটা কী? যেহেতু রমা দাসগুপ্তা আপনার ক্লায়েন্ট তাই আপনি তাকে লুকিয়ে রাখছেন, নাকি আপনি সত্যিই জানেন না সে কোথায় আছে?

—আমি সত্যিই জানি না সে কোথায় আছে।

সতীশ বর্মন বললে, আমার মনে হয় মিস্টার বাসুর বিরুদ্ধে আমরা চার্জ ফ্রেম করতে পারি।

শর্মাজী বললেন, না। আমি বিশ্বাস করি উনি সত্যিই কথাই বলছেন—উনি জানেন না মেয়েটি বর্তমানে কোথায় আছে।

বাসু বলেন, থ্যাঙ্ক শর্মাজী। তাহলে আপনাকে আরও একটা সংবাদ জানাই। গঙ্গারামজী কী জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন তা কি আপনাকে জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—একথা কি আপনি খেয়াল করে দেখেছেন যে, মিসেস খান্না ছয় তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত ছিলেন না?

শর্মাজীর ভুঁ কণ্ঠন হল। বললেন, ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

—এবং মিসেস খান্না ছয় তারিখের মর্নিং ফ্লাইটে শ্রীনগরে এসে গরুতে পারেন?

সতীশ বর্মন বাধা দিয়ে বলে, আমরা সে খোঁজ নিয়েছি। প্যাসেঞ্জার লিস্টে মিসেস খান্নার নাম নেই—

বাসু বলেন, তাঁর নাম সাত বা আট তারিখের লিস্টেও নেই। সুতরাং আমরা জানি না ছয় তারিখের টিকটখানা তিনি স্বনামে বুক করেছিলেন কিনা। এবং মৃত মহাদেওপ্রসাদ তাঁর স্ত্রীকে 'সুরমা' বলে ডাকতেন, না, শুধু 'রমা' বলে ডাকতেন?

সতীশ বর্মন বলে ওঠে, সেই এক প্যাঁচ! নিজের ক্লায়েন্টকে ঝাঁচতে আর কোন শিখণ্ডীকে পুলিশের সামনে মেলে ধরা।

শর্মাজী গম্ভীর স্বরে বললেন, ধন্যবাদ। সবগুলো তথ্যই জানতাম। শেষেরটা ছাড়া। আচ্ছা চলি, গুড নাইট!

গুঁরা চলে যেতেই বাসু কৌশিককে বলেন, এখনই সুর্যপ্রসাদকে একটা ফোন কর। কাল ভোর চারটের সময় গাড়িটা আমার চাই।



আট

কৌশিককে নিয়ে শ্রীনগর থেকে যখন রওনা হয়েছিলেন তখনও রাত কাবার হয়নি। হাড়-কাঁপানো শীত। পহেলগাঁওয়ে যখন পৌঁছালেন তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। ফাকা রাস্তায় বুলেটের মত গাড়িটা চলে এসেছে। বাসু-সাহেব গাড়িটা সেই মেথডিস্ট চার্চের পিছন দিকে দ্বিতীয় বাড়িটার সামনে দাঁড় করালেন। কৌশিককে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তৃতীয় বাড়িখানার সামনে এসে কলিং বেল বাজালেন।

গৃহস্বামিনী বোধ হয় তখনও শয্যাভ্যাগ করেননি। একটু বিলম্ব হল তাঁর আসতে। এবারও ল্যাচ-কী দেওয়া দরজা অল্প ফাঁক করে বললেন, কী চাই? ও আপনারা! এত সকালে?

বাসু বললেন, হ্যাঁ রাত থাকতেই বেরিয়েছি। মিসেস কাপুর ফিরে এসেছেন ভেবেছিলাম: কিন্তু ওর দরজাটা তালাবন্ধ।

—না ও ফেরেনি। ভিতরে বসবেন?

বাসু ইংরাজী ছেড়ে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে বললেন, না বসব না। আপনার বোধ হয় এখনও প্রাতঃকৃত্যাদিই সারা হয়নি, নয়?

মহিলা সসঙ্কোচে ইংরাজীতে বললেন, মাপ করবেন। আমি হিন্দি জ্ঞানি না। কী বলছেন?

—এ ময়না পাখিটাকে আর একবার দেখতে চাই।

—ও! কিন্তু ওটা তো ও বাড়িতে আছে।

বাসু বললেন, তাহলে ও বাড়ির চাবিটাই বরং দিন। আমি একটু বাথরুমেও যাব।

মিসেস কৃষ্ণমাচারীর মূর্তি অপসারিত হল। একটু পরে ফিরে এসে একটি চাবি দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বললেন, ওর বেডরুমের চাবিটা ও আমাকে দিয়ে যানি। এটা সদরের চাবি। ময়নাটা বারান্দায় টাঙানো আছে, আর ল্যাট্রিনও ব্যবহার করতে পারবেন।

—থ্যাঙ্কু সো মাচ।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই কৌশিক বলল, ভদ্রমহিলা হিন্দি একেবারেই জানেন না, তাই মুন্নার ঐ 'বোলটার' অর্থগ্রহণ হয়নি।

বাসু বললেন, একেবারেই জানেন না, তা নয়। সেদিন যখন মুন্না বলেছিল—‘আইয়ে বৈঠিয়ে চা পিজিয়ে’ তখন উনি বুঝতে পেরেছিলেন।

কৌশিক বলে, তা তো বুঝলাম। এখন কি ময়না বদল করবেন?

—অফকোর্স! তুমি গাড়ি থেকে ঐ পাখিটাকে নিয়ে এস। আমি এ বাড়ির দরজাটা খুলি। ময়না বদল করে, চাবিটা ঐ ভদ্রমহিলাকে ফেরত দিয়ে বাসু আবার এসে বসলেন গাড়িতে। বললেন, আমার ভয় ছিল, ইতিমধ্যেই পুলিশে এটাকে না সরিয়ে নিয়ে থাকে।

—সে আশঙ্কাও ছিল নাকি?

—নিশ্চয়! তাই তো রাত থাকতেই চলে এসেছি!

কৌশিক বলে, সতীশ বর্মণ এ ভুল করল কেন? কাল তারা বিকালের দিকে নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল। মিসেস কৃষ্ণমাচারীকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। পাখিটার অদ্ভুত ‘বোলটাও’ শুনছে। তবু পাখিটাকে নিয়ে যানি কেন? আন্দাজ করতে পারেন?

—পারি। দুটো কারণে। প্রথমত ওরা রমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়। ঐ পাখিটার টানেই রমা ফিরে আসতে পারে এটাই ওরা আশা করেছিল; ভেবেছিল, আমি এসে যদি জেনে যাই ‘মুন্না’কে পুলিশে ‘সীজ’ করে নিয়ে গিয়েছে তাহলে রমা আর তার বাড়িতে ফিরবেই না। দ্বিতীয়ত, ওদের খিওরি—রমাই হত্যাকারী। সেক্ষেত্রে পাখিটাকে রমা খাটিয়ে রাখবে কেন এটা ওরা বুঝে উঠতে পারেনি। পাখিটা যে ‘বোল’ পড়ছে তা শুনেও রমা ঘাবড়াচ্ছে না কেন এটা ওদের মাথায় ঢোকেনি। সে বাই হোক, আজ বিকালের মধ্যেই এখানে সতীশ বর্মণ আসবে এবং পাখিটাকে ‘সীজ’ করবে।

—কেন?

—কাল রাতে ওরা জেনেছে মহাদেওপ্রসাদ তাঁর স্ত্রীকে ‘রমা’ বলে ডাকতেন। সতীশ বর্মণ সে-কথার গুরুত্ব না দিলেও শর্মাজীর অর্ডারে যোগীন্দ্র সিং পাখিটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

পাহলগাঁও থেকে আবার শ্রীনগরে যখন এসে পৌছালেন তখন বেশ বেলা হয়েছে। দোকানপাট সব খুলেছে। বাসু-সাহেব গাড়িটাকে নিয়ে এলেন সেন্ট্রাল মার্কেটে। ইয়াকুব মিঞার দোকানে এসে বললেন, মিঞাসাব একটা উপকার করতে হবে। এই পাখিটাকে আপনার জিম্মাদারীতে দিন সাতেক রাখতে হবে। রাজী আছেন?

—আলবৎ। এ-আর বেশী কথা কি?

বাসু-সাহেব একটি পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বলেন, নিন ধরুন।

—এটা কেন স্যার?

—আমার পাখির খোরাকি।

—আমি কি ওকে সোনার দানা খাওয়াব?

—না, সেজন্য নয়। প্রথম কথা, দোকানে এটাকে রাখবেন না। আপনার বাড়িতে রাখবেন। আর এটা যে আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছি সে কথাটা যেন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না পারে। কেমন? কোন ক্রমেই যেন এ পাখিটা খোয়া না যায়।

ইয়াকুব বললে, ঠিক হায় সা'ব। কিন্তু কেন বলুন তে?

ঠিক তখনই বোল পড়ল পাখিটা: রমা! মৎ মারো। পিশুল নামাও।...ক্রম...হায় রাম।

ইয়াকুবের চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে ওঠে!

বাসু বলেন, শুনলেন তো? এই হচ্ছে আমার একনহর সাক্ষী। সেদিন যে লোকটার ছবি দেখিয়েছিলাম তার নাম রমাপ্রসাদ। ডাকনাম 'রমা'। লোকটা যখন হত্যা করে তখন এই ময়নাটা শূনে ফেলেছিল এ কথাগুলো। এখন বুঝছেন তো ময়নাটার দাম কত? ওর কিছু ভালমন্দ হয়ে গেলে পুলিশ কিন্তু আপনাকেই সন্দেহ করবে। এজন্যই মাত্র সাতদিনের খোরাকি বাবদ নগদ একশ' টাকা দিচ্ছি। খুব সাবধান! ওকে একেবারে লুকিয়ে রাখবেন। পঞ্চাশ টাকা এখন দিয়ে গেলাম, আবার পঞ্চাশ টাকা এই শাবু দেবেন দিনসাতেক পরে, যখন ময়নাকে ডেলিভারী নিতে আসবেন। ঠিক হায়?

ইয়াকুব মস্ত সেলাম করে বললে, বেফিকর রহিয়ে সা'ব।

সেন্ট্রাল মার্কেট থেকে বেরিয়ে এলেন যখন তখন সূর্য মধ্যগগনে। বাসু বলেন, এবেলার মত খেল খতম; চল হাউসবোটে কিরি।

হাউসবোটে চূপচাপ বসে আছেন রানী দেবী। নিতান্ত একা।

মধ্যাহ্ন-আহার শেষ হলে বাসু বলেন, কৌশিক এ-বেলায় তুমি রানীকে নিয়ে নৌকায় করে একটু ঘুরে এস। ইচ্ছা করলে গাড়িতেও যেতে পার, কারণ আমার গাড়ি লাগবে না।

—আপনি এ বেলা তাহলে কী করবেন?

—আমি এই হাউসবোটেই থাকব। একটু থিংক করব।

এই 'থিংক'-করা ব্যাপারটার সঙ্গে রানী দেবী ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। উনি এখন হুইক্লির বোতল নিয়ে বসবেন, পাইপ ধরিয়ে। বাইরে যদি সাইক্লোন হতে থাকে, পায়ের নিচে ভূমিকম্প মাটি দু-ফাক হয়ে যায় উনি টের পাবেন না। কায়মনোবাক্যে উনি ঝুঁদ হয়ে থাকবেন এ 'থিংক' করার ব্যাপারে। রানী দেবী লক্ষ্য করে দেখেছেন, প্রতিবারই রহস্য সমাধানের শেষাশেষি কয়েকঘণ্টা এইভাবে অন্তর্লীন চিন্তায় উনি মগ্নচৈতন্য হয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাগর-জগতে ফিরে এসে একটা স্বগতোক্তি করেন: লোকটা কে বুঝতে পারছি, কেন করেছে তাও বোঝা যাচ্ছে—কিন্তু প্রমাণ করব কী করে?

বেলা একটা নাগাদ কৌশিক আর রানী দেবী বেরিয়ে গেলেন, নৌকাতেই। বাসু বোতলটা টেনে নিলেন।

তদায়ত্তা ভাঙলো খোদাবজ্রের ডাকে। যখন সে ফুটখানেক দূরত্বে এগিয়ে এসে তৃতীয়বারের জন্যে বললে, হজ্জের?

চমকে জেগে উঠে বললেন, ক্যা বাৎ? ক্যা হুয়া?

একই আর্জি তৃতীয়বার পেশ করল খোদাবজ্র, ছোটাহজ্জের আয়ে হেঁ। আপকো সেলাম দিয়া।

বাসু হাত-ঘড়িতে দেখলেন বেলা চারটে। হাউসবোটের জানলা দিয়ে নজর পড়ল পড়ন্ত রৌদ্রে

বিলাস বিমোহে। দূরে সারি সারি গাছের পাতায় সোন-গলানো রোদ। মনকে গুটিয়ে আনলেন সেদিক থেকে। বললেন, ঠিক হয়। মায় আড়ি আড়াই।

খেয়াল হল শীত করছে। দুপুরে শুধু পাঞ্জামি গায়ে বসেছিলেন। হুইকির কল্যাণেই বোধ হয় টের পাননি, প্রখর রৌদ্রতাপ অবসৃত হয়েছে অপরাহ্নের নিরুত্তাপ পদক্ষেপে। ঘর ছেড়ে করিডোরে পা দিয়েই আবার ফিরে গেলেন। শালটা খুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন। বাইরের ঘরে এসে দেখেন সূর্যপ্রসাদ এবং গঙ্গারামজী এসেছেন।

ওঁরা কিছু বলার আগেই নিজের থেকে বলে ওঠেন, আপনাদেরই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। কাল রাতেই তোমাদের বলেছিলাম, আমি মুম্বার তল্লাস করছি। মুম্বাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সে আছে রমা দাসগুপ্তার বাড়িতে—পহেলগাঁওয়ে। সে নাকি একটা অদ্ভুত 'বোল' পড়ছে: 'রমা! মং মারো... পিস্তল নামাও... ফ্রম... হায় রাম।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, ময়নাটা একথা কেন বলছে? তোমরা আন্দাজ করতে পার?

সূর্য বলে, এর তো একটাই জবাব—লোকটা যখন পিতাজীকে গুলি করে তখন মুম্বা সেখানে ছিল। আমি তো সেদিনই বলেছি, মুম্বার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—একবার মাত্র শুন্যেই কখনও কখনও সে 'বোল' তুলে নিতে পারত। তা পুলিশে কি 'মুম্বা'কে সীজ করেছে?

—পুলিস এখনও খবরটা জানতে পারেনি। আমি রমার কর্মস্থল থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। পহেলগাঁওয়ে মেথডিস্ট চার্চের পিছনে পাশাপাশি তিনখানা বাড়ি, তার মাঝের বাড়িটাই রমা। কিন্তু ওর বাড়িতে তালো মূলছে। ওর প্রতিবেশিনী বললেন, রমা কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সূর্য বলে, তাহলে আপনি কেমন করে 'মুম্বা'কে দেখলেন?

—ওর বাড়ির পিছনের বারান্দায় খাঁচাটা ঝোলানো আছে। আমি দূর থেকে দেখেছি মাত্র। ওর বোল স্বকর্ণে শুন্যে এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে 'রমা' কে? রমা দাসগুপ্তা, না সুরমা খাম্বা? গঙ্গারামজী বললেন, রমা দাসগুপ্তা হতে পারে না, কারণ তাহলে সে ঐ পাখিটাকে এতদিন জিন্দা রাখত না।

তারপর সূর্যের দিকে ফিরে বললেন, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, খাম্বাজী মিসেস খাম্বাকে 'রমা' বলে ডাকতেন?

বাসু বলেন, কিছু মুশকিল হচ্ছে এই যে সুরমা দেবীর একটা বক্তৃ-আটনি 'অ্যালেনবাই' রয়েছে। গঙ্গারাম বলেন, তাই নাকি? সেটা কী?

—মিসেস খাম্বা প্লেনের টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে ছয় তারিখ ভোর দিল্লি থেকে রওনা হন। শ্রীনগরে এসে পৌছান ছয় তারিখ সন্ধ্যায়। বাসে ওঁর সহযাত্রী ছিলেন এমন একজন ভদ্রলোক যিনি সন্দেহের অতীত।

গঙ্গারাম বলেন, কে তিনি?

বাসু সে-কথা কানে না নিয়ে বললেন, ঐ দুজন ছাড়া 'রমা' নামের আর কাউকে তোমরা চেন? দুজনেই জানলেন, তেমন কোন লোকের কথা ওঁরা মনে করতে পারছেন না।

বাসু বলেন, তাহলে পাখিটা ঐ বোল বলছে কেন?

সূর্য বলে, ময়নাটার কথা মূলতুবি থাক। যে জন্য আমরা এসেছি সে কথাই বলি। পিতাজীর যে সিন্দূরটা আমাদের বাড়িতে আছে, তাতে কিছু কাগজপত্র ও গহনা ছিল বটে। কিন্তু ক্যাশ ছিল না। পিতাজীর যে স্ট্রেকেসটা লগ্ন-কেবিনে পাওয়া গেছে তাতে একটি গোদরেজের নম্বরী চাবি ছিল। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তাদের ভন্টের লকারের চাবি সেটা। এইমাত্র আমি সেখান থেকেই আসছি। ভন্টে ছিল কিছু দলিলপত্র, কিছু শেয়ারের কাগজ, একটা খামে 430 খানা একশ টাকার নোট আর ঐ উইলটা! এই দেখুন। বিশেষ করে এই প্যারাগرافটা :



“যেহেতু আমি আমার স্ত্রী শ্রীসুরমা খান্নার সহিত গত বৎসর বাইশে অগস্ট তারিখে একটি চুক্তি করিয়াছি যে, আমার স্ত্রী সুরমা খান্না একতরফা বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করিবেন এবং আমি কোনও আপত্তি পেশ করিব না; এবং আমার আপত্তি বা প্রতিবাদ না থাকায় তিনি একতরফা বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পাইবেন এবং সে-কারণে তাঁহার বাকি জীবনের ভরণ-পোষণ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের খেসারৎ বাবদ তিনি উক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পাদন-সাপেক্ষে আমার নিকট হইতে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করিবেন, সেই হেতু আমি আমার উইলে উপযুক্ত স্ত্রী শ্রীসুরমা খান্নার জন্য কোনও সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছি না। যেহেতু আমি মনে করি তাঁহার বাকি জীবনের ভরণপোষণ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ-খেসারত বাবদ ঐ 50,000 টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) যথেষ্ট, ন্যায্য এবং পর্যাপ্ত। উল্লেখ থাকে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ডিক্রি আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হইবার পূর্বেই যদি কোন কারণে আমার দেহান্তর ঘটে তবে পূর্ব বৎসরের ঐ বাইশে অগস্টের চুক্তি অনুযায়ী আমার স্ত্রী শ্রীসুরমা খান্না আমার সম্পত্তি হইতে ঐ 50,000 টাকাই শুধু পাইবেন—তাঁহার আর কোনও দাবী-দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না। সেই কারণে ঐ উইলে আমার সম্পত্তির আংশিক ওয়ারিশরূপে আমি তাঁহার উল্লেখ করি নাই। আমার মৃত্যুর পূর্বে অথবা পরে ঐ 50,000 টাকাই তিনি শুধু পাইবেন। তন্নিম্ন আমার শেয়ার, ব্যাঙ্ক-ব্যালাল, ফিল্ড-ডিপোজিট প্রভৃতি হইতে আমার একান্ত-সচিব শ্রীগঙ্গারাম যাদব তাঁহার একনিষ্ঠ সেবা ও বহুদূর প্রতিদান স্বরূপ 10,000 (দশ হাজার টাকা) পাইবেন। তন্নিম্ন ‘ক’ বর্ণিত সূচী অনুসারে আমার ব্যক্তিগত ভূতা, ড্রাইভার, কর্মচারীর নগদে হাজার হইতে পাঁচশ টাকা আমার স্নেহের দান স্বরূপ লাভ করিবেন। এই অর্থ প্রদান করার পর আমার যাবতীয় স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমি আমার একমাত্র পুত্র কল্যাণী শ্রীমান সুরমপ্রসাদ খান্নাকে নির্বৃত্ত-স্বত্বে প্রদান করিয়া দিইতেছি। প্রকাশ থাকে যে, আমার বোপার্জিত সম্পত্তি ব্যতিরেকে আমার পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধাংশ আমার পিতৃদেব আমার ভ্রাতা শ্রীমান শ্রীতমপ্রসাদ খান্নাকে দান করিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে আমার ভ্রাতা শ্রীতম তাহার পৈতৃক সম্পত্তি আমাকেই নির্বৃত্ত-স্বত্বে দান করিয়া সংসার ত্যাগ করে। আইনত সে সম্পত্তি বর্তমানে আমার। তবু আমি একান্তভাবে আশা রাখি যে, যদি কোনদিন শ্রীশ্রীতম আমার পুত্রের সাক্ষাতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে শ্রীমান সুরম এমন ব্যবস্থা করিবে যাহাতে শ্রীতম অর্থকষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য না হয়। শর্তসাপেক্ষে নির্বৃত্ত-স্বত্বে উইল সম্পাদন করা আইনত গ্রাহ্য নহে এ বিষয়ে আমি অবগত আছি। ইহা আমার পুত্রের নিকট অনুরোধ মাত্র।”

পাঠ শেষ করে সুরম বলে, এখন বলুন স্যার, যাদ প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভের পূর্বেই পিতাজ্ঞীর দেহান্তর হয়েছিল, তাহলে কি বিমাতার সে সম্পত্তিতে কোনও অধিকার বর্তায়? বাসু বললেন, না। উইলের বয়ান এমন নিখুঁত ছকা, যে সুরমা দেবী ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী কিছুই দাবি করতে পারেন না। তুমি বরং বল, তোমার চাচাজী শ্রীতমপ্রসাদের কথা।

—স্বী বলব? আমি জীবনে তাঁকে কোনদিন দেখিনি। যতদূর জানি, পিতাজ্ঞীর সঙ্গে ইদানীং তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। অবশ্য তিনি যদি কোনদিন সশরীরে এসে উপস্থিত হন এবং নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে পারেন তবে নিশ্চয় আমি তাঁকে সম্পত্তির অংশ দেব। শুধু তাই নয়, আমি আমার বিমাতাকেও যেচ্ছায় বেশ কিছু টাকা দেব?

বাসু সবিস্ময়ে বলেন, কাকে? সুরমা দেবীকে?

—আজ্ঞে না। রমা দেবীকে। তিনি কোথায় আছেন জানেন?

—না। এখনও জানি না।

সুরম বলে, আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি মনে করেন রমা দেবী এই জঘন্য ব্যাপারটার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত?

বাসু বললেন, না। আমি আত্মরিকভাবে বিশ্বাস করি, সে জড়িত নয়। কিন্তু পুলিশ যদি একবার তাকে ধরতে পারে, তাহলে তাকে ঝাঁচানোও খুব কঠিন।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—কেন? কঠিন কেন?

—আনুষঙ্গিক তথ্য, যাকে বলে ‘সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স’ তা রমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো। হত্যাপরোধ প্রমাণ করতে তিনটি জিনিসের দরকার—উদ্দেশ্য, সুযোগ এবং অস্ত্র। আর হত্যাপরোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় ‘অ্যালোবাই’, অর্থাৎ হত্যার সময় সে যে অন্য কোথাও ছিল তার প্রমাণ আছে। বেচারীর অবস্থা দেখ—যশোদা কাপূরের ছদ্মনামে মহাদেও ওকে বিবাহ করেন। তিনি যে বিবাহিত এই তথ্যটা গোপন করে। এর চেয়ে অনেক সামান্য কারণে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে খুন করেছে। অসংখ্য কেস-হিস্ট্রি আছে তার। দ্বিতীয়ত সুযোগ। রমা জানতো কোন লগ-কেবিনে তাকে পাওয়া যাবে। তৃতীয় অস্ত্র। সেটা মন-বাহাদুর ওরই জিম্মায় রেখে গিয়েছিল। আর বেচারীর কোনও ‘অ্যালোবাই’ নেই। কী জানো সুর্য, আইন যাকে বলে ‘সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স’ তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী নেই। ফ্যাক্ট বা তথ্য হচ্ছে চোঁড়া সাপ। যেভাবে তাকে ইন্টারপ্রেট করবে, যে-চোখে তাকে দেখবে তাতেই ফ্যাক্টের ফণায় বিষ জমে উঠবে!

গঙ্গারামজী বলেন, তাহলে কেন মনে করছেন রমা দেবী ও কাজটা করেননি?

—যেহেতু আমি প্রমাণ পেয়েছি। কী প্রমাণ তা আমি বলব না, কারণ রমা আমার ক্লায়েন্ট। তাছাড়া আমি নিশ্চিত, ঘটনার সময় ‘মুন্না’ ঐ কেবিনে ছিল না।

সুর্য বলে, আমাদের কি উচিত নয় পুলিশকে জানানো যে, ‘মুন্না’ এখন কোথায় আছে তা আমরা জানতে পেরেছি?

—কী দরকার? ওরা ওদের পথে চলুক, আমরা আমাদের পথে অগ্রসর হব। আমি বরং তোমার মায়ের সঙ্গে আবার একবার কথা বলতে চাই।

—কিন্তু তিনি যে কোথায় আছেন তা তো আমরা জানি না। আপনি কাল চলে আসার পরেই ওঁরা দুজন মালপত্র নিয়ে চলে যান। ঘটনাদুয়েক পরে টেলিফোন করে জানানো পারি, ওঁরা ঐ হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা কিছু বলে যাননি!

এই সময়েই কৌশিক আর রানী দেবী ফিরে এলেন। সুর্য ও গঙ্গারাম বিদায় হলেন। ওঁরা কিছু মার্কেটিং করে এসেছেন। সে সব দেখাতেই কিছু সময় গেল। তারপর খোশগল্ল চলল কিছুক্ষণ।

আরও ঘটনাক্রমে পরে বাসু-সাহেব বললেন, সুর্যকে একবার ফোনে ধর তো?

কৌশিক ফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করল। একটু পরেই সাড়া দিল সুর্য। বাসু তাকে বললেন, একটা কথা গঙ্গারামজীকে জিজ্ঞাসা করা ‘হয়নি। তোমার পিতাজী কি গঙ্গারামকে কোন নগদ টাকা দিয়েছিলেন—দিল্লি যাবার রাহাখরচ বাবদ?

সুর্য বলল, ঠিক জানি না। কেন বলুন তো?

—তুমি গঙ্গারামজীকে একটু জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানানো? আমি টেলিফোনটা ধরে আছি।

—চাচাজী তো এখন নেই। ওঁর রাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। সেখানেই গেছেন। ফিরতে রাত হবে। কাল সকালে আপনাকে জানাব।

বাসু বললেন, না সুর্য, তাহলে সারা রাত আমার ঘুম হবে না। আমি জেগেই আছি। গঙ্গারামজী ফিরে এলে যেন আমাকে ফোন করে খবরটা জানান।

সুর্য স্বীকৃতিসহ শুবরাত্রি জানিয়ে লাইন কেটে দিল।

কৌশিক বলে, ঐ খবরটা সত্যিই এত জরুরী?

—না হলে আমি মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছি?

যাই হোক বাসু-সাহেবকে বিনিম্ন রজনী যাপন করতে হল না। গঙ্গারাম রাত প্রায় পৌনে এগারোটায় টেলিফোন করে জানানো, দোশরা তারিখে তার মালিক গঙ্গারামজীকে দশখানি একশ টাকার নোট

দিয়ে বলেছিলেন, যদি দিল্লি যেতে হয় তাই পথ-খরচটা রাখ। আমি টেলিফোনে নির্দেশ দিলেই তুমি ফিল্ড-ডিপজিটগুলি নিয়ে দিল্লি চলে যাবে।

বাসু বললেন, থ্যাঙ্ক!

গঙ্গারাম প্রশ্ন করেন, এ খবরটা হঠাৎ জানতে চাইছেন কেন?

—ডেবিট-ক্রেডিট মেলাতে। ও আপনি বুঝলেন না।

পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বাসু-সাহেব প্রাতঃরাশের টেবিলে এসে দেখেন ডাইনিং টেবিলে খোদাবক্স চারজনের চারখানা প্লেট সাজিয়েছে। রানী দেবী আর কৌশিকই শুধু নয়, প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে আছে সুজাতাও।

—এ কী! তুমি! কোথা থেকে? কখন এসেছ?

সুজাতা বলে, এই মিনিট পনের। আমি ফেলু মেরেছি বাসু-মামু। আপনার পাহাড়ী ময়না আমার কাছে ধুলো দিয়ে সটকেছে।

বাসু সন্মোহে বলেন, যেমন দেবা তেমনি দেবী! তোমরা দুজনেই সমান। এমন করলে তোমাদের 'সুকৌশলী' চলবে কেমন করে?

রানী ঠুকে ধমক দেন, তুমি আর ওকে বকো না। বেচারী এমনিতেই একেবারে ভেঙে পড়েছে।

বাসু-সাহেব জোড়া পোচের প্লেটটা টেনে নিয়ে বলেন, শিকল কাটল কী করে?

—আমরা একটা হোটলে উঠেছিলাম। এই গ্রীনগারেই। নাম ভাড়িয়ে। ডবল-বেড রুম। আমরা দুই বোন এই পরিচয়ে। কাল সারাদিন দুজনে একসঙ্গে ছিলাম। হোটেল ছেড়ে সারাদিনে একবারও বার হইনি। ও বেশ গল্পগুজব করছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—ও পালাবার তালে আছে। ও বরং ভাব দেখাচ্ছিল যেন আপনার ছত্রছায়ায় এসে ও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। যগোদা কাপুরের সঙ্গে ওর প্রেম কী-করে হল সেই গল্পই শোনালো সারাদিন। রাতে দরজাটা বন্ধ করে চাবি আমি বালিসের নিচে রেখেছিলাম। তাই প্রথম রাতে ও পালাতে পারেনি। পরদিন যখন দেখলাম ওর পালাবার কোনও ইচ্ছাই নেই তখন আমি একটু অসাবধান হয়ে পড়ি। কাল রাতে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে চাবি কী-হোলেই রেখে শুয়েছিলাম। আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি পাশের বিছানাটা খালি। প্রথমে ভেবেছিলাম—ও বুঝি বাথরুমে আছে। তার পরই নজর হল টেবিলের উপরে চাবিটা রাখা আছে, আর তার নিচে একখণ্ড কাগজ চাপা দেওয়া। এই দেখুন:

এক লাইনের চিঠি: কিছু মনে করো না ভাই, চলে যাচ্ছি।

কৌশিক বলে, পালালো কেন? কোথায় যেতে পারে?

বাসু বলেন, ও গেছে পহেলগাঁও। তার দেবাজ থেকে একবাণ্ডিল চিঠি বার করে আনতে! নিতান্ত ছেলেমানুষী!

রানী বলেন, তা ছেলেমানুষ ছেলেমানুষী করবে না?

বাসু ধমক দিয়ে ওঠেন, ছেলেমানুষ! জানো, ওর বয়স কত?

রানী বলেন, বছর দিয়ে কি ছেলেমানুষী মাপা যায়?

\* \* \*

বিকেলবেলা বাসু-সাহেব একটা টেলিফোন পেলেন। রিসিভারটা তুলে নিয়ে আশ্চর্যবোধ করা মাত্র ও-প্রান্ত থেকে শর্মাঙ্গী বলেন, দুঃসংবাদ আছে মিস্টার বাসু। মানে আপনার তরফে।

—বুঝেছি। আমার ক্লারেককে আপনারা খুঁজে পেয়েছেন।

—হ্যাঁ। শুধু খুঁজেই পাইনি? তাকে হাতে-নাতে ধরা গেছে।

—হাতে-নাতে মানে?

—পুলিস আজ সকাল দশটা নাগাদ ওকে ওর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করেছে। ও তখন অর্গলবদ্ধ ঘরে

## কাটায়-কাটায়-২

বসে একরাশ এভিডেন্স পোড়াচ্ছিল। আর ওর বারান্দায় মরে পড়েছিল সেই ময়নাটা: মুন্না!

—মরে পড়েছিল? রমা মেরেছে?

—তাছাড়া আর কে?

বাসুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। বলেন, সে কেন মারতে যাবে?

—পাখিটা কি 'বোল' পড়ে তা নিশ্চয় আমনি ভুলে যাননি?

—সে কথা নয় মিস্টার শর্মা। আপনি কি কোনও যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন—সেক্ষেত্রে এতদিন কেন ঐ মেয়েটি এমন একটা মারাত্মক এভিডেন্সকে খাইয়ে-দাইয়ে ঝাচিয়ে রাখল? কেন তাকে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলল না?

—মিস্টার বর্মন বলছেন, হয়তো পাখিটা এই নতুন বোলটা সম্প্রতি পড়তে শুরু করেছে। উনি ক্রিমিনোলজি বিষয়ে এক্সপার্ট—

—টু হেল্ উইথ্ বর্মন অ্যান্ড হিজ এক্সপার্ট ওপিনিয়ান! আপনি নিজে বিশ্বাস করতে পারেন—একটা 'বোল পড়া' পাখি একটা বাক্য একবার মাত্র শুনে দশ-বারোদিন সেটা স্মৃতিতে পুঁথি রাখল, তারপর হঠাৎ একদিন বোল পড়ল? যে কোনও প্রাণীবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করলেই...

ওঁকে খামিয়ে দিয়ে শর্মাভী বলেন, বাই দ্য ওয়ে, মিসেস্ সুরমা খান্না কোথায় গেছেন আপনি জানেন?

—না। আমরা কেউই জানি না। আপনি কি তাঁর অ্যালেবাইটা যাচাই করতে পেরেছেন?

—তাঁর কোনও 'অ্যালেবাই' আছে নাকি?

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন।

—আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছি না। আশ্চর্য মানুষ! স্বামী মারা গেছেন আর এখন উনি এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন কেন?

—এবং সেটাও আমার প্রশ্ন।

—সে যাই-হোক, যে জন্য আপনাকে ফোন করছি সেই আসল কারণটা এবার বলি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন্স জাজ আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। কাল কখন আপনার সময় হতে পারে?

—সাক্ষাৎ কোথায় হবে? পহেলগাঁওয়ে?

—না, শ্রীনগরেই। ধরুন যদি কাল সাড়ে নটা নাগাদ আপনাকে পিক্ আপ করে নিই? অসুবিধা আছে কিছু?

—তার আগে আমি আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে কোথায় আছে? আই মীন, রমা দাসগুপ্তা?

—শ্রীনগরের জেল-হাজতে।

—তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে কাল আটটার সময় আমি জেল-হাজতে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি। তারপর আপনার অফিসে নটায় যাব। গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। সুরমের গাড়িতেই যাব।

—দ্যাটস্ অল রাইট।

—একটা কথা, আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট জাজের নামটা কী?

—জাস্টিস্ জে. পি. লাল।

—জাস্টিস্ জগদানন্দ প্রসাদ লাল কি?

—হ্যাঁ, আপনি চেনেন?

—নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষের এমন কোন প্র্যাকটিসিং লইয়ার নেই যে তাঁর নাম জানে না। আইনের ওপর অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। ইট উড বি রিয়াল অনার টু মীট হিম।



নয়

জেল-হাজত সংলগ্ন একটি বিশেষ কক্ষে বসেছিলেন বাসু-সাহেব। এ ঘরেই অভিযুক্ত আসামীরা তাদের উকিল বা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে। ঠুকে একটি চেয়ারে বসিয়ে রেখে মেয়ে-কয়েদীদের 'মেট্রন' ভিতরে গিয়েছে অভিযুক্তকে নিয়ে আসতে। শর্মাজী পূর্বাংই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাসু-সাহেব ঘরটিকে লক্ষ্য করে দেখছিলেন। দেওয়ালে একটাও ছবি নেই। ব্লিচিং পাউডারের একটা উগ্র গন্ধ। এই সূর্যোদয়োচ্ছল দিনের প্রথম প্রহরেও ঘরের ভিতরটা আলো-আধারি—একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস যেন আটকে আছে।

একটু পরেই মেট্রন নিয়ে এল রমা দাসগুপ্তাকে। ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেবকে বললে, মায় বাহার রহুঙ্গী।

দরজাটা টেনে দিয়ে সে চলে যায়।

রমা ঠুকে দেখে ম্লান হাসল। দরজার কাছেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, আবার কেন এসেছেন? আপনার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে এই বিপদ ডেকে এনেছি। তবু আপনার উৎসাহে ভীটা পড়েনি? বাসু শুধু বললেন, বস এ চেয়ারটায়। কথা আছে।

রমা বলল। সপ্রতিভভাবে বললে, কথা সব ফুরিয়ে গেছে বাসু-সাহেব। এখন শত চেষ্টা করলেও আপনি আর আমাকে ঝাঁচাতে পারবেন না।

বাসু বলেন, আমি কিছু অতটা নিরাশ নই। হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে ওরা অনেকগুলি 'এভিডেন্স' দাখিল করবে বটে—কিন্তু তোমার স্বপক্ষেও যুক্তি কম নয়।

রমা একথাই আশ্বস্ত হল না একটুও। ম্লান হেসে বললে, এটা আপনাদের একটা বাঁধা বুলি, না ব্যারিস্টার সাহেব? অভিযুক্তের মনোবল ফিরিয়ে আনতে?

বাসু বলেন, তুমি এবার আমাকে সব কথা খুলে বলবে?

—সেটা নিভান্তই পশুশ্রম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ দুনিয়ায় আমার দু-কড়ি-সাতের খেলা শেষ হয়ে গেছে! পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে আমার! যে মানুষটাকে ভালবাসলাম—এত...এতদিন পরে, সে মাত্র সাত দিনের মধ্যেই আমাকে ছেড়ে চলে গেল! আর ভাগ্যের কী প্রহসন দেখুন, ওরা বলছে আমি নাকি নিজে হাতে সেই মানুষটাকে খুন করেছি! আমি...আমি...

হঠাৎ গলাটা ধরে এল ওর। অসীম মনোবলে উদ্গত অশ্রুকে সঞ্চার করে বললে, না। যা ভাবছেন তা নয়। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ব না। কারণ সত্যিই ঝাঁচতে আর ইচ্ছা নেই আমার! আচ্ছা, একটা কথা—ওরা ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন দেবে না তো?

বাসু বলেন, রমা, তুমি তো বুদ্ধিমতী! এ রকম পাগলামি করছ কেন? আমি তোমাকে অহেতুক মিথ্যা বলে উৎসাহ যোগাচ্ছি না। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করছি—তুমি খুন করনি। বললে তুমি বিশ্বাস করবে রমা কী যুক্তিতে আমি ঐ সিদ্ধান্তে এসেছি? একটি মাত্র যুক্তি—কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে তা আমি জানি। কিন্তু যে ধরনের প্রমাণের সাহায্যে তাকে অপরাধী বলে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা যায় সে ধরনের প্রমাণ আমার হাতে নেই। তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করলে, সব তথ্য আমার হাতে তুলে না দিলে আমি কেমন করে লড়ব?

ধীরে ধীরে অবসন্নতার একটা মেঘ যেন সরে গেল মেয়েটির মুখের উপর থেকে। বললে, আপনি জানেন, কে ঠুকে খুন করেছে? কেন করেছে?

বাসু নীরবে শিরকালনে সম্মতিসূচক প্রত্যাশার করলেন।

—কে সে? আমাকে বলতে কী বাধা?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—না। তোমাকেও এখনও বলা চলবে না। তবে তুমি তো আমার পদ্ধতি জান। সওয়াল জবাবের মাধ্যমে আদালতেই অপরাধীকে আমি চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করি—আমি শুধু চাইছি, তুমি আমাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করে যাও শুধু।

সোজা হয়ে বসল রমা। বললে, বেশ। বলুন কী জানতে চাইছেন?

—প্রথমে বল, কেন তুমি আমার অব্যাহা হলে? কেন সুজাতার চোখকে ঝাঁকি দিয়ে পাহেলগাঁওয়ে গিয়েছিলে?

ওঁর চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে। আপনি বলেছিলেন, পুলিশে সেগুলি নিয়ে যাবে, পড়বে, আদালতে দাখিল করবে। আমি সেটা চাইনি। তাই।

—কী এমন মারাত্মক কথা ছিল সেসব চিঠিতে!

এতক্ষণে হাসল মেয়েটি। বললে, মারাত্মক কথা কিছুই ছিল না। কিন্তু চিঠিগুলো এমনই ব্যক্তিগত যে,—কী বলব, আদালতে সেগুলো পড়া হচ্ছে মনে করলেই আমার আপাদমস্তক ছালা করতে থাকে। কেমন করে বোঝাব আপনাকে বুঝতে পারছি না। এ শুধুই একটা সেক্টিমেন্টাল অনুভূতি।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তাহলে তুমি ‘মুন্না’কে মেরে ফেললে কেন?

—এ কথাটা পুলিশেও জিজ্ঞাসা করেছিল। কী আশ্চর্য—আপনারা সত্যিই বিশ্বাস করছেন—ওকে আমি মেরেছি?

—তুমি মারোনি?

—নিশ্চয়ই না। আমি তাকে কেন মারতে যাব?

—হয়তো তুমি ওর একটা অদ্ভুত বোল শুনিয়েছিলে...

—জানি, কিন্তু সেটা তো সে সেই প্রথম দিন থেকেই বলছে—সেই দোশরা সেটেশ্বর থেকে। তখন তো উনি বৈঠকে। উনিই তো নিজের হাতে ওটাকে আমার কাছে দিয়ে গেলেন। মুন্না তো আসৌ কোনদিন ঐ লগ্-কেবিনে যায়নি!

—তাহলে? কে ওকে মারল? তুমি কখন সেটা জানতে পারলে?

—শ্রীনগর থেকে আমি ভোর ছটা পনেরোর বাসে রওনা হয়েছিলাম। নটা নাগাদ বাড়িতে এসে পৌঁছাই। পাশের বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলে চিঠিগুলো পোড়াতে শুরু করি। তার মিনিট দশেকের মধ্যেই সদর দরজায় কে কড়া নাড়ল। বুলে দেখি একজন পাঞ্জাবী পুলিশ অফিসার এবং আর একজন লোক। তাঁরা তখনই বললেন, ‘যুআর আন্ডার অ্যারেস্ট’। তাঁরা আমার সামনেই ঘরটা সার্চ করলেন। তাঁরাই আবিষ্কার করলেন—মুন্না মরে পড়ে আছে খাচায়। যুনিফর্ম যিনি পরেননি তিনি বাঙালী। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘পাখিটাকে এভাবে মেরেছেন কেন?’ আমি বললাম, ‘আমি মারিনি’। তখনই ঐ পাঞ্জাবী অফিসারটি ইংরাজীতে বললেন, মিস দাসগুপ্তা আপনি আমাদের প্রব্লেম জবাবে যা বলছেন বা বলবেন, তা প্রয়োজনবোধে আমরা আপনার বিরুদ্ধে আদালতে ব্যবহার করতে পারি। তখনই আমার সন্দেহ হল—ওরা আমাকে, আমাকে...একটা জঘন্য অপরাধে ফাঁসাতে চায়। আমি আপনার অনেকগুলো কাহিনী পড়েছি। তাই আমার মনে পড়ল—এ-ক্ষেত্রে সংবিধানগত অধিকারে আমি প্রব্লেম জবাব দিতে অস্বীকার করতে পারি। তাই আমি আর কোন কথা বলিনি। আমি কি ভুল করেছি?

—না। তুমি ঠিকই করেছ। এবার বল, মন-বাহাদুর তোমার কাছে যে শিল্পলতা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল সেটা কেমন করে লগ্-কেবিনে পাওয়া গেল? তুমি কি সেটা নিজেই লগ্-কেবিনে নিয়ে গিয়েছিলে?

—না। আমি বলছি বিস্তারিত। শুরুর দোশরা সেটেশ্বর ভোর ছটার বাসে উনি পাহেলগাঁও থেকে শ্রীনগরে যান। ফিরে আসেন ঐ দিনই সন্ধ্যার সময়। ওঁর সঙ্গে ছিল ‘মুন্না’। সেটা আমাকে উনি উপহার

দেন। শনি আর রবি উনি পহেলাগাওয়ায়ে ছিলেন। রবিবার বিকালের দিকে উনি বললেন, দিন দশ-বারোয় জন্য বাইরে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাইলাম, কোথায়? বললেন, ভবঘুরেকে বিয়ে করেছে রমা, সব কথার জবাব পাবে না। তবে দিন দশ-বারো পরে ফিরে আসব। তারপর কী ভেবে নিজে থেকেই বলেন, এখন সংসারী হয়েছি, এবার থেকে আশ্রয়দাতার একটা অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হবে। শুনো আমার কেমন যেন খটকা লাগলো। প্রশ্ন করলাম, তুমি কি কিছু বিপদের আশঙ্কা করছ? উনি হঠাৎ হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছ তুমি। আজকালের মধ্যেই একজনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। ভাবছি একটা ছোরা কিনে ফেলি। তোমার কাছে গোটা কুড়িক টাকা হবে? আমি বললাম, টাকা দিচ্ছি, কিছু ঐ সঙ্গে আরও একটা জিনিস তোমাকে দিতে পারি—একটা স্লোডেড রিভলভার। উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। তখন বুঝিয়ে বললাম, বাহাদুর সেটা আমার কাছে রেখে গেছে। ফিরে এসে নেবে। উনি তখন বললেন, তাহলে টাকা চাইনে। তুমি ঐ রিভলভারটাই দাও। দিন সাতেক পরে ফেরত পাবে। ভয় নেই, ওটা আমি ব্যবহার করব না। কিন্তু ওটা কাছে থাকা ভালো। আমি তখন ঠেকে রিভলভারটা দিলাম। উনি সেইদিনই বিকালে চলে গেলেন। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে উনি ঐ লগ্-কেবিনেই যাচ্ছেন। তারপর আর তাঁকে কোনদিন দেখিনি।

বাসু মিনিটখানেক কী ভাবলেন। তারপর বললেন, আমার কাছে কিছু গোপন করোনি তো? মেয়েটিও এতক্ষণ নতমুখে কী ভাবছিল। বললে, হ্যাঁ একটা কথা এখনও আপনাকে বলিনি। সেটাই বোধহয় আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ এভিডেন্স!

বাসু সোজা হয়ে বলেন, কী?

—আমি মঙ্গলবার খুব ভোরে উঠে ঐ লগ্-কেবিনের দিকে গিয়েছিলাম। মঙ্গলবার, ছয় তারিখ বেলা দশটা নাগাদ আমি এখানেই ছিলাম!

—কেন? তুমি তো জানতে না উনি ওখানেই গেছেন?

—না। তা জানতাম না। এটাও নিতান্তই সেন্টিমেন্ট। ঐ কেবিনটার কাছে বাওয়ায় একটা মুরগি কামনা হল। ঐ আইনবনের মৃদু গন্ধ, কাঠবিড়ালী আর পাখিগুলোর... কী বলব, আমি একটু পাগলাটে ধরনের। যখন যা খেয়াল চাপে...

—ঠিক আছে। কেফিয়ং দিতে হবে না। তুমি কী করেছিলে শুধু তাই বল। কেমন করে গেলে ওখানে?

—ভোরবেলা রওনা হয়েছিলাম। কিছুটা বাসে, কিছুটা হেঁটে। ওখানে গিয়ে পৌছাই দশটা নাগাদ। তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ ওখান থেকে ফিরে আসি। অফিসে যাইনি। ক্যাসুয়াল লীচ নিয়েছিলাম।

—তোমাকে লগ্-কেবিনের কাছাকাছি কেউ দেখেছিল?

—হ্যাঁ। ওখানকার দায়েরায়ান।

—তুমি কি দেখলে লগ্-কেবিনটা বন্ধ?

—হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি, উনি তখন কাছেই কোথাও বাসে মাছ ধরছিলেন।

—জানলা দিয়ে ভিতরে উকি দাওনি?

—না। আমি তো শুধু বেড়াতেই গিয়েছিলাম।

আবার দুজনেই কিছুটা চুপচাপ।

হঠাৎ মেয়েটির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। বলল, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, উনি নেই। কেন—কেন এমন করে ঠেকে মারল বলুন তো? এমন একজন সরল, শান্ত, প্রকৃতিপ্রেমিক...

বাসু ওর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললেন, মনকে শক্ত কর রমা। দু-চার দিনের মধ্যেই তোমার কেস উঠবে আদালতে। প্রাথমিক শুনানী। তোমার বিরুদ্ধে যে রকম কেস, আমার আশঙ্কা হয় দায়রা-সোপর্দ হবেই। যদি না আমি তার আগে কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ সংগ্রহ করে...

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

মেয়েটি ঠেকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি ওদের কী বলব? ওরা যদি সব কথা জানতে চায়? কতটা বলব? আমি কি বলব যে, কোনও কথার জবাব আমি দেব না?

বাসু উঠে দাঁড়ান। বলেন, না! ঠিক উল্টোটা। তুমি আদ্যন্ত সত্য কথা বলবে। কোন কিছু গোপন করবে না। মনে থাকবে?

—ছয় তারিখ সকালে যে আমি, আমি ওখানে গিয়েছিলাম...

—বললাম তো, দ্য হোল টুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য টুথ!

মেয়েটি কুণ্ঠিত ভ্রুসে বললে, কিন্তু কাল বিকালে তো আপনি আমাকে পুলিশের কাছ থেকে লুকিয়েই রাখতে চেয়েছিলেন?

বাসু হাসলেন। বললেন, না, রমা, পুলিশের কাছ থেকে নয়। আমি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম সেই লোকটার কাছ থেকে যে মুম্বাকে মারতে আসছে।

—সে কে?

—বুঝলে না? আমি জানতাম, লোকটা মুম্বাকে খুন করতে আসবে। তুমি যদি তাকে দেখে ফেলতে পাখিটাকে মারতে বা প্রতিবাদ করতে যেতে তাহলে লোকটা তোমাকেও মেরে ফেলত! লোকটা একটা খুন আগেই করেছে—মহাদেওপ্রসাদকে;—প্রয়োজন হলে সে আর একটা খুনও করে বসত!

—কিন্তু, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন লোকটা মুম্বাকে মারতে আসবে?

—‘পিওর ডিডাকশান’ রমা! পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব। এখন বল, আদ্যন্ত সত্যি কথা বলতে পারবে তো?

আবার ব্লান হাসল মেয়েটি। বললে, আদ্যন্ত সত্যি কথা বলা কি এতই কঠিন? দেখবেন, আমি পারব।



দশ

সেশনস চলেছে। জাস্টিস লাল দশটার সময় আদালতে যাবেন। আদালত অবশ্য ঠিক পাশের ঘরখানাই। এখানা ঠুর চেম্বার। ঠিক সাড়ে নটার সময় বাসু-সাহেবকে নিয়ে শর্মাজী ঠুর ঘরে এলেন। জাস্টিস লাল বাসুরই সমবয়সী, দু-এক বছরের ছোট-বড় হতে পারেন। একমাথা ধপধপে চুল, গৌফদাড়ি কামনো। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েননি। চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা। বাসু-সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ডিলাইটেড টু মীট যু মিস্টার বাসু। আপনার সব কীর্তি-কাহিনীই আমার জানা, চাক্ষুষ কখনও দেখিনি এই যা।

বাসু আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বলেন, স্যার, আপনার বিরুদ্ধে আমি ডাকাতির অভিযোগ আনব...

—মানে?

—এখানে এসে প্রথমই আপনাকে যে কথাগুলো বলব ডেবে এসেছিলাম, তা আপনি ছিনিয়ে নিয়ে বলে ফেললেন।

হো-হো করে হেসে উঠলেন লাল।

বাসু যোগ করেন, আইন এবং আদালত বিষয়ে আপনার মৌলিক চিন্তা আমাদের মুগ্ধ করেছে; বিশেষ করে শেষ বইখানা: *অ্যান অ্যানালিসিস অব জুডিশিয়ারি*।

—যাক, ওটা পড়া আছে আপনার। তাহলে অল্প কথায় সারা যাবে। দশটায় আমার একটা কেস আছে। তাই সংক্ষেপে সারতে চাই। আপনাকে ডেকেছি; একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশানে; মানে আইন-আদালত সম্বন্ধে নৈর্যতিক আলোচনায়। বস্তুত আমি একটি প্রস্তাব রাখব আপনার সামনে। আপনি গ্রহণ করতেও পারেন, বর্জন করতেও পারেন।



—বাসু বলেন, বলুন?

লাল বলেন, সময় কম। সরাসরি বিষয়বস্তুতে আসা যাক। আপনি আমার বইটা পড়েছেন। আপনি জানেন, আমি তাতে ভারতীয় জুডিশিয়ারির সমস্যাগুলি এবং তার সমাধানের বিষয় আলোচনা করেছি। যে কোন আদালতে যান, দেখবেন মামলা পাঁচ-সাত-দশ বছর ধরে ঝুলে আছে! শুধু হিয়ারিঙ ডেট আর হিয়ারিঙ ডেট! অথচ বছরের 365 দিনের মধ্যে আদালতই সবচেয়ে বেশি দিন বন্ধ থাকে। কল-কারখানার কথা ছেড়ে দিন— স্কুল-কলেজ-সরকারী-বেসরকারী অফিসের তুলনায় কোর্টের ছুটি অনেক-অনেক বেশি। যদি প্রশ্ন করেন—কেন? জবাবে শুনবেন জজ-সাহেবদের বেশি বিশ্রামের দরকার। তাঁদের ল-পয়েন্টের পড়াশুনা করার সময় চাই। যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তা চাই না। দ্বিতীয় কথা, এই গোটা কাঠামোটাকেই আমি আমার গ্রন্থে আক্রমণ করেছি। আপনার মনে আছে নিশ্চয়, শেষদিকে আমি বলেছি ‘পিপলস্-কোর্ট’ বা গণ-আদালতের কথা। আমি বলেছিলাম, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে বিচার-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আংশিক ভাবে ন্যস্ত করে ঐ পর্বতপ্রমাণ এরিয়ার কেসগুলো’ শেষ করা যায় কিনা। দেশে ‘পঞ্চায়েত-বাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেখানে আছেন দেশ-দশের আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা। আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম, সেইসব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে জুরির মাধ্যমে আমরা কিছুটা সুবিধা করতে পারি কিনা। আমার প্রস্তাবটা ছিল এই রকম:

বর্তমানে একশ্রেণীর ক্রিমিনাল কেসগুলোর প্রাথমিক বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। সেখানে ‘প্রাইম-ফেসি’ কেস প্রতিষ্ঠিত হলে সেগুলি দায়রার সোপর্দ করা হয়। অর্থাৎ সেশনসে আসে। শুধুমাত্র কলকাতা আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে হোমিসাইড কেসগুলোর বিচার হয় তিন ধাপে—প্রথমে করোনারের আদালত, তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের এবং সবশেষে সেশনসে। তারপর আপীল হলে তো হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট আছেই। কলকাতা বা মাদ্রাজ ছাড়া বোম্বাই বা দিল্লির মতো শহরেও করোনারের ব্যবস্থা নেই। যদি জানতে চাই, কেন? তাহলে জবাবে শুনতে হবে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল 1861 সালে, যখন বোম্বাই জমজমাট হয়নি, দিল্লি রাজধানী ছিল না। আমি প্রস্তাব করেছিলাম, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজধানীতে করোনারের আদালত থাকবে এবং করোনার হবেন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত কোনও ‘সভাধিপতি’। এটাই আমার প্রথম পর্যায়ের পিপলস্-কোর্ট বা গণ-আদালত। সভাধিপতি-করোনার হোমিসাইড কেসগুলার প্রাথমিক শুনানী নিলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে যাবে। এ পরীক্ষা ফলপ্রসূ হলে আমরা দেখব ঐ ‘সভাধিপতি-করোনার’কে প্রাথমিক আইনের শর্ট-কোর্স দিয়ে তাঁদের ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা। সেক্ষেত্রে ঐ করোনার আদালত থেকে কেস সরাসরি দায়রায় আসবে।

এ নিয়ে আমি সুপ্রীম কোর্টের কয়েকজন জাজের সঙ্গে এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে কথা বলি। গুণা পরীক্ষামূলকভাবে একটি কেস করতে সম্মত হয়েছেন। বিশেষ আদেশনামা জারী করে আমাকেই সেই পরীক্ষাটি করতে বলেছেন। ঐ বিচারের প্রসিডিংস আদ্যন্ত টেপ করা হবে, যেটা শুনলে সুপ্রীম কোর্ট বিধান দেবেন এজাতীয় বিচারের সম্ভাবনা কতখানি। মুশকিল হচ্ছে এই যে, সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অনুমতি পেলেও আমি সেটা কার্যকরী করতে পারছিলাম না নানান কারণে। সে যাই হোক, এখন দেখছি একটি অপূর্ব সুযোগ এসেছে। লেট মহাদেওপ্রসাদ খান্নার খুনের মামলাটা। মহাদেওপ্রসাদ এক্স-এম. পি।। স্বনামধন্য ব্যক্তি, সূত্রারা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস। এদিকে দেখা যাচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই কেসটার জন্য সি. বি. আই. থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে এনেছেন। ফলে এই কেসটা একটা সর্বভারতীয় রূপ নিতে চলেছে। তারপর যখন শুনলাম ডিফেন্স কাউন্সেল হচ্ছেন ‘পেরী মেসন অফ দ্য ইন্সট’ ডব্লিউ.আমি মনস্থির করেছি। এখন আপনি বলুন, আপনি কি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?

বাসু বলেন, আমি এখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ঐ সভাধিপতিকে কি ফাস্টক্লাস

## কাটায়-কাটায়-২

ম্যাজিস্ট্রেটের পদাধিকার-বলে-প্রাপ্ত অধিকার দেওয়া হবে? জুরি থাকবে কি? ক্রস এক্সামিনেশন, রি-ডাইরেক্ট, ইত্যাদি থাকবে? বিচারক যেহেতু আইন জানেন না, তাই বে-আইনি কিছু হলে তা কে দেখবে?

—না। দেড় দু'শ বছর আগে যেভাবে বিচার হত সেভাবেই হবে। বাদী ও প্রতিবাদী তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছামত সাক্ষীদের সমন ধরাবেন। করোনার আদালতে যেভাবে বিচার হয় সেভাবেই হবে। আর একটা কথা—আমি নিজে উপস্থিত থাকব। বিচারক অনভিজ্ঞতার জন্য বে-আইনি কিছু করলে আমি সম্পূর্ণ বিচারটাকেই বিধিবিহীন বলে পুনর্বিচারের আয়োজন করব। সে অধিকারও আমাকে দেওয়া হয়েছে।

বাসু বললেন, সে-ক্ষেত্রে আমি সম্মত।

—থ্যাঙ্ক মিষ্টার বাসু।

বাসু বলেন, আমি ডেবেছিলিাম লেট মহাদেওপ্রসাদের কেসটার বিষয়েই বুঝি আপনি কিছু আলোচনা করতে চান!

লাল হেসে বলেন, তাই কি পারি? ওটা যে সাবজুডিস!



## এগারো

আদালতে অপ্রত্যাশিত জনসমাগম হয়েছে। একাধিক কারণে। এ কয়দিন সংবাদপত্রে নানান খবর ফলাও করে ছাপা হওয়াতে সাধারণ মানুষ স্বতই উৎসাহী। এদিকে এই 'করোনাবাদের-আদালত' নিয়ে জাস্টিস লাল যে পরীক্ষা করতে চলেছেন সে বিষয়েও আইনজ্ঞ মানুষদের কৌতুহল।

সভাপতি-করোনাবাদের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। মাঝারি গড়ন, গম্ভীর এবং আত্মপ্রত্যয়ের একটা ভাবব্যঞ্জনায় মনে হয় তিনি দৃঢ়চেতা। সমবেত জনমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি বললেন, বন্ধুগণ! আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আজকের এই বিচার নানান কারণে আইন-বিভাগের একটা বিশিষ্ট দিক চিহ্ন। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি স্বর্গত মহাদেও প্রসাদ খান্নার রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করতে—কেন তিনি মারা গেলেন। এবং যদি দেখা যায়, তিনি স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি, কেউ তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে তাহলে কে সেই লোক, সে কথাও আমরা ডেবে দেখব। আমরা এখানে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আসামীর বিচার করতে বসিনি। আমরা শুধু নির্ধারণ করতে বসেছি পাহেলগাঁওয়ার অদূরে ট্রাউট-প্যারাডাইসের একটি নির্জন লগ-কেবিনে কীভাবে মহাদেও প্রসাদ খান্না মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিছু ক্যামেরাধারী সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের আমি জানাচ্ছি—বিচার চলাকালে তাঁরা যেন কোন আলোকচিত্র গ্রহণ না করেন। সাধারণ দর্শকদের আমি বলব, তাঁরা যেন কোনও গণ্ডগোল না করেন।

আমি করোনাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেই অগ্রসর হতে চাই। করোনার অধিকাংশ সময়েই বাদীপক্ষের প্রতিনিধিকে—এক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীপ্রকাশ সাকসেনাকে—প্রশ্নগুলি করে যাওয়ার সুযোগ দেন। তার মানে এই নয় যে পি. পি. ই এ বিচার পরিচালনা করবেন। তার মানে এই যে, পি. পি. আমাকে সাহায্য করবেন সেতো উপনীত হতে। এবং এ-ক্ষেত্রে ঐ সঙ্গে তিনি সন্তোষ হত্যাকারীকে চিহ্নিত করবার প্রচেষ্টা করবেন। এস. ডি. ও. সদর শ্রীশর্মাও এখানে উপস্থিত—তিনিও ঐ কাজে আমাদের সাহায্য করবেন, যেহেতু তদন্তে তিনিও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাড সেশান্স জাজ জাস্টিস লালও এখানে উপস্থিত। তিনি বস্তুত আমার বিচারক। যদিও তিনি এ বিচারে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন না। সে যাই হোক, আমাকে জানানো হয়েছে—একজন

বিশেষজ্ঞকেও কেন্দ্রীয় সি. বি. আই.য়ের সংস্থা থেকে আনানো হয়েছে—যিনি এজাতীয় হত্যারহস্য উদ্ভাবনে পারদর্শী; তাঁর সাহচর্যও আমরা পাব। এছাড়া মৃত খান্নাকীর পুত্র শ্রীসূর্যপ্রসাদ খান্নার তরফে উপস্থিত আছেন শ্রীপি. কে. বাসু, ব্যারিস্টার। প্রসঙ্গত তিনি শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তার কৌসিলীও বটে।

আমি সকলকেই পরিচয়ভাবে জানিয়ে রাখতে চাই যে, দীর্ঘ বক্তৃতা বা চুলচেরা আইনঘটিত 'অবজেকশান' শুনবার জন্য আমরা সমবেত হইনি। নিছক 'তথ্য' ছাড়া আমাদের আর কোনও কিছুতে কৌতূহল নেই। সুতরাং সওয়াল-জবাবের প্যাঁচে সাক্ষীকে কায়দা করা, বা গরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে জুরি ও বিচারককে অভিভূত করার চেষ্টাকে আমরা বরদাস্ত করব না।

সাধারণ বিচারসভায় বাদী তাঁর ইচ্ছামত সাক্ষীদের ক্রমান্বয়ে আহ্বান করেন, তাঁকে প্রশ্ন করেন এবং প্রতিবাদী তাঁকে জেরা করেন। বাদীর সাক্ষীর তালিকা শেষ হলে প্রতিবাদী তাঁর সাক্ষীদের একে একে আহ্বান করেন এবং সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। সেবার বাদী সাক্ষীদের জেরা করেন। আমরা এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হব না। কারণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করার একমাত্র হেতু বাদী অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করতে চান, প্রতিবাদী প্রমাণ করতে চান সে নির্দোষ। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত কেউ নেই। আরক্ষা বিভাগ যদি কাউকে এই কেস-এ আটক করে থাকে, তা তাদের ব্যাপার। আমার সামনে এমন কোনও তথ্য নেই যাতে কাউকে অভিযুক্ত বা আসামীরূপে চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু আসামী বলে কিছু নেই, তাই বাদী ও প্রতিবাদীও কেউ নেই। সুতরাং সত্য উদ্ঘাটন মানসে আমিই সাক্ষীদের পর্যায়ক্রমে আহ্বান করব এবং 'তথ্য' সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রশ্ন করব। আমার প্রশ্ন শেষ হলে পি. পি. এবং শ্রীবাসু যাতে সাক্ষীকে প্রশ্ন করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে আমাদের সাহায্য করতে পারেন সেটাও আমরা দেখব।

আশা করি আমি আমার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিটা বোঝাতে পেরেছি। এখানে 'তথ্য' সংগ্রহের মাধ্যমে 'সত্য' প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য নেই। জেরার মাধ্যমে সাক্ষীকে দিয়ে কিছু কবুল করানো, লজা বক্তৃতা বা 'টেকনিক্যাল অবজেকশান' আমরা কোনমতেই বরদাস্ত করব না। অ্যাম আই ক্রিমার?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পি. পি. প্রকাশ সাকসেনা এর পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু 'টেকনিক্যাল অবজেকশান' বলতে ঠিক কী বোঝায় সে বিষয়ে করোনারের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকটি বলে ওঠেন, সে-ক্ষেত্রে আমি যেভাবে সেটাকে 'ইন্টারপ্রেট' করব সেটাই গ্রাহ্য হবে। লুক হিয়ার সারস! আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আইন কিছুমাত্র জানি না। আমার জুরিরাও সাধারণ মানুষ—ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানসন্ধান ইত্যাদি। তাঁরাও আইন জানেন না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়ে যে সব 'তথ্য' এ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে তাই সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে দেওয়া, যাতে জুরিরা বুঝতে পারেন কী-ভাবে মহাদেও প্রসাদ মৃত্যুবরণ করেন। জুরিরা জানেন, তারা এখানে কেন সমবেত হয়েছেন। অন্তত আমি জানি আমি এ চেয়ারে কেন বসেছি। সুতরাং 'টেকনিক্যালিটি' বলতে কী বোঝায় তার ভাষা আমি চূড়ান্তভাবে দেব।

সর্বপ্রথমে আমি আহ্বান করতে চাই মহম্মদ খুরশেদকে, যিনি মৃতদেহ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। মিস্টার খুরশেদ, আপনি এগিয়ে আসুন এবং হলফনামা পাঠ করুন।

খুরশেদ হলফ নিলেন, নিজের নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচয় দিলেন। বিচারক প্রশ্ন করেন, মিস্টার খুরশেদ, আপনিই প্রথম মৃতদেহটি আবিষ্কার করেন, তাই না?

প্রকাশ সাকসেনা তার পার্শ্ববর্তী ডেপুটিকে বলল, প্রথম প্রশ্নটিই মীডিং কোডেন।

ডেপুটি জনান্তিকে বলল, চপে যান স্যার! এখানে আইন মোজাবেক কিছুই হবে না!

খুরশেদ শূন্য বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায়?

—পহেলগাঁওয়ের উত্তরে ট্রাউট-প্যারাডাইসের একটি লগ্-কেবিনে।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—আপনাকে আমি একটি ফটো দেখাচ্ছি। দেখে বলুন এই কেবিনটিই কি?

সাক্ষী আলোকচিত্রটি দেখে স্বীকার করলেন, এই কেবিনই। বিচারক তখন ঠেকে আনুপূর্বিক সব কিছু একটা বিবৃতির আকারে বলতে বলেন। কবে, কখন, কী ভাবে উনি মৃতদেহটি আবিষ্কার করেন।

সাক্ষী যা বললেন তার সংক্ষিপ্তসার এই রকম: মৃতদেহটি উনি আবিষ্কার করেন রবিবার, এগারোই সেপ্টেম্বর। উনিই একটি লগ্-কেবিন ভাড়া নিয়েছিলেন। রবিবার এগারোই সেপ্টেম্বর সকাল আটটা নাগাদ যখন উনি ঐ লগ্-কেবিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ঐ লগ্-কেবিনটার ভিতর থেকে একটা ময়নার ডাক শোনেন। ময়নাটা ক্রমাগত কর্কশ স্বরে ডাকছিল। উনি লক্ষ্য করে দেখেন, লগ্-কেবিনের সদর দরজাটা বন্ধ। তখন ঠুর মনে পড়ে দিন দুয়েক আগেও উনি দেখেছিলেন ঘরটা তালাবদ্ধ এবং তখনও একটা পাখির কর্কশ ডাক শোনেন। উনি ভাবেন, এই লগ্-কেবিনটি যিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনি হয়তো শহরে গিয়ে কোনও কারণে আটকে পড়েছেন এবং অতৃপ্ত ময়নাটা তাই ক্ষুধার তাড়নায় ডাকছে। কৌতূহলী হয়ে উনি এগিয়ে আসেন। জানলা দিয়ে ভিতরে উকি দিয়ে একজন মানুষকে রক্তাশ্রুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখনই উনি নিজের লগ্-কেবিনে ফিরে যান এবং পুলিশকে টেলিফোনে খবর দেন। তারপর ও. সি. যোগীন্দ্র সিং এবং এস. ডি. ও শর্মাজী এসে পড়েন। দারোয়ানের কাছ থেকে ড্রিফট চাবি নিয়ে ঘরটা খোলেন।

করোনার বলেন, ঠিক আছে। এর পর কী হয়েছিল তা আমরা ও. সি. যোগীন্দ্র সিংয়ের কাছে শুনব। মিস্টার পি. পি. অ্যান্ড মিস্টার বাসু আপনাদের কোনও প্রশ্ন আছে?

দুজনেই জানালেন তাঁদের কোনও জিজ্ঞাস্য নেই। অতঃপর বিচারকের আহ্বানে সাক্ষী দ্বিতে উঠলেন যোগীন্দ্র সিং। করোনার বলেন, এবার আপনি বলুন ঘরে ঢুকে আপনারা কী দেখলেন?

যোগীন্দ্র প্রথমেই লগ্-কেবিনের একটি ম্যান দাখিল করে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি কোনটা কোথায় ছিল তা ঐ নক্সাতে দেখানো হয়েছে। তিনি জানালেন, মৃতদেহটি মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়েছিল। ঠা-হাতটা বাড়ানো, ডান হাত বৃকের উপর। পিন্ডলটা ছিল মৃতদেহ থেকে অনেক দূরে। বললেন, প্রথমেই আমরা ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলাম। না হলে পচামাছের গন্ধে ঘরের ভিতর দাঁড়ানো যাচ্ছিল না! মাছের পলোটা প্রথমেই ঘর থেকে বার করে বাইরে রাখা হল। ময়নাটাকে আমরা খাচায় পুরে ফেললাম। মৃতদেহের এবং পিন্ডলের আউট-লাইনটা কাঠের মেঝেতে চক দিয়ে দাগিয়ে দিলাম। মৃতের পরনে ছিল পায়জামা। উর্ধ্বাঙ্গে পুরোহাতা শার্ট ও হাতকাটা সোয়েটার ছিল। হাতে দস্তানা পরা ছিল না। আমি থানাতেই বলে গিয়েছিলাম, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স, ফটোগ্রাফার ও ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট এসে গেল। কয়েকটা ফটো নিয়ে মৃতদেহকে আমরা মর্গে পাঠিয়ে দিলাম। এসঙ্গে মাছের পলোটাও। ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট আঙুলের ছাপ নেন।

করোনার বলেন, জাস্ট এ মিনিট! ফটোগুলো কি আপনি সঙ্গে করে এনেছেন?

—ইয়েস স্যার!—খান-হয়েক হাফ-সাইজ ফটো তিনি দাখিল করেন।

করোনার সেগুলি নিজেও দেখলেন এবং জুরীদের দেখতে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করেন, আঙুলের ছাপ কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকগুলি। মহাদেও প্রসাদের এবং দারোয়ানের। একটা কাচের গ্লাসে শ্রীমা দাসগুপ্তার একটি এবং আরও তিন-চারটি অজানা লোকের, যারা হয়তো আগে ঐ ঘরে বাস করে গেছেন।

—শ্রীমা দাসগুপ্তার আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ আছে কি?

—আজ্ঞে না, নেই। উনি গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ঠুর আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। একটি জলের গ্লাসে ঐ আঙুলের ছাপ নিঃসন্দেহে পাওয়া গেছে।

—ঠিক আছে। তারপর কী হল বলে যান।

যোগীন্দ্র তাঁর জবানবন্দি দিয়ে বলেন, তারপর এস. ডি. ও শর্মাজী এবং আমি লগ্-কেবিনটাকে

ভালাভাবে পরীক্ষা করি। প্রথমে রান্নাঘরের কথা বলি: সেখানে কিছু আনাজপাতি ছিল, কিছু টিনের খাবার। কফি, বিস্কুট, চিনি, কন্ডেন্সড মিক্স ইত্যাদি ছিল। রান্নাঘরে ময়লাফেলা বড়িতে দুটি ডিমের খোলা, পাঁচবুটি জড়ানো পাতলা কাগজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্টোভের উপর সস্প্যাননে কিছু ঘন হয়ে যাওয়া কফি ছিল। সিংক-এ একটা কাচকড়ার প্লেটে পাঁচবুটির টুকরা এবং ডিমের ভূতলাবশেষ ছিল। মনে হল, খাবার পর ঐ প্লেটটা সিংক-এ নামিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু ধোয়া হয়নি।

বাথরুমে একটা ব্যবহৃত তোয়ালে এবং ছাড়া আন্ডারওয়ার ছিল। সোপকেস স্ট্যান্ডে একটা সাবানও ছিল কিন্তু বাথরুমের মগটা ছিল না।

শয়নকক্ষে লক্ষণীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে চেয়ারের পিঠে ঝোলানো একটা গরম কোট। তার পকেটে রুমাল, একটা ক্যাপস্টান সিগ্রেটের প্যাকেটে অটটি সিগ্রেট, একটি দেশলাই। কোটের ইনসাইড পকেটে মনিব্যাগ ছিল। তাতে ছিল শ-তিনেক টাকা—নোট ও খুচরায়, আর ছিল একখণ্ড কাগজ। তাতে শ্রীমা দাসগুপ্তার নাম-ঠিকানা, যদিও নামটা লেখা ছিল রমা খান্না!

—এক মিনিট! কাগজটা আপনি এনেছেন?

যোগীন্দ্র সেটি দাখিল করেন। করোনার সেটা পরীক্ষা করেন। বাসুও এবং জুরীরাও। ইংরেজী হরফে লেখা ছিল: মিসেস রমা খান্না, মেথডিস্ট চার্চের পিছনে মাঝের কোয়ার্টার্স, পহেলগাঁও। বাসু-সাহেব জনান্তিকে রমাকে প্রশ্ন করেন, এটার কথা তো কিছু বলনি?

—আমি এটার অস্তিত্বের কথা জানতামই না, কী বলব?

করোনার বলেন, যু মে প্রসীড—

যোগীন্দ্র বলেন, দেওয়ালে পেরেকে আটকানো হাজার থেকে ঝুলছিল একটা গরম প্যান্ট। টেবিলের উপর ছিল একটা অ্যালার্ম ঘড়ি। দুটো বেজে সাত মিনিটে দম ফুরিয়ে থেমে ছিল। অ্যালার্ম ঠাটটা ছিল সাড়ে ষাটটার ঘরে। অ্যালার্ম-দমও সম্পূর্ণ শেষ হয়েছিল, মানে দম বাজার পর ঘড়ির অ্যালার্ম দম ফুরিয়ে থেমে গিয়েছিল। এ ছাড়া ছিল টেলিফোন। খাটের নিচে সুটকেস—তাতে জামা-কাপড়, শেভিং-সেট, দশ প্যাকেট সিগ্রেট, টুথব্রাশ-পেস্ট, কিছু ঔষধপত্র ও খাম-পোস্টকার্ড এবং একশ টাকার চুয়ানখানা নোট। সুটকেস তালাবদ্ধ ছিল না। ফায়ার স্পেসে কাঠগুলি সাজানো ছিল। ঘিছানাটি পরিপাটি করে পাতা, তাতে পাটভাঙা একটা চাদর।

শয়নকক্ষে একটা গা-আলমারি ছিল। তার নিচের তাকে একজোড়া ধুলোমাখা জুতো, মোজা, জুতা-ঝাড়া ব্রাশ ছিল। মাঝের তাকে আধডজনখানেক ধোপদস্ত বিছানার চাদর ও কিছু তোয়ালে। উপরের তাকটা এতই উচুতে যে, মেঝেতে দাঁড়িয়ে সহজে নজর চলে না। চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম—সেখানেও কিছু জিনিসপত্র আছে: একটা মেয়েদের অন্তর্বাস, মানে বক্ষবন্ধনী, মেডেনফর্ম, 32" মাপের। একজোড়া উলের-কাঁটা, কিছু উল ও আধবোনো সোয়েটার এবং খান-দুয়েক ছবি। জলরঙে আকা। ঐ লগ-কেবিনের কাছ থেকে দেখা নিসর্গ চিত্র। এছাড়া ঘরে ছিল হুইল-ছিপ।

পিস্তলটাতে দুটো চোষার। দুটি থেকেই ফায়ার করা হয়েছে, কিন্তু স্পেন্ট-আপ বুলেটগুলি ঐ পিস্তলেই আছে। সেটি স্যাক্সবি কোম্পানির। তার নম্বর পি-293750।

করোনার প্রশ্ন করেন, ঐ পিস্তলটার বিষয়ে শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তা কি আপনার কাছে কোনও স্বীকারোক্তি করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটা কিছু অনেক পরে। মাত্র গত পরশুদিন। উনি বলেছিলেন, ঐ পিস্তলটা স্টেট-ব্যাকের দারোয়ান মন-বাহাদুরের। সে দেশে যাওয়ার সময় ওটা রমা দেবীর কাছে গচ্ছিত রেখে যায় এবং সেটি তিনি তাঁর স্বামী মহাদেও প্রসাদ খান্নাকে দিয়েছিলেন শুরুবার দোশরা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়।

পাব্লিক প্রসিকিউটার প্রকাশ সাকসেনা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, জাস্ট এ মোমেন্ট। রমা

## কাটায়-কাটায়-২

দেবী সেই স্বীকারোক্তি কি স্বেচ্ছায় করেছিলেন, না পুলিশ তাঁকে ভয় দেখিয়ে, বা লোভ দেখিয়ে সে-কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল?

—না কোনরকম ভয় বা লোভ তাঁকে দেখানো হয়নি। আপনিই আমার সম্মুখে রমা দেবীকে প্রদর্শন করেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় ঐ স্বীকৃতি দেন।

করোনার বলেন, বর্তমান সাক্ষীকে আর কেউ কোন প্রশ্ন করবেন?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার দু-একটা প্রশ্ন আছে।

—জিজ্ঞাসা করুন।

বাসু বলেন, যোগীন্দ্র সিংজী, আপনি আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন, শয়নকক্ষের মাঝের তাকে আধ-ডজন-খানেক পাটভাঙা বিছানার চাদর ছিল। আধডজন-খানেক বলতে পাঁচ থেকে সাতখানা যা কিছু হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি গুনে দেখেছিলেন কটা চাদর ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছয়টা।

—মিস্টার সিং, আপনি কি বলতে পারেন অতগুলো চাদর কেন ছিল?

—হ্যাঁ পারি। লগ্ন-কেবিনে সপ্তাহে একদিন মাত্র লন্ড্রির ব্যবস্থা আছে। অতগুলো চাদর থাকে যাতে সেল্ফ-হেল্পে বিছানা পরিষ্কার রাখা যায়।

—ধন্যবাদ। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি ঘরের যে নকশাটা দিয়েছেন তাতে খাটের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তার একদিকে দেখছি একটা ছোট্ট আয়তক্ষেত্র আছে; ওটা কি মাথার বালিশের অবস্থান দেখানো হয়েছে?

—ইয়েস! দ্যাটস্ ইট।

—আমার তৃতীয় প্রশ্ন, টেবিলের উপর ঘড়িটা ছিল একথা আপনি জানিয়েছেন। সেটা টেবিলের কোনখানে ছিল? খাটের দিকে না বাথরুমের দিকে?

—খাটের দিকে।

—দ্যাটস্ অল।—বাসুর প্রশ্ন শেষ হল।

করোনার বললেন, এবার আমি শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তাকে সাক্ষী দিতে ডাকব। তারপর জুরীদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা হয়তো জানেন, মহাদেওপ্রসাদের হত্যাপরাধে পুলিশ শ্রীমতী দাসগুপ্তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আর শ্রীযুক্ত পি. কে. বাসু তাঁর কৌসিলী। এ-সব ক্ষেত্রে অভিযুক্তের কাউন্সেলার তাঁর মক্কেলকে এই রকম করোনার-আদালতে কোনও কথা না বলাতে বলেন। সুতরাং শ্রীমতী দাসগুপ্তা সম্ভবতঃ আমাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন না। তবু আমি তাঁকে সাক্ষী দিতে ডাকছি, যাতে আপনারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পান, চিহ্নিত করেন, এবং কী ভাষায় তিনি উত্তরদানে অস্বীকৃত হচ্ছেন, তাও লক্ষ্য করেন।

রমা দাসগুপ্তা সাক্ষীর মধ্যে উঠে দাঁড়ায় ও শপথবাক্য পাঠ করে।

বাসু বলেন, মহামান্য করোনার ও জুরীদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি—প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে আমি আমার মক্কেলকে পরামর্শ দিয়েছি সব কিছু অকপটে বলতে। শ্রীমতী দাসগুপ্তাকে আমি অনুপ্রাণিত করছি, জিজ্ঞাসিত হলে তিনি যেন প্রশ্নগুলির যথাযথ জবাব দেন।

জাস্টিস লাল ঝুঁকে পড়ে বাসুকে ভাল করে দেখলেন।

রমাকে দেখে মনে হয় সে খুবই ক্লান্ত, দেহে ও মনে অবসাদগ্রস্ত। তবু তার স্বল্প ভঙ্গিমায় কিছুটা প্রশান্তি এবং সম্ভবত দাঁড়ের ব্যঞ্জনা। দীর্ঘসময় ধরে সে তার অভিজ্ঞতার একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনিয়ে গেল। গত বছর কী ভাবে সে পাহেলগাঁওয়ার অদূরে চিত্রাঙ্কনরত খান্নাজীর সাক্ষাৎ পায়, কী ভাবে এক বছর ধরে তাঁর চিঠি পায়। তারপর এ বছরের ঘটনা। কীভাবে তাদের বিবাহ হয়, এই লগ্ন-কেবিনে মধুক্রিয়া যাপন করে এবং গত দোশরা সেস্টেম্বরে সে তার স্বামীর কাছ থেকে একটা

ময়না উপহার পায়। তাকে একটি পিস্তল দেয়। সবশেষে জানানো, খবরের কাগজে মহাদেও প্রসাদের ছবি থেকে সে জানতে পারে তার স্বামীর পরিচয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদে মর্মান্বিত হয়ে পড়ে।

প্রকাশ সাক্সেনা! লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ওর দীর্ঘ জ্বানবন্দি শেষ হওয়া মাত্র। বলে, মিস্ দাসগুপ্তা, একথা কি সত্য যে, আপনি সংবাদপত্রে ঐ ছবিটি দেখেই তৎক্ষণাৎ আপনার কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং আত্মগোপন করেন?

—হ্যাঁ, তৎক্ষণাৎ আমি কর্মস্থল ত্যাগ করে শ্রীনগরে আসি। কিছু আত্মগোপন করিনি। আমি নিজেকে বিপদগ্রস্ত ভেবেছিলাম; তাই শ্রীপি. কে. বাসুর শরণাপন্ন হই। তিনি আমাকে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রকাশ বলে, ছদ্মনামে একটা হোটেল উঠতে পরামর্শ দেন?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বাসু! এ প্রশ্নের জবাব আমার মক্কেল দেবে না। সে বলেছে শ্রীনগরে পৌঁছেই সে আমাকে তার কাউন্সেলার হিসাবে নিযুক্ত করে। ফলে এর পর সে যা কিছু করেছে, তা আমার নির্দেশে করেছে। তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। রমা তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দিও না।

প্রকাশ বলে, আমার ধারণা, করোনার বলেছিলেন, এখানে টেকনিক্যাল অবজেকশান কিছু থাকবে না।

—আমি তো টেকনিক্যাল অবজেকশান কিছু দিইনি। আমি আমার মক্কেলকে শুধু বলেছি, ও প্রশ্নের জবাবটা না দিতে।

—আই ডিমান্ড দ্যাট শী আনসার ইট!

করোনার বলেন, মিস্টার পি. পি., আপনি এ দাবী করতে পারেন না। বস্তুত শ্রীবাসুর নির্দেশে শ্রীমতী দাসগুপ্তা কোন প্রশ্নের জবাবই না দিতে পারতেন। কিছু প্রকৃত্য সত্য উদ্ঘাটনে শ্রীবাসু স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সাক্ষীকে প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছেন। আপনি যে প্রশ্নটি বর্তমানে পেশ করেছেন, সে বিষয়ে শ্রীবাসু বলেছেন—তাঁর নির্দেশেই সাক্ষী যা কিছু করার তা করেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাক্ষী বাধ্য নন। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

প্রকাশ সাক্সেনা তখন সাক্ষীকে অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে, একথা কি সত্য যে, যেদিন আপনি গ্রেপ্তার হন সেদিন সকাল ছয়টার বাসে আপনি শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁওয়ের বাসায় ফিরে আসেন?

—হ্যাঁ, সত্য।

—এবং বাড়িতে ফিরেই আপনি কিছু কাগজপত্র পোড়াতে শুরু করেন!

—হ্যাঁ, তাও সত্য।

—কারণ ঐ কাগজপত্রের মধ্যে এমন তথ্য ছিল যাতে আপনার হত্যাপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়?

—না, সেকথা ঠিক নয়। আমি যে কাগজপত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলছিলাম তা শুধু চিঠি। আমার স্বামী গত এক বছর ধরে যেগুলি আমাকে লিখেছেন। আমি চাইনি তা পুলিশের হাতে পড়ুক—এবং প্রকাশ্য আদালতে তা পড়া হয়।

—কেন? তাতে আপনার আপত্তি কিসের? যদি তাতে আপনার হত্যাপরাধ প্রতিষ্ঠিত না হয়?

—চিঠিগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমি চাইনি তা প্রকাশ্য আদালতে পড়া হোক।

—সে কথা আপনি আগেও বলেছেন। আমি জানতে চাইছি: কেন?

—এটা সেক্টিমেণ্টের কথা। এর জবাব হয় না।

—বেশ! একথা কি সত্য যে, যেদিন মহাদেও প্রসাদ খুন হন, সেদিন সকালে আপনি বেলা দশটা নাগাদ ঐ লগ-কেবিনে উপস্থিত ছিলেন?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন বাসু: অবজেকশান য়োর অনার। কোন্ তারিখে মহাদেও প্রসাদ খুন হয়েছেন তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং প্রশ্নটি অবৈধ!

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

প্রকাশ বুঝে ওঠে, আপনি বলতে চান মহাদেও প্রসাদ ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটা নাগাদ খুন হননি?

বাসু বলেন, আমি বলতে চাই—সেটাও এই করোনার-এনকোয়ারির অন্তর্ভুক্ত! কে-কবে-কখন-কেন মহাদেও প্রসাদকে হত্যা করেছে—যদি আদৌ তিনি খুন হয়ে থাকেন—তাই এখানে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

প্রকাশ বলে, অলরাইট! আমি প্রশ্নটা সাক্ষীকে অন্যভাবে করছি, একথা কি সত্য যে, গত ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা নাগাদ আপনি ঐ লগ্-কেবিনে ছিলেন?

—না। আমি...

—প্রকাশ বুঝে ওঠে, না? আপনি অস্বীকার করছেন? আমি যদি প্রমাণ দিই?

রমা বলে, আপনার আগেকার প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে দেননি। মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছেন। আপনি কী চান? আগেকার প্রথম প্রশ্নটার জবাবটা শেষ করব, না পরের প্রশ্নটার জবাব দেব?

—হোয়াট ডু যু মীন?

—আমি বলতে চাই—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব, না, আমি ছয়ই সেপ্টেম্বর সকালে ঐ লগ্-কেবিনে উপস্থিত ছিলাম না। আমি ঐ লগ্-কেবিনের কাছাকাছি গিয়েছিলাম। সেটাকে বন্ধ দেখি। এবং ফিরে আসি।

—তাই বলুন। আপনি কেন গিয়েছিলেন ওখানে?

—বেড়াতে। যেখানে আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রিটা কেটেছিল সেটা দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই।

—আপনি কী দেখলেন তাই বলুন।

রমা উত্তরে জানায় যে, লগ্-কেবিনটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। না, কোনও ময়নার ডাক সে শোনেনি। একমাত্র লগ্-কেবিনের দারোয়ান ছাড়া জনমানবের সাক্ষাৎ সে পায়নি। আধঘণ্টাখানেক ওখানে ঘোরাঘুরি করে সে পহেলগাওয়ে ফিরে আসে।

প্রকাশ বলেন, এ কথা সত্য নয়। আপনি ঐ লগ্-কেবিনের ভিতরে ঢুকেছিলেন। মহাদেও প্রসাদের সঙ্গে আপনার কথা-কাটাকাটি হয়, কারণ তার পূর্বেই আপনি জানতে পেরেছিলেন যে মহাদেও বিবাহিত। সেই সময় আপনি পিস্তল দেখিয়ে তাকে ভয় দেখান। তারপর...

রমা তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, না! এসব কিছু হয়নি!

প্রকাশ বলে, আমার প্রশ্নটা শেষ হয়নি...

বাসু বাধা দিয়ে করোনারকে বলেন, যোর অনার, আমি মনেকরি, আমার মক্কেল ঐ ব্যাপারে যতটুকু জানেন, তা বলেছেন। এর পর যদি প্রশ্ন করা হয় তবে তা ক্রস-এক্সামিনেশান ছাড়া আর কিছু নয়। যদি অন্য কোনও প্রশ্ন করবার না থাকে তাহলে আমি আমার মক্কেলকে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে বলব।

প্রকাশ বললে, না আমার অন্য প্রশ্ন আছে। বলুন, রমা দেবী, যেদিন আপনি গ্রেপ্তার হন, সেদিন ময়নাটাকে কেন আপনি মেরে ফেললেন?

—আমি মারিনি। কে মেরেছে তা আমি জানি না।

—অথচ পাখিটা আপনার তালাবন্ধ বাড়িতে ছিল।

—না, বারান্দায় ছিল। পাঁচিল টপকিয়ে যে কেউ ওটাকে মেরে ফেলতে পারত।

—পারত কি পারত না, সে-কথা অবাস্তব! আপনি নিজেকে হাতেই পাখিটাকে মেরে ফেলেছিলেন, কারণ সেটা একটা অদ্ভুত বোল পড়ত। তাই না?

—না, একথা সত্য নয়।



প্রকাশ বলল, বোধ হয় আপনার স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিতে আমি একটু সাহায্য করতে পারি, দেখুন তো—

প্রকাশের ইস্তিমাত্র তার একজন সহকারী কালো কাপড়ে ঢাকা একটা পাখির খাঁচা এনে রাখল সামনের টেবিলে। আর যাদুকর যেমন নাটকীয়ভাবে ঢাকা খুলে দেখায় টুফির ভিতর খরগোশ—ঠিক সেই ভঙ্গিতে কালো কাপড়টা তুলে দিয়ে খাঁচাটাকে অনাবৃত করে ফেলল, ঠেলে দিল রমার দিকে। দেখা গেল, খাঁচাটার ভিতরে একটা রক্তাক্ত ময়নার ধড়—তার মুণ্ডটা দেহ-বিযুক্ত হয়ে পড়ে আছে। শীতৎস দৃশ্য!

—এ কীর্তিটা আপনারই, তাই না রমা দেবী?

রমা দুই হাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, ওটা...ওটা সরিয়ে নিন! আমার গা গুলচ্ছে...ব্রীজ...

প্রকাশ নাটকীয় ভঙ্গিতে জুরিদের সম্বোধন করে বলে, বিবেকের দংশন! অপরাধের প্রমাণে অপরাধীর আর্তি! পাপের স্বীকৃতি!

বাসু একলাফে এগিয়ে যান। প্রকাশের সহকর্মীর হাত থেকে কালো কাপড়টা কেড়ে নিয়ে খাঁচাটা ঢেকে দেন। জুরিদের দিকে ফিরে বলেন, মোটেই এটা পাপের স্বীকৃতি নয়, ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, ঐ মেয়েটির প্রতি কী অমানুষিক মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে! ও বেচারী মাত্র সাতদিনের বিবাহিত জীবনের মধ্যেই জানতে পারল ও বিধবা। তারপর পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করে বলল—তুমিই হত্যাকারী! জেল হাজতে জেরায়-জেরায় তাকে পাগল করে তুলে এখানে তাকে টেনে আনা হয়েছে। এই কদিনে কেউ ঐ সদ্য বিধবাকে কোনও সহানুভূতির কথা শোনায়নি। তার উপরে পাবলিক প্রসিকিউটার একটা রক্তমাখা পাখি...

প্রকাশ বললে, সহযোগী কি একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন?

—না, আমি আপনার বক্তৃতার উপসংহার টানছি!

করোনার সজোরে তার হাতুড়িটা ঠুকে বললেন, অর্ডার, অর্ডার!

বাসু-সাহেব বললেন, আদালতে শৃঙ্খলা আনতে হলে আপনি পি. পি.-কে বলুন—এসব বিবেক-বাহীর নাটকীয়তা আমরা শুনতে রাজী নই! ঐ মেয়েটির স্বামীর উপর যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছে। তারপর একটা রক্তমাখা নিহত পাখি ওর কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলতেও সহযোগীর ঝিধা হল না। এবং তারও পরে মেয়েটির স্বাভাবিক বিবমিষাকে তিনি বলছেন, বিবেকের দংশন! বিচারালয়ে আপনি যদি 'অর্ডার' চান, তাহলে সহযোগীকে নাটক করতে বাধণ করুন!

—আমি কিছুই নাটক করিনি; প্রকাশ সাকসেনা বলে।

করোনার বলেন, আমি দুপক্ষকেই বক্তৃতা দিতে বারণ করছি। করোনার মনে করেন, যেভাবে ঐ মৃত পাখিটাকে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে ঐ মহিলার বিচলিত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত আমারও গা গুলিয়ে উঠেছিল।

বাসু বলেন, য়োর অনার! আমাদের সকলেরই একই অনুভূতি হয়েছে। নাটকীয় ভাবে ওটা উপস্থাপনের একটি ইউদ্দেশ্য—দৃঢ়চেতা সাক্ষীর মনোবলে আঘাত করা।

—সেরকম কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না—প্রকাশ বলে।

—তাহলে ওটা উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? করোনার জানতে চান।

—আমি মৃত পাখিটাকে সনাক্ত করতে চেয়েছিলাম মাত্র।

বাসু বলেন, তা করবার প্রয়োজনে রক্তমাখা পাখিটা সাক্ষীর কোলের উপর টেনে এনে ফেলার প্রয়োজন ছিল না।

—ছিল, কি ছিল না, সেটা আমি বুঝব।

শর্মাস্ত্রী উঠে দাঁড়ান। বলেন, জাস্ট এ মিনিট! করোনার এ বিষয়ে কোনও বুলিং দিলে আমি দেখতে পারি সেটা কার্যকরী করা হচ্ছে কি না।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

পদার্থের অধ্যাপকটি বলেন, করোনার বুলিং দিচ্ছেন। করোনার বুলিং দিয়ে বলছেন—এ আদালতে ব্যক্তিগত বাদানুবাদ বরদাস্ত করা হবে না। করোনার আরও বলছেন, দু-পক্ষই নাটকীয়তা বর্জন করে শুধু মাত্র তথ্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করুন।

প্রকাশ বলে, আমি শুধু পাখিটাকে সনাক্ত করতে চেয়েছিলাম।

করোনার বলেন, একথা আপনি আগেও বলেছেন, আমি শুনছি। সে বিষয়ে আমি যা বুলিং দেবার তাও দিয়েছি, আশা করি আপনি শুনছেন। মিস্টার পি. পি. আপনার আর কোনও জিজ্ঞাস্য আছে?

—নো স্যার।

—মিস্টার বাসু? আপনার?

—আছে য়োর অনার।

বাসু একটু আগিয়ে যান। রমার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, রমা! জানি, ঐ পাখিটার দিকে তাকিয়ে দেখতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি বলব, তুমি ওটার দিকে তাকিয়ে দেখ একবার। আমি জানতে চাই—এই ময়নাটাকেই কি তোমার স্বামী তোমাকে উপহার দিয়েছিলেন?

রমা দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা কামড়ায়। বাসু ইতিমধ্যে কালো কাপড়ের চাকনাটা সরিয়ে নিয়েছেন। রমা সেদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে। পারে না। বলে, আমি... আমি ওটার দিকে তাকাতে পারছি না। তবে আমার স্বামী যে পাখিটা আমাকে দিয়েছিলেন তার ডান পায়ের মাঝের আঙুলটা কাটা ছিল। উনি বলেছিলেন, 'ইদুর-মারা কলে ওর ঐ একটি আঙুল কাটা গিয়েছিল।'

বাসু বলেন, কিছু এই মৃত ময়নাটার দু পায়ের সব কটা আঙুলই তো রয়েছে।

—তাহলে ঐ মরা পাখিটা 'মুন্না' নয়।

রমা একথা বলল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। বাসু কৌশিককে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। সে কাপড়ে-ঢাকা আর একটা ঝাঁটা হাতে এগিয়ে এল। ঝাঁটাটা ওর হাত থেকে নিয়ে বাসু বলেন, রমা, এবার এটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ভয় নেই, এটা মরা পাখি নয়। দেখ তো, এটাকে চিনতে পার কিনা।

রমা তখনও সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। ঠিক তখনই ওই পাখিটা 'বোল' পড়ল আইয়ে বৈঠিয়ে, চায়ে পিজিয়ে!

যেন সখিৎ পেয়ে রমা এদিকে ফিরল, বলল, এই তো! এই তো মুন্না! তবে যে পুলিশে বলল, মুন্নাকে কে যেন মেরে ফেলেছে!

পাখিটা আবার বোল পড়: রাম নাম সং হ্যায়!

রমা বলে, ঐ তো ওর মাঝের আঙুলটা কাটা।

ঠিক তখনই মুন্না বোল পড়ল: 'রমা...মৎ মারো...পিস্তল নামাও! ক্রম...হায় রাম!

পরিস্কার মানুষের কণ্ঠস্বর। সমস্ত আদালতে একটা চাপা উত্তেজনা।

রমা বলল, ঐ তো সেই বোলটা বলেছে! ও নির্ঘাৎ মুন্না!

প্রকাশ সাকসেনা এগিয়ে এসে করোনারকে বলে, য়োর অনার! আমি মুন্নার ঐ বোলটা টেপ-রেকর্ডারে টেপ করতে চাই।

বাসু বলেন, সহযোগী কি মুন্নাকে সাক্ষী হিসাবে তুলতে চান?

—না! পাখিটা একটা বিচিত্র 'বোল' পড়েছে। আমি সেটা টেপরেকর্ড করতে চাই মাত্র।

—কিন্তু পাখিটার ঐ বক্তব্য তো হলফনামা নিয়ে নয়। মি লর্ড! সহযোগী যদি মুন্নাকে সাক্ষী হিসাবে তলব করতে চান, তাহলে আমার দাবী, প্রথমে তাকে দিয়ে হলফনামা পাঠ করাতে হবে!

প্রকাশ বিরক্ত হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! পাখিটাকে সাক্ষী হিসাবে আমি আদৌ দেখছি না। তার একটা বোল এভিডেন্স হিসাবে রেকর্ড করতে চাইছি মাত্র। আমি করোনারের কলিং চাইছি।

করোনার বললেন, না, পাখির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না। কিন্তু পাখির কোনও 'বোল' একটা তথ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। পাখিটা কী বলেছে তা আমি শুনছি, জুরিরাও শুনছেন। পাখির ঐ উক্তি

আইন-মোতাবেক গ্রাহ্য কিনা তা পরবর্তী আদালতে—যদি এ মামলা আসৌ দায়রায় সোপর্দ করা হয়—আইন-বিশারদেরা বিচার করবেন। আপাতত যেমন সাক্ষ্য চলছিল চলুক।

বাসু বলেন, রমা, তুমি কি মুন্নার মুখে ঐ 'বোলটা' আগেও শুনছ?

—হ্যাঁ, প্রথম দিন থেকেই। অর্থাৎ সেই দাশরা সেপ্টেম্বর থেকেই।

বাসু বলেন, তাঁর আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

করোনার বলেন, অতঃপর শ্রীযুক্তা সুরমা খান্নাকে আমি সাক্ষী হিসাবে ডাকছি।

প্রকাশ সাক্ষেনা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, শ্রীযুক্তা সুরমা খান্না, অথবা তাঁর পুত্র জগদীশ মাধুরকে সমন ধরানো যায়নি। তাঁরা কোথায় আছেন আমরা জানি না।

করোনার বলেন, আর মহাদেওপ্রসাদের একান্ত সচিব? গঙ্গারাম যাদবকে?

প্রকাশ বলেন, তিনি উপস্থিত। তাঁকে সমন দেওয়া হয়েছে। ঐ তো বসে আছেন।

করোনার বলেন, ঠিক আছে। তাঁকে এর পর আমি সাক্ষী দিতে ডাকব। তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। এখন আমি শ্রীসতীশ বর্মনকে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে বসতে অনুরোধ করছি।

বর্মন সাক্ষীর মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসলেন। করোনার বলেন, আপনি সি. বি. আই.য়ের একজন অফিসার, কান্ট্রীর প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধ পেয়ে সি. বি. আই. আপনাকে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে পাঠিয়েছে—এ কথা সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি বারোই সেপ্টেম্বর এস. ডি. ও. শর্মাজী এবং ও. সি. যোগীন্দর সিং এর সঙ্গে ঐ লগ্-কেবিনে গিয়ে তদন্ত করেছিলেন। এ কথা সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেখানে আপনি কী দেখেন বলে যান।

সতীশ বর্মন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিতে থাকেন। পথে তাঁরা বাসুর সাক্ষাৎ পান সেক্ষণে বলেন। তারপর বাসু প্রশ্ন করলে গঙ্গারামজী বলেন—

বাধা দিয়ে করোনার বলেন, তিনি কী বলেন, তা আমরা তাঁর মুখেই শুনব। আমরা বরং শুনতে চাই তদন্ত করে আপনি কী সিদ্ধান্তে এসেছেন।—তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি হয়তো বলবেন, সাক্ষীর সিদ্ধান্ত আমাদের শোনার কথা নয়; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাক্ষী হচ্ছেন একজন বিশেষজ্ঞ। অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ঐকে কেন্দ্রীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সংস্থা এখানে পাঠিয়েছেন এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তদন্ত করতে। ফলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর সিদ্ধান্ত কী, তা আমরা জানতে ইচ্ছুক। আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

বাসু বলেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমরা এখানে কারও বিচার করতে আসিনি। এসেছি সত্যানুসন্ধানে। কেন্দ্রীয় সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে কী মনে করেন, কী তাঁর সিদ্ধান্ত তা শুনতে আমরাও আগ্রহী। উনি ঠিক মতামত ব্যক্ত করুন। আমিও প্রশ্নের মাধ্যমে আমার মনে যেটুকু সংশয় আছে তা পরিষ্কার করে নেব।

সতীশ বর্মনকে এখন বেশ ডগমগ মনে হচ্ছে। সে তাঁর বক্তব্য শুরু করল শেষ সিদ্ধান্ত দিয়ে: আমার মতে মহাদেও প্রসাদ খান্নাকে হত্যা করেছেন শ্রীমতী রমা দাসগুপ্তা। যেহেতু তাঁর বিবাহটা আইনানুসারে সিদ্ধ নয়, তাই আমি তাঁকে রমা খান্না বলতে চাই না। রমা দাসগুপ্তার বিরুদ্ধে যুক্তি পর্বতপ্রমাণ এবং অকাটা। প্রথম কথা: মোটিভ বা উদ্দেশ্য। মহাদেও নিজেই যশোদা কাপুরের পরিচয়ে অবিবাহিত বলেছিলেন; ডুল বুঝিয়ে রমা দেবীকে শয্যাসঙ্গিনী করেছিলেন। যে মুহূর্তে রমা দেবী জানতে পারলেন তাঁর স্বামী যশোদা কাপুর বিবাহিত; সেই মুহূর্তে—আই মীন ছয়ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা তিনি ঐ পিগলট নিয়ে লগ্-কেবিনের দিকে যান। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—স্বামীকে খুন করার বাসনা হয়তো তাঁর ছিল না। তবে পিগলট দেখিয়ে ভয় দেখানোর ইচ্ছাটা ছিল। তাই তিনি করেছিলেন।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

সে সময় খান্নাজী এমন কোনও কথা বলেন যাতে উত্তেজিতা অবস্থায় রমা দেবী পিস্তলের দুটি ট্রিগারই টেনে দেন। 'ডেলিবারেট মার্ডার' হয়তো নয়, কিন্তু কালপেবল্ হোমিসাইড। অর্থাৎ সুপরিকল্পিত হত্যা নয়; উদ্বেজনার মুহুর্তে হঠাৎ হত্যা করে বসা।

উদ্বেশের কথা বলেছি। দ্বিতীয় কথা: সুযোগ। বাহাদুর নিজে থেকেই গুঁর জিন্মায় পিস্তলটা রেখে যাওয়ায়, এবং নিতান্ত নির্জনে খান্নাজী আছেন একথা জানা থাকায় রমা দেবীর সুযোগ পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। এটা আশ্চর্য্যের কেস কিছুতেই হতে পারে না। কারণ পিস্তলটা ছিল মৃতদেহের নাগালের বাইরে এবং তাতে কারও আঙুলের ছাপ ছিল না।

তৃতীয়ত: অ্যালোবাইয়ের অভাব। শূণ্ণ অভাব নয়, ঘটনার সময় রমা দেবী যে ঐ লগ্-কেবিনের ধারে-কাছেই ছিলেন তা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করেছেন। না করে তাঁর কোন উপায় ছিল না। ওখানকার দারোয়ান তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, চিনতে পেরেছিল। তাই লগ্-কেবিনের কাছে যাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বীকার করছেন, কিন্তু ভিতরে ঢোকার কথা অস্বীকার করছেন।

চতুর্থত: রমা দাসগুপ্তার গল্পটা যে আদ্যন্ত বানানো তার প্রমাণ তাঁর তথাকথিত স্বামীর বুক-পকেট থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ঐ কাগজখানায়। তিনি স্ত্রীর ঠিকানায় লিখেছেন 'মিসেস্ রমা খান্না', 'মিসেস্ রমা কাপুর' নয়। সুতরাং মহাদেওপ্রসাদ যে যশোদা কাপুর নন, একথা রমা দেবীও জানতেন, খান্নাজীও জানতেন। আমরা মৃতের পকেটে প্রাপ্ত ঐ কাগজখানা হস্তরেখাবিদদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা সন্দেহাতীত ভাবে বলেছেন হাতের লেখা মহাদেও প্রসাদ খান্নার।

পঞ্চমত: পাখিটাকে হত্যা করা। পাখিটা ঘটনার সময় ঐ লগ্-কেবিনেই ছিল। রমা দেবীর বাসায় নয়। পাখিটার এমন ক্ষমতা আছে যে, একবার মাত্র শুন্যেই কোনও বোল তুলে নিতে পারে। সুর্য্যপ্রসাদ এবং গঙ্গারামজীর সাক্ষ্য এখনও গ্রহণ করা হয়নি। এ তথ্যটা তাঁদের সাক্ষ্যে প্রমাণ হবে—ঐ যে 'রাম নাম সং হায়' বোলটা ও একটু আগে পড়ল, ওটা সে একবার মাত্র শুন্যেই শিখ ফেলেছিল। এ-ক্ষেত্রেও রমা দেবী যখন পিস্তল দেখিয়ে মহাদেওকে ভয় দেখাচ্ছেন তখন খান্নাজী বলে ওঠেন: 'রমা, মৎ মারো... পিস্তল নামাও!' ঠিক সেই মুহুর্তেই রমা দেবী গুলি করেন। পাখিটা সেই শব্দটাও তুলেছে। এবং তারপরে মহাশয়জীর উচ্চারিত দুটি অন্তিম শব্দ: হায় রাম! মহাদেওপ্রসাদ খান্নার জীবনেও ঐ দুটি শব্দের সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস পড়ে। এখন ঘটনা হচ্ছে এই যে, রমা দেবী জানতেন—খান্নাজী তাঁর স্ত্রীকে 'রমা' বলে ডাকেন। মুহুর্তমধ্যে গুঁর মনে হয় হত্যাপর্য্যট ঐই সুরমা দেবীর স্বক্ষে চাপানো যায় কি না। কারণ রমা দেবীকে কেউই চেনে না, স্বভট্ ঐ বোলটা 'সুরমা'কে চিহ্নিত করবে। অথচ তিনি তখন জানতেন না, সুরমার কোনও অকাটা অ্যালোবাই আছে কিনা। তাই তিনি দু'এক দিন পরে আর একটি ময়না এনে ঐঘরে টাঙিয়ে দিয়ে মুন্সাকে নিজের বাসায় নিয়ে যান। তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন সুরমার অ্যালোবাই বিষয়ে। প্রশ্ন হতে পারে, পরে এসে উনি কেমন করে ঐ বন্ধ ঘরে ঢাকেন। এর সহজ জবাব হচ্ছে, ঐ লগ্-কেবিনে তিনি খান্নাজীর সঙ্গে তথাকথিত মধুচন্নিমা যাপন করে যান। ফলে তাঁর কাছে একটি ডুম্‌কেট চাবি থাকা খুবই সম্ভব। তারপর যে মুহুর্তে তিনি শুনলেন যে, তাঁকে পুলিশ ঝুঁজছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর কাউন্সেলের আদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর বাসায় ফিরে যান ও মুন্সাকে হত্যা করেন।

সেক্ষেপে এইটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি, রমা দেবীর বিরুদ্ধে এভিডেন্স এমন জোরালো যে, যে-কোন আদালতেই বিচার হ'ক না কেন 'গিল্টি' ভার্ডিষ্ট হবেই। যত বড় ব্যারিস্টারই হন, রমা দেবীকে বাঁচাবে পারবেন না।

করোনার প্রশ্ন করেন, মৃত্যুর সময়টা কিভাবে আপনি চিহ্নিত করছেন? ঐ যে বললেন ছয়ই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটা—

—সেটা হাইলি টেকনিক্যাল ব্যাপার, স্যার। ওর পিছনে অপরাধবিজ্ঞানসম্মত নানান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিডাকশান আছে। সে সব কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, তাছাড়া অনেক 'টেকনিক্যাল ডিটেইলস্'...ওয়েল, ওটা স্যার একজন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত বলেই আপাতত ধরে নিন।

করোনার কী বলবেন ভেবে পান না।

বাসু বলেন, য়োর অনার! যতই 'হাইলি টেকনিক্যাল' হোক, ব্যাপারটা আমরা একটা আপ্তব্যক্য বলে মেনে নিতে পারি না। আমি মনে করি, এ-কैसे মৃত্যুর সময়টাই হচ্ছে একটা ভাইটাল ক্লু। সুতরাং সাক্ষীর যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তটা আমরা শুনতে চাই।

করোনার বলেন, মৃত্যুর সময়টা যে ছয় তারিখ সকাল এগারোটা এটা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। আমি সময় সংকেপ করতে চাইছিলাম মাত্র।

বাসু বলেন, 'সবাই' বলতে কে কে আমি জানি না। আমি মেনে নিইনি। অটোলি সার্জেনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে। তিনি বললেন, পাঁচ-সাত দিনের বাসি মড়া—এতদিনে সব পচে ঢোল হয়ে যাবার কথা। নিতান্ত ঠাণ্ডার মধ্যে ছিল বলে তা হয়নি। মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে তিনি কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না। অপর পক্ষে ছয়ই সেপ্টেম্বর সকালে, ঘটনাচক্রে আমার মক্কেল সেখানে উপস্থিত ছিল। এজন্য আমি জানতে চাই কী কী এভিডেন্সের মাধ্যমে ঐ বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক মৃত্যুর সময়টা চিহ্নিত করছেন।

করোনার কিছু বলার আগেই সতীশ বর্মন বলে ওঠে, স্যার। ঠুর মনে যখন সংশয় জেগেছে, তখন সেটা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি এ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম এ জন্য যে, ব্যাপারটা 'হাইলি টেকনিক্যাল'! অপরাধবিজ্ঞান বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা নেই তাঁদের পক্ষে এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রের ধারণ করা কঠিন। যা হোক আমি বলছি, শুনুন। বুঝবার চেষ্টা করুন। প্রথমতঃ জানা তথ্যগুলি তৌল করে দেখুন। আমরা জানি যে, খান্নাজী উদ্বোধনের দিনে ওখানে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি মোমরা শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে অন্য কোথাও দিন দু-তিন ছিলেন বটে তবে পাঁচই বিকাল নাগাদ তিনি নিশ্চয়ই লগ্-কেবিনে পৌছান। পহেলগাঁও থেকে ঐ পথে যে বাসটা যায় সেটা ঐ ট্রাউট-প্যারাডাইস্‌ বাস স্ট্যাণ্ডে পৌছায় বিকাল তিনটায়। ফলে তিনি পদব্রজে লগ্-কেবিনে সওয়া তিনটার মধ্যেই পৌছান। রাত আটটা পর্যন্ত যে তিনি জীবিত ছিলেন তার অকাটা প্রমাণ আছে। কারণ ঐ সময়ে তিনি ঐ অঞ্চল থেকে টেলিফোনে তাঁর সেক্রেটারি গঙ্গারামজীর সঙ্গে কথা বলেন। গঙ্গারামজী ঐ সামনেই বসে আছেন, তাঁর সাক্ষ্য এখনও নেওয়া হয়নি। যখন নেওয়া হবে তখন সে তথ্যটা জানবেন। গঙ্গারামজী দীর্ঘ দশ বছর ধরে খান্নাজীর একান্ত সচিব; মনিবের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে তিনি ভুল করবেন না। তাছাড়া ওরা টেলিফোনে এমন একটা বিষয়ে আলোচনা করেন যা তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে জানা অসম্ভব। ফলে, প্রমাণ হল, পাঁচই সেপ্টেম্বর সোমবার, রাত আটটা পর্যন্ত তিনি ঐ লগ্-কেবিনেই জীবিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছিলেন এবং সেটা সাড়ে পাঁচটায় বেজে দম খতম হয়ে থেমে গেছে। সুতরাং বোঝা যায় তিনি পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় গান্ধোখান করেছিলেন। দ্রুতগতি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে উনি কফি বানান, ডিমের পোচ বানান এবং প্রাতঃরাশ সেরে নেন। উনি খুব সকাল সকাল মাছ ধরা শুরু করতে চেয়েছিলেন, কারণ রোদ বেশি উঠে গেলে মাছে টোপ খায় না। ফলে ঐটো বাসন ধোওয়ার সময়ও তাঁর ছিল না। আন্দাজ সাড়ে ছয়টা সাতটা নাগাদ তিনি মাছ ধরতে বেরিয়ে যান। উনি একজন দক্ষ মেছুড়ে। অন্যান্য মেছুড়ের ডিড় তখনও হয়নি। ফলে বেলা দশটার মধ্যেই তিনি দৈনিক ঊর্ধ্বসীমায় যতটা মাছ ধরা আইন-সম্মত সেই দেড় কে-জি মাছ ধরে লগ্-কেবিনে ফিরে আসেন। ফিরে এসে এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম কাজই হলুয়া উচিত ছিল মাছগুলো ধুয়ে কেটে গ্লিডি ফেলে দেওয়া। তিনি সেসব কিছুই করেননি। মানে করার সময় পাননি। কোট ও প্যান্ট খুলে পায়জামা পরে তিনি হয়তো আবার এক কাপ কফি বানাতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই রমা দেবী এসে পৌছান। তারপর কী হয়েছিল আমি তা আগেই বলেছি।

করোনার প্রশ্ন করেন, কিন্তু ঠিক এগারোটা কেন বলছেন?

—ঠিক এগারোটা বলিনি। বলেছি, সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। ঐ সময়টা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করছি শুনুন। বস্তুত এখানেই অভিজ্ঞতার দরকার—এগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ক্লু' যা

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

সাধারণ মানুষের নজরে পড়বে না, অপরাধবিজ্ঞানীরই শুধু নজর হবে। প্রথম কথা: মৃতদেহের পরনে ছিল পায়জামা এবং সোয়েটার, এবং চেয়ারের হাতলে গরম কেট, সেওয়ালে বোলানো ছিল গরম প্যান্ট। আমরা থার্মামিটারের সাহায্যে ঐ লগ্-কেবিনের তাপমাত্রার একটি গ্রাফ তৈরী করেছি। দেখা যাচ্ছে, সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত এম্বরের চালে সরাসরি সূর্যালোক পড়ে না, তাই ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বেলা এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত সরাসরি ব্রোড পেডের ঘরটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। এবং চারটের পর দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রাত্রে রীতিমতো শীত করে। মৃতের পোশাক প্রমাণ করে মৃত্যু সময়টা নতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। বেশী ঠাণ্ডা হলে উনি কোটটা পরে থাকতেন। বেশী গরম হলে উনি সোয়েটারটা খুলে ফেলতেন। ফলে মৃত্যুর সময়টা হয় সকাল সাড়ে দশটা এগারোটা অথবা বিকাল তিনটে চারটে। শেষোক্ত সময়টাকে বাদ দিচ্ছি এজন্য যে, তিনি মধ্যাহ্ন আহার করেননি। করলে নিশ্চয়ই তিনি ঐ মাছগুলি খুয়ে কেটে রান্না করতেন। ফলে রমা দেবীর প্রবেশমুহূর্তটা হচ্ছে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা!

বাসু বললেন, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রথম কথা, আপনার খিওরি অনুসারে খান্নাজী ঐ লগ্-কেবিনে আসেন পাঁচই বিকালে এবং হত হন ছয় তারিখ বেলা সাড়ে দশ-এগারোটা। আমরা জেনেছি, খান্নাজীর সুটকেসে দশ-প্যাকেট সিগারেট ছিল—যা থেকে মনে হয় তিনি বেশ হেভি শোকার। অথচ লগ্-কেবিনের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে অথবা কাছেপিঠে কোনও খালি সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া যায়নি। শুধু যোগীন্দর সিং বলেছেন—ওঁর পকেটে একটা প্যাকেট দেখেছিলেন যাতে আটটা সিগারেট ছিল। এ-ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন খান্নাজীর মত শোকার পাঁচ তারিখ বিকাল থেকে ছয়ই বেলা এগারোটার মধ্যে মাত্র দুটি সিগারেট খেয়েছিলেন?

সতীশ বর্মন হেসে বললেন, কিছু আপনি ভুলে যাচ্ছেন—ছয়ই সকালে তিনি নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ঠিক কোথায় বসে তিনি মাছ ধরেছিলেন তা আমরা জানি না। হয়তো সেখানে পড়ে আছে একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট। শুধু তাই নয়—ওঁর লগ্-কেবিনের টেলিফোনটা বিকল হয়ে পড়ায় উনি পাঁচই রাত আটটা নাগাদ অন্য কোনও জায়গা থেকে ওঁর একান্ত সচিবকে টেলিফোন করেন। ফলে সেখানেও খালি প্যাকেটটা ফেলে আসতে পারেন!

বাসু বলেন, আই সী! আচ্ছা এবার অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যাক। যোগীন্দর সিং বলেছেন—ফায়ার-স্মেসে কাঠগুলো সাজানো ছিল, আগুন দ্বালার অপেক্ষায়। তাই না?

—হ্যাঁ।

—আপনার খিওরি অনুসারে খান্নাজী সকালবেলা সাড়ে পাঁচটার উঠে খুব ভাড়াডাড়ি প্রান্তকৃত্যাদি সেরে দ্রুতহাতে প্রান্তরাশ বানিয়ে খেয়ে নেন। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই; কারণ সকাল-সকাল তিনি মাছ ধরতে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

—প্রান্তকৃত্যাদির মধ্যে দাঁতমাজা ও দাড়িকামানো নিশ্চয়ই পড়ে?

—সেটা উনি আগের দিন সন্ধ্যা বা রাত্রেও করে থাকতে পারেন। আমরা জানি না, উনি রাত্রে দাঁত মাজতেন না সকালে।

—সে যাই হোক উনি লগ্-কেবিনে পৌছে অস্ত্রত একবার দাঁত মাজেন ও দাড়ি কামান—কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর টুথব্রাশ, পেস্ট ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব কিছু ছিল তাঁর সুটকেসে। এটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না কি? কোন নতুন জায়গায় কেউ গেলে এবং সেখানে পাঁচ-সাতদিন থাকবেন জানা থাকলে দাঁতমাজা ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম কেউ বাগের বাগে সুটকেসে তোলে না। বাথরুমের তাকে রেখে দেয়। নয় কি?

বর্মন একটু অশান্তভাবে বলে, তা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না; হয়তো উনি স্নান করার সময় দাঁত মাজেন ও দাড়ি কামান। মাছ ধরে ফিরে এসে স্নানের আগেই তো তিনি মারা যান।

—রাত্রে দাঁত না মেজে এবং সকালেও না মেজে কেউ ব্রেকফাস্ট করে?

—এসব ছোটখাটো অসঙ্গতি সব কেস-এই থাকে। আমি বরাবর দেখছি—তদন্ত করতে গেলে এমন দু-একটা ছোটখাটো অসঙ্গতি থেকেই যায়।

—তখন আপনি কী করেন?

—ঐ ছোটখাটো অসঙ্গতিগুলোকে অগ্রাহ্য করি।

—এমন কতগুলি অসঙ্গতি অগ্রাহ্য করে আপনি আপনার ঐ থিওরিটা খাড়া করেছেন?

—ঐ একটাই। মানে স্বাভাবিক হত যদি টুথব্রাশ, পেস্ট এবং দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বাথরুমে থাকত।

—বুঝলাম। আপনার থিওরি অনুসারে খান্নাজী কখন ঐ ফায়ার-শ্রেন্সের কাঠগুলো সাজিয়েছিলেন?

—সকালে নিশ্চয়ই নয়, তখন তাড়া ছিল। মাছ ধরে ফিরে এসেই নিশ্চয় তা করেছিলেন।

—কিন্তু মাছ ধরে ফিরে এসে তাঁর প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল পলো থেকে মাছগুলো বার করে ধুয়ে ফেলা। মাছের পিঙ্গি গেলে ফেলা, কারণ কেবিনটা তখন গরম হচ্ছে। রান্নার যোগাড় করা। কারণ মধ্যাহ্ন আহারটা আগে করতে হবে; তারপর রাত্রের জন্য ফায়ার-শ্রেন্স সাজানো, যেটা বিকালেও করা চলত। অথচ উনি মাছগুলো না ধুয়ে, রান্নার কোনও যোগাড় না করে ফায়ার-শ্রেন্সটা সাজাতে বসলেন? এটাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না কি?

সতীশ বর্মণ একটু বিরক্তভাবেই বলল, এমনও হতে পারে তিনি আগের দিন বিকালেই কাঠগুলো সাজিয়েছেন?

—সে কী? তারপর সারারাত শীতে হি হি করে কেঁপেছেন, আগুন জ্বালেননি?

সতীশ একটু অন্তর্ভুক্তি বোধ করছে, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বীকার করতে বাধ্য হল—না, আগের দিন সম্ভ্যায় নয়। ছয় তারিখেই তিনি কাঠটা আবার সাজান।

—কিন্তু কখন? মাছ ধরতে যাবার আগে, না মাছ ধরে ফিরে এসে?

সতীশ বিরক্ত হয়ে বলে, তা আমি কেমন করে জানব?

—একজ্যোতিষি! আপনি তা জানেন না। অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর কোনও অনুমানও করতে পারছেন না, কারণ এটাও একটা ছোটখাটো অসঙ্গতি যা অগ্রাহ্য করতে হবে। তৃতীয়ত: আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন লগ-কেবিনের দেওয়ালে একটা নিয়মাবলী টাঙানো আছে এবং তাতে ঐ লগ-কেবিনের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ আছে—একটি ট্রেবিল, একটি চেয়ার, বাসনপত্র কী কী আছে ইত্যাদি।

—হ্যাঁ, দেখেছি। তাতে কী হল?

—তাতে লেখা আছে, সাতদিন অন্তর লগ-কেবিনে লক্ষ্যীয় ব্যবস্থা করা হয়। এজন্যই আলমারিতে ছয়টি খোপ বিছানার চাদর এবং বিছানায় পাতা একটা পাটভাজা চাদর আছে, তাই নয়?

—সম্ভবত তাই।

—এবং যোগীন্দ্র সিংএর জবানবন্দি অনুসারে দেখা যাচ্ছে বিছানাটি পরিপাটি টান-টান করে পাতা। নিশ্চয়ই ছয়ই তারিখে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে খান্নাজী স্বহস্তে বিছানাটি পাতেন। অথবা ফিরে এসে? তাই নয়। যেহেতু রাত্রে ঐ বিছানায় তিনি শুয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই তাই।

—এক্ষেত্রে কি আমাদের আশা করা উচিত নয় যে, আলমারির তাকে পাঁচটি খোপ চাদর থাকবে এবং নিচের তাকে একটা সয়েলড চাদর থাকবে?

সতীশ বর্মণের পুনরায় ভুরুকণ হল। বললে, এ-ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে—খান্নাজী সয়েলড লিনেনটা পরিবর্তন করেননি।

—কেন? খান্নাজী তো ঐ ট্রাউট-প্যারাডাইস্-এ বছর-বছর যান। তিনি তো জানেন—সাত দিনের জন্য সাতটা চাদর আছে?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স নয়।

—আপনি তাই মনে করেন? অর্থাৎ এটাও একটা ছোটোখাটো অসঙ্গতি যা অগ্রাহ্য করতে হবে, তাই নয়? বেশ, চতুর্থত: অ্যালার্ম ঘড়িটার দম শেষ হয়ে থেমে গিয়েছিল, নয়?

—হ্যাঁ।

—অথচ প্লানে দেখছি বালিস্টা যেখানে আছে সেদিকে মাথা করে শুলে শুয়ে-শুয়েই অ্যালার্ম ঘড়িটার নাগাল পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করলেই খাম্বাজী হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামিয়ে দেবেন, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে?

—কারণ কারণ ঘুম ভাঙতে দেয় হয়।

—তা তো হয়ই। কিন্তু অ্যালার্ম ক্লকের শব্দে যার ঘুম ভাঙে, তার ন্যাচারাল রিস্পন্স অ্যাকশনই হয় হাত বাড়িয়ে ঘড়িটার শব্দ বন্ধ করা। তাই নয়?

—ওভাবে কিছুই প্রমাণ হয় না। অনেকে অ্যালার্ম ঘড়ি হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেবার পরও ঘুমিয়ে পড়ে।

—তা পড়ক। এখানে তো তা হয়নি। কারণ ঘড়িটার অ্যালার্ম দম সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে থামানো হয়নি।

—তাহলে ধরে নিতে হবে ‘অ্যালার্মের’ শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙেনি। হয়তো আরও আধঘণ্টা পরে তাঁর ঘুম ভাঙে। ধরুন ছ’টায়। তাই হবে, সেজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি করে—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাসু বলেন, ফায়ার-মেন্সে কাঠ সাজাতে বসে যান!

—আমি তা বলতে চাইনি।

—তবে কী বলতে চান? তাড়াতাড়ি করে সয়েলড চাদরটা কেটে ইঝি করতে লেগে যান?

সতীশ বর্মন বলে ওঠে, এ সবই অবাস্তব কথা! সব অবাস্তব।

—কেন অবাস্তব? কেন এতগুলো সূত্রকে আপনি অগ্রাহ্য করছেন?

সতীশ বর্মন কোনও প্রত্যুত্তর করে না।

বাসু বলেন, মিস্টার বর্মন, আপনি কি বুঝতে পারছেন, আপনার থিয়োরিটা ঠাঁড়াচ্ছে না! অসংখ্য অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে।

বর্মন রুখে ওঠে, তার মানে আপনি কি বিকল্প কোনও থিয়োরি শোনাতে চান?

—একজ্যোতিলি। এবং এমন একটা থিয়োরি আমি শোনাতে চাই যাতে কোনও অসঙ্গতি নেই। যা জিগস্ ধাঁধার মত ঝাজে-ঝাজে মিলে যাবে। শুনবেন?

—কী আপনার থিয়োরি?

—মহাদেও প্রসাদ খাম্বা খুন হয়েছেন পাঁচই বিকাল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

—পাঁচই? অসম্ভব! ছয় তারিখ সূর্যোদয়ের আগে ট্রাউট মাছ ধরা সম্পূর্ণ বে-আইনি ব্যাপার। লগ্-কেবিনের ঐ দেড় কে. জি. মাছের অস্তিত্বতেই প্রমাণিত হচ্ছে খাম্বাজী পাঁচ তারিখে খুন হননি!

বাসু বলেন, মিস্টার বর্মন, এবার আপনাকে একটা অতি শক্ত প্রশ্ন করি—এক্সপার্ট হিসাবে বলুন, মানুষ খুন করা কি আইন-সঙ্গত কাজ?

সতীশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জবাব দেওয়া বাহুল্য বোধে।

—সুতরাং মানুষ খুনের মত বে-আইনি কাজ যে লোকটা করতে যাচ্ছে সে কি দেড় কে. জি. মাছ আগের দিন ধরতে পারে না? কিম্বা বাজার থেকে কিনতে? আর তা যদি পারে, তাহলে আপনি কি দয়া করে করোনার এবং জুরি মহোদয়ের কাছে জানাবেন যে, আপনার বিশেষজ্ঞের মতামতের দাম দেড় কে. জি. ট্রাউট মাছের সমান? আপনার সমস্ত যুক্তিটাই ঝুলছে ঐ দেড় কে. জি. মাছের পলোটার সূতোয়?

বর্মন নিম্পলক নেত্রে শূন্য তাকিয়ে থাকে। জবাব দিতে পারে না। কী বেন ভাবছে সে।



বাসু বলে চলেন, ধীরভাবে চিন্তা করে দেখুন মিস্টার বর্মন—আপনি প্রথমেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, রমা দাসগুপ্তা ছয়ই সকাল এগারোটার সময় খাম্বাজীকে খুন করেছে। তাই এই সিদ্ধান্তের পরিপূরক তথ্যগুলিই আপনি বেছে নিয়েছেন—এ তথ্যের পরিপন্থী সূত্রগুলিকে পরিহার করে। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় বিচার করলে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন খাম্বাজী খুন হয়েছিলেন পাঁচ তারিখ বিকাল চারটায় এবং হত্যাকারী বুঝতে পেরেছিল এই নির্জন লগ-কেবিনে মৃতদেহ অবিকৃত হবে অন্তত চার-পাঁচদিন পরে। তাই ছয় তারিখ সকালের দিকে কোন বস্ত্র-আটুনি অ্যালেবাই তৈরী করে সে দেড় কে. জি. মাছও এই কেবিনে রেখে যায়। সে জানত, পুলিশ ধরে নেবে খুনটা হয়েছে ছয় তারিখ সকালে।

কেউ কোনও কথা বলছে না। আদালত কর্তৃক। সতীশ বর্মন মেসিনীনিবন্ধ দৃষ্টিতে কী ভাবছে। বাসু বলেই চলেন, এবং ডেবে দেখুন মিস্টার বর্মন, এই সিদ্ধান্তে আসতে হলে আপনাকে ছোটখাটো কোন অসঙ্গতিই অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে না। বিছানার চাদরের হিসাব মিলে যাচ্ছে, যেহেতু রাতে তিনি এই খাটে ঘুমাননি। অ্যালার্ম ঘড়িটা দম ফুরিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই কারণ লগ-কেবিনের একমাত্র বাসিন্দা পূর্বদিনই মরে পড়ে-আছেন মাটিতে। সিগারেটের খালি প্যাকেট কেবিনের ধারে কাছে নেই, কারণ মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে তিনি এসেছেন ও দুটি মাত্র সিগারেট খেয়েছেন। ফায়ার-প্রেসের কাঠগুলো তিনি সাজাননি, ওটা সাজানোই ছিল। কোট ও গরম প্যান্ট না পরা এবং সোয়েটার গা থেকে না খোলা সজ্জাপূর্ণ, কারণ আপনিই বলেছেন বিকাল চারটে থেকে সাড়ে চারটের সময় ঘরটার অবস্থা না-গরম না-ঠাণ্ডা। স্ট্রিকেস থেকে দাঁত মাজা বা দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বার করার কোনও প্রয়োজন হয়নি। আর হত্যাকারী এই পাখিটার প্রতি অতি-দরদী হয়ে উঠেছিল শুধু এজন্যেই যে মুন্না এই বোলটা পড়ে—যাতে হত্যাপরোধ রমা দেবীর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। আমি একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত, আমারও ধারণা খাম্বাজী এই কেবিনে পৌছান পাঁচই বিকাল সাড়ে তিনটায়। কোট প্যান্ট খুলে পায়জামা পরে নেন। একটু কফি বানিয়ে এবং দুটি ডিম ও ক্রটি সহযোগে বৈকালিক টিফিন সারেন। চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ দরজায় কেউ টোকা দেয়। খাম্বাজী দরজা খুলে আগভুক্তকে দেখেন—সে গুরু পরিচিত ও বিশ্বাসভাজন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি—লোকটা এসেছে তাঁকে খুন করতে। এবং তার পকেটে একটা লোডেড রিভলভার। কিছু লোকটা হঠাৎ দেখতে পায় টেবিলের উপর বা খাটের উপর পড়ে আছে মন-বাহাদুরের রিভলভারটা, যেটা খাম্বাজী আত্মরক্ষার্থে এনেছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। সম্ভবত পাখিটার এই অভূত বোলটা শুনই খাম্বাজী বুঝতে পারেন কেউ তাঁকে খুন করতে চায় এবং অপরাধটা রমা দেবীর কাঁধে চাপিয়ে দিতে চায়। কিছু এই আগভুক্তই যে সেই হত্যাকারী তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আগভুক্ত দ্রুতগতিতে মন-বাহাদুরের রিভলভারটা তুলে নেয় এবং দুটি ট্রিগারই একসঙ্গে টেনে দেয়। সে এটা আত্মহত্যার কেস বলে চালাতে চায়নি—সে হত্যাপরাধটা রমা দেবীর স্বন্ধেই চাপাতে চেয়েছিল। তাই ফিসার প্রিন্ট মুছে নিয়ে রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে দেয়। দেড় কে. জি. মাছ সে নিয়েই এসেছিল—সেটা রেখে দিয়ে, পাখিটার জন্যে এক মগ জল কিছু কিছু বিন্টু ছড়িয়ে দিয়ে সে চলে যায়—যাবার সময় ইয়েল-সকওয়াল দরজাটা টেনে দিয়ে। নাউ মিস্টার বর্মন, আপনি অপরাধবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত—সি. বি. আই.-য়ের এক্সপার্ট। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে একটা বিরুদ্ধ যুক্তি—একটিমাত্র স্বস্বাভিসম্মত অসঙ্গতি দেখাতে পারেন যা আমার এই থিয়োরির সাথে মিলছে না?

সতীশ বর্মন এর জবাবে যা বললে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। বললে, না! আমি বিশ্বাস করি না জগদীশ মাথুর এ কাজটা করেছে—কারণ রমা দাসগুপ্তাকে সে আদৌ তখন চিনত না।

বাসু বলেন, এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয় মিস্টার বর্মন! আমি জানতে চাই, আমার এই থিয়োরিটা কেন মানতে রাজী নন আপনি? কোথাও কোনও অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছেন?

—হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সতীশ। বলে, পাচ্ছি। প্রকাণ্ড বড় একটা অসঙ্গতি। পাঁচই বিকাল চারটের সময় খাম্বাজী হত হলে তিনি কেমন করে ঐদিন রাত আটটার সময় ফোন করলেন?

—কাকে?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—ওর একান্ত...জাস্ট এ মিনিট—তার মানে—

—এই তো! ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন আপনি! তার মানে মহাদেও প্রসাদ খান্না পাঁচই রাত আটটায় কোন টেলিফোন করেনি!

—বাই জোভ! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সতীশ বর্মন!

—একজাঙলি! এতক্ষণে আপনি প্রকৃত অপরাধবিজ্ঞানীর মত একটা কথা বলেছেন। খান্নাজীকে যে খুন করে সে লোকটার নাম...গঙ্গারাম যাদব!

শর্মাজীও উঠে দাঁড়িয়েছেন: মিস্টার যাদব! মিস্টার গঙ্গারাম যাদব!

দেখা গেল, যে চেয়ারখানাতে গঙ্গারাম যাদব এতক্ষণ বসেছিলেন সেটা শূন্যগর্ভ!

করোনার বললেন, আধঘণ্টার জন্য আদালতের কাজ স্থগিত রইল। মিস্টার যোগীন্দর সিং...কুইক!

কিছু কোথায় যোগীন্দর? সেও নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে সকলের অলক্ষ্যে! গঙ্গারাম অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে!

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, রমা, তোমার যত্নগার শেষ হয়েছে। আর কেউ এরপর তোমাকে বিরক্ত করবে না। এখন তুমি প্রাণভরে কঁাদতে পার।



বারো

ঘণ্টাখানেক পরের কথা! এস. ডি. ও. শর্মাজীর অফিসঘরে বসেছিলেন বাসু আর কৌশিক। শর্মাজীর জীপ গেছে পুলিশ হাজতে—রমা দেবীর রিলিজ-অর্ডার নিয়ে। একটু পরেই বন্দিনীকে মুক্ত করে জীপটা ফিরে আসবে। শর্মাজী বলেন, আপনি কী করে আশ্বাস করলেন এটা গঙ্গারামের কাজ? ওর তো কোনও মোটিভ ছিল না?

বাসু বলেন, কেসটার ঐটুকুই ছিল জটিলতা। কে খুন করেছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম অনেক আগেই, কিন্তু কেন খুন করেছে তা বুঝতে দেরি হল।

শর্মা বলেন, কে খুন করেছে সেটাই বা কেমন করে বুঝলেন?

—ভেবে দেখুন মৃত্যুর সময় যদি ছয় তারিখ সকাল হয়, যা ছিল আপনাদের থিয়োরি, তাতে অনেকগুলি অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। সুতরাং সিদ্ধান্তে এলাম, সময়টা পাঁচ তারিখ বিকাল। তার অনুসিদ্ধান্ত: রমা দাসগুপ্তা হত্যাকারী হতে পারে না। কারণ রমা ডেলিবারেট মার্ডারবার হতেই পারে না; উদ্বেজনার মুহূর্তে হত্যা করলে কেবিনে দেড় কে. জি. মাছ থাকতে পারে না! সুতরাং রমা বাদ গেল। সুরমা দেবীর কোনও মোটিভই নেই। তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছেন। মহাদেওকে হত্যা করার ইচ্ছে থাকলে কোনমতেই তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করার পরে 'হত্যা'টা করতেন না। জগদীশ ছয় তারিখ পর্যন্ত দিল্লিতে ছিল—ভাল প্রমাণ আছে। যেহেতু 'রমা' এবং 'সুরমা' দুজনের কেউ হত্যাকারী নয়, এবং ময়নাটা আসৌ লগ্-কেবিনে যায়নি, তখন ধরে নিতে হবে ঐ বোলটা মুরাকে কেউ 'টিউটার' করেছে, বা বারে বারে শুনিয়ে শিখিয়েছে। কে হতে পারে? এবার চিন্তা করে দেখুন, মহাদেও প্রথমে বলেছিলেন পাঁচই সেপ্টেম্বর এসে মুরাকে নিয়ে যাবেন। সুতরাং হত্যাকারী—যে ঐ বোলটা শিখিয়েছে, সে এমন একজন যার কাছে পাখিটা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল। কে সে? দুজন মাত্র হতে পারে: সুবয় এবং গঙ্গারাম। সুবয় না হওয়ারই সম্ভাবনা। তার প্রথম কারণ, সে নিজে থেকে আমাকে 'এনগেজ' করেছে; শ্রীনগর থেকে রুলকাতায় 'ট্রাক-কল' করে আমাকে নিযুক্ত করতে চেয়েছে। হয়তো একটু অবিনয় থেকে যাচ্ছে, তবে যুক্তির খাতিরে মেনে নিতেই হবে যে, আমার ব্যাক-আউন্ড জানার পর সে কিছুতেই আমাকে নিযুক্ত করত না—যদি সে নিজেই হত পিতৃহন্তা!

শর্মা বললেন, তাছাড়া তার কোন মোটিভও ছিল না। সে নিজেই যে উইলের ওয়ারিশ তা সে জানত না।

বাসু বললেন, না, আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। তার কোনও মোটিভ থাকা অসম্ভব হত না, যদি ঘটনাচক্রে সে জানতও পারত যে, মহাদেব তৃতীয়বার একটি মহিলার পাণিগ্রহণ করেছেন। সে যাই হোক, সম্ভবত ঘনীভূত হচ্ছে গঙ্গারামের উপর, যদিও তার 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য বুজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ, আপাতত ধরে নিন, গঙ্গারামের কিছু 'মোটিভ' আছে, সেক্ষেত্রে গঙ্গারাম কি এ কাজটা করতে পারে? তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবস্থাটা বিচার করে দেখা যাক:

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গঙ্গারাম জানত: এক: পাঁচই সকালে অমরনাথ তীর্থ থেকে ফিরে মহাদেও শ্রীনগরে আসবেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদে গঙ্গারামকে দিয়ে, পাখিটাকে নিয়ে লগ-কেবিনে ফিরে যাবেন। দুই: পরদিন ছয়ই ভোরের প্লেনে সুরমা ও জগদীশ শ্রীনগরে আসবেন এ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিতে। তিন: গঙ্গারাম যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদে পেয়েছেন এটা গোপন তথ্য। সুরম পর্বত জানবে না, জানেন শুধু মহাদেও। ঐ তিনটি সূত্র অবলম্বন করে গঙ্গারাম ধ্যান করল—পাঁচ তারিখ বিকালে সে দেখে কে. জি. মাছ নিয়ে তার মটোরবাইকে চেপে ঐ লগ-কেবিনে যাবে, মহাদেওকে খুন করে মাছটা সেখানে রেখে ফিরে আসবে এবং পরদিন ছয় তারিখ ভোরের প্লেনে দিল্লি চলে যাবে। এক্ষেত্রে ওর পরিকল্পনা-মত ঘটনা কোন খাতে বইত? সুরমা ও জগদীশ ছয়ই সকালে এ বাড়িতে বোজা নিয়ে সেখতেন—শ্রীনগরে মহাদেও বা গঙ্গারাম কেউই নেই। মহাদেও কত নম্বর লগ-কেবিনে আছেন তা সুরমই জানত না, সুরমা কিছুতেই সেটা বুজে পেতেন না। গঙ্গারাম আশা করেছিল, দশ-এগারো তারিখ নাগাদ হয়তো মৃতদেহ পড়ে উঠবে এবং অবিকৃত হবে। তারপর পুলিশ অবধারিতভাবে মৃত্যুর সময়টা ছয়ই সকাল দশটা বা এগারোটা বলে ধরে নেবে। গঙ্গারামের অ্যালবাই আছে—সে ছয় তারিখ ভোরের প্লেন ধরেছে এবং তার কোনও 'মোটিভ' নেই। অথচ সুরমা সৈবীর অ্যালবাই থাকবে কিনা সে জানে না। যদি না থাকে, পাখির ঐ বোলটা মারাত্মকভাবে তাঁকে চিহ্নিত করবে। ঠগের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কী ছিল তা অনেকেই জানত।

শর্মাজী বললেন, মাপ করবেন মিস্টার বাসু, আমি কিছু কিছুই বুঝতে পারছি না। গঙ্গারামের 'মোটিভ'টা কি? সে তো জানতই না উইলে মহাদেও তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন? কী লাভ হচ্ছে তার এই হত্যাকাণ্ডে?

—ঐ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা।

—তা কেমন করে সম্ভব? সেটা তো দিল্লি ব্রাঞ্চ শ্রীনগর ব্রাঞ্চের উপর অ্যাকাউন্ট-পেয়ী ব্যাল-ড্রাফট দিয়েছে।

বাসু হেসে বললেন, শর্মাজী, কোরোডেটিক ইন্কোয়েশনটার দুটো রুট ছিল—'এক' আর 'ওয়াই'; অর্থাৎ 'কে' আর 'কেন' করোনার আদালতে আপনি লক্ষ্য করেছেন—'কে' এই প্রশ্নটা সমাধান করতে আমি দেখিয়েছিলাম 'সময়টা' নির্ধারণ করার অনেক অসঙ্গতি ছিল। ঠিক তেমনি, 'কেন' এই প্রশ্নটার সমাধানও এক বাস্তব অসঙ্গতির জট ছাড়াই হতে আপনার কাছে। প্রথম কথা: উনি যখন অমরনাথ তীর্থে যান, তখন নিশ্চয়ই কয়েক হাজার টাকা মজায় বেধে নিয়ে যাননি, যেহেতু সেখানে সে টাকা ইচ্ছা থাকলেও খরচ করা যায় না। সুতরাং অমরনাথ থেকে যখন শ্রীনগরে ফিরে আসেন, আই মীন দোশরা সেপ্টেম্বর সকালে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে বেশি টাকা ছিল না, বড়জোর দু'একশ টাকা, কেমন?

—সেটাই সম্ভব। কেন?

—দেখছি দোশরা তিনি তাঁর ব্যাল অ্যাকাউন্ট থেকেও ঐদিন টাকা তোলেননি। অথচ লগ-কেবিনে যখন তিনি মারা গেলেন তখন তাঁর কাছে 5,700 টাকা একশ টাকার নোট রয়েছে। এ টাকা কোথা থেকে এল?

## কাটার-কাটার-২

শর্মা বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি লকার থেকে নগদ টাকা নিয়ে যান!

—একজ্যাস্টিলি। তাহলে দোশরা ঠুর ডস্টে ছিল 5,700+43,800 একুনে 49,500 টাকা; নয়? এবং তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও আছে আট হাজারের উপর। সে-ক্ষেত্রে তিনি কেন তাঁর একান্ত সচিবকে স্নেনের ভাড়া দিয়ে দিল্লি পাঠাবেন? তাঁর কাছেই তো রয়েছে নগদে সাতান্ন হাজার টাকা?

—কিন্তু তিনি তো তা সন্তোষে গঙ্গারামকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন, দ্বিতীয়ত ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার মিস্টার সোম্বী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন যে, মহাদেও যখন ডস্টে গেলেন তখন তাঁর হাতে ছিল ফোলিও ব্যাগ, যার ভিতরে ছিল ঐ ফিফ্‌ড-ডিপসিটগুলো! তাই নয়? এখন বলুন, উনি তখন ব্যাগ হাতে লকার খুলতে গেলেন কেন?

—আমি তো ভেবেছিলাম ঐ ছয়-সাত হাজার টাকা লকার থেকে বার করে আনতে!

—হয় নয়, ছায়ায় হাজার। ঐ লকারে তখন ছিল একশ টাকার নোটের ঠিক এক লাখ টাকা। ব্র্যাক মানি। যার সন্ধান সুরযও জানে না, জানেন গঙ্গারাম। একটু অঙ্ক কষে দেখুন, মানে বাম্বাজীর ডেবিট ক্রেডিট:

অমরনাম তীর্থে থেকে ফেরার পথে ঠুর কাছে	
নগদে ছিল, আপনার আঙ্গাজমত	... 200
মৃত্যুর পরে তাঁর মানিব্যাগে ছিল	... 300
ঐ স্টকেসে ছিল	... 5,400
নগদে একটি ময়না কেনা বাবদ	... 200
গঙ্গারামকে হাতখরচ দেন (গঙ্গারামের কথামত)	1,000
দোশরা থেকে পাঁচই ঠুর হাতখরচ আঙ্গাজ	... 100
	7,200
লকারে পরে নগদে পাওয়া গেছে	... 43,800

51,000

হিসাবটা ঠিক মিলছে না, নয়? ব্র্যাকমানি লোকে নগদে লুকিয়ে রাখে, দশ-হাজারের গুণিতকে। সুতরাং ঐ ডেবিট-ক্রেডিটে হাজার টাকার গরমিল হচ্ছে। কেন? হাজার টাকার একটাই 'এন্ট্রি' আছে। সেটাই ভুল। অর্থাৎ মহাদেও, তাঁর প্রাইভেট-সেক্রেটারীকে নগদ হাজার টাকা দেননি। সে গ্যাটের পরস্যা খরচ করে দিল্লি গেছে তার অ্যালেবাই-র খাতিরে। ঐই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরও অনেকগুলি যুক্তি রয়েছে যে। গঙ্গারামের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী—দোশরা তারিখে মহাদেও তাকে বলেছিলেন ক্যান সার্টিফিকেটগুলি বাড়িতে রাখতে। কারণ তিনি অন্য কোন সূত্র থেকে 50,000 টাকা যোগাড় করবেন। দেহাৎ না পেলে তিনি টেলিফোনে নির্দেশ দেবেন যাতে গঙ্গারাম দিল্লি গিয়ে ড্রাক্টটা নিয়ে আসে। সে-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কি মহাদেও দোশরা দুপুরের বাসে টাউন্ট-শ্যারাদাইসে চলে যেতে পারেন? সেখানে টাউন্ট মাছই শুধু পাওয়া যায়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার লোন পাওয়া যায় না। শর্মাজী বলেন, তা ঠিক।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ঐ লকারে নগদ এক লাখ টাকা ব্র্যাকমানি ছিল। যে-কথা সুরয জানত না, কিন্তু গঙ্গারাম জানত। এবং এটাও সে জানত যে, মহাদেও 'অ্যালিমনি'র টাকা যেটাবেন ব্র্যাক-মানিতে। কারণ সুরমা নগদই চেয়েছেন, ঐ দু-নশ্বর খাতার অতগুলি টাকার সচিবহার নিশ্চয়ই করবেন মহাদেও। সেটা জানা ছিল বলেই গঙ্গারাম ঐ পরিকল্পনা করে। গঙ্গারাম জানত—মহাদেও অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি বেঁচে থাকলে প্রতিশোধ নিতেনই। সোজা পথে না হলে বাঁকা পথে। এজন্য টাকাটা হজম করতে হলে মহাদেওকে হত্যা করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। মহাদেও আত্মহত্যা করেছেন এটা প্রমাণ করা

## উল্লের কাঁটা

শত। পুলিশ সহজে সেটা বিশ্বাস করত না। হেতুর অভাবে। তার চেয়ে অনেক সহজ: অপরাধটা সুরমার কাছে চাপানো। কারণ 'রমা' দেবীর কথা সে জানত না।

যে-হেতু একমাত্র গঙ্গারামই হত্যাকারী হতে পারে, তাই আমি ধরে নিলাম হয় তো দোশরা সেন্টেম্বর ওর লকারে ছিল নগদে এক লাখ টাকা। তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায়:

মৃত্যুর পরে লগ্-কেবিনে পাওয়া গেছে (মানিবাগ ও সুটকেসে)	... 5,700
একটি ময়না কেনার খরচ	... 200
দোশরা থেকে পাঁচই ওর হাতখরচ (একশ নয়, কিছু বেশি)	... 300
গঙ্গারামকে 'অ্যালিমনি' মেটাতে দেওয়া	50,000
লকারে নগদে পাওয়া গেছে	... 43,800

1,00,000

আমার এই হাইপথেসিসটা ঠিক কিনা যাচাই করতে আমি একটা ফাঁদ পাভলাম—গঙ্গারামের উপস্থিতিতে সুরমাকে জানালাম, সুরমা দেবীর একটা বস্ত্র-বীথুনি 'অ্যালেবাই' আছে। এক-কথা বলার আগেই আমি কিছু মুদ্রাকে রমার বাড়ি থেকে সরিয়ে দ্বিতীয় পাখিটকে ওখানে রেখে এসেছি। আর ঐলসে কায়দা করে জানিয়ে দিলাম, মুদ্রা আছে রমার বাড়িতে, পহেলগাওয়ায়, মেথডিস্ট চার্চের পিছনে দ্বিতীয় বারান্দায়, অরক্ষিত অবস্থায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হত্যাকারী প্রাণধান করেছে—সে সুরমাই হোক, অথবা গঙ্গারামই হোক, মুদ্রার ঐ বোলটা এখন পুলিশের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে। যেহেতু 'রমা' বা 'সুরমা' হত্যাকারী নয়, তখন স্বভাবতই পুলিশ ভাবতে শুরু করবে যে, মুদ্রাকে সে ঐ বোলটা টিউটার করিয়েছে, শিখিয়েছে। আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, খবরটা শোনার পরেই প্রকৃত হত্যাকারী এই সুযোগে নেবে, আমার ফাঁদে পা দেবে—অর্থাৎ মুদ্রাকে হত্যা করতে ছুটবে। ওরা আমাদের হাউসবোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যা ছটায়। তার ঘন্টাকানেক পরে টেলিফোন করে দেখলাম সুরম বাড়িতে আছে, কিন্তু গঙ্গারাম কোথায় বুঝি 'নেশ' নিমন্ত্রণ রাখতে গেছে। তার ফিরে আসতে রাত প্রায় এগারোটো হল। গঙ্গারাম বাস-এ যায়নি, নিজস্ব মোটরবাইকে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তেই হত্যাকারী চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। হত্যাকারী চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হওয়ার মানেই হচ্ছে তার মোটিভ রূপে আমি যা অনুমান করেছি তা সত্য। মুশকিল হচ্ছে এই যে, মোটিভটা আমি প্রমাণ করতে পারতাম না কোনদিনই। যেহেতু ব্ল্যাকমানির হিসাব থাকে না। তাই আমি আপনাদের জানাতে পারিনি আমার সিদ্ধান্তটা। ভেবে দেখলাম, ওর অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে হলে কিছু দাটকীয়তার আশ্রয় আমাকে নিতে হবে। এজন্য সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে তিলতিল করে সমাধানটা দাখিল করতে থাকি: আমি জানতাম, যে-মুহূর্তে মৃত্যুর সময়টা ছয় তারিখ সকাল থেকে পাঁচ তারিখ বিকালে আমি সরিয়ে নিয়ে যাব, সেই মুহূর্তে গঙ্গারাম নার্সাস হয়ে পড়বে। আর তারপর যখন তিলতিল করে হত্যাকারীর পরিচয়টা স্পষ্ট করতে থাকব তখন আতঙ্কের তাড়নায় গঙ্গারাম পালাবার চেষ্টা করবে। আর তাতেই তার হত্যাপরোধটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঘটনাও ঠিক সেই খাতে বইল।

শর্মাজী বলেন, গঙ্গারাম ধরা পড়বেই। আজকালের মধ্যেই। কিন্তু অপরাধটা আমরা প্রমাণ করব কী করে? কোন প্রমাণ তো নেই।

বাসু বললেন, সম্ভবত আছে। গঙ্গারামের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সে মহাদেও প্রসাদের টেলিফোন পায় পাঁচ তারিখ রাত আটটায় এবং পরদিন সে সকালের ফ্লাইটে গিমি চলে যায়। দেখুন এজন্য সে বলেছে লগ্-কেবিনের টেলিফোনটা ডেড হয়ে গিয়েছিল। কারণ সে জানত, লগ্-কেবিন থেকে যা টেলিফোন করা হয় তার লিস্ট থাকে; তার বিল বোর্ডারকে মেটাতে হয়। কিন্তু এই সিজনটাইমে অত অল্প সময়ে মেনে সীট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া তার নিজস্ব 'অ্যালিবাইট'টা পাকা করতে সে নিশ্চয় অনেক আগেই সীটটা বুক করেছিল। সে অনেক আগে থেকেই ঐ পরিকল্পনা করেছিল। একটু খোঁজ নিলেই

## কাঁটার-কাঁটার-২

আপনি জানতে পারবেন ঐ টিকিটা কবে বিক্রি হয়। সেটাই চূড়ান্ত প্রমাণ। মহাদেও যদি ব্র্যাকমানির বদলে হোয়াইট মানিতে 'আলিমনি'র টাকাটা মেটাতেন তাহলে তিনি আদৌ হত হতেন না! কালো টাকাই তাঁকে মেরেছে!

শর্মাজী বলেন, মুন্সার ব্যাপারটা কিন্তু এখনও ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে। ওটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন?

বাসু বলেন, সত্যি কথা বলতে কি ওটা আমার নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়নি। দোশরা তারিখে মুন্সাকে নিয়ে মহাদেও যখন আড়াইটার বাসে শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও আসেন, তখন বাসের মধ্যেই নিশ্চয় মুন্সা ঐ বোলাটা দু-একবার পড়ে। মহাদেও অবাক হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান; দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন। উনি বুঝতে পারেন, কেউ তাঁকে হত্যা করতে চায়, এবং হত্যাপর্যন্ত হয় রমা, নয় সুরমার কাঁধে চাপাতে চাইছে। তাই পহেলগাঁওয়ে পৌঁছেই তিনি পাখিটাকে রমাকে রাখতে দিলেন। তিনি রমাকে তার পরেই বলেছিলেন, তাঁর একটা অস্ত্রের প্রয়োজন, আশ্রয়কর্মে। তাই রমা তাঁকে ঐ রিভলভারটা দেয়। এ পর্যন্ত বোকা যাচ্ছে। কিন্তু তারপর মহাদেও যে কেমন করে ময়নাটা বদলে ফেললেন, এটুকুই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

শর্মা বলেন, কেন? আমার ধরে নিতে পারি, তেশরা কিম্বা চৌঠা আবার শ্রীনগর আসেন এবং দ্বিতীয় ময়নাটা খরিদ করে তাঁর লগ-কেবিনে ফিরে গেছেন।

—উহু! মহাদেও ওটা খরিদ করেছেন দোশরা সেন্টেশ্বর দুপুরে। জুয়াবারে। শ্রীনগরেই। সেন্ট্রাল মার্কেটে, ইয়াকুব-মিঞার দোকান থেকে। লোকটা হিসাবের পাক-খাতা দেখে বলেছে। মহাদেওয়ের ফটো দেখে সনাক্ত করেছে।

এই সময়েই যোগীন্দর সিং দ্বারের কাছ থেকে বলে, মে আই কাম ইন স্যার?

—আইয়ে, আইয়ে, ক্যা বাং?

যোগীন্দর এসে বলে, গঙ্গারাম ধরা পড়েছে। শ্রীনগরে পৌছবার আগেই।

শর্মাজী বলেন, কনগ্রাচুলেশনস!

যোগীন্দর বলে, কৃতিত্বটা আমার নয় স্যার, ঠুর!—বাসু-সাহেবকে দেখায়।

—ঠুর তো বটেই। উনিই তো আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

—আজ্ঞে না, স্যার, করোনারের আদালতে ঢুকবার আগেই উনি আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, মিস্টার সিং—হত্যাকারী কে আমি তা জানি, নামটা আপনাকে এখনই বলতে পারছি না, তবে সে আদালতে আছে এবং যে মুহূর্তে আমি তাকে চিহ্নিত করব, তখনই সে পালাতে চেষ্টা করবে। আপনি সজাগ থাকবেন। গ্রেনড্রেস পুলিশ দিয়ে আদালত ঘিরে রাখবেন।

শর্মাজী বাসুকে বলেন, কী আশ্চর্য! শূণ্য আমাকেই বলেননি?

বাসুর কর্ণকুহরে সে-কথা প্রবেশ করল না। উনি তখনও কী যেন ভাবছেন। চোখ দুটি বোজা, পাঁচটা ধরা আছে বা হাতে। ডান হাতে গায়ত্রী জপ করার ভঙ্গিতে উণ্টো করে এক দুই তিন গুনছেন। একটু পরেই একটা জীপ এসে থামল। দ্বারপথে রমার মূর্তিটা আবির্ভূত হতে শর্মা বলেন, কাম ইন প্রীজ—কনগ্রাচুলেশনস!

রমা উদ্বেগিত হয়ে বাসুকে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাসু বলেন, জাস্ট এ মিনিট! রমা, সেই দোশরা সেন্টেশ্বরের কথা তোমার ঠিক ঠিক মনে আছে?

রমা তখনও আসন গ্রহণ করেনি। বলে, কোন কথা?

দোশরা সেন্টেশ্বর বেলা আড়াইটার বাসে মহাদেও শ্রীনগর থেকে রওনা দেন। তার মানে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিনি পহেলগাঁও বাস স্ট্যান্ডে পৌছান। বাস স্ট্যান্ড থেকে তোমার বাড়ি ইটাপথে দশ-বারো মিনিট, তার মানে...

বাধা নিয়ে রমা বলেন, না, বাস স্ট্যান্ডেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আর আড়াইটায় নয়, উনি দেড়টার বাসে শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও আসেন।

বাসু বলেন, অসম্ভব! দেড়টার বাসে তিনি আসতেই পারেন না। কারণ ঠিক বেলা দুটোয় তিনি ছিলেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ান ম্যানজারের ঘরে। উনি আড়াইটার বাসে গিয়েছিলেন।

রমা বললে, না, আপনি ভুল করছেন। উনি দেড়টার বাসেই এসেছিলেন। কারণ দেড়টার বাসটা পহেলগাঁওয়ে পৌঁছায় চারটে চল্লিশে। আমার ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। তাই চারটে চল্লিশের বাসটাকে স্ট্যান্ডে ঢুকতে দেখি। আর আড়াইটার বাস পহেলগাঁওয়ে পৌঁছায় পাঁচটা চল্লিশে—তার অনেক আগে আমি বাড়ি চলে যাই।

বাসু অনেকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বলেন, তুমি ভুল করছ রমা। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার সোফী আমাকে বলেছিল, মিস্টার খান্না দ্বিতীয়বার যখন ব্যাঙ্কে ফিরে আসেন তখন ব্যাঙ্কের আওয়ার্স শেষ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ দুটো বেজে গিয়েছিল। তুমিই কিছু গণগোল করছ—

রমা রাগ করে না। বলে, না, ভুল করলে করেছে এ সোফীই। আমার পরিষ্কার মনে আছে—উনি যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন দেড়টার বাসে ফিরবেন। তাই অফিস যাওয়ার সময়েই আমি বাস-স্ট্যান্ডে টাইম-কীপারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দেড়টার বাসটা কখন পৌঁছায়। সে বলেছিল বিকাল চারটে চল্লিশ। তাই অফিস ছুটি হতেই আমি তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যান্ডে চলে যাই। তখন দেড়টার বাসটা 'ইন' করছে। বাসটা রাইট-টাইম ছিল।

বাসু বলেন, তুমি তাহলে ঠকে বাস থেকে নামতে দেখেছ?

—হ্যাঁ। কেন?

—তখন ঠর কাছে কটা ময়না ছিল?

—একটাই। এ মুন্সাই। কেন?

বাসু বলেন, ষ্ট্রেঞ্জ!

—ষ্ট্রেঞ্জ মানে?

—জিগ্‌স্‌ ধাঁধার আবার একটা মিসিং পীস।

এরপর যোগীন্দর, শর্মাজী, কৌশিক, সূজাতা এবং রমা নানা কথা আলোচনা করতে থাকেন। বাসু-সাহেবের কর্ণকুহরে কোনও কথাই যাচ্ছিল না। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্নচৈতন্য। হঠাৎ একটা কথায় তাঁর ধ্যানমগ্নতা ভেঙে গেল। শর্মাজী বলছেন, সত্যিই মহাদেওপ্রসাদ খান্নাজী ছিলেন একজন দিলদরাজ মানুষ! কখনও কারও প্রতি কোনও অন্যায় করেননি।

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি তখন থেকে কী ভাবছেন, বলুন তো?

—এ কথাই ভাবছিলাম। আমিও কি একই জাতের ভুল করছি? বর্মণ যা করেছিল? অর্থাৎ একটা পূর্ব-সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে এডিভেলগুলোকে ইন্টারপ্রেট করছি—যে সূত্রগুলো আমার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী সেগুলো অগ্রাহ্য করছি?

শর্মাজী বলেন, আপনি তো চূড়ান্ত সমাধান করেই ফেলেছেন। এখন আবার...

—না, না। কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছেই। না হলে আমার সলিউশান জিগ্‌স্‌ ধাঁধার মতো খাঁজে খাঁজে মিলে যাচ্ছে না কেন?

—একটাই তো অসঙ্গতি আছে। তাই নয়? দ্বিতীয় পাখিটা কী করে এল?

—না, শুধু একটাই নয়! আরও আছে। দেড়টার বাস না আড়াইটার বাস? তাহাড়া ঐ উইলটা!

—উইলে কী অসঙ্গতি?

—দেখছেন না, আপনি এখনই বলছিলেন, মহাদেওপ্রসাদ কখনও কারও কাছে কোনও অন্যায় করেননি। কিন্তু রমাসেখীর প্রতি তাঁর আচরণটা দেখেছেন? উইলটা অত্যন্ত নিপুণভাবে বানানো। তিনি

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

একথাও লিখেছেন, বিবাহ বিচ্ছেদ আইনত সিদ্ধ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হলে মিসেস সুবমা খান্না ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্রই পাবেন। উনি ঠুঁর প্রত্যেকটি কর্মীকে কিছু না কিছু দিয়ে গেছেন। এমন একজন বিচক্ষণ মানুষ উইলে রমার কোনও উল্লেখই করবেন না?

ঐ সময় ট্রেড করে শর্মাজীৱ বেয়ারা চা-বিস্কুট নিয়ে এল। সকলকে বিতরণ করল। শর্মাজী বলেন, হয়তো রমা দেবীকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি উইলটা করেন।

—তা তো করেনই! কিন্তু বিবাহের পরে কেন তিনি ওটা নতুন করে লিখলেন না? তিনি তো দোশরা শ্রীনগরে এসে লকারটা খুলেছিলেন! এবং তখন তিনি জানতেন, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে? না, মিস্টার শর্মা। কোথাও প্রকাণ্ড একটা ফ্যালাসি আছে! লোকটার পকেটে স্বহস্ত-লিখিত মিসেস রমা খান্নার স্বীকৃতি আছে, অথচ উইলে তার উল্লেখ নেই?

কৌশিক বলে, আপনার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মামু।

বাসু-সাহেবের ঝুশ হল না। আবার আলোচনা এগিয়ে চলে।

কোথাও কিছু নেই, শর্মাজীৱ গ্লাস-টপ টেবিলে একটা মুষ্টিাঘাত করে বসলেন বাসু। ঝনঝন করে উঠল চায়ের কাপগুলো।

শর্মাজী অবাক হয়ে বলেন, কী হল?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন উত্তেজনাৱ। বলেন, রমা তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডে। নয়? আমার দেখা না পেলে তুমি যেন কোথায় যেতে?

রমা বলে, সে-কথা এখন কেন? আপনি এ-প্রশ্ন সেদিনই করেছিলেন, আমি বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে আমি সেই ঘরটাতে যেতাম যেখানে...

—কারেই! ঘরটা তুমি খুঁজে বার করতে পারবে?

—কেন পারব না?

—দেন গেট আপ! ও বাকি চা-টুকু তোমার না খেলেও চলবে। চল ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দেবে চল।

—এখনই! কেন?

—ডোন্ট আর্গু! জিগস্ ধাঁধার একটা ছোট্ট টুকরো ঐ ঘরে পড়ে আছে। দেখি সেটা কুড়িয়ে পাই কিনা!

রমার বাহুমূল চেপে ধরে তিনি নির্গমন-স্বারের দিকে এগিয়ে চলেন। কৌশিক পিছন থেকে বলে, আমরা? আমরা কী করব?

—যু শাট আপ! চা খাও বসে বসে!

রমার বাহুমূল যেমন ধরা আছে তেমনি ভাবেই বন্দিনীকে নিয়ে এসে উঠলেন সেই সিনেমন-রঙের অ্যাধাসাডারে। বললেন, ড্রাইভারকে বল, কোন দিকে যেতে হবে।

মিনিট পনের পরে গাড়িটা এসে থামল সেন্ট্রাল মার্কেটের পিছনে একট বিজি অঞ্চলে। সারি সারি লরি, ট্রেলার, মালপত্রের গুদাম। রমা বলল, আর গাড়ি যাবে না। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে।

—অল রাইট! চল, হেঁটেই যাব।

সরু গলিপথ দিয়ে দুজনে এসে থামলেন একটা দোতলা বাড়ির সামনে। এতক্ষণে অন্ধকার হয়েছে। রাস্তায় মাতালের বোলা চোখের মত বাতি। সবটাই আলো-আধারি। বাড়িটার নিচে গুদামঘর। লরি থেকে মালখালাস হচ্ছে। পাশ দিয়ে একটা নড়বড়ে সিড়ি উঠে গেছে কাঠের বাড়িটায়। রমা আঙুল তুলে বললে, ঐ ঘরটা!

বাসু বললেন, ঘরের দরজাটা বন্ধ কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে। কে থাকতে পারে ঘরটার ভিতর? রমা বললে, আমি কী জানি?



—লেটস্ ইন্ডেস্টিগেট! চল আমরা তদন্ত করে দেখি। এস।  
কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উঠে এলেন দ্বিতলে। বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়ালেন বাসু-সাহেব। ঝাঁ-হাতে তখনও ধরা আছে রমার বাহুমূল। কড়া নাড়লেন দরজায়।  
ভিতর থেকে অর্গলমোচনের শব্দ হল। দ্বার খুলে একজন শ্রৌঢ় ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলেন, কাকে চাই?

যেন লিভিংস্টোন সন্ধান করছেন স্ট্যানলিকে।

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, মিস্টার যশোদা কাপুর, আই প্রিজন্ম?

পাশ থেকে রমা একটা চাপা আর্দনাদ করে উঠল: ও...ও কে?

ভদ্রলোক বাসু-সাহেবের প্রসারিত করটা গ্রহণ করলেন না। রমার পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলে বললেন, কী হয়েছে রমা? তুমি অমন করছ কেন?

—তুমি!

—হ্যাঁ, আমিই। তুমি কি ভৃত দেখছ?

রমা বোধ হয় ঋণমুহুর্তের জন্য ভুলে গেল বাসু-সাহেবের উপস্থিতি। সবলে জড়িয়ে ধরল ঐ শ্রৌঢ় ভদ্রলোককে।

বাসু বলেন, একটা কথা! আপনি কি জানেন, মিস্টার মহাদেও প্রসাদ খান্না মারা গেছেন?

—চমকে উঠল লোকটা: মারা গেছেন! মানে! কবে? কী করে?

—সেটা আপনার জ্বর কাছে শুনবেন। গুড নাইট!



ভেরো

অরও ঘটানুয়েক পরের কথা।

হাউসবোটের ড্রাইংরুমে সমবেত হয়েছেন সবাই। বাসু-সাহেব রানী দেবীকে সর্বশেষ ঘটনার চুখকসার শোনালেন। সুজাতা কফির পটে কফিটা তৈরী হয়েছে কিনা দেখছে। কৌশিক এবং সূর্য ঘরের অপর প্রান্তে নিম্নস্বরে কথোপকথনে ব্যস্ত।

দ্বারের কাছে ধ্বনিত হল: আসতে পারি?

সবাই চোখ তুলে তাকায়—যশোদা কাপুর এবং রমা দাসগুপ্তা।

বাসু-সাহেব এগিয়ে এসে আগবুকের করগ্রহণ করে বলেন, আইয়ে আইয়ে খান্নাজী।

সূর্য উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। নত হয়ে প্রণাম করতে যায়। তার আগেই শ্রীভদ্র প্রসাদ খান্না ওকে সবলে বুকে টেনে নেন।

রমা এগিয়ে এসে রানী দেবীকে প্রণাম করে। বলে, কী যে বলব আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি... আমি...

রানীও ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, কিছুই বলতে হবে না রমা। তোমার বুকের মধ্যে এখন কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি।

সবাই স্থির হয়ে বসার পর বাসু সূর্যকে প্রশ্ন করেন, তোমার কাকাকে দেখতে কি ঠিক বাবার মতো?

সূর্য বললে, না। বাবা বেশ বড়িয়ে গেছিলেন। তবে বছর সাত-আট আগে তাকে দেখতে ঠিক এই রকমই ছিল। খবরের কাগজ থেকে যখন ছবি চেয়ে পাঠায়, আমি বাবার একটা পুরানো ফটোগ্রাফই দিয়েছিলাম। তাতেই চাচীজীর ভুল হয়েছে।

## কাটার-কাটার-২

শ্রীতম প্রসাদজী বলেন, আমি খবরের কাগজ পড়া বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তাই এত বড় খবরটা জানি না। অবশ্যই আমি মাত্র কালকেই শ্রীনগরে ফিরে এসেছি। তার আগের দিন দশকে এমন পাহাড়ী অঞ্চলে ছিলাম যেখানে খবরের কাগজ যায় না।

বাসু বলেন, যদি কিছু না মনে করেন, আপনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কেন?

শ্রীতমজী হেসে বলেন, দেখুন, আমি একজন পাগলাটে মানুষ। ভবঘুরে। পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াই। হয়তো ময়লা বা হেঁড়া জুতো-জামা পরি। অথচ মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমার চেহারা সঙ্গে দাদার চেহারা খুবই সাদৃশ্য। দাদা একজন খানদানী নামী ব্যক্তি। নিজের উপাধি খান্না বললেই লোকে প্রশ্ন করত, ‘মহাদেওপ্রসাদ খান্নাজী আপনার কেউ হন?’ জবাবে সত্য কথা বললেই নানান প্রশ্ন উঠে পড়ে। দাদা কেন তাঁর মায়ের পেটের ভাইকে দেখেন না, লক্ষপতির ভাই কেন ভবঘুরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই নিজের নামটাকেই বদলে নিয়েছিলাম।

বাসু বলেন, আমার আরো দুয়েকটি প্রশ্ন আছে। জিজ্ঞাসা করব?

—নিশ্চয়ই করবেন। রমার কাছে শুনছি, আপনি ওকে ফাঁসির দড়ি থেকে ঝাটিয়েছেন। আমি... আমি কী দিতে পারি আপনাকে? বড় জোর আপনার একখানা পোট্টো... কিছু...

—সে সব কথা পরে হবে। আপনি বলুন, দাদার সঙ্গে কি সম্প্রতি দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, হয়েছে। দাদা এবছর অমরনাথ তীর্থে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে পহেলগাঁওয়ে তাঁর দেখা পাই। পহেলগাঁও পোস্ট-অফিসে। অনেক পুরানো দিনের গল্প হল। তারিখটা আমার মনে আছে—ঠিক আমার বিয়ের পরদিন। আঠাশে অগস্ট। আমি দাদাকে বললাম—বিয়ে করেছি। দাদা শূনে খুব খুশী। বলেন, রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছি। ভালো কথা। শ্রীনগরে হিন্দুমতে আবার আমি তোদের বিয়ে দেব। আমি ওকে রমার বাসায় নিয়ে যেতে চাইলাম। উনি রাজী হলেন না, বললেন, ভাইয়ের বৌ কি কেউ খালি হাতে দেখে? তবে তখনই একটা কাগজে রমার নাম-ঠিকানা নিয়ে পকেটে রাখলেন। আমরা দুই ভাই একটা রেস্তোরাঁয় চুকে কিছু খেলাম। দাদা বললেন, শ্রীতম, এবার আমিও বোধহয় মুক্তি পাইছি। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন...

একটু ইতস্তত করে বললেন, না?! সব কথাই বলব। আপনারা জানান কি না জানি না, দাদার এবারকার বিবাহ সুখের হয়নি। উনি আমাকে বললেন, এতদিনে উনি ভাইভোর্স পাচ্ছেন। কথাপ্রসঙ্গে আরও বললেন, ট্রাউট-প্যারাডাইসের সেই লগ্-কেবিনটা তোর মনে আছে? ওটা এবারও আমি ভাড়া নিয়েছি। ওখানে পাঁচই আমি আসব। আমি তখন ঠুর কাছ থেকে লগ্-কেবিনের চাবিটা চেয়ে নিলাম। বললাম, তুমি তো শ্যচ তারিখে আসবে, তার আগে ওখানে আমি দুদিন থাকতে চাই। সঙ্গীক। উনি খুশী হয়ে চাবিটা আমাকে দিয়ে দিলেন। দিন দুয়েক আমি আর রমা সেখানে ছিলাম। পয়লা সেপ্টেম্বর আমরা পহেলগাঁওয়ে ফিরে এলাম। পরদিন ভোরের বাসে আমি আর দাদা শ্রীনগরে আসি। দাদা বলেছিলেন, ব্যাক্তে ঠুর কী একটা কাজ আছে, সেটা সেয়ে সেড়টার বাসে পহেলগাঁও ফিরবেন। আমি তাঁকে বললাম—আমিও ঐ বাসেই ফিরব। শ্রীনগরে পৌঁছে উনি সুরযের ওখানে গেলেন, আমি আমার ডেরায় চলে এলাম। ঐ ঘরটা মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় আমি রেখেছি আজ বছরদশেক। বেলা একটা নাগাদ বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে আবার দাদার দেখা পেলাম। ঠুর সঙ্গে একটা পাহাড়ী ময়না ছিল। সেটা আমিই ওঁকে দিয়েছিলাম। দাদা বলেন, এটাকে চিনতে পারিস? চিনতে আমার অসুবিধা হল না। তার ডান পায়ে একটা আঙুল কাটা ছিল। দাদা তখন বলেন, শ্রীতম, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। ও একটা নোতুন বোল পড়ছে! ভারী অদ্ভুত। একটু পরেই পাখিটা ‘বোলটা’ পড়ল। শূনে আমি দাবড়ে গেলাম। বললাম, দাদা, এ বোল ও কেমন করে শিখল? এর মানে কী?

আমার দাদা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। রাজনীতি করে চুল পাকিয়েছেন। বললেন, ঠুর বিশ্বাস কেউ ওঁকে হত্যা করতে চায় এবং হত্যাপরামর্শটা ডাবিজীর ঘাড়ে চাপাতে চায়। আমি অবাক হয়ে

বলি—এমনভাবে কে ওঁকে হত্যা করতে পারে? উনি জবাবে বললেন, উনি এককালে সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। তখন অনেক লোকের কাছে অপ্রিয় হয়েছেন। অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনও কোনও লোকের বিরুদ্ধে কমিশন বসিয়েছেন। তাদেরই মধ্যে কেউ হয়তো এতদিন পর প্রতিশোধ নিতে চায়।

এই পর্যন্ত বলে প্রীতমজী থামলেন। নিজের মনেই স্নান হাসলেন। তারপর বলেন, এই বোধ হয় দুনিয়াদারীর মজা। অত বড় বিচক্ষণ মানুষ হয়েও উনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। এর পর আমাকে কী বললেন, জানেন?

—কী?

—বললেন গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে এ পাখিটা এতদিন কার কাছে ছিল,—সেই ঐ বোলটা ওকে শিখিয়েছে!

বাসু-সাহেব বলেন, আশ্চর্য! এত বিশ্বাস?

—জী হা! এতটাই বিশ্বাস করতেন উনি গঙ্গারামকে। অথচ কী ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখুন। পরমুহূর্তে বলেন, প্রীতম, তুই তো পাখির বিষয়ে অনেক কিছু খোঁজ রাখিস! বলতে পারিস, এ-রকম একটা পাহাড়ী ময়না কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? আমি ওঁকে জানালাম শ্রীনগরে সেন্ট্রাল মার্কেটে ইয়াকুব মিঞার দোকানে। উনি বললেন, তাহলে তুই মুন্সাকে নিয়ে পহেলগাঁও ফিরে যা। ওটা তোর বউয়ের কাছে রাখ। আমি আর একটা ময়না কিনে আড়াইটার বাসে ফিরে যাব। লোকটা কে তা জানি না, সুরমার প্রতি আমার কোনও দরদ নেই—তাই বলে, বিনা অপরাধে তাকে ফাঁসির দড়িতেও আমি ঝুলতে দেব না।

পহেলগাঁওয়ের কোন হোটেলে দাদা ছিলেন তা আমি জানতাম। কথা হল, চৌঠা আমি তাঁর সাথে দেখা করব, এবং এ বিষয়ে কী সাবধানতা নেওয়া যায় সে কথা আলোচনা করব। আমি পহেলগাঁওয়ে ফিরে ময়নাটা রমাকেই রাখতে দিলাম। দাদার কথা কিছু বলিনি। আমার সত্যিকারের পরিচয়ও দিহিনি। কেন, সে কথা আপনার আমি বলব না। শূধু রমাকেই বলব। কারণ ও বুঝবে। ওর সব কথা ও আমাকে বলেছে—কেন ও এত ব্যসেও অবিবাহিতা। আমার জীবনেও অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম, আমি নিশ্চ বেকার একথা জ্ঞানার পরেও...

হঠাৎ মাঝপথে থেমে বলেন, যাক সে-সব অবাস্তব কথা! যে কথা বলছিলাম। চার তারিখে যখন দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তখন মনে হল একটা ছোরা কিনে দাদাকে উপহার দিলে কেমন হয়? রমার কাছে গোটাকুড়ি টাকা ধার চাইলাম।

বাসু বলেন, বাকিটা আমরা জানি—

সুরম বললে, চাচাজী, পিতাজী তাঁর উইলে বলেছেন আপনার যা ন্যায্য...

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন প্রীতমজী: না! তা হয় না!

বাসু বলেন, আমি একটা কথা বলব প্রীতমজী?

—জী হা, বলুন।

—আপনি এখনই বলছিলেন আপনার ব্রীকে আমি ফাঁসির দড়ি থেকে ঝাঁচিয়েছি, তাই আমার একটা ফি পাওনা আছে। তাই না?

—জী হা! কিন্তু আপনি তো জানেন আমার কতটুকু সামর্থ্য?

—আর আমি যদি এমন কিছু দাবী করি যা আপনার সামর্থ্যের ভিতর?

—হুকুম ফরমাইয়ে সাব!

—আপনি আপনার দাদার দানটা অস্বীকার করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা আমি চাই। প্রীতমজী, আমি জানি—আপনি যদি তাঁর স্নেহের দান গ্রহণ করেন, সংসারী হন, সে টাকায় একটা স্টুডিও খুলে বসে মনের আনন্দে ছবি আঁকতে বসে যান, তবে স্বর্গ থেকে তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। তাছাড়া ঐ

## কাটায়-কাটার-২

মেয়েটাকেই বা কেন সুখ-স্বাস্থ্য আনন্দঘন বিবাহিত জীবন থেকে বঞ্চিত করবেন আপনি? ও তো টাকার লোভে আপনাকে বিয়ে করেনি?

হাসলেন শ্রীতমপ্রসাদ খান্না। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি কি বল?

রমা সাড়া দিল না। সে তখন রানী দেবীর কেলসে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছে!



## তৎকালীন কবিতা



অ-আ-ক-খুনের কাঁটা

রচনাকাল : 1986

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা 1987

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীগৌতম রায়

উৎসর্গ : শ্রীপ্রফুল্ল রায়

—আহ! ওটা কী করছে! ওটা সন্ট! এই নাও—

নুনের পাক্কাটা সরিয়ে শুগার-পট্টা রানী দেবী ঠেলে দিলেন স্বামীর দিকে।

—ও, আয়াম সরি! এবার চিনির পাত্র থেকে এক চামচ চিনি তুলে নিয়ে নিজের চায়েই কাপে মিশিয়ে নিলেন বাসুসাহেব। সুজাতা কুণ্ঠিত হৃদয়ে দেখতে থাকে তার বাসুমামার চায়ে চিনি-মেশানোর কায়দাটা। বাসুসাহেব আদৌ ভুলো মানুষ নন।

রানী বলেন, তোমার আজ কী হয়েছে বল তো? সকাল থেকে ভীষণ অন্যমনস্ক দেখছি!

বাসু জবাব দিলেন না। সুনিপুণভাবে তিনি চায়েই কাপে চিনি মেশাতে থাকেন। 'সুনিপুণভাবে' অর্থে এক বিদ্বু চা যেন ছলকে প্লেটে না পড়ে, কাপের কাঁধায় চামচের আঘাত লেগে যেন হীনটন শব্দ না ওঠে। এ সব অসৌজন্য নাকি টেবিল-ম্যানারের বিরুদ্ধে। এ জাতীয় আচরণ ঠর মজ্জায়, মজ্জায় মেশানো—সচেতনভাবে করেন না। এ কিছু খানদানী টা-পাটা নয়। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে প্রাতঃরাশের টেবিলে বসেছেন ঠরা চারজন—বাসুসাহেব, রানী দেবী, কৌশিক আর সুজাতা। বিশেষ, মানে ঠর ছোকরা চাকর, রান্নাঘর থেকে খানকয় গরম টোস্ট এনে রেখে গোল খাবার টেবিলে। রানী দেবী কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, কী ডিটেক্টিভ সাহেব? আমার ডিভাকশান ঠিক? তোমাদের আবার কোন কেস এসেছে নিশ্চয়? খুনটা হল কে?

কৌশিক আর সুজাতা থাকে এ একই বাড়িতে। ভাড়াটেও নয়, পেয়িং-গেস্টও নয়, ব্যবসায়ের পার্টনার। বাসুসাহেব প্রখ্যাত ক্রিমিনাল লইয়ার, আর কৌশিক-সুজাতা যৌথভাবে খুলেছে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা-অফিস: 'সুকৌশলী'। একতলার একদিকে ব্যারিস্টার সাহেবের অফিস, অপরদিকে সুকৌশলী; মাঝখানে দুই অফিসের যৌথ রিসেপশান কাউন্টার। তাতে বসেন মিসেস. রানী

## কাটায়-কাটায়-২

বাসু—বাসুসাহেবের পদ্ম সহধর্মিণী। দ্বিতলটা কৌশিক-সুজাতার রেসিডেন্স। বাসুসাহেব সঙ্গীক একতলাতেই থাকেন, কারণ রানীর পক্ষে হুইল-চেয়ারে দ্বিতলে ওঠা সম্ভবপর নয়।

রানীর প্রস্নে কৌশিক টোস্টের কর্তৃত্ব অংশটা গলাধঃকরণ করে বলে, আমি যদুদ্র খবর রাখি—এ হস্তায় কোন মক্কেল বাসুমামুর টোকাঠ পার হয়নি!

বাসু বললেন, ভুল হল তোমার।

কৌশিক প্রশ্ন করে, এসেছে? আমার নজর এড়িয়ে কোন মক্কেল?

—তা বলছি না। বলছি, তোমার 'স্টেটমেন্ট'টা ভুল।

—কী আবার ভুল হল? আমি তো শুধু বললাম: 'এ হস্তায় কোন মক্কেল বাসুমামুর টোকাঠ পার হয়নি!'

বাসু জোড়া-পোচের স্টেটটা টেনে নিয়ে বলেন, সুজাতা! তুমি বলতে পার? তোমার কর্তার ঐ স্টেটমেন্টে কোন ভুল আছে কিনা?

কৌশিক তার ধর্মপত্নীর দিকে অসহায়ভাবে তাকায়।

—পারি মামু! 'সপ্তাহ' বলতে আমরা সচরাচর 'বুন্নি সোম টু রবি'। সপ্তাহ শুরু হয় 'সোম থেকে'। আজই সোমবার। ও 'মীন' করছে গত সপ্তাহ, বলছে 'এ সপ্তাহ'।

—কারেই! আর কোন ভুল?

—হ্যাঁ। আপনার চেয়ারের প্রবেশ-পথে কোনও টোকাঠের চতুর্থ কাঠ নেই। ইন-ফ্যাক্ট এ বাড়ির কোন ঘরের দরজাতেই তেমন কোন কাঠ নেই। তিন-কাঠের ফ্রেম আছে প্রতিটি দরজায়। সুতরাং 'টোকাঠ' শব্দটা যদি কেউ উচ্চারণ করে তবে বুঝতে হবে—হয় সে বাংলার কাঁচা, অথবা 'সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এ'।

রানী দেবী উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। বলেন না, না, কৌশিকের মাতৃভাষা বাংলা, বেচারি বোধহয় সিভিল-এঞ্জিনিয়ারিং-এই একটু কাঁচা। তোমার মতো পাকা এঞ্জিনিয়ার নয়।

কৌশিক শিবপুরের বি.ই.। সিভিল-এরই। বেচারি নিঃশেষে দ্বিতীয় টোস্টে মাখন মাখাতে থাকে। বাসু বলেন, ও যা বলতে চায়, গুছিয়ে বলতে পারল না, সেই স্টেটমেন্টটা কিছু ঠিক। অর্থাৎ 'গত সপ্তাহে আমার চেয়ারে কোন মক্কেল আসেনি'। কিন্তু রানুর অবজ্ঞারডেশানটাকেও উড়িয়ে দিতে পারছি না—ওর ডিডাকশানটাও ঠিক—'পর্বতো বহিমান ধূমাং'! লবণে শর্করাত্মক যখন হয়েছে, তখন আমার চিত্তচাক্ষুস্যের হেতু আছে—পত্রাং!

—অর্থাৎ?

—আজকের ডাকে একটা রহস্যময় চিঠি পেয়েছি। খামের চিঠি। দাঁড়াও দেখছি।

এটি নিশ্চয় শনিবারের চিঠি। এসেছে বিকালের ডাকে। কিন্তু ওরা সপ্তাহান্তে বেড়াতে গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। ফিরেছেন রবিবার রাতে। বাসুসাহেবের ঘুম ভাঙে কাক-ডাকা ভোরে। বাড়ির আর সকলের নিদ্রাভঙ্গের আগেই তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এবং এক চক্র প্রাতঃস্রমণ সমাপনান্তে তাঁর চেয়ারে এসে বসেন। গত দিনের বিকালের ডাকে আসা চিঠিগুলি পড়েন এবং তার মাধ্যমে এ.বি.সি. দাগ দিতে দিতেই খাবার টেবিলে ডাক পড়ে। প্রাতরাশ শেষ হলে রানী দেবী এসে চিঠিগুলি সটিং করেন। কোন চিঠি যাবে হেঁচা কাগজের খুড়িতে, কোনটা সরিয়ে রাখতে হবে সময়মতো জবাব দিতে, আর কোনটা জরুরি। যে কোন কারণেই হোক, আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। ডাকের একখানি চিঠি আশ্রয় পেয়েছে বাসুসাহেবের ড্রেসিংগাউনের পকেটে। খামটা বের করে উনি সন্তর্পণ টেবিলের উপর রেখে বললেন, তোমরা একে একে দেখ। তারপর আলোচনা হবে। না, না, অত সাবধানতার দরকার নেই। খামে কোন ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেই।

কৌশিক আর সুজাতার চোখাচোখি হল। কৌশিক ত্রীক বললে, আমার দিকে তাকান কেন? তুমিই আগে দেখ, আমি আবার কী বলতে কী বলব।

সুজাতা মুখ টিপে হেসে বলে, বাঃ! তা কী হয়? তুমি হলে গিয়ে ‘সুকৌশলী’র সিনিয়ার পার্টনার। রানী (দেবী) হেসে বলেন, তোমাদের ঐ অজাযুদ্ধ-ঋষিপ্রাক্ক শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার বাপু ধৈর্য ধাকবে না। আমিই দেখি প্রথম—

খামটা লম্বাটে। পোস্ট-অফিসে যে বকম খাম কিনতে পাওয়া যায়, তা নয়। বেশ ভালো খাম। দামী, মোটা কাগজ। খামের উপর টিকিট সঁটা। নাম-ঠিকানা টাইপ করা—মায় কোনায় Q.M.S. ছাপটাও। ভিতরের কাগজখানা কিছু খেলো। তার এক পিঠে কিছু অঙ্ক কথা। সম্ভবত বীজগণিতের। মনে হয় কোন বড় কাগজ থেকে লম্বালম্বিভাবে ছেঁড়া। তাই অঙ্কটার সবটা বোঝা যাচ্ছে না। অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে টাইপ করা একখানি চিঠি। চিঠির উপরে একটি কুমিরের ছোট্ট ছবি। রঙিন ছবি। কোন ইংরেজি ছবির বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সেটে দেওয়া হয়েছে। ছবির নিচে টাইপ করা আছে ইংরেজী ব্লক-ক্যাপিটালে—



‘A’—FOR ALLIGATORAIH NAMAH!

তার নিচে ইংরেজী চিঠিখানির আক্ষরিক অনুবাদটা এইরকম:

“শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শি. কে. বাসু, বার-আট-সেয়েষু,

“মহাশয়,

“শুনিয়াছি, আপনি কী একটি ‘আন-ব্রোকেন-রেকর্ডের’ অধিকারী।

“আপনাকে ষড়বিংশতিটি সুযোগ দিতেছি। ইয়তো X, Q অথবা Z-এ পৌঁছিয়া আমি কিছু প্যোয়েটিক-লাইসেন্স গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। নিজগুণে ক্ষমা করিবেন!

“ষড়বিংশতিবারই গাঙু মারিলে কেন্দানি প্রদর্শন হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন কি?

“রেডি-স্টেডি-গো: ‘A’ফর ASANSOL। তাং—এ মাসের উনিশে!

ইতি একান্ত গুণমুগ্ধ

“A-B-C”

বার-বার তিনবার পাঠ করে রানী দেবী নিঃশব্দে পত্রখানি সুজাতার হাতে দিলেন। সুজাতাও খুঁটিয়ে দেখল চিঠিখানা। কোন মন্তব্য প্রকাশ করল না। হস্তান্তরিত করল কৌশিককে। কৌশিক কিছু চিঠিখানা পড়ে নীরব থাকতে পারল না। বললে, বন্ধ উদ্ভাদ!

রানী বললেন, কিছু বন্ধ উদ্ভাদের ইংরেজি জ্ঞানটা টনটনে। একটাও বানান ভুল করেনি।

—এবং টাইপিং-এ পাকা হাত। ছাপার ভুলও নেই।—যোগ করল সুজাতা।

—কিন্তু ঐ কথাটার মানে কী হল? ঐ ALLIGATORAIH NAMAH? —জানতে চান রানী।

বাসু বলেন, Alligator শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন। লোকটা সংকৃত ভালো জানে। এবং বিসর্গ চিহ্ন যে রোমান হরফে ‘H’ দিয়ে বোঝাতে হয় সেটাও। শূণ্য শেয়ানা-পাগল নয়, লোকটা শিক্ষিত। সম্ভবত উচ্চশিক্ষিত!

কৌশিক বলে, মানছি! শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, মহোমহাপাধ্যায়। কিন্তু বন্ধ-উদ্ভাদ!

বাসুসাহেব চুপুট ধরছিলেন। নিপুণভাবে সেটা ধরিয়ে একমুখ খোঁয়া ছেড়ে বলেন, সুজাতা?

—উ?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—এবার কৌশিকের স্টেটমেন্টে কোনো ভুল নজরে পড়েছে তোমার ?

—পড়েছে বাসুমাম। দুটো ভুল। একটা ভাষার, একটা ডিডাকশনের। কথটা ‘মহোমহাপাখ্যায়’ নয়, ‘মহামহোপাখ্যায়’; আর বন্ধ উদ্ভাদ মানে raving lunatic! সে চিঠি টাইপ করতে কিংবা খামের উপর ঠিকানা লিখতে পারে না, উপযুক্ত টিকিট সাঁটতে জানে না, ‘Q.M.S.’ শব্দের অর্থ বোঝে না।

—কারেন্ট! ফুল মার্কস!

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। বলে, অনেক কাজ বাকি আছে। উদ্ভাদের প্রলাপ—

—সুজাতা ?

—হ্যাঁ মামু। আমি লক্ষ্য করেছি। এবারও ওর ভুল হয়েছে। ‘ট্রান্সফার্ড এপিথেট’! নিজের বাকপ্রয়োগের আর বিশ্লেষণের ভাঙিকে সে মনে করছে অপরের পাগলামি—

রানী দেবী কৌশিকের পাঞ্জাবির হাতটা খপ্প করে চেপে ধরেন। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, ‘লেগপুলিং’ থামাও দেবি তোমরা। কৌশিক বলতে চায়, এটা পাগলের কাণ্ড। হতে পারে। ‘লোকটা বন্ধ উদ্ভাদ’ বলেছে সে—এটাও ‘পোয়েটিক লাইসেন্স’, একটু অতিশয়োক্তি। আমারও মনে হয়, চিঠিখানা যে লিখেছে সে একটু—কী বলব? ‘একসেন্সিক’, আধপাগলা! এরকম প্র্যাক্টিক্যাল জোক করা তার উচিত হয়নি। সে ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছে...আই মীন, সে তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ প্রো করেছে! ইঙ্গিত করেছে, উনিশ তারিখে আসানসোলে একটা দুঘণ্টা ঘটতে চলেছে, যার কিনারা তুমি করতে পারবে না। খুব সম্ভবত এটা একটা অমূলক হুমকি। তোমার রাত্রের নিম্নাহরণই তার উদ্দেশ্য।

—কেন? আমার নিম্নাহরণে তার স্বার্থ?

—যে কোন কারণেই হোক সে তোমার উপর খান্না। চান্ডড়া ছেলে হলে বলতে হবে ওদের সরষতী পুজোয় তুমি চালা দাওনি, তাই একটা হুমকি দিয়ে তোমার রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিচ্ছে।

—সংস্কৃত বা ইংরেজিতে যার এরকম দখল সে পাড়ায় পাড়ায় মা সরষতীর নামে চালা চেয়ে বেড়াবে?

—ওটা একটা কথার কথা। ‘গাড্জু’ এবং ‘কেন্দানি’ শব্দ প্রয়োগে ওটা আমার মনে হয়েছে। হয়তো তোমার কল্যাণে বেচারি বেশ কিছুদিন ঘানি ঘুরিয়েছে। বেরিয়ে এসে এভাবেই শোধ নিচ্ছে। বাসুসাহেব সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, আর তোমার মত?

—আমি মামিমার সঙ্গে একমত : প্র্যাক্টিক্যাল জোক!

—আর কৌশিক?

কৌশিক ইতিমধ্যে আবার বসে পড়েছে। বললে, আমার বিশ্বাস সুজাতার স্টেটমেন্টটা ভুল। সে যা ‘মীন’ করতে চায়, তার উলটো কথা বলছে। ও বলতে চায় ‘ইম-প্র্যাক্টিক্যাল জোক’। পাগলটা ইঙ্গিতে বলেছে, আপনাকে ছাব্বিশটা সুযোগ দেবে! এ টু জেড। শুরু হচ্ছে ‘এ ফর আসানসোল’ দিয়ে। হয়তো শেষ হবে Zaire বা Zambia দিয়ে। সেটা অসম্ভব! ইমপ্র্যাক্টিক্যাল!

বাসু বলেন, একেত্রে কী আমার কর্তব্য?

কৌশিক বলে, চিঠিখানা ছেঁড়া কাগজের বুড়িতে ফেলে দেওয়া। ওটার কথা ভুলে থাকা। এবং রাত্রে পোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলা।

—এটাই তোমাদের সম্মিলিত অভিমত?

রানী বলেন, তুমি কী করতে চাও?

—কৌশিক! তুমি এই চিঠি আর খামের খান-তিনেক Xerox কপি করে নিয়ে এস। আমি তত্ত্বক্ষণ ডি. আই. জি., সি. আই. ডি.-কে একটা ফোন করে ব্যাপারটা জানাই।

সুজাতা বলে, আপনি বিশ্বাস করেন—উনিশ তারিখে আসানসোলে একটা কিছু ঘটতে থাকে?

—পয়েন্ট-জিরো-ওয়ান পার্সেন্ট চান্স আছে বৈকি। আজ রাত্রে আমাকে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে না; কিন্তু তোমাদের কথামতো চিঠিখানা যদি ছিঁড়ে ফেলি আর বিশ তারিখের খবরের কাগজে যদি



দেখি, আসানসোলে একটা বিস্তী ব্যাপার ঘটছে, তাহলে বিশ তারিখে রাত্রে একমুঠো গ্লিপিং ট্যাবলেট খেলেও আমার ঘুম হবে না।

রানী সায় সেন, তা ঠিক। এমনও হতে পারে—ঝড়ে কাক মরবে আর ফকিরের কেরামতি বাড়বে। অর্থাৎ নিতান্ত সৈবক্রমে আসানসোলে একটা খুন-জখম বা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হবে—যার সঙ্গে ঐ পত্রলেখকের কোন সম্পর্কই নেই, অথচ আমরা নিজেদের দায়ী করব।

কৌশিক বললে, সে-কথা ঠিক। দিন খামটা, আমি জেরক্স করিয়ে আনি। হোক পাগলামি, তবু 'আঠারো ঘা' বানানোর দুর্লভ সুযোগ থেকে কেন নিজেদের বঞ্চিত করি?

—আঠারো ঘা মানে?—সূজাতা জানতে চায়।

—'বাঘে ছুঁলে' যা হয়। এটাও 'ট্রান্সকার্ড এপিথেট'! 'বাঘ' অর্থে 'পুলিস'।

রানী দেবী হাসতে হাসতে বলেন, তা ঠিক। এক নম্বর 'ঘা'টা নিয়ে অত চিন্তা করছি না। বহুরঙে শুরু হলেও সেটা লঘুক্রিয়া; কিন্তু দু-নম্বর ঘা হল কৌশিকের জেরক্স করতে দৌড়ানো। তিন নম্বর এখনি পেট্রিল পুড়িয়ে ধানায় যাওয়া, চার নম্বর.....

বাসু বলেন, তবু তো তোমরা আঠারোয় থামবে। আমাকে তো ছাবিশ পর্বন্ত ছুটতে হবে!

ডি. আই. জি., সি. আই. ডি. কাগজখানা দেখে বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না বাসুসাহেব। এ জাতীয় উড়ো চিঠি আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে পাই। লোকটা যে কোন কারণেই হোক আপনার সাক্ষ্যে ঈর্ষান্বিত। না হলে 'আনরোকন রেকর্ড' কথাটা উল্লেখ করত না। এ পর্যন্ত কোন অপরাধীই যে আপনার হাত এড়িয়ে নিকৃতি পায়নি—এ খবরটুকু তার জানা। হয়তো আদালত এলাকার লোক। আপনার কাছে বেইজ্ঞত হয়েছেো তা যদি হয় আমি খুশি হব। কারণ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে লোকটা ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডের। সে ক্ষেত্রে একটু ভাবনার কথা—

—কী ধরনের ভাবনার কথা?

—ধরুন, লোকটা অপরাধ জগতের। আপনি তো জানেনই যে, ওদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ রেশারেশি আছে। এমন হতে পারে লোকটা ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছে যে, ওর বিপক্ষ দলের কেউ কেউ উনিশে একটা রাহাজানির পরিকল্পনা করেছে আসানসোলে। খবরটা সে সরাসরি পুলিশকে জানাতে চায় না। পাগল সেজে আপনাকে জানালো। কারণ তার বিশ্বাস—আপনি সেটা আমাদের জানাবেন। পুলিশ সতর্ক থাকবে। কিন্তু ওর বিপক্ষদলের লোকেরা তাকে সন্দেহ করবে না। ভাববে, কোনো পাগলের কাণ্ড—যে হতভাগা নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে আর ফকির সেজে ঝড়ে মরা কাকটার কৃতিত্ব দাবী করতে চায়।

—বুঝলাম। এ ক্ষেত্রে আপনি কী করতে চান?

—আসানসোলে কোনো স্পেশাল-স্কোয়াড নিচয়ই পাঠাবো না। ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব অবশ্য। যাতে আসানসোল থানা সজাগ থাকে।

—আমার আর কিছু করণীয় আছে?

—আপনি আবার কী করবেন? আপনি পুলিশে রিপোর্ট করেছেন, পাগলের চিঠিখানার অরিজিনাল কপি শৌছে দিয়েছেন, বাস! আপনার করণীয় কাজ একটাই—এ ব্যাপারটা ফ্রেফ ভুলে গিয়ে নিজের কাজকর্মে মগ্ন থাকা।

—থ্যাঙ্কু।

বাসুসাহেব ঠার নিউ আলিপুয়ের বাড়িতে ফিরে গেলেন নিশ্চিন্ত মনে।



## দুই

বিভিন্ন স্ট্রীটের একটা ভাঙা দোতলা বাড়ি। একতলায় একজন ডাক্তারের চেম্বার। তিনিই গৃহকর্তা। ডাক্তার দাশরথী দে। একতলার অংশটা ভাঙা দেওয়া। দ্বিতলে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব আস্তানা। স্বামী স্ত্রী আর একটি মেয়ে—মৌ, যাদবপুরে পড়ে তিনতলায় সিঁড়িঘরের লাগোয়া একটা চিলে-কোঠা। এক বৃদ্ধ ওখানে ভাড়া থাকেন। একা মানুষ। তিনকূলে নাকি তাঁর কেউ নেই। তাঁর গৃহস্থালীর সরঞ্জামও সামান্য। পূর্ব দিকে একটা জানলা, মোটা-মোটা লোহার গরাদ দেওয়া। ঘরে একটি তক্তাপোষ, উপরে সতরঞ্চি পাতা; বিছানাটা মাথার কাছে গোটানো। একপ্রান্তে একটি আলমারি। তালাবদ্ধ। সেটা খুললে দেখা যাবে উপরের তাকে শুধু অঙ্কের বই—প্যাটিগণিত, বীজগণিত, ক্যালকুলাস, জ্যামিতি: কিছু কিছু শিশুসাহিত্যের বইও। বইগুলি জরাজীর্ণ—মনে হয় সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানে কেনা। পাতা উল্টে দেখলে বুঝতে পারা যাবে—তা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মালিকের নাম লেখা। শ্রীশিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তী। তারিখ দেওয়া—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার। তুলনায় মাঝের শেলফে এক থাক বাকবাক বই—আনকোরা নতুন; যেন বইয়ের দোকানের একটি তাক। কিছু বইয়ের পাতা কাটা নেই। কিছু প্যাকেট খোলাই হয়নি। সেগুলি ধর্মপুস্তক। উদ্বোধন কার্যালয়, বেলেড় মঠ অথবা পতিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত। অবশ্য এসবই দৃষ্টির আড়ালে—যেহেতু কাঠের আলমারিটি তালাবদ্ধ।

যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাতে দেখা যায়—ঘরের একপ্রান্তে একটি সস্তা টেবিল। একটিমাত্র খাড়া-শিঁঠ হাতলহীন চেয়ার। কিছু কাগজপত্র—কাগজ-চাপা, পিন-কুশন, আঠার শিশি। আর এসবের সঙ্গে নিত্যস্থ বোমানান একটি প্রায়-নতুন পোর্টেবল টাইপ-রাইটার।

বৃদ্ধ তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। স্নান করে এসেছেন তিনি। বাথরুম একতলায়, ডিসপেন্সারির সংলগ্ন। প্রতিবার বাথরুমে যেতে তাঁকে তিনতলা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। উপায় নেই। এর চেয়ে সস্তায় কলকাতা শহরে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। তাহাড়া একবেলা তিনি ডাক্তারসাহেবের সংসারে অন্নগ্রহণ করেন। নৈশ আহার। দিনে বাইরেই কোথাও খেয়ে আসেন। সকাল-বিকাল চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। সুতরাং আর কোনো বামেলা নেই। ডাক্তারের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, পেয়িং-গেস্ট রাখবার প্রয়োজন। হেঁচুটা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর ছাত্র হচ্ছেন ডক্টর দে। দীর্ঘদিন পূর্বে যখন গৃহকর্তা স্থলে পড়তেন শিবাজী ছিলেন ঠাসের স্থলের থার্ড মাস্টার অঙ্কের ক্লাস নিতেন তিনি। মৌকে পড়ানোর সুযোগ পাননি, কারণ সে অন্ধ নয়নি। কিন্তু মৌ রোজ সন্ধ্যায় ঠার তিনতলার ঘরে উঠে আসে। টাইপিং শিখতে। সখ হিসাবে।

মাস্টারমশাই তাঁর কোলা ব্যাগে খানকতক বই ভরে নিলেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরে পায়ে একটা ক্রিতে বাঁধা ক্যান্সিলের জুতো পরলেন। কাল রাত্রেই একটা ছোট স্যুটকেস গৃহীয়ে রেখেছিলেন। সেটাও তুলে নিলেন হাতে/ছাতা? না দরকার নেই। বর্ষাকাল পার হয়েছে। অক্টোবরের আঠারো তারিখ আজ। রাসের ভেমন তেজ নেই। ঘরে তালা লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন। দ্বিতলের ল্যান্ডিংয়ে নেমে একটু থমকে দাঁড়ালেন। ইঁকাড় পাড়লেন, বৌমা?

মৌ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এসে বললে, মা বাথরুমে আছেন মাস্টারমশাই। আপনি কি বের হচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ। তোমার মাকে বলে দিও, দু-দিন থাকব না। বিশ তারিখ সন্ধ্যায় ফিরব। সেদিন রাতে খাব।

—আজ রাতে খাবেন না?

—না। এই তো ট্রেন ধরতে যাচ্ছি।

—একটু কিছু মুখে দিয়ে যান। একেবারে বাসি মুখে...

—না না, কাল একটু দই এনে রেখেছিলাম। ভিজ্জেটিড়ে দিয়ে সকালেই,...

—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—আসানসোল।

—ও বাবা! সে তো অনেকদূর! থাকবেন কোথায়?

—হোটেল-ধর্মশালা ঝুঞ্জে নেব।

মৌ আর কথা বাড়ায় না! বৃদ্ধ টুকটুক করে নিচে নামতে থাকেন।

মৌ পিছন ফিরতেই দেখে বাথরুম থেকে প্রমীলা বার হয়ে এসেছেন। বললেন, মাস্টারমশাই কি আবার টারে গেলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আসানসোল। পরশু সন্ধ্যাবেলা ফিরবেন বললেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রমীলার। যেন আপন মনেই বললেন, কী দরকার এ ব্যয়ে সে এতটা পরিশ্রম করার? উনি তো কতবার বলেছেন, ‘মাস্টারমশাই, ওসব চাকরি ছেড়ে দিন এবার। আমরা তো আছি। আমার বাবা-কাকা থাকলে কি দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতাম না?’ কিন্তু কে কার কথা শোনে!—

মৌ বলল, পাগল মানুষ তো!

—মৌ!—ধমকে উঠলেন প্রমীলা।

মৌ সলজ্জে বলে আমি সে কথা বলিনি, মা! কিন্তু আত্মভোলা মানুষ তো। আর সত্যকে তুমিও অস্বীকার করতে পার না। এককালে উনি পাগলা-গারসে আটকও ছিলেন!

—সেই কথাটিই ভুলে যেতে চেষ্টা কর। উনি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। শুধু তোমার নয়, তোমার বাবারও শিক্ষক উনি। বৃড়ো মানুষকে সম্মান দিতে শেখ!

মৌ আগ্রহ করল। জেনারেশান গ্যাপ! সে কী বলতে চায়, আর মা তার কী অর্থ করছে! সে আর কথা বাড়ায় না। আজ তার ফাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস।



কৌশিক ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে দেখে চতুর্থ চেয়ারটি খালি। রাণী দেবীর দিকে ফিরে জানতে চায়, মামু কোথায়?

—ভোরবেলা মর্নিং-ওয়াকে গেছেন। এখনো ফেরেননি।

কৌশিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। এত দেবী হয় না তাঁর বেড়িয়ে ফিরতে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সদর দরজা খুলে প্রবেশ করলেন বাসুসাহেব। তাঁর পরিধানে সাদা শর্টস, টাইলার জামা, পুলওভার, পায়ে সাদা মোজা আর হাফিং শূ। বগলে একগোছা দৈনিক পত্রিকা। কাগজের বাড়িলাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, তোমাদের ডিভাকশানই ঠিক। স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, বসুমতী কোন কাগজেই আসানসোলের কোন খবর নেই।

কৌশিক দ্বিতীয়বার তার মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। এবার সময় নয়, তারিখটা। আজ বিশে অক্টোবর।

## কাটার কাটা-২

ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বললে, সবগুলো কাগজ খুঁটিয়ে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, পার্কের বেঞ্চিতে বসে বসে।

বাড়িতে দুটি কাগজ আসে। একটা বাংলা একটা ইংরাজি। বেলা সাতটা নাগাদ। বেশ বোকা গেল, বাসুসাহেব মনে মনে একটু চিন্তিত ছিলেন। এ দু-তিন ঘণ্টাও তাঁর সবুর সময়। ভোর বেলাতেই পাঁচখানা খবরের কাগজ কিনে নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছেন।

অজ্ঞাত পত্রলেখকের বিষয়েই আলোচনাটা মোড় নিল। কোন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সে এমন 'গ্র্যাটিক্যাল জোক'টা করেছিল? আহারাতে বিশু যখন চায়ের পট্টা রেখে গেল তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। কৌশিক উঠে গিয়ে ধরল। একটু শূনে নিয়ে বলে, মামু, আপনার ফোন, টাঙ্ক-লাইনে।

বাসু এসে ফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, বাসু স্পিকিং ...

—আমি, স্যার, রবি বলছি, রবি বোস...

—রবি বোস? আপনাকে তো ঠিক প্লেস করতে পারছি না...কোথায় আমরা মীট করেছি?...

—চিনতে পারছেন না? আমি ইন্সপেক্টার রবি বোস, সেই কমলেশ মিত্র মার্ডার কেস-এ।

—ও! আই সী! তুমি সেই রবি? এখনো লটারীর টিকিট কেনার বাতিকাটা আছে?

—না, নেই। এক জন্মে কেউ দু-দুবার জ্যাক-পট হিট করে না!

—আই সী! তুমি ইতিমধ্যে একবার লটারীর টিকিটে মোটা দাঁও মেরেছ তাহলে? ...

—সেটা তো, স্যার, আপনি জানেনই!

—কই না তো! তুমি তো কখনো জানাওনি।

—জানানোর তো প্রয়োজন ছিল না স্যার! ছিল?\*

—না, ছিল না। যা হোক, এখন ফোন করছ কেন? কোথা থেকে বলছ?

—আসানসোল থেকে। আমি এখন আসানসোল সদর থানার ও.সি.!

ভৌগোলিক নামটা শ্রবণমাত্র সচকিত হয়ে উঠলেন বাসুসাহেব। পূর্বমুহূর্তের রসিকতার বাম্পমাত্র রইল না আর। বললেন, ইয়েস? ফায়ার! আগ্রাম অল ইয়ার্স!

—কাল রাত এখানে একটা খুন হয়েছে। মধ্যরাত্রে। একজন নগণ্য দোকানদার। এসব মামুলি খুন নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। কিছু গত সপ্তাহে হেড-কোয়ার্টার্স থেকে একটা রহস্যময় চিঠি পেয়েছিলাম—একটা 'ফোর-ওয়ানিং'। তাই মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য।

—মধ্যরাত্রে দোকানদার খুন হয়েছে বলছ? কোথায়? বাড়িতে, না দোকানে?

—মধ্যরাত্রে ঠিক নয়। রাত দশটা পঞ্চাশ থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। দোকানেই।

—দোকানের মালপত্র বা ক্যাশ...

—না, স্যার, কিছু খোয়া যায়নি। মোটিভ অন্য কিছু। লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফলে নারীঘটিত ব্যাপার বলে মনে হয় না। রাজনীতির ধারে-কাছে লোকটা কোনদিন ছিল না—সুতরাং পলিটিক্যাল মার্ডারও নয়। বিরাট সম্পত্তির মালিক নয় যে, উইলঘটিত...

—বাট হোয়াই দেন?

—সেটাই চরম রহস্য! আমার তো মনে হচ্ছে—'কে' প্রশ্নটাকে ছাপিয়ে উঠেছে: 'কেন'।

—তোমার বড়কর্তাকে টেলিফোনে জানিয়েছ? তিনি কী বলেন?

—তাঁর মতে পিয়ার কোয়েলিডেল! কাকতালীয় ঘটনা। অর্থাৎ আপনারা পত্রশাস্তি এবং অধরবাবুর মৃত্যু...

---

\* 'ঘড়ির কাটা'-তে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

—কী নাম বললে? হলধর?

না স্যার। অ-খ-র। A for Alligator, D for Delhi...

—বুঝেছি! অধর! পুরো নামটা কী?

—অধরকুমার আঢ়ি! অদ্ভুত কোয়েলিডেল! নয়?

বাসু বললেন, শোন রবি! তুফান এক্সপ্রেসটা অ্যাটেন্ড কর। আমি যাচ্ছি। আমরা দুজন। কোনও হোটেল...

—হোটেল কেন স্যার? আমার গরিবখানাতেই থাকবেন। আপনাকে ঐ লটারীর টাকা প্যাওয়ার পর...

—হ্যাং য়োর লটারি! সন্দেহজনক সব কজনকে যেন সজ্ঞাবেলায় পাই। আমরা আসছি। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে উনি প্রাতরাশের টেবিলের দিকে ফিরে দেখেন সবাই উৎকর্ষ হয়ে বসে আছে। উনি কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, তৈরী হয়ে নাও। আমরা তুফানে আসানসোল যাচ্ছি। বুঝেছ নিশ্চয়? লোকটা ফাঁকা হুমকি দেয়নি।

রাণী বললেন, এটা নেহাৎই একটা কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না?

—সম্ভবত নয়। কারণ মৃত লোকটা 'অধর আঢ়ি অফ আসানসোল'—'A'-র অ্যালাটারেশন।



অধরবাসুর সোকানটা খুবই ছোট। একটা ডবল বেড বাটের মাপে। তবে অবস্থানটা জবর, জি. টি. রোডের উপর। আসানসোল ই. আই. আর. স্কুলের বিপরীতে। মনিহারী সোকান। অধরবাসুর আদি-বাড়ি পূর্ববঙ্গে। বয়স ষাট-বাষট্টি। পাটিশানের সময় বাপের হাত ধরে এ দেশে আসেন। সোকানটা খুলেছিলেন গুর বাবাই। উত্তরাধিকার সূত্রে এখন উনিই ছিলেন তাঁর মালিক। বিপত্নীক। দুই ছেলে, মেয়ে নেই। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, কুলটিতে সত্নীক বাস করছে। সেখানেই চাকরি করে। ছোটটি গুর কাছেই থাকে। ক্লাস টেন-এ পড়ে—সামনের ঐ স্কুলে। সোকানঘরের উপরে এক কামরার একটি ঘরে বাপ-বেটায় থাকতেন। ঠিকে-ঝি বাসন মেজে যেত। রান্না করতেন অধরবাসু নিজেই।

মৃত্যুর সময়টা নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে:

অধরবাসুকে জীবিত অবস্থায় শেষবার দেখেছে গুর ছোট ছেলে সুনীল। রাত দশটা নাগাদ সে নেমে এসে বাবাকে বলেছিল, সোকান বন্ধ করবে না? অনেক রাত হয়ে গেল যে।

অধরবাসু ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, দশটা দশ হয়েছে। তুই আর একটু জেগে থাক। আধঘণ্টার মধ্যেই আসব আমি। হিসাবটা আজ রাতেই শেষ করে রাখব।

এরপর সুনীল উপরে উঠে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পড়তে থাকে। তারপর সে দরজা খোলা রেখেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তার বাবা যে রাতে খুন হয়েছে তা সে জানতে পারে পরদিন ডোরবেলা। যখন ঘুম ভেঙে দেখে দরজা খোলা। বাবা ঘরে নেই। তখন সবে আলো ফুটেছে। ঠিক কটা তা সুনীল জানে না। গুর বাবা খুব ভোরে ওঠেন—কিন্তু ছেলেকে ডেকে দেন। এভাবে দরজা খুলে রেখে নেমে যান না। তাই সুনীল একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একছুটে নেমে এসে দেখে যে, সোকানঘরও হাট করে খোলা। আর কাউটারের ঠিক তলাতেই অধরবাসু ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে আছেন। মৃত। রান্ধা থেকে সেটা নজরে পড়ে না। তখন একটু-একটু করে আলো ফুটেছে। দু-চারজন লোক পথ দিয়ে যাতায়াত করছে। মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার নাকে ফেটি জড়িয়ে ঝাড়ু চালাচ্ছে।

## কাটায়-কাটায়-২

—তাহলে কেন তখন টেলিফোনে বললে যে, রাত সাড়ে এগারোটায় মধ্যে খুন হয়েছে?—জানতে চাইলেন বাসুসাহেব।

বিস্তারিত বিবরণটা শোনাচ্ছিল থানা-অফিসার রবি বোস। থানাতেই। কৌশিক বসে আছে পাশের চেয়ারটায়। তুফান এক্সপ্রেস অ্যাটেন্ড করে ওদের দুজনকে রবি নিয়ে এসে বসিয়েছে তার অফিসে। রবি জবাবে বলল, তার কারণ—সাধনবাবুর জবানবন্দি। উনি নাইট শো সিনেমা দেখে রিকশা করে সত্ৰীক ফিরছিলেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। উনি ধূমপায়ী। পকেটে হাত দিয়ে হঠাৎ দেখেন সিগারেট ফুরিয়েছে। নাইটশো সিনেমাটা ভেঙেছে রাত ঠিক এগারোটা কুড়িতে। ফলে, আন্দাজ এগারোটা পঁচিশ নাগাদ তিনি জি.টি. রোড দিয়ে পাস করছিলেন। হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ে একটি দোকান খোলা আছে। লোডশেডিং চলছিল। সব দোকান বন্ধ। শুধু ঐ দোকানটিতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। কাউন্টারের উপর একটা মোমদানিতে। কিন্তু ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, মোমবাতিটা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, দপ দপ করছিল। অধরবাবুর দোকানে যে সিগ্রেট পাওয়া যায় তা ধূমপায়ী ভদ্রলোকটির জানা ছিল। তিনি রিকশা থামিয়ে দোকানের কাছে এগিয়ে যান। কাউকে দেখতে পান না। দোকানের মালিকের নামটা তিনি জানতেন না—তবে টাকমাথা এক ভদ্রলোক যে দোকানটায় বসেন এটা তাঁর জানা ছিল। ‘ও মশাই! শুনছেন? ভিতরে কে আছেন?’—ইত্যাদি বার কয়েক হাঁকাড় পেড়েও কারও সাড়া পান না। ঐ সময়ে তাঁর নজরে পড়ে কাউন্টারের উপরে পড়ে আছে একটা খোলা হিসাবের খাতা আর একটা ডট পেন। আর তার পাশেই একটা বই—উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত শ্রীমন্তগবদগীতা। ইতিমধ্যে রিক্সা থেকে ওঁর গিন্নী তাড়া দিলেন। মোমবাতিটাও দপ করে নিবে গেল। সাধনবাবু টর্চের আলোয় রিক্সায় ফিরে আসেন। সিগারেট কেনা হয়নি তাঁর।

বাসু বললেন, বুঝলাম। খুব সম্ভবত সাধনবাবু যখন হাঁকাহাঁকি করছিলেন, তখন দোকানের মালিক ওঁর কাছ থেকে হাতখানেক তফাতে মরে পড়ে আছেন। কিন্তু কাউন্টারটা আড়াল করায় রাস্তার সমতলে ঠাঁড়িয়ে তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেননা। ফলে, নাইন্টিনাইন পার্সেন্ট চান্স সাড়ে এগারোটায় আগেই উনি খুন হয়েছেন। কিন্তু দশটা পঞ্চমীর পরে কেন? ওঁর ছোট ছেলে সুনীল তো তার বাপকে জীবিতাবস্থায় দেখেছিল রাত দশটা দশে?

—কারণ সুনীলের স্পষ্ট মনে আছে যে, সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে লোডশেডিং হয়নি। ইলেকট্রিক সাল্লাইয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঐ এলাকায় কাল রাত্রে লোড-শেডিং শুরু হয় দশটা বাহান্নয় তারপর অধরবাবু মোমবাতি জ্বালতে আন্দাজ মিনিট-তিনেক সময় নিয়েছেন নিশ্চয়। ফলে দশটা পঞ্চম। এছাড়া আমি একটা বিকল্প পরীক্ষা করেও দেখেছি। অধরবাবুর দোকান থেকে ঐ বাড়িলের আর একটি মোমবাতি ছেলে আজ সকালে দেখেছি সেটা পুড়ে শেষ হতে ঠিক পঁচিশ মিনিট সময় লাগে।

—গুড ওয়ার্ক! কিন্তু একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে যে রবিবাবু। দশটা পঞ্চম থেকে এগারোটা পঁচিশ হচ্ছে আধঘণ্টা। কিন্তু মোমবাতির আয়ু যে পঁচিশ মিনিট।

—কথাটা আমিও ভেবেছি। হয়তো সে মোমবাতিটা একটু বড় ছিল।

—একটু বড় নয়, টুয়েলভ পার্সেন্ট বড়! পঁচিশ মিনিটের বদলে আধঘণ্টা। দ্বিতীয়ত—সিনেমা হাউস থেকে জি. টি. রোডের ঐ জায়গাটায় রিকশায় আসতে কতক্ষণ সময় লাগার কথা? আই মীন—গভীর রাত্রে, ফাঁকা রাস্তা পেলে?

—মিনিট পাঁচেক।

—তাহলে আরও অন্তত মিনিট-পাঁচেক আন-অ্যাকাউন্টেড থেকে যাচ্ছে! তাই নয়? সিনেমা ভাঙামাত্র সাধনবাবু সত্ৰীক ‘হল’ থেকে ভীড় ঠেলে বার হয়ে এসে রিক্সা ধরেননি নিশ্চয়। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কি যে, ‘শো’র শেষ পর্যন্ত ওঁরা দেখেছেন কিনা?

—না স্যার। ও সম্ভাবনাটা আমার মনে হয়নি। থ্যাঙ্ক স্যার। আমি জিজ্ঞাসা করব।

কৌশিক হঠাৎ বলে বসে, খুব সম্ভবত তিনি শেষ পর্যন্তই দেখেছেন। এবং তা হলে টাইম এলিমেন্টটা আরও জটিল হয়ে পড়ছে। যে মোমবাতির আয়ু ষ্টিশ মিনিট তা অন্তত ষ্টিশ মিনিট জ্বলেছে!

বাসুসাহেব পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আদৌ নয়! রবিবাবুর ডিডাকশান কারেক্ট। খুনটা হয়েছে দশটা পঞ্চমীর পরে এবং সাড়ে এগারোটায় আগে।

কৌশিক বলে, কিন্তু মোমবাতিটা তাহলে... ?

বাসু বললেন, মোমবাতি যথারীতি ষ্টিশ মিনিটই জ্বলেছে। মোমবাতি যারা বানায় তারা ষ্টিশ দেলে বানায়। এক-আধ মিনিটের বেশি এদিক-ওদিক হওয়ার কথা নয়।

—তাহলে?

—বুঝলে না? ধরা যাক, এগারোটা পাঁচে উনি দোকানের সামনে এলেন। তখন চতুর্দিকে লোড-শেডিং। একটি মাত্র দোকানে একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। অর্থাৎ নীরঞ্জন অঙ্ককারে একশ গজ দূর থেকেও আবছা দেখা যাচ্ছে দোকানের আলোটা। হয়তো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দোকানদারকে আর আততায়ীর শিল্পে। লোকটা দেখতে পেল পিছনের কাউন্টারে কোন জিনিস—সেটা হলিগ্রাফ, মাথার ভেল, টুথপেস্ট যাই হোক। সেটাই কিনতে চাইল। ন্যাচারালি দোকানদার পিছন ফিরবে। তৎক্ষণাৎ আততায়ী হুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল বাতিটা আর তৎক্ষণাৎ খুন করল লোকটাকে। অঙ্ককারেই সে টেনেটুনে মৃতদেহটা চেঁলে দিল কাউন্টারের তলায়। হয়তো দেখে নিল চারিদিক। ঠিক সে সময়ে যদি জি.টি. রোড দিয়ে কোনও ট্রাক বা রিক্সা পাস করে তাহলে অপেক্ষা করবে। চারদিক সুনসান হয়েছে বুঝলে লাইটার ছেলে মোমবাতিটা আবার জ্বালাবে। কারণ সে তখন নিশ্চিত যে, বহুদূরের প্রত্যক্ষদর্শী যদি আদৌ কেউ থাকে সে তখন দেখবে দোকান থেকে একজন খরিদার ফিরে যাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় যে মোমবাতিটা নিবে গিয়েছিল সেটা আবার জ্বালা হয়েছে! দোকানি হয়তো ভিতর দিকে গেছে অথবা নিচু হয়ে কিছু করছে। ফলে মোমবাতি তার নির্দিষ্ট মেয়াদের একতিলও বেশি জ্বলেনি!



বাসুসাহেব সকলের এজাহার নিলেন। একে একে। রবি বসু তাঁদের আসতে বলেছিল। কারও কোন উক্তি থেকে নতুন কিছু আলোকপাত হল না। ইতিমধ্যে কুলটি থেকে অধরবাবুর বড় ছেলে কার্তিক সতীক এসে পড়েছে। সে কুলটিতে একটা কারখানায় কাজ করে। সম্ভানাদি এখনো হয়নি। বছরতিনেক বিবাহ করেছে। বাপের সঙ্গে সন্তান ছিল। বাপকে খুন করে দোকানটা দখল করার চেষ্টা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ চাকরী ছেড়ে সে দোকান দেখতে পারে না। কোন বিবস্ত্র লোক তাকে মোতায়ন করলেই হত। আর বাপের চেয়ে বিবস্ত্র লোক সে কোথায় পাবে?

হিসাবের খাতা অনুসারে দেখা গেল—চেনা-জানা খরিদারের কাছে বেশ কিছু ধার আছে। 'বেশ কিছু' মানে মিলিত অঙ্কটা—প্রায় হাজারখানেক টাকা। কিন্তু কোন একজনের কাছে দেড়শ টাকার বেশি নয়। এত সামান্য টাকার জন্য কেউ মানুষ খুন করে না।

অধরবাবু রাজনীতির ধারে-কাছে ছিলেন না। বার্ণপুর-কুলটি অঞ্চলের লেবার ইউনিয়নের কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই। মন্ডান-পাটীদের কাছ থেকে শতহস্ত দুই থাকতেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি। ত্রীলোকঘটিত কোন বদনাম নেই। সে রাতে ক্যান্স-কাউন্টারে সাড়ে সাতশ মতো টাকা ছিল। খোলা দ্রয়ারে। সেটা খোয়া যায়নি।

## কাটা-কাটা-২

ঠিকই বলেছিল রবি! 'কে' প্রস্তুত ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে যে প্রস্তুত, তা 'কেন' ?

সাধনবাবুকে বিস্তারিত জেরা করলেন বাসুসাহেব। কিন্তু ইতিপূর্বে পুলিশকে যা বলেছেন তার বেশি কিছু যোগ করতে পারলেন না। শুধু বললেন, একটা কথা বলি স্যার, আগে ওটা খেয়াল হয়নি—এ দুটো একটু ইনকম্প্যাটবল নয়? রাত বারোটায় সান-মাইকা-টপ দোকানের কাউন্টারে পাশাপাশি দুজনে শুরে আছেন? একজন মনিহারি দোকানের খাতা আর দ্বিতীয়জন শ্রীমন্তগবঙ্গীতা!

বাসু বললেন, অধরবাবু বোধ করি আর এক রামপ্রসাদ! হিসাবও কবেন, গীতাও পড়েন।

বইটি উনি পরীক্ষা করে দেখলেন। আনকোরা নতুন। উদ্বোধন প্রকাশনীর। মালিকের নাম লেখা নেই কোথাও। সুনীল বা কার্তিক বইটি কখনো দেখেনি বলল।

সান-মাইকা-টপ টেবিলে কোনও ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেই। এমন-কি মৃত অধরবাবুরও নয়। আততায়ী সব কিছু মুছে দিয়ে গেছে।

ফিরে আসবার মুখে কার্তিক কাতরভাবে প্রশ্ন করল, কে এভাবে ঠেকে খুন করল স্যার? কী ভাবেই বা মুহূর্তমধ্যে...

বাসুসাহেব বললেন, কে করেছে, কেন করেছে তা বলতে পারছি না কার্তিকবাবু। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি—তিনি খুব বেশি যত্নগা পাননি। মুহূর্তমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আততায়ী তাঁর পিছন ফেয়ার সযোগে তাঁর মাথায় খুব ভারি কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে। সম্ভবত লোহার ডাণ্ডা অথবা লম্বা হাতলওয়ালা ছাযার—যেটা সে কোর্টের আঙিনে লুকিয়ে এনেছিল। ওর ক্রেনিয়াম বিচূর্ণ হয়ে যায়। হয়তো পিছন ফিরে আততায়ীর মুখখানাও তিনি দেখে যাননি।

ঘরের ওপ্রান্তে বসেছিল একটি বোল-সভের বছরের কিশোর দু-ইটির মধ্যে মাথা গুঁজে। ডুগরে কেঁদে ওঠে সে। বাসুসাহেব উঠে এসে তার মাথায় হাতটা রাখলেন। অল্প-আঁধ লাল একজোড়া চোখ তুলে সুনীল বললে, আমি... আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি না স্যার? ... পুলিশ কিছু করবে না! আমার বাবা যে গরিব...

বাসু বললেন, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পার সুনীল। মাসখানেক পরেই তোমার টেস্ট পরীক্ষা। মন খারাপ না করে বাবা যা বলতেন সর্ব প্রথম তাঁর সেই ইচ্ছাটাই পূরণ করবার চেষ্টা কর। ভালভাবে পাশ করবার চেষ্টা কর। দোকানটা তো তোমাকেই দেখতে হবে।

—না, আমি বলছিলাম, এ লোকটাকে ধরবার জন্য...

—আমার মনে থাকবে। প্রয়োজন হলেই তোমাকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু ততদিন তুমি নিজেকে শক্ত করে রাখ। পড়াশুনাটা ছেড় না। কেমন?

সুনীল আঙিনে চোখটা মুছে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

## তিন

গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা এটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। বাসুসাহেবের পত্র এবং অধরবাবুর পঞ্চদশ এ দুটি 'প্রাপ্তি' যোগ নিঃসম্পর্কিত। 'কে' খুন করেছে সেটা বোঝা না যাবার একটিই হেতু: অধরবাবুর জীবনে এমন একটা অনুদযাতিত অধ্যায় আছে, যার কথা এখনো জানা যায়নি। হয়তো জানতেন অধরবাবু এবং আততায়ী। এনকোয়ারি? সে তো রুটিনমাসিক হচ্ছেই। খবরটা এত নগণ্য যে, দুদিন পরে দু-একটি সংবাদপত্রে ভিতরের পাতায় 'অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক আসানসোলে দোকানদার নিহত' সংবাদটা যে ছাপা হয়েছিল তা সুনীল, কার্তিক এবং বাসু-পরিবারের কজনের বাইরে হয়তো কারও নজরেই পড়েনি।

কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল যখন বাসুসাহেব দ্বিতীয় একখানা পত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন পুলিশের কাছে।

একই জাতের খাম, একই জাতের কাগজে, সম্ভবত একই টাইপ-রাইটারে ছাপা। কাগজটার পিছন



দিকে জ্যামিতির একটা প্রতিপাদ্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কাগজটা লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে ফেলার অঙ্কটা বোঝা যাচ্ছে না। পরপৃষ্ঠায় একটা ছাপা-ছবি অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে ঝাঁটা। জীবটা অদ্ভুতদর্শন। এবার রঙিন ছবি নয়। একরঙা। তার ডলায় লেখা:



**'B' FOR BECHARATHERIUMAIH NAMA!**

"ত্রীযুক্ত বাবু পি. কে. বাসু, বার-আট-লয়েবু,

"বেচারি মহাশয়,

"পঞ্চবিংশতিটি সুযোগ বাকি থাকিতেই এতটা মুখড়াইয়া পড়িলেন কেন?

"গাঙ্গু কে না মারে?

"টাই-টাই-টাই এগেন: 'B' FOR BURDWAN! তাং: এ মাসের সাতাশে। ইতি

গুণমুখ

B-C-D"

এস. এস. ওয়ান, অর্থাৎ স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বার্ডওয়ান রেঞ্জ বললেন, দেখা যাচ্ছে, আপনার অনুমানই ঠিক। অধরবাবুর খুন আর আপনার ঐ রহস্যজনক পত্র সম্পর্ক-বিযুক্ত নয়। লোকটা আবার হুমকি দিয়েছে। আজ বাইশ তারিখ। পুরো শীচদিন সময় আছে। রাস্কেলটাকে এবার ধরতেই হবে। যেমন করে হোক।

—কিন্তু কী স্টেপ নিতে চাইছেন আপনারা?

—সমস্ত ব্যাপারটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে। 'B' অক্ষর দিয়ে যাদের নাম এবং বর্ধমান থাকে তারা যাতে সাবধান হতে পারে।

—নাম না উপাধি?

—ও ইয়েস। অধর আতির নাম উপাধি দুটোই ছিল 'এ' দিয়ে।

আই-বি-ক্রাইম বললেন, কিন্তু তাতে কি আমরা রাস্কেলটার ফাঁদেই পা দিচ্ছি না? আমার ধারণা লোকটা 'মেগ্যালোম্যানিয়া'ক—অর্থাৎ তার মস্তিষ্কবিকৃতির অবচেতনে আছে একটা আকাশজোড়া 'হামবড়াই' ভাব! বাসুসাহেবের উপর সে টেকা দিতে চাইছে। সে পাবলিসিটি চাইছে। মানে 'নটোরিটি'। কাগজে সব কথা জানিয়ে দিলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে-বা চায়,—বাসুসাহেবের চেয়ে বেশি নাম—তা সে 'বিখ্যাত'ই হোক বা 'কুখ্যাত'ই—তাই সে পেয়ে যাবে।

সি. আই. ডি. সিনিয়ার ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, আপনি কী বলেন বাসুসাহেব?

বাসু বললেন, এ ক্ষেত্রে আমি একজন পাটি। আমার কিছু বলা শোভন হবে না। লোকটা আমাকেই 'চ্যালেঞ্জ প্রো' করেছে। যদি আমি বলি—'খবরের কাগজে সব ছাপা উচিত নয়' তাহলে কেউ মনে করতে পারেন 'ব্যাচার-খেরিয়াম' মুখ লুকাতে চাইছে। তাই আমার পরামর্শ—আজ সন্ধ্যায় একটা কনফারেন্স ডাকুন। দু-একজন খুরদর ক্রিমিনলজি এক্সপার্ট এবং মনস্তত্ত্ববিদ, আমরা কজন তো আছিই

## কাঁটার-কাঁটার-২

আর ও.সি. বর্ধমানকে একটা ফোন করে অ্যাটেন্ড করতে বলুন। আপনারা সবাই মিলে স্থির করুন—কী কী স্টেপ আমরা নেব, খবরের কাগজে সব কিছু ছাপিয়ে দেব কিনা।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, যুক্তিপূর্ণ কথা। তাই করুন। বিকাল পাঁচটায় আপনার অসুবিধা হবে না তো বাসুসাহেব?

—না। আসানসোলের কেসটার আর কোন কু পাওয়া গেল?

—হ্যাঁ, একটা মাইনর ক্লু। এ আনকোরা 'গীতা' বইখানা কোথা থেকে এল। রবি আরও ইন্টেলিড এনকোয়ারি করে জেনেছে—একজন ফেরিওয়ালা সন্ধ্যা নাগাদ ঐ পাড়ায় কিছু বই বিক্রি করতে এসেছিল। অধরবাবুর দোকানের পরের পরের দোকানদার তার কাছে কী একটা ধর্মপুস্তক কিনেছিলেন। একটা বুড়ো মত লোক, বোলায় করে বই ফিরি করছিল। টেন-পাসেন্ট কমিশনে সে বাড়ি-বাড়ি বই বিক্রি করে। সম্ভবত অধরবাবু তার কাছেই বইটা কেনেন।

—বুড়ো মতন লোক? কী রকম সেখতে কিছু বলেছে? লম্বা না বটে, দাড়ি-গোফ...

বাধা দিয়ে আই. জি. সাহেব বলেন, দ্যাটস ইন্সটিরিয়াল। ফেরিওয়ালা বই বেচতে এসেছিল সন্ধ্যায়। অথচ সুনীল তার বাবাকে রাত দশটা পর্যন্ত জীবিত দেখেছে।

বাসু গভীর হয়ে বলেন, তা বটে! তবু আজ সন্ধ্যায় কি রবি বসুকেও আনানো যায় না?

আই. জি. সাহেব ভ্রাগ করলেন। বলেন, যাবে না কেন? একটা ফোন করলেই সে চলে আসতে পারবে। এখন তো সকাল সাড়ে দশটা। কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে ব্যারিস্টার সাহেব?

—আছে! আরও একটা অন্যান্য অনুরোধ করব, দেখুন যদি মঞ্জুর করা সম্ভবপর হয়।

—বলুন?

—আপনারা মেনে নিয়েছেন 'আসানসোল' আর 'বর্ধমান' দুটো বিচ্ছিন্ন কেস নয় দুটো খুন একই আততায়ীর হাতের কাজ—

ইন্সপেক্টর বরাট বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনার ডিডাকশানটা একটু প্রিম্যাচিওর হয়ে যাচ্ছে না বাসুসাহেব? 'বর্ধমানে' কোন খুন হয়নি। হবেই, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

বাসু একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, অল রাইট—চক্রধরপুর, চিনসুরা বা চাকদার কেসের পর না হয় সে বিষয়ে আলোচনা করব—

আই. জি. সাহেব বরাটের দিকে একটা ভৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলেন, না না, ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত সিরিয়াস। একজন 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' সমাজে নিশ্চিত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও সে বাসুসাহেবকে চিঠি লিখেছে—কিন্তু চ্যালেঞ্জটা আমাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। আসানসোলের কেসটাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিইনি। এবার আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চাই। বলুন, বাসুসাহেব, কী যেন বলছিলেন?

—আমি বলতে চাই, লোকটা কে জানি না, উদ্দেশ্য কী তাও জানি না; কিন্তু তার কর্মপদ্ধতি সে পূর্বাঙ্কেই ঘোষণা করেছে। 'এ. বি. সি.' করে সে ক্রমাগত খুন করে যাবে। আসানসোলে সে আমাদের বৈজ্ঞান্য করেছে। বর্ধমানে করতে যাচ্ছে সাতাশ তারিখে। এর পর 'চুঁচড়া' 'চাকদহ' 'চন্দ্রকোণা রোড' কোন একটা জায়গা সে বেছে নেবে। প্রত্যেকটি এলাকা ভিন্ন ভিন্ন ও. সি.-র এস্ত্রিয়ারে। আপনারা কি মনে করেন না একজন বিচক্ষণ 'অফিসার-অন-স্পেশাল-ডিউটি' নিয়োগ করে প্রতিটি কেসকে লিংক-আপ করা উচিত? না হলে প্রতিটি থানা-অফিসার খণ্ড খণ্ড চিত্রই শুধু পাবে। আততায়ীকে ধরা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

—হু আর প্যাফেক্টিবল কারেক্ট। একজন সিনিয়র ইন্সপেক্টরকে আমরা O.S.D. করে দেব। সে আপনার সঙ্গে অ্যাটাচড থাকবে। ইন্ ফ্যাক্টি—আপনার নির্দেশেই সে কাজ করবে। আমি আপনাকে পূর্ণ দায়িত্বটা দিতে চাই ব্যারিস্টারসাহেব!

ইন্সপেক্টর বরাট আর এস. এস. ওয়ান-এর দৃষ্টি বিনিময় হল। আই. জি. ক্রাইম যে

আরক্ষাবিভাগের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি আই. জি.-রও। তাই ইমপেক্টার বরাটের দিকে ফিরে বললেন, আপনার সি. আই.ডি. সমান্তরালে কাজ করে যাবে। আমি তাতে কোন হস্তক্ষেপ করছি না। কিন্তু অজ্ঞাত আততায়ী যেহেতু বাসুসাহেবকেই বারে-বারে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখছে তাই তাঁকে আমি এ সুযোগটা দিতে চাই। আমি আশা করব, আপনার সমান্তরালে তদন্তের বার্তা বিনিময় করে পরস্পরকে অবহিত করবেন। কোনক্রমেই যেন রাস্কেসলটা 'B' পার হয়ে 'C'-তে না পৌঁছাতে পারে। এখন বলুন ব্যারিস্টারসাহেব, আপনি কি এ তদন্তের জন্য অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে বিশেষ কাউকে পেতে চান? আপনি এদের অনেককেই চেনেন।

—তা চিনি। আমি খুশি হব যদি আসানসোল সদর থানায় নেস্ট-ম্যানকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে রবিকে আপনারা মুক্তি দেন। মাসখানেকের জন্য রবি বোসকে আমার সঙ্গে অ্যাটচ করে দিন। ছোঁকরা ভারি কাজের এবং বুদ্ধিমান!

—তাই হবে, আমি ব্যবস্থা করছি। সে আজ সন্ধ্যার মিটিঙে আসবে। থানার চার্জ নেস্ট-ইন-কমান্ডকে সাময়িকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে।

—থ্যাঙ্ক!



একশ তরিখ, সকাল।

ডাক্তার দে তিনতলায় উঠে এসে দেখলেন মাস্টারমশাই টেবিলে বসে একমনে কী যেন টাইপ করছেন। দরজা খোলাই ছিল। ডাক্তার দে ঘরে প্রবেশ করে ঠর খাটে বসলেন। তবু বুজের হুস হল না। দাশরথী ঝুঁকে পড়ে দেখলেন —মাস্টারমশায়ের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা একশ বাহান।

একটু গলা ঝাঁকারি দিলেন তিনি।

—কে? ও তুই? দাশু? কখন এলি?

—একটু আগে। আপনার লেখা কতদূর হল?

—আর্যভট্ট চ্যাপটারটা শেষ হয়ে এল।

দাশরথী জানেন, এ পাণ্ডুলিপি কোন দিনই ছাপা হবে না। আজ ছয় মাস ধরে তিনি লিখছেন, কাটাকুটি করছেন, আর কপি করছেন। অজ্ঞাত লেখকের “স্টাডি অফ ম্যাথমেটিক্স ইন অ্যানসেন্ট (এনশেন্ট?) ইন্ডিয়া” কোন প্রকাশকই কোনকালে ছাপবে না। তা জেনেও মাস্টারমশাইকে উৎসাহ দিয়ে যান: ‘অকুপেশনাল থেরাপি!’ মনোমত্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেই ঠর মানসিক ভারসাম্য আবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাবে না।

বললেন, আমি বলি কি স্যার, আপনি ক্যানভাসারের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সর্বকণের জন্য এ লেখাটা নিয়ে পড়ুন। মাসে-মাসে এ কটা টাকার জন্য...

—এ কটা নয়, দাশু! সাড়ে চার শ। বইটা ছাপতে খরচও তো আছে।

## কাটার-কাটার-২

—সে দায়িত্ব আমাদের। আপনার ছাত্রদের। আপনি তা নিয়ে কেন ভাবছেন?

বুদ্ধ হাসলেন। বললেন, এসব কথা তুমি আগেও বলেছ দাশু। দুটো কারণে আমি চাকরিটা ছাড়ছি না। এক নম্বর, এতে বাধ্যতামূলকভাবে আমি অ্যাকাটিভ থাকছি। আমি যে রকম গৈতো, চাকরি ছাড়লে দিনরাত বসে বসে লিখব। তার মানেই অজীর্ণ, ব্রাডপ্রসার...

—কেন? সম্ভ্রাহে তিনদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরী যাবেন! রেফারেলও তো দরকার....

—তা দরকার। কিছু দ্বিতীয় কারণটা কী জানিস দাশু? জীবনভর অঙ্কই শুধু কবে গোলাম। ভগবানের নাম তো কোনদিন নিইনি। পারানির কড়ি গুণে দেব কী দিয়ে? আসলে কাজটা তো ভাল—বাড়ি-বাড়ি ভাল ভাল বই ফিরি করে আসা! কথামৃত, গীতা, রামায়ণ; বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এদের লেখা বই!

—এরপরে আর কথা নেই। সেখি.. হাতটা দিন। আজ আপনার ইন্জেকশান নেবার দিন।

বুদ্ধ ঐ হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, কী ওষুধ রে ওটা?

—নাম শুনো কী বুঝবেন? 'অ্যানাটেনসল ডিকোনায়ড'।

—এ ইন্জেকশানে কী হয়?

ডাক্তার সে হেসে বলেন, 'অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন/ইহলোকে সুখী, অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।

অট্টহাস্য করে ওঠেন বুদ্ধ। বলেন, না আমি তো একেবারে ভালো হয়ে গেছি। মাস-তিনেকের মধ্যে একবারও 'এপিলেপটিক ফিট' হয়নি। কারও গলা টিপেও ধরিনি!

—স্বতিশক্তি?

—না। সে জটিলতাটা আছে। পিথাগোরাস থিওরেম বল, বাইনোমিয়াল থিওরেম বল, নাইন-পয়েন্ট সার্কেলের প্রুফটা বল—গড়গড় করে বলে যাব। কিন্তু যদি বলিস—কাল বিকালে কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, হয়তো কিছুতেই মনে করতে পারব না। ও মাসে মৌ গুনের কলেজ সোশালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হিসাব মতো আমি নাকি বৌমার সঙ্গে তিন ঘণ্টা নাচ-গান-অভিনয় দেখেছি। কিন্তু পরদিন সকালে সব, স—ব ব্ল্যাক। মৌ অনেক হিটস্ দিল—কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না—পূর্বরাত্রের সন্ধ্যাটা আমার কেমন ভাবে কেটেছে।

—হুম। কিন্তু তাহলে আশ্রমের নির্দেশমত আপনি কী করে বাড়ি-বাড়ি বই ফিরি করেন?

—এই যে, ডায়েরি দেখে দেখে। এই দ্যাখ না, কাল যাব শ্রীরামপুর, পরশু অফ, চব্বিশে রাসবিহারী অ্যান্ডিনুতে 'প্রিয়া' সিনেমা থেকে গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঠা-দিকের সোকান, শঁচিশে ছুটি, ছাব্বিশে বর্ধমান—ফিরব আঠালে সকালে... সব ডায়েরিতে লেখা আছে।

—আল্হা মাস্টারমশাই, আপনার সেদিনের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে?

—কোনটা রে?

—সেই যে 'পরীক্ষার হল'-এ একটি ছেলেকে টুকতে দেখে আপনি ক্রোশে গিয়ে তার গলা টিপে ধরেছিলেন?

মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ নিজের রগ টিপে বসে রইলেন। বললেন, ছেলের নাম মনে পড়ে না! চেহারাটাও নয়!

—আমাদের আগের ব্যাচের ছেলে?

—কী জানি! মনে নেই, কী জানিস দাশু। আসলে ঘটনাটা আমার একটুও মনে পড়ে না। এমনকি সেই পূজা-প্যাভেলো যে ছেলেরা বেলেদ্রাপনা করছিল তার গলা টিপে ধরার কথাও নয়। তবে বারে বারে শুনো শুনো একটা মনগড়া ছবি আমি তৈরী করে নিয়েছি। আমার মনের পটে যে ছবি তাতে পরীক্ষার 'হল'-এ যে টুকছিল তার মাথায় শিং ছিল, পূজা-প্যাভেলের মূর্তিটা সরস্বতীর আর বজ্রাত ছেলেরা ল্যাজ ছিল! অথচ ঘটনাটা ঘটে দুর্গা-পূজা প্যাভেলে। সুভাষা স্বীকার করতেনই হবে—সত্যি ঘটনাগুলো আমার একদম মনে নেই।

—যাক। ওসব কথা জোর করে মনে আনবার চেষ্টা করবেন না। এখন তো আপনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। না হলে কেউ পারে এমন একখানা গবেষণামূলক গ্ৰন্থ লিখতে?

মাস্টারমশাই উত্তরটায় সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, কিছু মাঝে মাঝে মানুষ খুন করবার জন্য আমার হাত এমনভাবে নিশ্চিপ্শি করে কেন বল তো?

—মাঝে মাঝে তো নয়, এমন ঘটনা আপনার জীবনে মাত্র তিনবার ঘটেছে।

—আসল দোষটা কার জানিস? আমার বাবার!

—আপনার বাবার?

—হ্যাঁ নামকরণ করাটা। শিবাজী, রাণা প্রতাপের সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত করে তিনি আমাকে একটা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি করতে চেয়েছিলেন। আর আমি হলাম গিয়ে নগণ্য থার্ড মাস্টার! হয় তো সেই ব্যর্থতাই এভাবে তির্যক প্রকাশ পায়!

—ওসব চিন্তা একদম করবেন না স্যার!

—বলছিঁস?



লন্ডন স্ট্রীটে আই. জি. ক্রাইমের ঘরে বসেছে একটা গোপন মন্ত্রণা সভা।

বাইশ তারিখ সন্ধ্যা পাঁচটায়।

সকাল বেলা যারা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আরও কজন যোগ দিয়েছেন। আসানসোল থেকে রবি, বর্ধমান ধানার ও. সি. আবদুল মহম্মদ, একজন রিটার্ডেড ক্রিমিনোলজির এক্সপার্ট ডঃ ব্যানার্জি এবং ডক্টর পলাশ মিত্র, প্রখ্যাত মানসিক চিকিৎসাবিদ। ঝাঁটী উম্মাদ আশ্রম থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন বছর তিনেক।

ডঃ ব্যানার্জি পত্র দুটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তিনি একমত। পত্র দুটি একই টাইপ-রাইটারে ছাপা এবং সম্ভবত একই ব্যক্তির ড্রাফট। তাঁর খারণা লোকটা পাগলাটে—পাগল কিনা বলা কঠিন। তবে সে জীবনে ব্যর্থ। প্রতিষ্ঠা চায়। দ্বিতীয় খুনটা সে কাকে করতে যাচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত তার সম্বন্ধে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

ডক্টর পলাশ মিত্রের সূচিকৃত অভিমত: লোকটা 'মেগালোম্যানিয়াক'—অর্থাৎ মনে করে যে, সে এক দুর্লভ প্রতিভা। তার যা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায়নি। এই পথেই সে বিখ্যাত বা কুখ্যাত হতে চায়। তার পড়াশুনার রেজল্ট ভাল। ইংরাজী জ্ঞান টনটনে, টাইপিঙের হাত খুব ভাল। কৌতুকবোধ প্রবল। 'পাগল' বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তার আকৃতি মোটেই সে রকম নয়। পথেঘাটে সেখলে, বা আধঘণ্টা তার সঙ্গে খোশ গল্প করলেও হয়তো বোঝা যাবে না যে, সে পাগল। আরও বললেন, এ জাতীয় হত্যাবিলাসী বা 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'রা দু জাতের হয়ে থাকে। প্রথম জাতের হত্যাবিলাসীরা বিশেষ এক জাতের মানুষকে খুন করে যায়—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, বিপরীত-লিঙ্গের মানুষ, স্কুল-চীচার ইত্যাদি। মনসেয়ীকরণ করে দেখা গেছে তার শিখনে একটা-না-একটা অতীত ইতিহাস থাকে, ঐ জগতের মানুষের কাছ থেকে অতীতে আঘাত পাওয়া। দ্বিতীয় জাতের হত্যাবিলাসী নির্বিচারে তার পথের বাধা সরিয়ে যায়। কোন দোকানদারের সঙ্গে কোন জিনিসের দর কষাকষি করতে করতে হয়তো তার গলা টিপে ধরে...

ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, কিছু অধরবাবুকে কোন একটা ডাঙা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল—যে অঙ্গটা আভতায়ী লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং এটা পূর্বপরিকল্পিতভাবে...

## কাটায়-কাটায়-২

ডক্টর মিত্র বাধা দিয়ে বলেন, আমি অ্যাকাডেমিক ভাবে ব্যাপারটা বলছি, স্পেসিফিক এ কেসটার কথা নয়। মানে, 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াকের' মানসিক বিকৃতিটা কী জাতের হয়।

—ঠিক আছে, আপনি বলুন।

—বলার বিশেষ কিছু নেই। 'ক্ল' বলতে ঐ দুখানি চিঠি। দ্বিতীয় খুনটা... আই মীন খুনের চেষ্টাটা হলে হয়তো পাগলটার চেহারা আর একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাসু বলেন, আমার মনে একটাই প্রশ্ন! আপনি যে দু-জাতের হত্যাবিলাসীর কথা বললেন, আমাদের পাগলটা তো তাদের কোন দলেই পড়েনা! বিশেষ এক জাতের মানুষকে যে সরিয়ে দিতে চায়, অথবা নিজের পথের বাধা সরিয়ে দেবার জন্য যে খুন করে, সে কি সে কথা এভাবে সকৌতুকে চিঠি লিখে ঘোষণা করতে পারে?

—আমি এমন কোনো কেস জানি না।

সারা রাত বেচারির ডাল করে ঘুম হয়নি। বার বারে উঠেছে, জল খেয়েছে আর বাথরুম গেছে। অথচ পাশের খাটে কৌশিক ভৌস ভৌস করে মোঘের মতো ঘুমিয়েছে, টেরও পায়নি। অবশ্য শেষ তার নিজেরই—ভাবে সুজাতা। লাইব্রেরী থেকে একটা বিদ্রী বই নিয়ে এসে সন্ধ্যারাতে পড়তে শুরু করেছিল। বিদ্রী বই মানে মনস্তত্ত্ব আর অপরাধ বিজ্ঞানের এক জগাখিচুড়ি গবেষণামূলক ইংরাজি বই। হত্যাবিলাসীদের মানসিকতা, কর্মপদ্ধতি, কেস-হিস্ট্রি এবং কীভাবে তাদের শ্রেণ্ডার করা হয়েছে। 'জ্যাক-দ্য-স্লীপার' এর উপরেই বয়ালিশ পাড়া। এককালে লোকটা নাকি লন্ডনে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ক্রমাগত সে মানুষ খুন করে যেত। হত্যাতোই তার আনন্দ। বাহুবিচার নেই! কী বলবে? লোকটা পাগল? কিন্তু পাগল কি ঐ রকম শয়ানা হয়? সমস্ত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কয়েক বছর ধরে হিমসিম খেয়েছে তার হদিস পেতে। আর একটি অদ্ভুত কেস। এ ছোকরা আমেরিকান—তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল: জ্যাক-দ্য-স্লীপারের হত্যাসংখ্যাকে অতিক্রম করা। বুড়ো-বাচ্চা, পুরুষ-স্ত্রী কোন বাহুবিচার নেই। জ্যান্ত মানুষ হলেই হল। মায় জানলা দিয়ে ঢুকে হাসপাতালের বেড়ে ঘুমন্ত রোগীকে হত্যা করে এসেছে! যে রোগীকে সে জানে না, চেনে না, অন্ধকারে বুঝতেও পারেনি সে পুরুষ নু স্ত্রীলোক। উদ্দেশ্য? বাঃ! রেকর্ড বেড়ে গেল না?

গ্রন্থকার একাডেমী হত্যাবিলাসীদের মনোবিকলনের বিশ্লেষণ করেছেন। সাত-আটটি কেস-হিস্ট্রি পড়ে সুজাতার মনে হল ওদের এই অজ্ঞাত হত্যাবিলাসীকে কোন গ্রুপেই ফেলা যাচ্ছে না। সে যেন পরিচিত প্যাটার্নের নয়—সে অনন্য। প্রথম কথা, যে কটা কেস্ হিস্ট্রি পড়ল তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অত্যাধীন স্বেচ্ছা নিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করেছে—সম্পূর্ণে সব ক্ল মুছে দিয়ে গেছে। এ লোকটা তা করেনি। আসানসোলে দোকানের সান-মাইকা-টপ্ কাউন্টারে কোনো ফিলারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি, এমনকি দোকানীরও নয়—তার একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হত্যাকারী স্থানত্যাগের আগে ক্রমাল দিয়ে টেবিলটা মুছে দিয়ে গিয়েছিল। এই বার মানসিকতা সে কেন একই টাইপরাইটারে দু দুবার চিঠি লিখবে? সে কি জানে না যে, প্রতিটি টাইপরাইটারের ছাপা ফিলার-প্রিন্টের মতো সনাক্ত করা যায়—বিশেষজ্ঞের চোখে? তার মানে কি লোকটার দ্বৈতসত্তা? ডক্টর জ্যাকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড? এক সময়ে সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। সুকুমার রায়ের বই থেকে 'ব্যাচারার্থেরিয়াম্'-এর ছবি কেটে চিঠিতে সাঁটছে নিতান্ত কৌতুকবশে, অন্য সময়ে অভিনয়ের মধ্যে লোহার ডাঙা নিয়ে গভীর রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোন একজন জ্যান্ত মানুষের সন্ধান? না! তাও তো নয়! বার বাসস্থান, নাম/উপাধির আদ্য অঙ্কর মিলে যাবে! কী করে সে বুঝে বার'করছে এমন অদ্ভুত কাকতালীয় যোগাযোগ? ওর মনে পড়ে গেল এক বাছবীর কথা—ইচুড়ার চন্দনা চ্যাটার্জির কথা। শিউরে উঠল সুজাতা! চন্দনার হাসিখুশি মুখটা মনে পড়ে গেল। বর্ধমানের পরে কি ইচুড়া?

ঠিক তখন মনে হল সম্ভবপূর্ণ কে যেন দরজায় নক করছে। গ্রাশ করে উঠল বুকের ভিতর! পরক্ষণেই মনে হল—এটা বর্ধমান নয়, নিউ আলিপুর; তার নামের আদ্যক্ষর বা উপাধি 'B' দিয়ে নয়! তবে কি ভুল শুনছে? দরজায় কেউ ঠকঠক করেনি? এ ওর অবচেতনের প্রতিক্রিয়া?

নাঃ! আবার কে যেন ঠকঠক করল। সুজাতা বেড-সুইচটা জ্বালে। টেবিল ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে। রাত সাড়ে চারটে। নাইট পরে শুয়েছিল সে। চাদরটা জড়িয়ে নিল গায়ে। কৌশিক এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উঠে এসে দরজা খুলে দিল। প্যাসেঞ্জে আলোটা জ্বলছে। দাঁড়িয়ে আছেন বাসুমাণু। পরনে গাউন, মুখে পাইপ। বললেন, কৌশিকের ঘুম ভাঙেনি?

—না। কী হয়েছে মাণু?

—যা আশঙ্কা করা গেছিল! তুমি মুখে-চোখে জল দিয়ে নিচে নেমে এস। কৌশিককে ডাকার দরকার নেই!—সিঁড়ির দিকে ফিরে গেলেন বাসুমাণু।

'যা আশঙ্কা করা গেছিল'! অর্থাৎ বর্ধমানে এক হতভাগ্য কাল গভীর রাতে...সে যখন জ্যাক-দ্য-স্ট্রীপারের নশপ ফল হত্যাচ্যাপ পড়ছিল? মৃত লোকটা কে?...পুরুষ? স্ত্রীলোক? আবার সোফানদার? এত—এত পুলিশের সতর্কতা সত্ত্বেও?

একটু পরে নিচে নেমে এসে দেখল বাসুমাণু টেবুল-ক্যাম্পের আলোয় কী একখানা চিঠি লিখছেন। সুজাতা নিঃশব্দে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। বাসুমাণু লক্ষ্য করলেন। কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরলেন। উপরে ঠিকানা লিখলেন। খামটা বন্ধ করলেন না। কাগজচাপার তলায় রেখে ঘুরে বসলেন সুজাতার মুখোমুখি। বললেন, বনানী ব্যানার্জি। বয়স সাতাশ-আটাশ। অবিবাহিত। সুন্দরী। সময় রাত বারোটা থেকে দুটো। শ্বাসরোধ করে হত্যা। মার্জারার কোন ক্লু রেখে যায়নি!

—এত তাড়াতাড়ি আপনি খবর পেলেন কেমন করে?

—আধঘন্টা আগে বর্ধমান থেকে রবি ট্রান্সকল করেছিল।

—কিছু রবিবারই বা রাত ভোর হবার আগে কেমন করে জানলেন—কোন বাড়ির, কোন রক্তস্রাব ঘরে একটা কুমারী মেয়েকে গলা টিপে মারা হয়েছে?

—না! মৃতদেহটা পাওয়া গেছে বর্ধমান স্টেশনে, টু ফিফটিন আপ বার্ডওয়ান লোকালের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে! শোন সুজাতা, আমি সকাল ছটা দশ-এর বর্ধমান-লোকালে ওখানে যাবছি। এবার একাই। তোমাদের দুজনের কাজ এখানে, মানে কলকাতায়। এই চিঠিখানা ধর। মদুলকে আলি-আওয়র্সে ধরবে। চিঠিখানা পড়লেই বুঝবে কী করতে হবে। সংক্ষেপে বনানীর পরিচয়টা দিই। খুব কিছু বিস্তারিত আমি জানি না। ইন্ ফ্যাক্ট, রবিও এখনো জানতে পারেনি। যেটুকু জানা গেছে তা এই:

বনানী ব্যানার্জির বাড়ি বর্ধমানে, কানাইনাটশাল পাড়ায়। ওরা দু বোন, বাবা-মা জীবিত। বাবা রিটার্নড রেলকর্মী। গার্ড, টিকিট-চেকার অথবা ডি.এস. অফিসের কেবান ছিলেন। ছোট বোনটা কলেজে পড়ে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্ভবত বি.এ.। তার নাম জানি না। বনানী বড় বোন। ভাল অভিনয় করত। কলকাতার একটি গ্রুপ-থিয়েটারে—'কুশীলব'-এ হিরোরিনের পার্ট। সাধারণত সপ্তাহে দুদিন—শনি রবি। প্রতি শুরুর কলকাতায় আসে, সোমবার ফিরে যায়। ও দুটো রাত ও কলকাতায় থাকে মাসীর বাড়ি, এক নম্বর ডোভার লেনে। সচরাচর বনানী সোমবার সকাল বা দুপুরের লোকাল ট্রেনে বর্ধমানে ফিরে যায়। কাল ওর কী দুর্ঘটনা হয়েছে—মেইন-লাইনের টু-ফিফটিন আপ লোকালটা ধরে গিয়েছিল। সেটা বর্ধমানে পৌঁছায় রাত পৌনে দুটোয়। ওর ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে ও একাই ছিল। গাড়ি ইয়ার্ডে নিয়ে যাবার আগে একজন বাতীর নজরে পড়ে।

সুজাতা বললে, এ তো অবিবাহিত। রাত দুটোর সময় একটা অবিবাহিতা মেয়ে কেমন করে সাহস পায় একা একা বর্ধমান স্টেশন থেকে কানাইনাটশাল রিকশা করে যাবার? দ্বিতীয়ত আপনি যা রলছেন তাতে তো ফার্স্টক্লাসে ওর যাবার কথা নয়। বাপ রিটার্নড কেবানী, নিজে কতই বা রোজগার করে?...

## কাটায়-কাটায়-২

—তাই জানতেই যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যাতেই ফিরে আসব। রানু ঘুমোচ্ছে, তাকে ডাকিনি। ঘুমোক। তোমরা সারাদিনে দেখ, এ দিককার কতটুকু খবর জানা যায়। মানে ‘কুশীলব’-এর। মদুল হোকবা জানালিস্ট। বুদ্ধিমান, করিৎকর্ম। প্রেস কার্ড আছে। এ টিপস্টা পেয়ে ও খুশিই হবে। হয়তো পরের সংখ্যা ‘সাপ্তাহিকে’ মদুল একটা ঝাঁকালো রিপোর্ট ঝাড়বে : ‘বর্ধমানে বার্ষপ্রেমী বনানী ব্যানার্জির বিদায়!’ তোমরা দুজন মদুলের সঙ্গে থাকবে। সন্দেহজনক সব কজনের ফটো নেবে...

—সন্দেহজনক মানে?

—এ বয়সের একটি অভিনেত্রীর, যে একা-একা অতরায়ে ট্রেন-ট্রাভেল করে, তার একটা রোমান্টিক অজ্ঞাত অধ্যায় থাকবার সম্ভাবনা। আর আমার তো বিশ্বাস—নাইটিং-নাইন-পারসন্ট চাপ বনানী একা যাচ্ছিল না, তার কোন পুরুষ সঙ্গী ছিল। যে লোকটা কেটে পড়েছে। সম্ভবত সেই আততায়ী।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে বটে।

—সে-ক্ষেত্রে লোকটা ‘কুশীলব’-এর কোন কুশীলব হওয়াই সম্ভব। এবার বুঝলে? ‘সন্দেহজনক’ শব্দটার অর্থ?

সুজাতা সলজ্জে ঘাড় নাড়ে।

—ও হ্যাঁ। ঐ সঙ্গে ডোভার লেনেও একবার টু মেরো। ওর মেসের নাম এস. রায়। বাসুসাহেব বাধকর্মে ঢুকে গেলেন। এখনো তাঁর প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়নি।

সুজাতা চট করে রান্নাঘরে চলে যায়। মামুর জন্য ঝটপট করে একটা ব্রেকফাস্ট বানাতে।

## চার

সকাল নটার মধ্যেই বাসুসাহেব বর্ধমান সদর থানায় উপস্থিত হলেন। মৃতদেহ তার পূর্বেই সদর হাসপাতালে অপসারিত হয়েছে। পোস্টমর্টেম হয়নি। তবে পুলিশের অভিজ্ঞ চোখে মৃত্যুর কারণটা স্পষ্ট—ওর গলার দুদিকে পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ; শ্বাসরোধ করে হত্যা।

বর্ধমান থানার ও. সি. আবদুল সাহেব এবং রবি বোস ইতিমধ্যে প্রাথমিক তদন্ত পর্যায়টা শেষ করেছে। গতকাল সারা বর্ধমান স্ট্রেন-ড্রেন পুলিশে ছেয়ে রাখা হয়েছিল। লোকাল টেলিফোন গাইডে ‘B’ অক্ষর দিয়ে যে কটা উপাধি আছে প্রত্যেকটি বাড়িতে টেলিফোন করে আবদুল সাহেবের সহকর্মী একটা রহস্যময় বার্তা জানিয়েছেন: ‘থানা থেকে বলছি। আপনাদের বাড়িতে আজ একটা হামলা হওয়ার গোপন ‘টিপস’ আমরা পেয়েছি। কথটা জানাজানি করবেন না। পুলিশে নজর রাখছে। আপনারা নিজেরাও একটু সাবধান থাকবেন। বেশি রাত পর্যন্ত বাড়ির কেউ বাইরে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।’

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানান জাতের প্রতিপ্রশ্ন হয়েছে—কী জাতের হামলা? ডাকাতি? পলিটিক্যাল? কোন সূত্রে জেনেছেন আপনারা?

প্রতিক্ষেত্রেই একই জবাব: আতঙ্কগ্রস্ত হবার দরকার নেই। পরিবারস্থ মানুষজনের বাইরে কাউকে কিছু বলবেন না। ঝি-চাকরদেরও নয়। এর বেশি কিছু আপাতত বলতে পারছি না। আজ রাতটা কেটে গেলে বুঝবেন ‘টিপসটা’ ভুল ছিল।

কেউ কেউ অতি-সাবধানী একটু পরে রিং ব্যাক করে জেনে নিয়েছিলেন—থানা থেকে সত্যিই একটু আগে ফোন করা হয়েছিল কিনা।

যতই গোপন করার চেষ্টা হোক খবরটা গোপনে পাবলিসিটি পায়। সারা শহরে একটা চাপা উত্তেজনা। কী—কেন—কর বরাতে ঘটতে যাচ্ছে তা কেউ জানত না—কিন্তু জীপের আনাগোনা যে হঠাৎ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে এটাও শহরের মানুষের নজর এড়ায়নি। লোড-শেডিং হয়নি—উপর মহল থেকে কঠিন সতর্কবাণী এসেছিল, সাতাশে রাতে যেন গোটা বর্ধমান এলাকায় একেবারে লোড-শেডিং না হয়। প্রয়োজনে আর সব কটা সার্কিট বন্ধ করেও।



মৃতদেহ যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম মনীশ সেন রায়। অ্যান্ড্রুইউলের অফিসার। ব্যালোর। বয়স ষাণ্মিশ। বর্ধমান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। ফার্স্ট ক্লাস মাসুলি আছে। বনানীকে চেনেন—ব্যক্তিগতভাবে নয়, বর্ধমানের একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী হিসাবে। তাঁর জবানবন্দির সংক্ষিপ্তসার এই রকম:

সচরাচর সেন রায় সাহেব সন্ধ্যা ছ’টা দশের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে রাত আটটার মধ্যে বর্ধমানে পৌঁছে যান। পূর্বরাত্র, অর্থাৎ সাতাশে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল কলকাতায়। তাই বাধ্য হয়ে মেন-লাইনের শেষ বর্ধমান লোকালটা ধরে ফিরছিলেন। প্রথম যে ফার্স্ট ক্লাস কামরাটায়ে ঢোকেন তার নিচের দুটি বেঞ্চিতেই চাদর পাতা। একটিতে একজন লোক শুয়ে ছিল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে। বিপরীত বেঞ্চিতে জানলার ধারে একা বসেছিল বনানী। তার পরনে হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদী, গায়ে ঐ রঙেরই ব্লাউজ। উপরের বার্থ দুটি খালি। সেন রায়ের সঙ্গে বনানীর চোখাচোখি হয়। বনানী ঠুকে না চিনৎ করে ‘ভান করে: সম্ভবত বনানী ঠুকে চিনত না—বর্ধমানের একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলে হয়তো সনাক্ত করতে পারত। অথচ উনি জানতেন, বনানী অভিনেত্রী, এবং তার অনেক পুরুষ ‘ফ্যান’ আছে। বনানীর দৃষ্টিতে একটা বিরক্তির ভঙ্গি লক্ষ্য করে উনি বুঝতে পারেন,—চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া সহযাত্রীটি ওর ‘নাগর’! তাই উনি পাশের কামরায় গিয়ে বসেন। বনানীর সহযাত্রীটিকে উনি দেখেননি; কিন্তু তার পায়ে ফিটেবাধা পুরুষদের জুতোটা চাদরের বাইরে বার হয়ে ছিল। তাতেই উনি আন্দাজ করতে পারেন যে, সে লোকটা পুরুষ।

ট্রেন যখন ব্যান্ডেল ছাড়ে—রাত বারোটা নাগাদ—তখন উনি একবার বাথরুমে যান। লক্ষ্য করে দেখেন, ঐ কামরার দরজাটা টানা। ভেতর থেকে বন্ধ কিনা তা জানতেন না অবশ্য। পরীক্ষা করে দেখেননি।

মনীশবাবুর অভিজ্ঞতায় বর্ধমান লোকালের শতকরা নব্বই ভাগ যাত্রী বর্ধমানের আগেই নেমে পড়ে। গভীর রাতের ট্রেন হলে শেষপ্রান্তের যাত্রীরা ঠাই বদল করে এক কামরায় এসে জোটেন, চিনতাই-পাটির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের জন্য। এমনকি ফার্স্ট ক্লাস নির্জন হয়ে গেলে সেকেন্ড ক্লাসেও চলে আসেন। ওর কামরায় শেষ প্যাসেঞ্জারটি শঙ্কিগড়ে নেমে গেলে উনি কামরা বদলে এ ঘরে চলে এলেন। দেখলেন, দরজাটা তখনও বন্ধ। কৌতূহলবশে পাল্লাটা ধরে টানতেই সেটা খুলে গেল। উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বনানী একা নিচের বেঞ্চেই লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। কামরায় দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। বনানী উঠো দিকে মুখ করে ঘুমোচ্ছিল। মনীশবাবু রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান। ঐ বয়সের একটি মেয়ে দরজা খোলা রেখে এমন অরক্ষিত কামরায় এত রাতে এভাবে ঘুমোয় কী করে! যাই হোক ট্রেন গাংপুর স্টেশান পার হলে তিনি বারকয়েক ওকে নাম ধরে ডাকলেন। ওর নাম যে ‘মিস বনার্জি’ তা জানা ছিল মনীশের। মেয়েটি সাড়া দিল না। তখন বাধ্য হয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন ও অজ্ঞান হয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে না। ট্রেন থামতেই উনি ছুটে দিয়ে গার্ডকে ডেকে আনেন। তখন বোঝা যায়—বনানী অজ্ঞান নয়, মৃত!

ব্যাপারটা ঘোরালো। অত্যন্ত ঘোরালো—যদি মনীশ সেন রায় আদ্যন্ত সত্য কথা না বলে থাকে।

ও. সি. ঠুকে সে-কথা বেশ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, মিস্টার সেন রায়, বুঝতেই পারছেন পুলিশ-অফিসার হিসাবে আমাকে এতকু করতেই হবে। আপনার স্টেটমেন্ট অনুসারে আপনি সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যই করেছেন; কিন্তু আপনার স্টেটমেন্ট করোবরেট করবার কোন উপায় নেই। একটি নির্জন রেল কামরায় ছিলেন আপনারা মাত্র দুজন। আপনি আর মৃত বনানী।

মনীশ সেন রায় ক’বে উঠেছিল, আপনি কি সন্দেহ করছেন— আমি খুন করেছি?

—না। কারণ তা করলে আপনাকে আরেস্ট করতাম। তা করছি না। কিন্তু ‘বর্ধমান-কলকাতা’ ছাড়া আপনি এক সপ্তাহ আর কোথাও যাবেন না। গেলে থানাকে জানিয়ে যাবেন। আপনি অফিস-বাড়ি

## কাটার-কাটার-২

যেমন করছেন তেমনিই করবেন। শুধু আজকের দিনটা ছুটি নিন। কলকাতা থেকে হায়ার-অফিসাররা এনকোয়ারিতে আসবেন।

—কিছু আমার যে সকাল এগারোটায় অফিসে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—আপনি আপনার 'বস'-এর নাম আর টেলিফোন নম্বরটা দিন, আমি টেলিফোনে তাঁকে জানিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ! সেটুকু আমিই করতে পারব। শুধু আজকের দিনটাই তো?

—হ্যাঁ। আয়াম সরি ফর দ্য ট্রাবল।

—না! আপনার দুঃখিত হবার কী আছে? আমারই ভুল! গার্ডকে না ডেকে আমার নিঃশব্দে কেটে পড়া উচিত ছিল।

আবদুল মহম্মদ হেসে বলেছিলেন, সেটাই ভুল হত আপনার। কারণ তাহলে এতক্ষণ আপনি থাকতেন আমার লক্-আপে!

বনানীর বাবা, মা অথবা ছোট বোন ময়ূরাক্ষীর জবানবন্দি এখনো নেওয়া যায়নি। মানে, তাদের মানসিক অবস্থা বিচার করে। তবে ওদের প্রতিবেশীদের জবানবন্দি থেকে বোকা গেছে, বনানী চিরকালই একটু ডাকবুকো ধরনের। অতরাং না হলেও বেশ রাত করে সে অনেকবার কলকাতা থেকে একা একাই ফিরে এসেছে। থিয়েটারে প্রতিরাতে ও দেড়শো টাকা করে পেত, তা ছাড়া যাতায়াত খরচ। অর্থাৎ মাসে প্রায় হাজার টাকা রোজগার করত। সুন্দরী, গ্ল্যামারাস, অভিনেত্রী। বদনাম কিছুটা থাকবেই। জনশ্রুতি সে নাকি সিনেমায় নামবার একটা চান্স পেয়েছিল। ভয়েস-টেস্টিং পর্যন্ত হয়ে গেছে। ফলাফল জানা যায়নি।

বাসুসাহেব বাধা দিয়ে বলেন, বাপ-মা-বোন কাউকেই জেরা করনি তোমরা, তাহলে এত খবর পেলে কার কাছে?

—অমল দত্ত। বনার্জি মহাশয়ের নেস্ট-ডোর নেবার। সদ্যপাস ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। ও পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা। ব্যাচিলার, কলকাতায় ফিলিপ্-এ কাজ করে।

—হুঁ! তার মূল টার্গেটটা কী? রিভার না ফরেস্ট?

—আজ্ঞে?

—সদ্যপাস ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একটি সুপাত্র। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার মূল প্রেরণাটা কোথায় ছিল? বনানী, না ময়ূরাক্ষী?

রবি হেসে বলে, আমার খারগা: বনানী। না হলে এভাবে ভেঙে পড়ত না।

—আর ওদের উপাধিটা কী? বনার্জি না ব্যানার্জি?

—ঐ একই কথা। বনানীর বাবা একটা 'জিনিওলজিক্যাল ট্রি'-র মাধ্যমে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, তিনি স্বনামধন্য ডব্লু. সি. বনার্জির বংশধর। তাই যদিও ওঁর বাবা ছিলেন ব্যানার্জি উনি নিজের নাম লেখেন 'বনার্জি'।

—বুঝলাম। তুমি ঐ দুজনের সঙ্গেই আমার ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দাও। মনীশ আর অমল দত্ত। আর পোস্ট-মর্টাম রিপোর্টটা এলে তার একটা কপি।

আবদুল মহম্মদ বললে, ও রিপোর্টে নতুন করে জানবার কিছু নেই স্যার।

—যু থিংক সো? আমি জানতে চাই— বনানী হেভি ডোজ-এর কোনও ঘূমের ওষুধ খেয়েছিল কিনা, ওর স্টমাকে ভুজাবশিষ্ট কী কী পাওয়া গেছে, আহ্বারের কতক্ষণ পর মৃত্যু হয়েছে এবং ওর দাঁতের ফাঁকে পান সুগুরির কুচি ছিল কিনা।

রবি বোস চোখ টিপে ওর সহকর্মীকে বারণ করল। আবদুল আর কিছু প্রশ্ন করল না।



মনীশ সেন রায় থানাতে জবানবন্দি দিতে এল রীতিমতো উদ্ধত ভঙ্গিতে। কিছু ঘরে ঢুকেই সে একটু থমকে গেল। বাসুসাহেব তখন একমনে পাইপে তামাক ভরছিলেন, চমকটা তিনি লক্ষ্য করেননি। বললেন, ব্রীজ টেক য়োর সীট মিস্টার সেন রায়। শুনুন, আমি পুলিশের লোক নই...

বাধা দিয়ে সেন রায় বলে, জানি স্যার! আপনাকে আমি চিনি। ইন্ ফ্যাক্ট, আপনার কথাই এতক্ষণ ভাবতে ভাবতে আসছিলাম...

—আমার কথা! হঠাৎ আমার কথা কেন?

—এই মাথামোটা পুলিশগুলো নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে কেস সাজাবে। তখন আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে—ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে। তাই।

—আই সী! না, মনীশবাবু! নাইটিনাইন-পয়েন্ট-নাইন পাসেটি চাল তোমার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস সাজাবে না। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি—তুমি টু হান্ড্রেড-পারসেন্ট নট-গিল্টি। আমরা যাকে খুঁজছি সে একটা 'হেমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক'। আধা-পাগল! অ্যান্ড্রুইউলের অফিসার সে হতে পারে না।

—হেমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক! কী করে জানলেন?

—সম্ভবত কাল-পরশুর মধ্যেই খবরের কাগজে তার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। এখন তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব তার সত্য জবাব দিও। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আদালতে এসব প্রশ্ন উঠবে না। তা তুমি আসামীই হও অথবা সরকারপক্ষের সাক্ষীই হও। তুমি কি আমাকে আদ্যন্ত সত্য জবাব দেবে? খুনি লোকটাকে ধরতে সাহায্য করবে?

—বলুন স্যার? আমি ওয়ার্ড-অফ-অনার দিচ্ছি।

—বনানীর প্রতি কি তোমার কোনও সফট-কর্নার ছিল? রোমাণ্টিক্যালি অথবা সেক্সুয়ালি? প্রশ্ন শুনে মনীশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। নড়েচড়ে বললে, ছিল, স্যার। বনানী গ্রামারাস মেয়ে; তার সেক্স-অ্যাপীল ছিল। স্টেজে এবং ট্রেনে তাকে বারে-বারে দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ ছিল না। কোন দিন কথাবার্তা হয়নি।

—তুমি কি জান তার কোনও লাভার ছিল?

—সঠিক জানি না। আন্দাজ করেছি এবং লোকমুখে শুনেছি সে কন্জারভেটিভ ছিল না।

—মীনং...পরসা খরচ করতে রাজী হলে সে লিব্রাল হলেও হতে পারত।

—নতনেয়ে মনীশ বললে, হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

—তুমি নিজেকে কখনো চেষ্টা করেছিলে?

—না, করিনি। আমার মানসিক গঠন সে জাতের নয়। তার সঙ্গে আমার যে আলাপই ছিল না।

—ও কি একা-একা যাতায়াত করতো? কখনো কোনও এসকর্ট তোমার নজরে পড়েনি?

—অর্ন দ্য কন্ট্রারি, ওর সঙ্গে বরাবরই একজন থাকত। ওরই প্রতিবেশী। নামটা ঠিক জানি না।

ফিলিপ্স-এর এজিনিয়ার।

—ওর অভিনয় তুমি দেখনি?

—বহুবার।

—'কুশীলব'-এ কি ওর কোনও প্রেমিক ছিল?

—আমি ঠিক জানি না, স্যার।

—ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্তই। তবে মনে হচ্ছে তোমাকে আবার আমার প্রয়োজন হবে। সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।



অমল দত্ত জীবনবন্দি দিতে এল ঝোড়ো কাকের চোহারা নিয়ে। চুলগলে, শুষু অবিন্যস্তই নয়, বুল-শার্টের বোতামগুলো এক এক-ঘর ভুল ফুটোর ঢোকানো। তার মুখে নিদারুণ বেদনা, হতাশা আর বিরক্তি। রবি বোস বলল, বসুন অমলবাবু।

অমল সে কথায় কান দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, আপনারা আর ক-দফা জীবনবন্দি নেবেন বলুনতো মশাই?

ও. সি. বলেন, ক্ষুদ্র হবেন না অমলবাবু। আমাদের উদ্দেশ্যটা তো বুঝছেন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন...

—অ! তা প্রশ্ন করুন। কী জানতে চান?

বাসু মনে মনে একটা ওকালতি লব্জ উচ্চারণ করলেন: 'হোস্টাইল উইটনেস'। মুখে বললেন, কাল রাত দুটো নাগাদ আপনি কোথায় ছিলেন অমলবাবু?

—টু ফিফটিন-আপ বর্ধমান লোকালের ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। কেন?

রবি এবং আবদুল যেন শক খেয়েছে। সোজা হয়ে বসে দুজনেই।

বাসু নির্বিকারভাবে বলেন, আই সী! যে কামরায় বনানী ছিল?

—না হলে তাকে হত্যা করব কী করে? আমিই তো গলা টিপে তাকে মেরেছি। কেন, জানেন না? ঐরা তো সকলেই জানেন।

আবদুল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রবিও সরে গেছে ওর কাছাকাছি। একটা হাত তার পকেটে। বাসুসাহেব কিছু এখনো নির্বিকার। বললেন, ফর রোর ইনফরমেশান, মিস্টার দত্ত। আমি পুলিশের কেউ নই।

—অ! —এতক্ষণে অমল দত্ত বসে পড়ে চেয়ারে। বলে, আপনি ব্যক্তিটি কে?

—আমি একজন ভারতীয়। পুলিশে যখন আততায়ীকে ধরবার চেষ্টা করে তখন মিথ্যা কথা বলি না। যতই ক্ষুদ্র হই, যতই মানসিক আঘাত পাই। আপাতত এটুকুই আমার পরিচয়।

অমল এবার ঠেকে ভাল করে দেখে বললে, অয়্যাম সরি, স্যার! আপনি পি. কে. বাসু। কাগজে আপনার ছবি দেখছি। কী জানেন স্যার, সকাল থেকে ঐরা আমায় জেরবার করে দিচ্ছেন। যেন মানুষের ব্যক্তিগত সেক্টিমেন্ট বলে কিছু থাকতে নেই... আমার একমাত্র অপরাধ আমি বনানীকে ভালবাসতাম।

—আই সী! এখন কি শাস্তভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? না, আমি পরে তোমাকে ডেকে পাঠাব? তোমার মানসিক ভারসাম্য ফিরে এলে?

—অয়্যাম এক্সট্রিমলি সরি স্যার! না, না, আমি ঠিক আছি। কাল আমি ঠিক ওর আগের দশটা পঞ্চম্বর কর্ড লাইনের লোকালটায় বর্ধমানে ফিরে আসি। রাত দুটোয় আমি বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম।

—তুমি কি বনানীকে তোমার মনোভাব কখনো জানিয়েছিলে?

অমল পুলিশ-অফিসার দুজনের দিকে দেখে নিয়ে বললে, ঐদের সামনে আমি সেসব কথা বলব না স্যার। আপনি যদি জনান্তিকে জানতে চান এবং এসব কথা খবরের কাগজে ছাপা হবে না গ্যারান্টি সেন...

বাসু-সাহেব পুলিশ-পূজবঘরের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা কী বল?

আবদুল কিছু বলার আগেই রবি বলে ওঠে, থানার ভিতর সেটা অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে জীপ রেডি আছে। আপনি মিস্টার দত্তকে নিয়ে রেস্ট হাউসে চলে যান। সেখানে উনি যা বলবেন তা উকিলকে বলা 'প্রিভিলেজড কনফেশন'। আমাদের এক্সিয়ারের বাইরে।

বাসু-সাহেব খুশি হলেন রবির উপস্থিতি বৃদ্ধি দেখে। উপযুক্ত সহকর্মী বেছে নিয়েছেন তিনি। রবি ভালোভা-ই জানে—অমল দত্ত বাসু-সাহেবের মজ্জল নয়, সে যা বলবে তা আদৌ 'প্রিভিলেজড কনফেশন' নয়; কিন্তু এভাবেই অমলের আত্মস্তরিতা বা 'ইগো' চরিতার্থ হবে। এভাবেই তার কাছ থেকে ভিতরের কথা বার করা যাবে।

রেস্ট-হাউসে দু'কাপ কফি নিয়ে বাসু-সাহেব অমল দত্তের এজাহারটা শুনলেন।

ই্যা, অমল দত্ত বনানীকে ভালবাসে, মানে, বাসতো। সে কথা সে তাকে বহুবার বলেছে। বনানী সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিত। তার মনোভাবটা বোঝা যায়নি কোনদিন। কখনো বলেছে, 'বিয়ের পর তো তুমি আমাকে খাচার ময়না করে রাখবে, খিয়েটার করতে দেবে না', কখনো বলেছে, 'আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ, তুমি বাতি নেভাও, আর আমি বাতি জ্বালি।' অমল হয়তো সর্বিশ্বমেয় জানতে চেয়েছে—'তার মানে?' আর বনানী খিলখিল করে হেসে বলেছে—'আমি স্টেজে ঢুকলে স্পট-লাইট আমার মুখে পড়ে, দেখনি? আর তুমি? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার—যার একমাত্র কাজ লোড-শেডিং-এর এজাজমা করা!'

মোট কথা, বনানীর মনোভাবটা বোঝা যায়নি। তবে অমলকে সে যথেষ্ট প্রভ্রম দিত। অমল বর্ষমানে ওর প্রতিবেশী। ওরা প্রায়ই এক ট্রেনে যাতায়াত করত। একসঙ্গে কলকাতায় ঘোরাঘুরি করত।

বাসু-সাহেবের মনে হল—বনানী যে অমলকে নিয়ে খেলা করতো তার দুটো উদ্দেশ্য। প্রথমটা হচ্ছে স্বভাবগত—পুরুষমানুষকে নিয়ে খেলা করায় তার আনন্দ; দ্বিতীয়টা আত্মরক্ষার্থে—অবাকমানীয় পুরুষমানুষকে দূরে হটাতে। অমল ছিল বনানীর 'মোরিফায়েড এসকট'—রাঙতার সাজপরা দেহরক্ষী।

অমল জানালো, বনানীর একাধিক পুরুষবন্ধু ছিল। ওর ধারণা, এইটা বনানীর স্বভাব। ওর আরও ধারণা, এই আপাত—'বেলেলাপনা' একেবারে উপরকার জিনিস। অন্তরে মেয়েটা ছিল দারুণ 'সিউরিটান'—অমলকে সে কোনদিন চুমু পর্যন্ত খেতে দেয়নি।

মাসখানেক হল বনানী নাকি একজন বড়লোক কাপ্তেন ফিল্ম-প্রডিউসারের খপ্পরে পড়েছিল। অমল কখনো তাকে দেখেনি। তবে এটুকু জানে, লোকটা বিবাহিত আর বনানীর শিচ্ছেন দেবার খরচ করত। সে নাকি ওকে সিনেমায় নামিয়ে দেবার সুযোগ দিতে চাইছিল।

বাসু-সাহেব অনেক জেরা করেও সেই অজ্ঞাত কাপ্তেনবাবু সন্ধান কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারলেন না।

অমলও ওঁকে শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করল—বনানীকে যে এভাবে হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বার করতে সে সব রকম সাহায্য করতাই প্রস্তুত।

বাসু-সাহেব তাকেও কথা দিয়ে এলেন, সময় হলে তোমাকে ডাকব।



মুদুল 'শনিবারের চিঠি'র জন্য একটা 'স্টোরি' পেল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সুজাতা একটি মজাদার মেয়ের সন্ধান পেল। তার কণ্ঠটি সোনা দিয়ে বাঁধানো—কী গানে, কী বাকচাতুরীতে। 'কুশীলব'—এর সবাই এবং ডোডার লেন-এর সকলেই মর্মান্বিত। কথা বলার মত মন-মেজাজ নেই কারও। সবাই মুবড়ে পড়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ উষা বাগচী। স্থলাঙ্গী এবং কুদর্শনা। কিছুটা ভগবান মেরে রেখেছেন, কিছুটা বা তার ভোজনপ্রিয়তা। তবু 'কুশীলব'—এ তার ডাক পড়ে। কারণ উষা বাগচী মধুকর্তী। ফরমাসী নাটক যখন লেখানো হয় তখন অন্তত এক সীনের অ্যাপিয়ারেন্সে ভিক্টোরী বা বৈরাগিনী বেশে উষা

## কাটার-কাটার-২

একখানি গান গেয়ে যায়—নাটক মুহূর্তে ‘পর্যোধি’! ওর সঙ্গে আলাপ করে সুজাতা বুঝতে পারে একমাত্র এই মেয়েটাই অতটা মুখড়ে পড়েনি। কিছুটা স্বভাবগত কৌতুকপ্রিয়তায়, কিছুটা বা ঈর্ষায়! জনাত্মিক আলাপে সুজাতাকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, কী বলব তাই—অমন মৃত্যু বেশ শ্রুতরও না হয়; কিন্তু একথাও বলব—ওজাতের মেয়ে এভাবেই পটলোন্তোলন করে!

—ও জাতের মেয়ে মানে?—সুজাতা মেয়েলী কৌতুহল দেখায়।

—দিনরাত যে মেয়ে গুনগুন করে: ‘কে নিবি গো কিনে আমার, কে নিবি গো কিনে?’

—ওর বুদ্ধি অনেক পুরুষ ‘ফ্যান’ ছিল?

—তা যদি বলেন, তা হলে বলব—‘ফ্যান’ বস্তুটা হচ্ছে ‘নেসেসারি ইভল’, শিল্পীর কাছে। আচার্য পি. সি. রায়ও তাই বলতেন—কিছুটা ‘ফ্যান’ হজম করা ভাল। তাই বলে কি গাং গাং করে শুধু ‘ফ্যান’ই গিলতে হবে? ফ্যানটা গেলে ফেলে ঝরঝরে ভাত খেতে হবে না? নিজের ঝকঝকে ঘর, নিজের তক্ততকে ঘর, নিজের বক্‌বকে বাচ্চা?

সুজাতা হেসে বলে, শিল্পীর পক্ষে ‘ফ্যানটা বুদ্ধি ‘নেসেসারি ইভল’?

—নয়? এই আমাকেই দেখুন না। কালো-মোট! তাই বলে কি ‘উষা-ফ্যানের’ নাম কেউ শোনেনি? কিছু আমার কথা হচ্ছে—নিজের মান নিজের কাছে। চেনা নেই, অচেনা নেই, যে কেউ এসে পটাস্ করে ফ্যানের বোতাম টিপল আর অমনি ঝাঁ ঝাঁ পাক খেতে হবে?

সুজাতা সায় দেয়—বটেই তো। বনানীর বুদ্ধি অনেক ‘লাভার’ ছিল?

—তা ছিল। বৃন্দাবনের কনভার্স থিয়োরেম। বোড়শ গোপ! থিয়েটার শেষ হলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে ওকে ডোভার লেন তক্ত এস্কর্ট করে নিয়ে যাবে!

—আপনি তাদের সবাইকে চেনেন?

—কিছু মনে করবেন না ভাই—এটা আপনার বোকার মত প্রশ্ন হল! বোড়শ গোপকে কি চিনে রাখা সম্ভব? বনানী নিজেই চিনতে পারত না। তবে হ্যাঁ—‘হ্যাভসাম, স্মাট, টল, ফেয়ার’ এমন কয়েকটি বংশীবাদককে ডুলতে পারিনি। ভোলা শক্ত।

—বংশীবাদক? আপনার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাতেন বুদ্ধি?

—আপনি ছেলেমানুষ অথবা অঙ্ক! আমার খানদানী বদনখানা দেখছেন না? বংশী অর্থে এখানে ‘হর্ন’ বা ‘হুটার’! ‘শো’ শেষ হলেই সমস্তর উঁরা বংশীধ্বনি করে ‘খনিকে’ ডাকতেন।

এর পরেই থিয়েটারের ম্যানেজার আর কৌশিক ওদের দিকে এগিয়ে আসে। ওদের রসসিক্ত নিভৃত কুজন বন্ধ করতে হল।

## পাঁচ

পয়লা নভেম্বর বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে একটা বিশ্রি দুর্ঘটনা ঘটল।

বেলা তখন আটটা। চিলে-কোঠার ঘর থেকে নিচে নেমে দোতলার ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই ইঁকাড় পাড়লেন, বৌমা?

দোতলায় ওঁরা তিনজনে প্রাতরাশে বসেছিলেন। প্রমীলা এসে বললেন, মাস্টারমশাই? আসুন ভিতরে আসুন।

—না বৌমা, ভিতরে যাব না। তোমার সারা মেঝে নোংরা হয়ে যাবে। এমনতেই এই দেখনা...হাতটা বিশ্রীভাবে কেটে গেল...ইয়ে, দাশু আছে? একটা ব্যান্ডেজ...

ডান হাতখানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন। ডান হাতের তালু দিয়ে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে। ওঁর খুঁতি, জামার আঙ্গিন রক্তে মাখামাখি!

—ঈস! কী-করে এমন হল!...ওগো...শিগগির এস...

ডক্টর দে চায়ের কাপটা নামিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। দেখেই বললেন, মৌ। আমার ডাক্তারী ব্যাগটা—কুইক!

প্রাথমিক চিকিৎসা যা করার তৎক্ষণাৎ করা হল। হাতের তালুতে ব্যাভেজ বাঁধা হল। ডক্টর দে ঠেকে জোর করে একটা খাটে শুইয়ে দিলেন। একটু গরম দুধও খাইয়ে দিলেন স-ব্র্যান্ডি। বললেন, এভাবে হাত কাটলেন কী করে?

—পেলিল ছুলতে গিয়ে।

—আপনি নিজে নিজে আর পেলিল কাটবেন না। মৌকে বলবেন, আর না হলে ঐ যে ঘোরানো পেলিল-কাটা কল পাওয়া যায় তাই দিয়ে কাটবেন।

মাস্টারমশাই হেসে বললেন, আর দাড়ি? শেড় করে দেবে কে? তুই?

ঠিকে ঝিকে প্রমীলা বললেন, তিনতলার ঘরটা মুছে দিয়ে আয় তো কুসমির মা। ঝি বাসন মাঝছিল, বললে, দেব মা, হাতটো অপসর হোক পহিলে।

প্রমীলার মনে হল হয়তো চিলে-কোঠার ঘরখানা খোলা রেখেই মাস্টারমশাই নিচে নেমে এসেছেন। সে ঘরের একটি ডুপলিকেট চাবি গুঁর কাছে বরাবরই থাকে। ঘরে আর কিছু না থাক একটা দামী টাইপ-রাইটার আছে। তাছাড়া রক্তারক্তি কাণ্ড কতটা হয়েছে দেখতে প্রমীলা নিজেই চাবিটা হাতে নিয়ে তিনতলায় উঠে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি!

সিঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা ধারা শেষ হয়েছে গুঁর টেবিলে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, মাস্টারমশায়ের ছড়ানো পাড়ুলিপির পাশেই টেবিলের উপর পড়ে আছে একটা বাঁধানো ফটো। চিনতে পারলেন সেটা। এটা বহুদিন আছে ওঘরে। মাস্টারমশায়ের নয়। একজন স্বনামধন্য পুরুষের। গুরুগিরি তাঁর ব্যবসা। অনেক শিষ্য আছে তাঁর। প্রতি বৎসর জন্মোৎসবে খবরের কাগজে তাঁর নাম, ফটো আর আশীর্বাণী ছাপা হয়। ভক্তদের বরচে। সম্প্রতি একটি নারীঘটিত ব্যাপারে ঐ শ্রৌত গুরুজীর নামে কিছু কেন্দ্রা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। বিধবার সম্পত্তি গ্রাস অথবা স্ত্রীলতাহানি, কী-যেন ব্যাপারটা দাশরথী ঐর শিষ্য নন, গুণগ্রাহীও নন। তাঁর কোনও রুগী রোগমুক্ত হবার পর ফটোখানি ডাক্তারবাবুকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, এটা শোবার ঘরে মাথার কাছে টাঙিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু। ‘বাবা’র আশীর্বাদ তাহলে নিত্য পাবেন। ডক্টর দে স্নেহের দানটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ত্রীকে রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘শোবার ঘরে একে রাখা যাবে না। মাথার দিকে রাখলে রোজ ঘুম ভেঙে ত্রীমুখখানি দেখতে পাব না, পায়ের দিকে রাখলে তা পাব—কিন্তু তাহলে ‘বাবা’র আশীর্বাদের বদলে হয়তো অভিশাপটাই জুটবে কপালে।’ প্রমীলা জানতেন, তাঁর স্বামী এসব গুরুবাদের বিশ্বাসী নন। ছবিখানি তাই দীর্ঘদিন চিলেকোঠার ঘরে হুক থেকে ঝুলছিল।

বর্তমানে দেখলেন, ফটোর কাঁচটা চুরমার হয়ে ঘরময় ছড়ানো। আর একটা পেলিল-কাটা ছুরি ছবিটার উপর এত জোরে মারা হয়েছে যে, ছবি ও ফ্রেম ভেদ করে ছুরির ফলাটা টেবিলে গৌখে আছে!!

প্রমীলা ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন। ছুরিটা সাবধানে উপড়ে নিলেন এবং একটি পুরানো খবরের কাগজে সব কিছু জড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে সন্তপণে নিচে নেমে এলেন। লুকিয়ে ফেললেন সব কিছু।

একটু পরে ঝি এসে ঘরটা ভিজে-ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিয়ে গেল।

মৌ দুপুরে কলেজে বেরিয়ে যাবার পর আদ্যোপান্ত সমস্ত রটনা স্বামীকে জানালেন।

মাস্টারমশাই তখন তিনতলায় ঘুমাস্থেন। আজ আর বই ফিরি করতে বার হননি তিনি।

বিকলে দাশরথী ঠেকে দেখতে এলেন। ঠেকে দেখে মাস্টারমশাই উঠে বসে বলেন, আয় দাশু।

বোস! আজ আর বের হইনি। কালও আমার ছুটি।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—দুপুরে ঘুমটা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। তুই বোধহয় ঘুমের ওষুধ কিছু দিয়েছিলি। নয়? দুপুরে এত ঘুমাইনা তো!

ডাক্তারবাবু বুঝতে পেরেছেন—কী কারণে মাস্টারমশাই ঐ ছবিখানি পেড়ে তাকে ছুরি-বিল্ক করেছেন। গুরু মহারাজের কেচ্ছা-সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকাখানা পড়ে আছে খাটের উপর। তিনি বরং জানতে চাইলেন— কেন মাস্টারমশাই তখন অমন মিথ্যা কথাটা বললেন: পেশিল ছুলতে গিয়ে ঠর হাত কেটেছে। কিন্তু সরাসরি সে প্রশ্নটা পেশ করলেন না। গল্পগুজবের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে বললেন, ঐ টাইপ-রাইটারটা কত দিয়ে কিনেছিলেন স্যার?

—কিনিনি তো। ওটা আমার এক ছাত্রের উপহার দিয়েছিল।

—ছাত্র? আমাদের ব্যাচের? কী নাম?

—না, তাদের ব্যাচের নয়। সেই যে ছেলটাকে পরীক্ষার হলে গলা টিপে ধরেছিলুম।

—তাই নাকি? তার সঙ্গে তাহলে আপনার দেখা হয়েছিল? তবু নামটা মনে পড়ে না?

—দেখা তো হয়নি। একটা বেগানা লোক হঠাৎ একদিন ওটা আমাকে শৌছে দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল সেই ছেলটোর একটি চিঠি। সে সময় আমি বেকার! থাকতুম একটা ছাপাখানায়। এক গাড়োল অধ্যাপকের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় আমার চাকরি যায়। লোকটা অঙ্কের কিছু জানত না, বুঝলি? যে অঙ্ক পাঁচটা স্টেপে কষা যায়, তাকে...

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, সে গল্প আপনি আগেও বলেছেন। টাইপ-রাইটারটার কথা বলুন।

—হ্যাঁ। টাইপ-রাইটার। তখন তো আমি বেকার! কী করব, কোথায় দু মুর্তো অন্ন সংস্থান হবে এই চিন্তা। এমন সময় একটা বেগানা লোক শৌছে দিয়ে গেল ঐ উপহারটা। আর একখানা চিঠি। দাঁড়া তাকে দেখাই...

কাগজপত্র অনেক ঘেঁটেও পত্রটি খুঁজে পেলেন না উনি। শেষে বললেন, তাহলে বোধহয় যত্ন করে রাখিনি। তবে চিঠির বক্তব্যটা আমার মনে আছে। হতভাগা লিখেছিল—“স্যার! আমার অপরাধেই আপনার চাকরি যায়! চুকছিলো আমি, আর চাকরি খোয়ালেন আপনি! আমি এখন ভালই রোজগার করি। শুনছি আপনি বেকার। চাকরি জোগাড় করা আপনার পক্ষে শক্ত। কিন্তু আপনি তো ভাল টাইপ করতে পারতেন, স্যার! এক কাজ করুন—হাইকোর্টের কাছে অনেকে ফুটপাথে বসে টাইপ করে, নিশ্চয় দেখেছেন। দলিল দস্তাবেজ কপি করে। স্বাধীন ব্যবস্থা। চাকরি খোয়াবার ভয় নেই। এই সঙ্গে একটি টাইপ-রাইটার, কাগজ আর কার্বন পাঠিয়ে দিলাম। আবার আপনি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ান। এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার নামটা উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়। যদি আমার নাম ডুলে গিয়ে থাকেন তবে ডুলেই থাকুন। মনে আনবার চেষ্টা করবেন না। ইতি আপনার অযোগ্য সেই ছাত্র।” বুঝলি দাদু! চিঠি পড়া শেষ করে তাকিয়ে দেখি যে-লোকটা যন্ত্রটা নামিয়ে রেখেছে সে ইতিমধ্যে হাওয়া?... ছেলটোর মনটা ভাল ছিল, তাই না? ওর গলা টিপে ধরাটা আমার উচিত হয়নি।

ডাক্তারবাবু এবার প্রসঙ্গান্তরে চলে আসেন। দেওয়ালের একটা হুকের দিকে আঙুল তুলে বলেন, ওখানে একটা ছবি ছিল না, মাস্টারমশাই?

শিবাজীপ্রতাপ অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ, হুক আছে, ফ্রেমের অবস্থিতিজনিত কারণে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে ঐ জায়গাটার একটা বর্ণপার্থক্যও নজরে পড়ে। দীর্ঘসময় সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, ঠিকই বলেছিস! ওখানে অনেকদিন ধরে একটা ছবি টাঙানো ছিল। কার ছবি বলতো?

দাশরথী স্বীকার করলেন না। বলেন, না, এমনিতেই মনে হল। দেওয়ালে কেমন একটা চৌকো দাগ হয়েছে না? অনেকদিন কোন ছবি টাঙানো থাকলেই সচরাচর এমন দাগ হয়।

—যু আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট মাই বয়! আশ্চর্য! কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! অথচ এঘরে আমিই তো থাকি! আমার মনে পড়া উচিত! কার ছবি হতে পারে?



দাশরথী বুঝতে পারেন, 'হতা' মানে মুছে ফেলা। ছুরিটি ঠেংখেই ঠর মানসিক প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। তাই স্মৃতি থেকে ঐ অভ্রয় লোকটার ছবিও মুছে ফেলেছেন। এককালে যেমন অঙ্ক কষা হয়ে গেলে ব্ল্যাকবোর্ড মুছে ফেলতেন।

তাই আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, বাবু! অমুক ব্রহ্মচারীর কি?

—হতে পারে! আই ডোন্ট রিমেম্বার! তবে ভালই হয়েছে, ছবিটা খোয়া গেছে। লোকটা ভাল ছিল না; বুকলি দাশু? পরশু কাগজে কী লিখেছে দেখেছিস?

—না! কী?

আকর্ষ: সংবাদপত্রে যেটুকু বার হয়েছে তার পৃথানুপৃথ বিবরণ দিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। শূধু সেই বিধবার নামটুকুই নয়, সাল-তারিখ, বিধবার সম্পত্তির আর্থিক মূল্য—সব কিছু!

সে-রাতে প্রমীলা স্বামীকে বললেন, তুমি অন্য কিছু ব্যবস্থা কর বাপু! আমার ভয় করে! এ কেমন জাতের পাগল?

ডক্টর দে বলেন, কেমন জাতের পাগল তা তোমাকে কী করে বোঝাই বল? মস্তিষ্কের যে-অংশটা স্মৃতিকে ধরে রাখে তার কয়েকটা স্নায়ু জট পাকিয়ে গেছে ঠর! আর উনি একটা মনগড়া দুনিয়া গড়তে চান—এ দুনিয়ার কোন কোন বস্তু বা প্রাণীর উপর প্রচণ্ড বিদ্বেষে...

—ও সব বড় বড় কথা থাক। আজ যে কাণ্ডটা হল, এর পর ঠেকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। কোন দিন হয়ত ছুরি নিয়ে মৌকেই...

দাশরথী কুণ্ঠিত ভুভঙ্গে একটি সিগারেট ধরালেন। মাস্টারমশাইকে তিনি সতাই ভালবাসেন। হারালো বাপের মতোই। কিছু প্রমীলা যে কথা বলছে সেটাও ভাববার। মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে যে ধরনের আচরণ করেন তা সূহ মানুষের নয়। তাকে রীতিমতো 'পাগলামী' বলা চলে। উনি নিজে ডাক্তারমানুষ। যখন বাইরে যান তখন মৌ আর প্রমীলা এ বাড়িতে অরক্ষিত থাকে। স্বজ্ঞানে না হোক 'অজ্ঞান' অবস্থায় যদি মাস্টারমশাই—

## ছয়

পুলিস কর্তৃপক্ষ তবু সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। সমস্ত খবরটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার স্বপক্ষে প্রায় সকলেই ভোট দিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ডক্টর ব্যানার্জি। তাঁর মতে A B C—না এখন ওর নাম B.C.D.—লোকটা 'নটোরিটি' চাইছে। কাগজে সব কিছু ছাপা হলে তার হত্যালিলা আরও বেড়ে যাবে। আরও আত্মপ্রচার চাইবে। আরও খুন করবে।

ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, ওর 'ইগো' যদি স্খীত হয়, তাহলেই ওর সতর্কতা কমে যাবে। ও ভাববে—বাসু-সাহেব আর পুলিস তার বুদ্ধির তুলনায় কিছুই নয়। ও ভুল করবে!

মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর পলাশ মিত্র বললেন, আমার অভিজ্ঞতা বলে—তা আদৌ হবে না। ওর হত্যালিলাটাই শূধু বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতাটা হ্রাস পাবে না। আপনারা বারে বারে বলছেন, ওর মনের দুটো অংশ আছে—'ডুয়েল পার্সোনালিটি'। একটা অংশে 'মেগ্যালেম্যানিয়া'—'হাঙ্গড়াই ভাব'! সে অংশটা ওকে বলছে: তুমি একজন দুর্লভ প্রতিভা! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপরাধী! পি. কে. বাসু বা পুলিস বিভাগ তোমার কেশগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় অংশটা 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়া'—সে হত্যাবিলাসী। জ্যাক দ্য রীপারের মতো মার্ভারার, স্টোনম্যানের মতো। জন দ্য কীলারের মতো। কিন্তু আমার মতে তার মনের ভিতর আরও দুটি সত্তা আছে!

—আরও দুটি?

—হ্যাঁ। তিন-নম্বর—সে শিশুর মতো সরল। কৌতুকপ্রিয়, শিশু-সাহিত্য পাঠে তার আগ্রহ, লুকোচুরি খেলায়, ধাঁধা সন্ড করায়, লেগ-পুলিং করায়। ওর মস্তিষ্কের সে অংশটা পরিণত হয়নি। বাচ্চাদের দলে ভিড়ে সে আজও খেলতে চায়: ও কুমির তোর জলকে নেমেছি! আর চতুর্থ দিক:

## কাটায়-কাটায়-২

লোকটা অন্ধ কবচে ভালবাসে। খিওরি অব নাহাৰ্স, তার প্রিয়। হয় অ্যাসেভিং অর্ডার, অথবা ডিসেভিং অর্ডার। তার প্রতিটি পদক্ষেপ আঙ্গিক ছকে বাঁধা!

ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, যেহেতু ওর টাইপ-করা কাগজের পিছনে সর্বদা অঙ্কই থাকে?

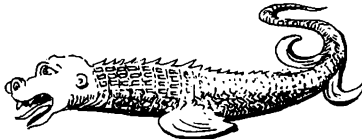
—শুধু সে জন্ম নয়। আপনার থার্ড লেটারটা দিন তোবাসু-সাহেব?

বাসু-সাহেব ঊর সকালে পাওয়া তিন নম্বর চিঠিখানা মেলে ধরলেন।

ডক্টর মিত্র তিনখানি চিঠি পাশাপাশি রাখলেন টেবিলের উপর। বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, তিনখানি চিঠি যদিও দশ-পনের দিন আগে-পরে টাইপ করা কিন্তু একটা আঙ্গিক যোগাযোগ আছে। যেন একটা ম্যাথমেটিক্যাল সিরিজ! তিন নম্বর চিঠিখানা দেখুন প্রথমে!

সকলে ঝুঁকে পড়েন।

তিন নম্বর চিঠি, যেখানি প্রাপ্তিমাত্র বাসু-সাহেব ছুটে এসেছেন, তার আকৃতি ও বয়ান একই রকম। খাম, কাগজ, টাইপ-রাইটারের সেই ছোট হাতের 't' অক্ষরটার একইভাবে লাইন ছাড়া। এবারেও উপরে একটি—একরঙা ছবি। অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা। চিঠিটা এই রকম



'C'-FOR CHILLANOSARAUSAIH NAMAH!

শ্রীযুক্ত পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-লয়েন্স,

“...আমরা মনে করিলাম যে, এইবার বোচারাকে বাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ দিন গেল, দশ দিন গেল, কেবল চীৎকারই চলতে লাগল, খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না...”

কী দুঃখের কথা!

খেড়ে জন্তুটা চীৎকার থামিয়ে সাপের মতো ঐক্যবৈক্যে যদি নদীর দিকে চলে যেতে রাজী থাকে তাহলে সংবাদপত্রে পার্সোনাল কলামে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। অথবা বাকি চতুর্বিংশতিটি হতভাগ্য সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারে।

অধীর আগ্রহে কাগজের পার্সোনাল কলাম লক্ষ্য করব। খেড়ে জন্তুটা হার মানল কি?

'C': FOR CHANDANNAGAR তাং: নভেম্বরের সাতই। ইতি

গুণসন্দিগ্ধ

C.D.E.

ডক্টর মিত্র বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, দশ-পনের দিন আগে-পিছে টাইপ করা চিঠিগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আঙ্গিক নিয়মে। প্রথম চিঠির সম্বোধন 'শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু'; দ্বিতীয়টাতে 'শ্রীল' বাদ গেছে, তৃতীয়টিতে 'বাবু' পরিত্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, সৌজন্যবোধ তিল-তিল করে কমছে। ওদিকে পরশেবেও 'একান্ত গুণমুগ্ধ', দ্বিতীয়ে 'একান্ত' পরিত্যক্ত, তৃতীয়তে একটি নূতন শব্দ 'গুণসন্দিগ্ধ'। নিজের নামটাও একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রগ্রেসানে এগিয়ে চলেছে—A.B.C.; B.C.D.; এবারে C.D.E.! লোকটা অন্ধের মাস্টার হলে আমি বিস্মিত হব না।

ইলপেস্তার বরাট বলেন, দশ-পনের দিন আগে-পিছে টাইপ করলেও ওর কাছে তো আগেকার চিঠির অফিস-কপি থাকতে পারে?

—পারে? আমার সন্দেহ হয়। ফাইল করে যে অফিস-কপি সাজিয়ে রাখে, সে না পাগল, না ক্রিমিনাল! আমার মতে লোকটা আদৌ কোনও কপি রাখেনি। যাতে তার বাড়ি সার্চ করে আপনারা নিশ্চিত প্রমাণ না পেতে পারেন। আমার তো ধারণা, চিঠিগুলো একই টাইপ-রাইটারে টাইপ করাও নয়। অতি সযত্নে দু-তিনটি টাইপ-রাইটারে ‘A’ অক্ষরটাকে ঐ ভাবে উঠিয়ে ছাপানো হয়েছে।

ডক্টর ব্যানার্জি প্রতিবাদ করেন, না! আমার দৃঢ় ধারণা সব চিঠি একই যন্ত্রে ছাপা। অর্থাৎ ‘A’ FOR ASANSOL, 7th inst’, ‘B. for BURDWAN, 27th inst’ এবং ‘C for CHANDANNAGAR, 7th Nov’—এই অংশগুলির টাইপ ভিন্ন যন্ত্রের।

—আপনি বলতে চান, ঐ রকম একটা হুঁত ক্রিমিনাল এ ধরনের একটা টাইপ-রাইটার নিজের হেপাজতে রাখবে? বাড়ি সার্চ হলে যা হবে একটা জোরালো এভিডেন্স?

—তা কী করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? হয়তো যন্ত্রটা রাখা আছে অন্যত্র। যেখানে গিয়ে নির্জনে বসে টাইপ করার সুযোগ তার আছে।

বাসু-সাহেব বলেন, আমার প্রশ্ন: খবরটা কি কাগজে ছাপিয়ে দেবেন? দিলে আজই ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ সময়ের ব্যবধান এবার মাত্র দু-দিন।

আই- জি- ক্রাইম বলেন, সেটা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। পোস্টাল জোনটা ভুল টাইপ করায় চিঠিখানা অহেতুক ডেলিভারি হতে দেরি হয়েছে।

নিউ আলিপুরের 700053-র বদলে খামে অসাবধানে ছাপা হয়েছে 700035। ফলে খামের উপর পোস্টাল ছাপটা উনত্রিশে অক্টোবরের হওয়া সত্ত্বেও চিঠিখানি বাসু-সাহেবের হস্তগত হয়েছে মাত্র আজই সকালে—অর্থাৎ নভেম্বরের ষাট তারিখে। আলমবাজার পোস্টঅফিস থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে।

এস-এস-বার্ডওয়ান রেঞ্জ বলেন, দু দিনই যথেষ্ট। আমার ব্যাটেলিয়ান রেডি। আজই খবরটা আমরা প্রেস-এ দিচ্ছি। তিনখানি চিঠির ব্লক সমেত সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যেকটি নামী দৈনিক পত্রিকায় সরকারী প্রেস-নোট হিসাবে ছাপা হয়ে যাবে। এ ছাড়া সরকারী বিজ্ঞাপনও থাকবে। চন্দননগরে প্রতিটি মানুষ—অন্তর্ ‘সি’ অক্ষর দিয়ে যার নাম বা উপাধি সে সতর্ক থাকবে। ঐ একটি দিন—সাতই নভেম্বর।

বাসু বলেন, তারিখটা সাতই, কিন্তু তিথিটা স্মরণ আছে আপনার?

—তিথি? মানে?

শুক্লা অষ্টমী। চন্দননগরে ঐদিন জগদ্ধাত্রী পূজা! প্রায় লাখখানেক বহিরাগত ওখানে আসবে। সেটা ভেবে দেখেছেন?

আই- জি- ক্রাইম সাহেব শুধু বললেন, মাই গড!

বাসু বললেন, আমার কিছু ধারণা পোস্টাল-জোন নাম্বারটা সজ্ঞানকৃতভাবে ভুল ছাপা। যাতে চিঠিটা ডেলিভারি হতে দেরী হয়।

ইলপেস্তার বরাট মুচকি হেসে বললেন, এটা কিছু আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ‘বিলো-ম্য-কেন্ট’ হিট করা হচ্ছে বাসু-সাহেব। প্রতিবারই সে ষাট-সাতদিন সময় আমাদের দিয়েছে। ঠিকানার ভুলটা স্বজ্ঞানকৃত নয়!

বাসু কোনও অফেন্স নিলেন না। বললেন, কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছে আমরা ক্রমশঃ সতর্ক হয়ে উঠছি। আশঙ্কা করছে, এবার হয়তো আমরা ব্যাপারটা কাগজে ছাপিয়ে দেব। সে জন্যই সে ঐ বিশেষ দিনটি বেছে নিয়েছে। কারণ সে জানে, ঐ দিন ‘সি’ নামের অসংখ্য যাত্রী একবেলার জন্য চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে যাবে। আর হয়তো চিঠিখানা আমরা পাব ঐ সাত তারিখেই!

কিন্তু বহিরাগত যাত্রীর মধ্যে কার নাম অথবা উপাধি ‘সি’-অক্ষর দিয়ে তা সে কেমন করে জানবে?

## কাটার-কাটার-২

—তা কেমন করে বলব? বনানী ব্যানার্জি যে ঐ ট্রেনে বর্ধমানে যাবে সেটাই বা সে কেমন করে জানল? বনানী তো সারাদিন বর্ধমানে ছিল না!

আই-জি বললেন, যেমন করেই হ'ক—চন্দননগরেই যেন এই বীভৎস নাটকের যবনিকাপাত হয়! বরাট বললেন,—আমাদের চেষ্টার ক্রটি হবে না স্যার।

স্থির হল, ডোর চারটে চকিবশের ফাস্ট টু হাড্বেড ওয়ান আপ লোকালে শতখানেক প্লেন-ড্রেস পুলিশ চন্দননগর যাবে। বিভিন্ন গ্রুপে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে সারা শহরে। নামী খবরের কাগজে পর পর দুদিনই সাবধানবাণীটা ছাপা হবে। ছয় ও সাত তারিখে।



পরদিন সকাল। অর্থাৎ ছয় তারিখ। বেলা নটা নাগাদ। বিডন স্ট্রীট বাড়ির চিলে-কোঠার ঘর। ভিতর থেকে ঘরটা ছিটকিনি বন্ধ। চৌকি এবং টেবিল দুটিই স্থানচ্যুত। চৌকির উপর বিছানো আছে সেদিনের সংবাদপত্র। আর গৃহস্বামী চতুষ্পদের ভঙ্গিতে সারা ঘরটা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রায় মিনিটপনের হামা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ো মানুষ, মাজাটা ধরে গেছে। একটু আড়মোড়া ভাঙলেন, তারপর আবার তুলেন নিলেন খবরের কাগজটা।

যা ঝুঞ্জছিলেন এতক্ষণ ধরে, তা পাননি। একটা পেনসিল-কাটা ছুরি আর পেনসিলটা!

অনেকক্ষণ উর্ধ্বমুখে চিন্তা করলেন। সিদ্ধান্তে এলেন—ছুরিটা নিশ্চয় বোমা অথবা দাশু সরিয়ে নিয়েছে। পাছে তিনি আবার হাত কেটে ফেলেন। এ সিদ্ধান্তের পিছনে দুটি যুক্তি। এক নম্বর, ঠুর টেবিলের উপর রাখা আছে একটা পেনসিল-কাটা কল। যেগুলোয় হাত কাটে না, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পেনসিল-কাটা যায়। নিঃসন্দেহে দাশু রেখে গেছে। দু নম্বর, ঠুর দাড়ি কামানোর সরঞ্জামটি অস্বর্জিত।

খোজ করেছিলেন সেটার বিষয়ে। দাশু বলেছিলেন, ‘আপনি এবার থেকে দাড়ি রাখুন স্যার। বেশ খোলতাই অধ্যাপক-অধ্যাপক দেখাবে।’ উনি হেসে জবাবে বলেছিলেন, ‘দূর পাগল। দাড়ি রাখলেই কি থার্ড-মাস্টার কলেজের অধ্যাপক হয়?’

কিছু বৃত্ততে পেরেছেন—শেভিং সেটটা ওরা ইচ্ছে করেই সরিয়ে নিয়ে গেছে। সেফটি রেক্সার নয়, উনি বরাবর ক্ষুর দিয়ে কামাতেন।

তা সে যাই হোক—পেনসিলটা গেল কোথায়?

গভীরভাবে চিন্তা করেও মনে করতে পারলেন না, ঠুর এই চিলে-কোঠার ঘরে কোন শেজিল কোন কালে ছিল কি না। কাগজপত্র সব উল্টে-পাল্টে দেখলেন—না! শেজিলের লেখা তো কোথাও নেই! সব কলম অথবা ডট পেন! তাহলে ‘কী’ ছুলতে গিয়ে অমন মারাত্মকভাবে হাতটা কাটল সেদিন? তবে কি...

ঠুর ডায়েরিটা বার করে আনলেন। খবরের কাগজের সংবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বৃদ্ধ যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। ঠুর হাত-পা ধরথর করে কাঁপতে থাকে। বিচিتر কেয়েসিডেল। কাকতালীয় ঘটনা! পর পর দু বার? প্রথাবিলিটির অঙ্কটা কীভাবে কষতে হবে?

ডায়েরিতে লেখা আছে: উনিশে অক্টোবর রাতে উনি ছিলেন আসানসোলের একটি হোটেল। সাতাশে বর্ধমানে যান, ফেরেন আঠাশে! রাত্রে কোথায় ছিলেন? ডায়েরিতে লেখা নেই। রাত দুটোর সময়? ডায়েরি নীরব। সাতাশে কোন ট্রেনে বর্ধমান যান? ডায়েরি নিরুত্তর!

তবে কি...?

অসম্ভব! এ হতে পারে না! তিনি ফার্স্টক্লাস টিকিট কাটবেন কেন? কিন্তু টিকিট ছাড়াই যদি তিনি ঐ কামরায় উঠে থাকেন? একটি অরক্ষিতা মেয়ে...নীল সিঁকের শাড়ি পরা...নীল ব্লাউজ...রেলকামরায় আর কেউ নেই...আবছা-আবছা মনে পড়ছে না?...।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন দশটা আঙুল নিজের অজান্তেই কখন বিস্তারিত হয়ে গেছে। একি? একি! তিনি ঠুর মাথার বালিশটার গলা টিপে ধরেছেন।

নিজের অজান্তেই আর্দনাদ করে ওঠেন বৃদ্ধ।

নিজের কণ্ঠস্বরেই ...

তৎক্ষণাৎ সহিত ফিরে আসে।

একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ!

বৃদ্ধ দ্রুত হাতে খাট আর টেবিলটাকে স্বস্থানে সরিয়ে দিলেন। খবরের কাগজটাকে বিছানার তলায় ঢাপা দিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার ছিটকিনি খুলে দিতে।

—কী হয়েছে স্যার? চীৎকার করে উঠলেন কেন?—চৌকাঠের ও প্রান্তে সতীক দাশরথী।

—আমি? কই না তো!—দীর্ঘ-দীর্ঘদিন বাদে সজ্ঞান অনুভব করলেন হেমাদিনী বয়েজ খুলের প্রাক্তন থার্ড মাস্টার।

দাশরথী বললেন, আশ্চর্য! আমি যে স্পষ্ট শুনলাম!

—তা হবে। পাগল মানুষ তো!

দাশরথীর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রমীলা। মাস্টারমশাই বললেন, বৌমা বর্ধমানে যেদিন গেলাম—ও মাসের সাতাশ তারিখে—সেদিন আমি কি সকালের ট্রেনে গেছিলাম, না রাতের ট্রেনে?

প্রমীলা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন বলুন তো?

—ডায়েরিতে লিখে রাখতে ভুলেছি।

একটু মনে করে প্রমীলা বললেন, বর্ধমানে তো? সকালে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে বলে গেলেন বর্ধমান যাচ্ছি, মনে নেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।—আসলে কিছু কিছুই মনে পড়েনি ঠুর!

ডাক্তারবাবু সতীক নেমে গেলে উনি একটু চিন্তা করলেন। অঙ্কের মাস্টার। পাঁচ মিনিটেই সলুড হয়ে গেল অঙ্কটা। ডানহাতের তালুটাই কেটেছে। আঙুলগুলো অক্ষত। লিখতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ডায়েরির সেদিনের পাতাখানা খুললেন। ছয়ই নভেম্বর। দেখলেন, লেখা আছে: “চন্দননগর—ঘড়িঘর থেকে গঙ্গাবাট, বাঁ-হাতি প্রত্যেকটি দোকান ও বাড়ি” ঠুর নিজেরই হাতের লেখা। কবে লিখেছিলেন সে-কথা মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে পণ্ডিতেরী আশ্রম থেকে মহারাজের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র এটা লিখেছিলেন ডায়েরিতে। পাতা উন্টে দেখলেন, সাতই নভেম্বরের পাতায় লেখা আছে মহারাজের নির্দেশ: “ভূম্পে কলেজ থেকে ফটকগোড়া—বাঁ-হাতি সব দোকান ও বাড়ি। সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন।”

উনি ডায়েরির ছয় তারিখের পাতায় এখন লিখলেন—“সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়। সাড়ে আট: পোপিল খুঁজিলাম। পাইলাম না। পৌনে নয়টা: বৌমা বলিল, সাতাশ তারিখ সকলের ট্রেনে বর্ধমান গিয়াছিলাম। এখন নয়টা চল্লিশ: স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। উদ্দেশ্য—এগারোটা দশের গাড়িতে চন্দননগর রওনা হওয়া। বাসযোগে হাওড়া যাইব।”

ডায়েরিটা বন্ধ করে এবার আলমারিটা খুললেন। বেছে বেছে খান দশ-বারো বই ব্যাগে ভরে নিলেন।

সবই ধর্মপুস্তক। এখনো অনেক বইয়ের প্যাকেট খোলাই হয়নি। উপায় কী? লোকে যে ধর্মপুস্তক কিনতেই চায় না। শিবাজীপ্রতাপ এজন্য বিব্রত। মহারাজ যদি বিক্রীত বইয়ের উপর কমিশন দিতেন তাহলে সন্ধ্যাচের কিছু থাকত না। কিছু তিনি মনি-অর্ডারে ঠেকে মাস-মাহিনা দেন—বিক্রি হোক আর না হোক! নিঃসন্দেহে মহারাজ ঠেকে তির্যকপন্থায় অর্থ সাহায্য করতেই এ ব্যবস্থা করেছেন। ভাবখানা: ভিক্ষা নয়, উনি উপার্জন করছেন। উপায় কী?

টাইম টেবলটা দেখলেন। এগারোটা দেশের লোকালখানা ধরতে চেষ্টা করবেন। নিশ্চয়ই সেটা ধরা যাবে। কিন্তু প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর ডায়েরিতে উনি লিখে যাবেন—সময় উল্লেখ করে—কখন, কোথায় উনি কী করছেন! স্মৃতির উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না। উনি দেখতে চান—আগামীকাল চন্দননগরে যদি কোনও দুখটনা ঘটে, যদি ইংরাজী 'C' অক্ষরযুক্ত নামের কোনও হতভাগ্য—আহ! সেকথা ভাবাও যায় না। না যাক! উনি দেখতে পান, দুখটনার মুহূর্তে উনি কোথায়, কী করছিলেন। স্মৃতিনির্ভর সিদ্ধান্ত নয়—ডায়েরি কী বলে!

কুঁজো থেকে গড়িয়ে এক গ্রাস জল খেলেন। ক্যাষিসের জুতোর ফিতে বাঁধলেন। তারপর বইয়ের ব্যাগটা তুলে নিয়ে এবং ডায়েরিখানা ভুলে টেবিলের উপর ফেলে রেখে অস্ত্রের মাস্টারমশাই ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করেন।

একতলার ডাক্তারখানায় ঠেকে আটকালেন ডাক্তারবাবু। বললেন, আজ আর নাই গেলেন স্যার? আপনার শরীর এখনো দুর্বল!

—না, না! আমার শরীরটা ভালই আছে। বৌমাকে বলে দিও, কাল সন্ধ্যায় ফিরব।

—কোথায় চলেছেন আজ?

—শ্রীরামপুর।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা!

মুখ ফসকে? না কি পাকা-ক্রিমিনালের মতো?—মনে মনে ভাবলেন অস্ত্রের প্রাক্তন থার্ড মাস্টারটি! মুখটা বেদনার্ধ হয়ে ওঠে! এ কী হোল তাঁর? এত মিথ্যে কথা কী ভাবে বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে? জিয়া যেন ঠাঁর শাসন মানছে না! আশ্চর্য! উনি কি নিজের অজান্তেই তিল তিল করে বদলে যাচ্ছেন? নির্বিরোধী গণিতশিক্ষক থেকে একটা পাকা ক্রিমিনালে রূপান্তরিত হচ্ছেন? ডোরিয়ান গ্রেন-ছবিখানার মতো?

ডাক্তারবাবু বললেন, শ্রীরামপুর? চন্দননগর নয় তো?

যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন বৃদ্ধ। তাঁর আপাদমস্তক একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। দরজায় টোকাঠখানা ধরে সামলে নিলেন নিজেকে। আমতা আমতা করে বলেন, চন্দ-ন-ন-গ-র! ও...ও-কথা বললে কেন হঠাৎ?

ঠাঁর ভাবান্তরটুকু ডাক্তারবাবুর নজর হয়নি। তিনি সিরিঞ্জ হাতে রুগীর বাহুমূলটায় ধরে ইন্জেকশান দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সেদিকে তাকিয়েই বললেন, এক নম্বর: আজ সেখানে প্রচণ্ড ভীড়—কাল জগদ্ধাত্রী পূজা! দু-নম্বর: আজ খবরের কাগজ দেখেননি?

বৃদ্ধ জবাব দিতে পারলেন না। গলকঠটা বারকড়ক ওঠা-নামা করল। ঢোক গিললেন।

যাকে ইন্জেকশান দেওয়া হচ্ছিল সেই রোগীটি বলল, সাংঘাতিক খবর মশাই। বিশ্বাস হয়? খুনিটা

নাকি সেখতে নিতান্ত সাধারণ—আপনার-আমার মতো!

বৃদ্ধ নতনেড়ে নেমে পড়েন পথে। বিনা বাক্যব্যয়ে।

সামনেই একটা পান বিড়ির দোকান। আয়নাটায় দেখতে পেলেন নিজ প্রতিবিম্ব। নিতান্ত সাধারণ। আপনার-আমার মতো।

ছয় তারিখ রাত আটটা। নৈশাহারে বসেছেন বাসু-সাহেব। সপরিবারে। সচরাচর ঠুঁরা ডিনারে বসেন রাত সাড়ে নয়টায়। আজ দেড়ঘণ্টা আগে। কারণ আগামীকাল ভোর পাঁচটার মধ্যে উনি গাড়ি নিয়ে চন্দননগর যাবেন। ঠুঁরা তিনজন। রানী দেবী বাদে। ফলে রাত চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে উঠতে হবে। গাড়িতে পেট্রল ভরা আছে। সঙ্গে যা যাবে সবই গাড়িতে তোলা হয়েছে। শুধুমাত্র বাসু-সাহেবের রিভলভারটা ছাড়া।

কৌশিক বললে, তৃতীয় চিঠিখানার ঐ লাইনটা রোমান হরফে বাঙলায় কেন টাইপ করা হল এটা আমি বুঝতে পারিনি। ঐ যে “Āmrā mone karilām je, aibār Bechārāke khābe bujhi”... ইত্যাদি। ওটার ইংরেজী অনুবাদ করা হল না কেন?

বাসু-সাহেব বললেন, জবাব দেবার আগে একটা প্রতিপ্রশ্ন করি: ‘ব্যাচারার্থেরিয়াম’ আর ‘চিল্লানোসরাস’ জন্তু দুটোকে কেন?

কৌশিক বলে, না; জুরাসিক পিরিয়ডের নয়, এটুকুই শুধু বলতে পারি।

—কেমন করে জানলে?

—‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ আর ‘জুওলজিক্যাল ডিক্সনারি’ খেঁটে।

—হু! তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন? অথবা রানুকে?

কৌশিক নীরব। বাসু-সাহেবই আবার বলেন, সন্ধ্যো?

কৌশিক আমতা আমতা করে, না, মানে ভেবেছিলাম কাল্পনিক কোনও জীব।

—বটেই তো! কিন্তু কল্পনাটা কার? ...জান না! সুকুমার রায়ের নাম শুনেন? শোননি! না শোনাই স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি সিনেমা করতেন না! অন্তত সত্যজিৎ রায়ের নামটা শুনেন? ঐ যে, যে ভ্রমলোক ‘গীতাঙ্গীর পথে’ না কী যেন একখানা পিকচার তুলেছেন? বিড়তি মুখজ্ঞে না বলাইচাঁদ বাঁড়জ্ঞে কার যেন লেখা বইটা! শোননি?

রানীদেবী হাসতে হাসতে বলেন, এতে কিছু প্রমাণ হচ্ছে তুমি ঐ লোকটার চিঠি পেয়ে দারুণ ক্রোশে গেছ! এতটা মেজাজ খারাপ তো সচরাচর কর না তুমি?

তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে রানী দেবী বললেন, ওটা সুকুমার রায়ের লেখা ‘হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি’ থেকে একটা উদ্ধৃতি। নিছক হাসির গল্প। অবশ্য এখন দেখছি ‘নিছক হাসির’ নয়, ও গল্পটা পড়ে কেউ কেউ ক্রোশও যায়।

আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি।

বাসু-সাহেব নির্বাক আহায়ে মন দিলেন।



## সাত

সাত তারিখ।

গাড়িটা যখন চন্দননগর থানা-কম্পাউন্ডে প্রবেশ করল তখন সকাল ছটা সাতচল্লিশ।

বাসু-সাহেবের নজরে পড়ল—থানা-কম্পাউন্ডে বসে আছেন কয়েকজন: ইন্সপেক্টর বরাট, মবি বোস, আর চন্দননগর থানার ও. সি. দীপক মাইতি। গাড়িটা পার্ক করে উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেমিকে। ঠের পিছন-পিছন কৌশিক আর সুজাতা। কেউ ঠদের স্বাগত জানানেন না।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

সুপ্রভাতও নয়। কেমন একটা খটকা লাগল বাসু-সাহেবের। যেন ওঁরা সবাই কী একটা শোকবার্তা শুনে একমিনিট নীরবতা পালন করছেন।

বাসু সবিস্ময়ে বলেন, কী ব্যাপার? সবাই সাতসকালেই এমন চূপচাপ?

দীপক বিহ্বলভাবে উঠে দাঁড়ায়। রবি মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি। ইন্সপেক্টর বরাট বলে ওঠেন, উই আর এক্সট্রিমলি সিরি বাসু-সাহেব! দ্য ড্রামা ইজ ওভার! নাটকের শেষ যবনিকা পড়ে গেছে।

বাসু নিজের অজান্তেই বসে পড়েন। অশ্রুটে বলেন, মানে?

—বাংলা মতে অবশ্য ছয় তারিখ—যেহেতু সূর্য্যোদয় হয়নি—কিন্তু ইংরেজী মতে ‘সি. ডি. ই.’ তার কথা রেখেছে। সাতই সকাল সাড়ে পাঁচটায়!

—কে? কোথায়? কখন খবর পেলেন?

—খবর পেয়েছি মিনিটপ্যাচে ক আগে। টেলিফোনে। ডেড-বডি এখনো সেখানেই পড়ে আছে। আমরা যাচ্ছিলাম। আসুন, আপনি বরং নিজের গাড়িটাই নিন।

দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল দুখানি জীপ। থানার সামনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে জনা-দশেক পুলিশ—যুনিফর্ম এবং ছদ্মবেশে। কে কোথায় পাহারা দেবে সব নির্দেশ এখনো পায়নি ঐ কজন। দীপকের ইঙ্গিতে তাদের কয়েকজন উঠে বসল জীপের পিছনে।

মটোরকেডটা প্রায় গোটা চন্দননগর শহরটা পাড়ি দিল। গঙ্গার কাছাকাছি একটা প্রায়-নির্জন অঞ্চলে এসে থামল। প্রকাশ্য হাতাওয়ালা দ্বিতল একটি সাবেকি বাড়ি। সামনে ঢালাই লোহার কারুকর্ম করা গেট। বোঝা যায়, এককালে শৌখিন বাগান ছিল বাড়িটা ঘিরে—এখন আগাছায় ভর্তি। দারোয়ান সসম্মুখে স্যালুট করে বললে, ইহার পাখারিয়ে সাঁব!

বাড়িতে ঢুকলেন না ওঁরা। দারোয়ানকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন গঙ্গার দিকে। উঁচু একটা বালিয়াড়ি মতো। হয়তো কোন যুগে গঙ্গার ডাঙন রুখতে কেউ মাটি ফেলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়েছিল। এখন কালকশ্মিরি জঙ্গলে ডরা। সেখানে একটা কংক্রিটের বেঞ্চি পাতা। জায়গাটা এমন যে, রাস্তা থেকেও নজরে পড়ে না, গঙ্গার দিক থেকেও নয়। সেই কংক্রিটের বেঞ্চির ঠিক সামনে পড়ে আছে মৃতদেহটা। মধ্যবয়সী একজন ডব্বলোক, বয়স পঞ্চাশের বেশ নিচে। পরনে ফুলপ্যাট, পুরোহাতা শার্ট, হাফহাতা সোয়েটার, গলায় মাফলার জড়ানো। পায়ে মোজা ও হাফিং শ্যু। একটু দূরে ছিটকে পড়ে আছে একটি সুদর্শন হাতির দাঁতের মুঠোয়াল। শৌখিন ছড়ি। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট: মাথার পিছন দিকটা ধেঁতলে গেছে!

বাসু-সাহেব আপন মনে অশ্রুটে বললেন, আসানসোল!

সুজাতা সবিস্ময়ে একবার তাঁর দিকে তাকালো। কৌশিক কানে কানে তাকে বলল, অর্থাৎ সেই প্রথম পদ্ধতিটা। আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে কোন হাতুড়ি নিয়ে এসেছিল লোকটা।

পুলিস ফটোগ্রাফার চার-পাঁচটা ফটো নিল। স্ট্রেকার নিয়ে যারা অপেক্ষা করছিল তারা বলল, অব্ উঠাই সাঁ-ব?

—জেরা সে ঠাঠর যাও!—বললেন ইন্সপেক্টর বরাট। মৃতব্যক্তির পকেট তল্লাসী করে দেখলেন। লাইফ-টাইম পার্কার কলম, মানিব্যাগ—তাতে শ-দুই টাকা, নোট ও ভাঙানিতে, রুমাল, নস্যির ডিবে, একটা নোট বই। লিস্ট বানানো হল। দুজন সাক্ষীর সহ নিয়ে ইনকোয়েস্টও করা হল। বাঁ-হাতের ঘড়িটা ভাঙেনি—সেটা টেরও পায়নি যে, তার ব্রালিকের হৃদস্পন্দন থেমে গেছে। ঠিকই সময় দিচ্ছে ঘড়িটা: টিক্‌টিক্—টিক্‌টিক্!

বাসু বরাটকে বললেন, কে উনি? কী নাম?

—ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি অব্ চন্দননগর।

—ডক্টর? মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার?

—না। ডকটরেট। বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। আসুন, ঘরে গিয়ে বসি।



দারোয়ান পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা খুলে ঠুন্দের বসতে দিল। গৃহবাসী কেউই এগিয়ে এলেন না ভিতর থেকে। বোধহয় সকলেই শোক-বিহ্বল; মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে অপেক্ষা করে বাসু-সাহেব প্রশ্নটা না করে পারলেন না, আর কে কে আছেন বাড়িতে? আই মীন...

জবাব দিল থানা-অফিসার দীপক মাইতি, আছেন ঠুন্ড জী, কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ। শয্যাশায়ী। আর আছেন ডক্টর চ্যাটার্জির শ্যালক মিস্টার বিকাশ মুখার্জি। কিন্তু তিনি গতকাল বিকালে কলকাতা গেছেন। আজ সকালেই ফেরার কথা। এনি মোমেন্ট এসে পড়বেন।

—আর কেউ নেই? যার কাছে কিছু জানতে পারি? অন্তত দুটো খবর...

—কী স্যার সে-দুটো? আমি ঠুন্দের বেশ ভালভাবেই চিনি। আই মে হেল্প য়ু।—জানতে চায় দীপক।

—এক নম্বর: ডক্টর চ্যাটার্জি খবরের কাগজ পড়তেন কিনা, আর দু নম্বর: তিনি জানতেন কি না যে, ঠাণ্ডার নাম চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি।

দীপক চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, আমি মিস্ গান্ধুলীকে খবর পাঠিয়েছি। উনি বলতে পারবেন...মানে, গতকালকার কাগজটা ডক্টর চ্যাটার্জি দেখেছেন কি না।

—মিস গান্ধুলী কে?

—ঠুন্ড প্রাইভেট সেক্রেটারী।

—আই সী! ঠুন্ড কারবারটা কী ছিল?

—কোন কারবারই ছিল না স্যার...আমি যতটুকু জানি বলি, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা—

চন্দননগরের এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার এককালে যথেষ্ট ধনী ছিলেন। বিশিষ্ট বনেদী পরিবার। চন্দ্রচূড়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন ফরাসী সরকারের বেনিয়ান। জাহাজে মাল আমদানি-রপ্তানি করতেন। জাহাজ যেত শহর কলকাতা পণ্ডিচেরি হয়ে মার্সল্‌স্ বন্দরে। এক পুকেই যা সক্ষম করেন বাকি চারপুরুষ তা এখনো শেষ করে উঠতে পারেননি। চন্দ্রচূড়ের পিতামহ ছিলেন আবার অন্য জাতের মানুষ। বিখ্যাত চাকর রায়েচ ছাত্র ছিলেন তিনি—রাসবিহারী, কানাইলাল, শ্রীশ ঘোষদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ যখন চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরি চলে যান তখন ঠাণ্ডার কিছু প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল। ঠাণ্ডার নাতি চন্দ্রচূড় বাঙলায় এম. এ. পাস করে কিছু দিন অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপর হঠাৎ রিজাইন দিয়ে বাড়ি বসেই একটি গবেষণা করছেন আজ ষাচ-সাত বছর ধরে। গুটি ষাচসাত কলেজের ছেলে প্রতিদিন কলেজ ছুটির পর এ বাড়িতে আসে, কী সব রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়। সে সব ব্যাপার দীপক ঠিক জানে না—ঠুন্ড প্রাইভেট সেক্রেটারী অনিতা গান্ধুলী বলতে পারে।

চন্দ্রচূড় ঠাণ্ডার পিতার একমাত্র সন্তান। এবং তিনি নিঃসন্তান। জীবন স্বাস্থ্য কোনকালেই ভাল ছিল না। মাস ছয়েক হল একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। ঠিকে ঝি, চাকর, দারোয়ান সংসারটা চালায়। মহাদেব ড্রাইভার গাড়ি চালায়। চন্দ্রচূড়ের নির্দেশে নয়—তিনি সাথে-পাঁচে নেই—বিকাশের ব্যবস্থাপনায়। সে এ পরিবারে আছে আজ বছর-সপ্তেক। বাইরের দিকটা সেই দেখে, সংসারটা এতদিন দেখতেন রমলা অর্থাৎ মিসেস চ্যাটার্জি—ইহানিং উনি শয্যাশায়ী হবার পর, অনিতা।

বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ সে এল। একটা রিক্‌শা চেপে। ওর সঙ্গে একটি বছর বিশেকের কলেজী ছাত্র। বস্তুত সেই খবর পেয়ে অনিতাদিকে ডেকে এনেছে।

কৌশিকের মনে হল—অনিতার বয়স ত্রিশের কাছে-পিঠে। কিন্তু মেদবর্জিত সূঠম দেহ। মাঝা রঙ, মুখখানি মিষ্টি—কৈদে কৈদে এখন চোখ দুটো রক্তিম। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই।

দীপক ওকে চেনে মনে হল। নাম ধরে ডাকল, এস অনিতা। বস, এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার কাছে কিছু জানতে চান।

অনিতা বসল না। প্রতিপ্রশ্ন করল, বিকাশদা কই?

—কলকাতায়। এখনো ফেরেননি।

## কাটার-কাটার-২

—সে কী! কাল রাতেই তো তাঁর ফিরে আসার কথা। দিসিকে বলা হয়েছে? ...আই মীন, মিসেস চ্যাটার্জিকে?

এবার জবাব দিল বলাই—গৃহতৃত্য। বললে, না! তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন। কিছু জানানো না। দীপক পুনরায় বলল, তাকে জানানোটা জরুরী নয়। আদৌ জানানো হবে কি না তা ডাক্তার বলবেন। মোট কথা, বিকাশবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে জানানো হবে না। তুমি বস। ওরা তোমাকে...উনি হচ্ছেন ইন্টেলিজেন্স বিভাগের মিস্টার বরাট, আর উনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। প্রীজ টেক য়োর সীট।

তবু বসল না অনিতা। তার হাতব্যাগ খুলে একটা নোট বই বার করল। সঙ্গের ছেলেটিকে বললে, বাবলু, এই নম্বরে তুই একটা কল বুক করতো।

—কার নম্বর ওটা?—জানতে চাইল ইলপেঙ্কির দীপক।

—‘সুইট হোম’ নামের একটা হোটেল। শেয়ালদায়। হ্যারিসন রোড ফাইওভারের কাছে। বিকাশদা সচরাচর কলকাতায় নাইট ইন্ট করলে ওখানেই ওঠে। ম্যানেজারের নাম হলধরবাবু।

কৌশিকের খেয়াল হয়নি, কিন্তু সুজাতার মনে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জেগেছে: বিকাশ দেখতে কেমন? বয়স কত? অনিতা যখন কলকাতায় যায় তখন নিশ্চয় প্রয়োজনে ‘সুইট হোম’ে ওঠে। তার মানে কি ওরা দুজনে যখন...না, তা হতে পারে না! হলধরবাবুও নিশ্চয় চেনেন ওদের।...কোনও ডবল-বেড রুমে...অসম্ভব!

সম্বিৎ ফিরে পেল যখন, তখন নজর পড়ল—ঘরের ওপ্রান্তে বাবলু টেলিফোন ডায়াল করছে, আর অনিতা বসে বসে তার এজাহার দিচ্ছে।

অনিতা বাঙলায় এম. এ.। ডক্টর চ্যাটার্জিকে রিসার্চে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে নটা নাগাদ আসে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি ফটকগোড়া অঞ্চলে। বাবা নেই..মা আছেন, একটা ভাই আছে। সে ডেলি-প্যাসেঞ্জার করে। কলকাতায় কোন সওদাগরী আফিসে চাকরি করে। এভাবে বছরপাচেক সে কাজ করছে ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে।

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনাকে উনি কোনও রিসার্চ অ্যালাউয়েন্স দেন?

—মহিনাই বলতে পারেন। মাসে পাঁচ শ। তাছাড়া দুপুরে এখানেই খাই। বলাই রাগা করে। বিকালে যারা আসে—মানে, কলেজের ছাত্ররা—ওরা ঘণ্টা-হিসাবে অ্যালাউয়েন্স পায়। আমিই হিসাব রাখি।

—গবেষণাটা কী নিয়ে?

—উনি একটা ‘রবীন্দ্র-অভিধান’ রচনা করছেন। আমরা স্বরবর্ণ শেষ করে ব্যঞ্জনবর্ণের ‘প’ অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছেছি—

বাসু বলেন, ‘রবীন্দ্র-অভিধান’ মানে?

মিস্টার বরাট ওঁকে বাধা দিয়ে বলেন, মাপ করবেন, বাসু-সাহেব, এ সব অ্যাকাডেমিক আলোচনা আপনি পরে করবেন। আমাকে কয়েকটা জরুরী ব্যাপার জেনে নিতে দিন আগে।

—অল রাইট! যু মে প্রসীড!—বাসু পাইপ ধরলেন।

বরাটের প্রশ্নোত্তরে জানা গেল আরও কিছু তথ্য। বিকাশ ব্যাটিলার। পেশায় মেডিক্যাল রিথ্রিজেন্টেটিভ। হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয় তাকে। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে কলকাতার একটি মেসে থাকত। ওর দিদি শয্যাশায়ী হবার পর থেকে এখন চন্দননগরই ওর হেড কোয়ার্টার্স। তবে সপ্তাহে তিন রাত্রি থাকে কি না সন্দেহ...হ্যাঁ, ডক্টর চ্যাটার্জি গতকাল খবরের কাগজটা পড়েছিলেন। চন্দননগরে যে আজ একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড হতে পারে—এবং টার্গেট যে ‘C’ অক্ষরের নামের অধিকারী এ কথা জানতেন। চন্দ্রচূড়ের নাম ও উপাধি দুটোই ‘সি’ দিয়ে, সুতরাং...

রবি বোস প্রশ্ন করে, বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি প্রাতঃভ্রমণ করতেন। তা আপনি তাঁকে বলেননি আজ সকালে এভাবে একা-একা বার হওয়া তাঁর উচিত হবে না?

—আমি বলিনি। বিকাশদা বলেছিলেন।

—কেন, আপনি বলেননি কেন?

কাল রবিবার ছিল। ছেলেরা কেউই আসেনি। আমারও আসার কথা ছিল না। কিছু খবরের কাগজটা পড়ে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এখানে একটা ফোন করি। বিকাশদা ফোন ধরেন। তিনি বলেন, খবরের কাগজ ঝরাও পড়েছেন। উনি এবং 'স্যার'। যাবতীয় সাবধানতা ঝরা অবলম্বন করছেন। তবু আমি শান্ত হতে পারিনি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ একটা রিক্সা নিয়ে এ-বাড়ি চলে আসি। কারণ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না—ওঁর নাম ও উপাধি দুটোই 'সি' দিয়ে।

এখানে এসে স্যারের দেখা পাইনি। উনি বিকালেও ঘন্টাখানেক বাগানে অথবা গঙ্গার ধারে পায়চারি করেন। তাই বাড়ি ছিলেন না। তবে বিকাশদা ছিলেন। গাড়ি নিয়ে কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। মহাদেব ডাইভারই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। চন্দ্রচূড়ের নিরাপত্তার বিষয়ে কী কী সাবধানতা নেওয়া হয়েছে বিকাশবাবু তা অনিতাকে বিস্তারিত জানালেন। দারোয়ান সতর্ক থাকবে, কোন লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। গেট সমস্ত দিন-রাত তালাবদ্ধ থাকবে। কোন অজুহাতেই যেন বাইরের কেউ না ঢোকে। বড়-সাহেবের অনুমতি নিয়ে কেউ যদি নেহাতই বাড়িতে ঢোকে তাহলে দারোয়ান একটা খাতায় তার নাম, খাম, সময় ও স্বাক্ষর রাখবে। এরপর নাকি অনিতা ঠেকে অনুরোধ করেছিল, 'আজ কলকাতায় নাই বা গেলেন, বিকাশদা?' তার জবাবে উনি বলেছিলেন, 'আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে অনিতা, তবে আজ তো রোববার ঘোষিত তারিখটা আগামী কাল, সাতই। আমি আজ রাত্রেই যেমন করে হোক ফিরে আসব।

—তারপর?—জানতে চাইলেন বরাটসাহেব।

—তারপর ঝরা রওনা হয়ে গেলে আমি দারোয়ানের কাছে খাতাখানা দেখতে চাই। দেখি, সে একটি খাতায় নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে নিষ্ঠাভরে 'এন্ট্রি' করেছে। কে আসছে, যাচ্ছে, সব।

—ডক্টর চ্যাটার্জি জানতেন না এসব কথা?

—কেন জানবেন না? খবরের কাগজ তিনিই সবার আগে পড়েন। পড়ে বিকাশবাবুকে ডেকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমার নামটা যে ডগ্গাবহ তা অ্যান্ডিন জানতুম না।' উনিই বিকাশবাবুকে এইসব সাবধানতার কথা বলেছিলেন এবং নিজে থেকেই বলেছিলেন যে, তিনি সাত তারিখে আদৌ বাড়ির বাইরে যাবেন না।

—মিসেস্ চ্যাটার্জি বা বলাইকে কিছু বলেননি আপনি?

—দিদিকে কিছু বলার প্রসঙ্গ ওঠে না। আর বলাই সে সময় বাড়ি ছিল না।

—আপনি একটু অপেক্ষা করলেন না কেন? উনি ফিরে আসা পর্যন্ত?

—আমার ভাড়া ছিল। আমি আরও কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে সাবধান করে দেব স্থির করেছিলাম—আমার বাস্বী চন্দ্রা চৌধুরী, এক বুড়ি পিসিমা চন্দ্রমুখী চট্টরাজ, আর ঘড়িঘরের কাছে একজন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, চিম্নলাল ছাবরিয়া, ওঁর মেয়েকে আমি পড়াই।

এই সময় বাবলু বলে উঠে, সাইলেন্স ব্রীজ।

সকলে তার দিকে ফেরে। বাবলু ততক্ষণে টেলিফোনের কথা মুখে বলছে, 'সুইট হোম'? ...আমি চন্দননগর থেকে বলছি...হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাক লাইনে। মিস্টার বিকাশ মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক...ইয়েস্! ওঁর বাড়িতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে...হ্যাঁ, হ্যাঁ চন্দননগরেই...ওঁকে একটু...ঠিক আছে, আমি ধরে থাকছি।

এদিকে ঘুরে বলে, ওদের হোটেল ঘরে ঘরে ফোন নেই। বিকাশদা ঘরে আছে, ডাকতে লোক গেছে।

ইলপেঙ্কায় বরাট এক লাফ দিয়ে এগিয়ে যান। বাবলুর হাত থেকে টেলিফোন রিসিভারটা ছিনিয়ে নেন। বললেন, লেট মি স্পীক...

একটু পরে শোনা গেল একতরফা কথোপকথন: বিকাশবাবু?...হ্যাঁ, চন্দননগর থেকেই বলছি। কী ব্যাপার? কাল রাতে ফিরলেন না যে?...না, আপনি আমাকে চিনবেন না।...হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, অ্যাকসিডেন্ট।...না, না, আপনার ভগ্নিপতি ভালই আছেন?...ও তাই নাকি? তাঁর নামও 'C' দিয়ে?...কী? না, আপনাদের বাড়ির কেউ নয়। যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নাম চিমনলাল ছাবড়িয়া। গঙ্গার ঘাটে!...হেড ইঞ্জুরি।...বিকল্প আপনাদের বাড়ির সামনেই, এবং পুলিশ আপনাদের চাকর না দারোয়ান কাকে যেন অ্যারেস্ট করেছে।...অনিতা দেবীর কাছে শুনলাম এই নম্বরে আপনাকে পেতে পারি, উনিই আপনাকে ফিরে আসতে...ইয়েস! যত শীঘ্র সম্ভব।

লাইনটা কেটে দিলেন উনি।

অনিতা বলে ওঠে, মানে? অহেতুক মিথ্যা কথা বললেন কেন?

—এতটা পথ ড্রাইভ করে আসবেন। না হয় বাড়ি এসেই দুঃসংবাদটা শুনবেন।

দীপক বলে, ইতিমধ্যে গুর স্টাডিরুমটা কি একটু দেখবেন? সেখানে যদি কোনো ক্ল...

বরাট বললেন, তুমি দেখে এসো, আমরা একটু পরে যাচ্ছি।

অনিতা আন্দাজ করে তার অনুপস্থিতিতে গুরা কিছু আলোচনা করতে চান। তাই বলে, চলুন, আমি ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছি। তুইও আয় বাবলু।

গুরা ভিতরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করতেই রবি বলে, আপনি হঠাৎ বিকাশবাবুকেই সন্দেহ করলেন যে?

বরাট বলেন, কবি বলেছেন, “যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—” কী মেন বাসু-সাহেব?

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে পাদপূরণ করেন, ‘কাল-কেউটে সাপ!’

রবি বললে, কিন্তু এটা তো একটা ‘অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের’ থার্ড টার্ম, বিকাশবাবু।

বরাট বলেন, ইয়াং ম্যান! তার গ্যারান্টি কোথায়? ‘C.D.E.’ হয়তো সম্ভাব্য বা দুপুরে আর কোন ‘সি’কে খুন করবে। এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল মার্ডার কেস। কেন হতে পারে না? এমনকি হতে পারে না যে, চম্ভুচুড় একটি উইল করে তাঁর সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যেতে চান? তিনি নিঃসন্দ্বান, তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। ফলে তাঁর নিকটতম আত্মীয় এবং ওয়ারিশ ঐ C.D.E.-র ঘোষণার সুযোগ নিয়ে—যেহেতু তাঁর ভগ্নিপতির নাম চম্ভুচুড় চ্যাটার্জি...এই অপকর্মটি করে বসল? এবং তারপর এমনও হতে পারে যে C.D.E. চন্দননগরে এসে শুনল, সাম মিস্টার ‘C C C’ ফৌজ হয়েছেন! সে ব্যাটা কোন উচ্চব্যাচা না করে কেটে পড়ল। আর ঝড়ে মরা কাকটার কেয়ামতি বুদ্ধিমান ফকিরের মত দাবী করে বসল? সে-সঙ্গেই বিকাশকে পুলিশ কোনদিনই সন্দেহ করবে না। তোমার ডিডাকশান মতো চম্ভুচুড় মার্ডারটা চিরটাকাল ক্রিমিনালদের ইতিহাসে লেখা থাকবে অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের থার্ড টার্ম হিসাবে।

বাসু বলেন, কারেই, ভেরি কারেই। শুধু তাই বা কেন বরাট সাহেব? সেই ‘হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক’টাকে যখন আমরা গ্রেপ্তার করব তখনো হয়তো সে স্বীকার করবে না যে, থার্ড মার্ডারটা সে করেনি। কারণ ফাঁসি তো তার একবারই হবে। একটা খুন কল্লক অথবা তিনটেই। সে তো হত্যার রেকর্ড তৈরি করে ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে নিজের নাম লিখে দিতে চায়।

বরাট উঠে দাঁড়ান। রবির দিকে ফিরে নিজের মাথায় একটা টোকা মেরে বলেন, এখানকার থ্রে-সেলগুলোকে আর একটু সচল রাখ রবিবাবু। ডোন্ট টেক এভরিথিং অ্যাট দেয়ার ফেসভ্যালু।

বাসু বরাট-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাউ ডিড্ হি টেক দ্য পাক্স? মানে, জামাইবাবুর বদলে ছাবরিয়া খুন হয়েছে শুনেন?

—নরম্যাল রিয়াকশন! ইফ ছেডে বাঁচল। কৃত্রিম সৌজন্যবশতঃ বলল, কী দুঃখের কথা! কিছু বেশ বোঝা যাচ্ছিল—অ্যাকসিডেন্ট শুনাই সে আঁকে উঠেছিল। জামাইবাবু ভাল আছেন শুনে জেনুইনলি রিলিভড। আসুন, এবার স্টাডিটাকে স্টাডি করি।

—আপনি দেখুন। আমরা একটু পরে আসছি।

বরাট হাসলেন। বলেন, অল রাইট!

একাই এগিয়ে গেলেন তিনি ডক্টর চ্যাটার্জির স্টাডি-রুমের দিকে। বাসু বলেন, রবি, ঐ দারোয়ান বাবাজীবনকে একটু ডাক দিকনি।

দারোয়ান এল। জেরার উত্তরে জানালো যে, গেট রোজ রায়েই তালাবদ্ধ থাকে। বড়সাহেব ভোরবেলা রোজই বেড়াতে যান, তখন এসে সে গেট খুলে দেয়। আজ সকালে সে গেট খুলতে আসেনি, কারণ ছোটবাবু বলে গিয়েছিলেন যে, বড়সাহেব আজ সকালে বেড়াতে যাবেন না। বড়সাহেব ঠিক তবিয়ে খারাপ। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, বড়সাহেব ডুপলিকেট চাবি দিয়ে গেট খুলে...

—বড়সাহেবের কাছে যে ডুপলিকেট চাবি আছে, তা তুমি জানতে?

—জী নেহী সাব!

—বড়সাহেবের তবিয়ে খারাপ, এ কথা তোমাকে কে বলল?

—ছোটসাহেব! তবিয়ে খারাপ হয় ইয়ে বাৎ নেহী বোলা, লেখিন বোলা থা কি উনহোনে ঘরসে স্কিলকুল বাহার নেহি যায়েসে। ইস্ লিয়ে ম্যনে সোচা...

—তোমনে অখবরমে যো খবর...

—জী নেহী সাব! আজই শূনা! 'বিশ্বামিত্র' মে বহু খবর নেহী থা কল!

বাসু-সাহেব ঝরিংগতি রবির দিকে ফিরে বলেন, 'বিশ্বামিত্রে' ইনসার্শন দেওয়া হয়নি?

রবি সলজ্জ বললে, ঠিক জানি না স্যার!

—ছি-ছি-ছি! বিশ্বামিত্রে 'ডবল কলম—পাঁচ সেন্টিমিটার' বিজ্ঞাপন দিতে কত খরচ পড়ে?

রবি চুপ করে ভৎসনা শোনে।

বাসু-সাহেব বারকতক পায়চারি করে ফিরে এসে বললেন, দারোয়ানজী, তোমার খাতাটা নিয়ে এস চা।

দারোয়ান সেলাম করে তার ঘর থেকে খাতাটি আনতে গেল।

—আশ্চর্য তোমরা! আই. জি. ক্রাইম-সাহেব ক্রিমার ইনস্ট্রাকশন দিলেন... আর তোমরা... কী চাচ্ছে তোমরা? পশ্চিমবঙ্গে উর্দুভাষী, হিন্দিভাষী লোকের নাম 'সি' অক্ষর দিয়ে হয় না? নাকি দলনগরে আজ যে কয়েক হাজার মানুষ আসছে তারা সবাই বাংলা-ইরোজি জানে?

রবি এ কথা বলল না যে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না। মাথা নিচু করে হেসেটা শুনল। দোহটা যারই হোক, আরক্ষা-বিভাগের। ফলে, সেও দোষী।

তাঁটা এল। হিন্দিতে লেখা। বাসু-সাহেব বললেন, তুমি পড়ে শোনাও দারোয়ানজী। আমি তে-লেখা দেবনাগরী হরফ ভাল পড়তে পারি না।

দারোয়ান পড়ে শোনায়: এতোয়ার: এক বাজ কর দশ মিনিট... পরকাস্বাবু...

—প্রকাশবাবুটি কে?

বড়সাহেবের দোস্ত। তিনি মিনিট-কুড়ি ছিলেন। খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন: প্রকাশচন্দ্র নিয়োগী। আরপর বিকাল চারটেয় এসেছিল স্থানীয় কিছু ছেলে, জগদ্ধাত্রী পূজার চাঁদা চাইতে। বড়সাহেব খুমোচ্ছেন বলে দারোয়ান তাদের তড়াইয়। পাঁচটা দশে অনিতা দিদি। দারোয়ান তাঁর স্বাক্ষর দাবী করেনি। সওয়া ছে বাজ্ঞে কিতাববাবু—কিছু ভিতরে ঢোকেননি।

—কিতাববাবুটি কে?

দারোয়ান জানায় ভদ্রলোককে সে আগে কখনো দেখেনি। বেগানা লোক বলে ইকিয়ে দিতে

যাচ্ছিল, কিন্তু খোদ বড়াসাব তাকে ভিতর থেকে দেখতে পান। এগিয়ে এসে কোলাপসিবল্ গেটের দুপাশ থেকে তাঁদের কী সব বাৎচিৎ হয়। লোকটা আদৌ ভিতরে আসেনি; কিন্তু বড়াসাহেব তার কাছ থেকে কী একটা কেতাব খরিদ করেন। ওর কাছে টাকা ছিল না তখন। বড়াসাহেবের নির্দেশ মত টাকাটা দারোয়ান ঐ কেতাববাবুকে মিটিয়ে দেয়। খরচটা খাতায় লিখে রাখে।

—তাঁর সেই কই?

—না সেই রাখা হয়নি। তিনি তো বাড়ির ভিতরে ঢোকেননি।

—বইটা কোথায় আছে জান?

—বড়াসাবকা টেবিল পেঁয় হোগা সায়েদ।

—দেখ তো, ঝুঁজে পাও কিনা।

দারোয়ান স্টাডিক্রমে ঢুকে গেল। একটু পরে ফিরে এল একখানি বাঁধানো বই হাতে। প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন। গ্রন্থের নাম—‘উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ’। লেখক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পাতাতে ডক্টর চ্যাটার্জির স্বাক্ষর ও গতকালকার তারিখ।

বাসুসাহেব বলেন, তোমার মনে আছে দারোয়ানজী? লোকটার চেহারা?

—জী হাঁ। বুঢ়া, বড়াসাব সে উমর জেয়াদাই হোগা শায়েদ। পায়ে ক্যাথিসের জুতো। হাতে একটা ঝোলা, তাতে বহুত-সে কিতাব!

—গায়ে একটা ‘ঢিলে-হাতা’ ওভারকোট ছিল কি?

দারোয়ান সবিস্ময়ে বলে, জী হাঁ!

—আর দেখ তো, তোমার হিসাবের খাতায় যে অঙ্কটা লেখা আছে সেটা কি সাড়ে বাইশ টাকা? বইটার দাম?

দারোয়ান দেখে নিয়ে বললে, জী হাঁ। আপকো কৈসে মালুম পড়া?

উত্তেজনার রবি দাঁড়িয়ে উঠেছে। বলে, স্যার! য়ু মীন... য়ু মীন...

বাসু সাহেব বইটার প্রথম পাতাটা খুলে ধরেন।

ঝুঁকে পড়ে দেখল গ্রন্থটার দাম: ষ্টিশ টাকা।

রবি বললে, মনে পড়েছে! আসানসোলের সেই ভদ্রলোকও বলেছিলেন টেন পারসেন্ট কমিশনে লোকটা বই বেচতে এসেছিল। কিন্তু ‘ঢিলে-হাতা’ কোটাটা...

—বাঃ! হাতুড়িটা তো আস্তিনের হাতার মতোই রাখতে হবে!

—মাই গড! একটা বুড়ো ফেরিওয়াল শেখ পর্যন্ত!

## আট

আটই নভেম্বর। বেলা এগারোটা। লডন স্ট্রীটে আই. জি. সি.-সাহেবের ঘরে কনফারেন্স।

ইলপেঙ্টার বরাট বলেলেন, এখন লোকটাকে ঝুঁজে বের করা তো ছেলেখেলা। উচ্চতা—একশ সপ্তর/আশি সে. মি.; ওজন—আন্দাজ সপ্তর কে.জি.; রঙ—তামটে, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। গায়ে ঢিলে হাতা কোট, পায়ে ক্যাথিসের জুতো, বয়স অ্যারাউন্ড ষাট। ক্যানভাসের ব্যাগে বই ফিরি করে।

ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান বলেন, কিছু মনে করবেন না বরাটসাহেব। আপনি যা বলছেন তার অর্ধেক আন্দাজ, বাকি অর্ধেক এফিমেরাল!

—‘এফিমেরাল’ মানে?

—কণ্ঠস্থায়ী। লোকটা হয়তো ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়েছে, জুতো ছেড়ে চটি পরেছে, ঢিলে-কোটটার বদলে এখন তার গায়ে পুরোহাতা সোয়েটার।

বরাট বলেন, কিন্তু আমরা যখন ওর ঘর সার্চ করব? তখন তো এসব জিনিস...

—আগে তার পান্ডা পাই, তার পর তো সার্চ। প্রথম হচ্ছে, ওর যেটুকু বর্ণনা জানা গেছে তা জানিয়ে কি আমরা কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেব?

বাসু জানতে চাইলেন, 'বিশ্বমিত্র', 'ইন্ডেফাক' ইত্যাদি সমেত?

ডি. আই. জি. কঠিনভাবে বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা বাসু-সাহেব! বিশ্বমিত্রে বিজ্ঞাপন থাকলেও কাজ হত না। ডক্টর চ্যাটার্জিকে মৃত্যু টানছিল! নাহলে সব জেনেশুনেও তিনি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেট খুলে শহীদ হতে যাবেন কেন?

রবি বলে, কোল্যাপসিবল্ গেটের দু-পাশ থেকে দুজনের কী কথোপকথন হয়েছে তা দারোয়ান জানে না। লোকটা কি ডক্টরসাহেবকে কোনভাবে সম্বোধিত করে...

ডক্টর পলাশ মিত্র সাইকলজিস্ট। বলেন, অসম্ভব! মানুষ সারারাত ঘুমিয়েও পরদিন ওভাবে সম্বোধিত হয়ে গেট খুলে বেরিয়ে যেতে পারে না। আমি অন্য একটা কথা ভাবছি। এ সংবাদটা কি আপনারা নিয়েছিলেন যে, ডক্টর চ্যাটার্জি 'সোমনামবোলিস্ট' কি না?

বাসু স্বীকার করেন, দ্যাটস্ আ গুড পয়েন্ট! না, ও সম্ভাবনার কথাটা আমাদের মনেই হয়নি। তা হতে পারে বটে! অনেকে ঘুমের ঘোরে নিজের অজান্তেই হেঁটে চলে বেড়ায়। কিন্তু তারা কি রাতের পোশাক ছেড়ে জামা-কাপড় পড়তে পারে? গেট বন্ধ দেখলে চাবি খুঁজে নিয়ে...

ডক্টর মিত্র বলেন, খুব রেয়ার কেস-এ এমন নজিরও আছে!

আই. জি. ক্রাইম একটু অর্ধেকের সঙ্গে বলে ওঠেন, অলরাইট! অলরাইট! ডক্টর চ্যাটার্জি কেন সব জেনে-বুঝেও মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছিলেন তার হেতুটা আপনারা খুঁজে বার করেছেন। আমি অন্য একটা বিষয়ে উৎসাহী: ঐ হত্যাবিলাসীটাকে কীভাবে আমরা খুঁজে পাব?

ডক্টর পলাশ মিত্র বলেন, থার্ড-মার্ডার থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, লোকটার 'ভিক্টিম' চয়নে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। দুটি 'পুরুষ', একটি স্ত্রী। দুটি বৃদ্ধ, একটি অল্পবয়সী। প্রথমটি নিম্নবিশ্তের, দ্বিতীয়টি মধ্যবিশ্তের, তৃতীয়টি উচ্চবিশ্তের। এদের জীবনযাত্রা, উপজীবিকা, শিক্ষা-দীক্ষায় কোনই মিল নেই। এ থেকে একটিই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ও 'মেগালোম্যানিয়াক'—ও মনে করে যে, ও নিজে একজন দুর্লভ প্রতিভার মানুষ। যেহেতু নিজ জীবিকায় সে স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখে রেখে যেতে পারেনি তাই অন্য একটি ক্ষেত্রে—ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে—সে রক্তাক্ষরে নিজের স্বাক্ষর রেখে থাকবে!

রবি বলে, দারোয়ানের জবানবন্দি হিসাবে লোকটাকে আদৌ পাগল বলে বোঝা যায় না কিন্তু।

ডক্টর ব্যানার্জি বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, সে-কথা তো প্রথম দিনেই আমি বলেছিলাম। জ্যাক দ্য হীপার, জন-দ্য কীলারকে দেখেও বোঝা যায়নি যে, তারা হত্যাবিলাসী।

আই. জি. সাহেব বলেন, বাসু-সাহেব! আপনার কী সাজেশান? ঐ খুনিটাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে?

বাসু বলেন, আমাদের প্রথমে ডেবে দেখতে হবে, লোকটা কী ভাবে ভিন্ন-ভিন্ন শহরে ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের নাম-উপাধি জানল? কেমন করে বুঝতে পারল একটি বিশেষ পূর্ব-যোষিত দিনে ঠিক কোন মুহূর্তটিতে ঐ বিশেষ নামের মানুষটি সবচেয়ে ভাল্‌নারেবল্! এ ধাঁধাটা সমাধানের আগে তাকে ধরবার চেষ্টা বৃথা—

—আর একটু বিস্তারিত করে বলবেন?

—ধরুন আসানসোল। অধরবাবু যে অত রাতে দোকানে একা থাকতেন, হঠাৎ যে লোড-শেডিং হবে, এসব কথা তো হত্যাকারী জানত না। জানা সম্ভবপর নয়। কনানী যে গভীর রাতে ঐ ট্রেনের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় একা থাকবে তাও নয়। তাহলে পাঁচ-সাত দশ দিন আগে থেকেই সে কীভাবে আমাকে ঐ জাতের চিঠি লিখতে পারে? ডক্টর চ্যাটার্জির হত্যাকাণ্ড তো একেবারে ভেক্সির পর্যায়!

ইন্সপেক্টর বরাট মুচুকি হেসে বলেন, ডেলুকি! তাহলে এতদিনে আপনি আপনার আই. কিউ-র সমতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন বলুন?

বাসু-সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, মিস্টার বরাট! চিঠিগুলো সে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লিখেছে বটে কিন্তু সে ব্যঙ্গ করেছে এই স্টেটের একটি বিশেষ বিভাগের ইন্টেলিজেন্সকে—ট্যাক্সপেমারদের অর্থে যাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়! আমি ডিফেন্স-কাউন্সেল! অপরাধী খোঁজা আমার জাত-ব্যবসা নয়।

আই. জি. সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, ব্লীজ ব্যারিস্টার সাহেব...

পাইপ-পাউচ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান।

আই. জি. সাহেব বলেন, আপনাকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, বাসু-সাহেব...হ্যাঁ, বরাটের ঐভাবে বলাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

ইন্সপেক্টর বরাটের মুখখানা কালো হয়ে যায়।

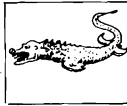
বাসু বলেন, আদৌ না! আমি স্বীকার করছি—লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী! কিন্তু তাকে পাকড়াও করা আমার কাজ নয়। আজ মিটিঙের শুরুতেই নিজ পদাধিকার বলে যিনি ঘোষণা করেছেন—‘এখন তো লোকটাকে গ্রেপ্তার করা ছেলে-খেলা’—তাকে সেই খেলাটা শেষ করতে দিন। তারপর তাকে যখন আদালতে তুলবেন তখন হয়তো আবার আমার ভূমিকা শুরু হবে। ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে।

হঠাৎ ডক্টর মিত্র আই. জি.-কে বলে ওঠেন, স্যার! কিছু মনেকরবেন না। আমরা পুলিশ বিভাগের লোক নই। এক্সপার্ট-ওপিনিয়ন নিতে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই আমি, বাসু-সাহেব বা ডক্টর ব্যানার্জি এ মিটিঙে এসেছি...

ইন্সপেক্টর বরাট ধরাগলায় বলেন, অল-রাইট! আই অ্যাপলজাইজ।

বাসু-সাহেব বলেন, অল-রাইট! লেটস প্রসীড!

আলোচনা আরও অনেকক্ষণ চলল। কিন্তু না বাসু-সাহেব, না বরাট—কেউই মুখ খোলেননি। স্থির হল এখনই সন্দেহজনক ব্যক্তিটির আনুমানিক বর্ণনা সংবাদপত্রে ছাপানো হবে না।



নয়-শশ-এগারো। চারদিন পরে বারো তারিখের সকালে বিকাশ মুখার্জি আর অনিতা এসে হাজির হল বাসু-সাহেবের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। রানী দেবীর মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁরা দেখা করলেন ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে।

—কী ব্যাপার? আপনারা?

বিকশ যা বললেন তার সারাংশ—ওঁরা পুলিশের উপর আদৌ ভরসা রাখতে পারছেন না। একটা ‘হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক’ সমাজে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওঁরা টি. এ. বিল বানাতে ব্যস্ত! ডক্টর চ্যাটার্জির কেসটার তদন্ত করবার জন্য বিকাশ মুখার্জি ওঁকে রিটেন করতে চান।

বাসু-সাহেব বললেন, তোমরা ভুল করছ। আমি গোয়েন্দা নই—

—আমরা জানি। ফর্মালি আমরা ‘সুকৌশলী’কেই এনগেজ করব, কিন্তু যদি আমরা নিশ্চিত হই যে, তার পিছনে আপনার ব্রেনটা আছে।

বাসু বলেন, লুক হিয়ার বিকাশবাসু। লোকটা ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই বারবার তিনবার পত্রাঘাত



করেছে। আমাকেই 'ডি-ফেম' করেছে। এবং আমি সে খবর সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং এটা আমার একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ! তোমরা রিটেন কর বা না কর...

বাধা দিয়ে অনিতা বলে, মাপ করবেন স্যার। আপনি কি আমাদের দিকটাও একটু ভেবে দেখেছেন? একটা নৃশংস খুনী দেবতুল্য ডক্টর চ্যাটার্জিকে খুন করে গেল, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? কবে কোন ক্লর সাহায্যে ঐ বরাটসাহেব বিকাশদার হাতে হাতকড়া পরাবেন?

—বিকাশদা?

—আপনি কি বলতে চান, কেন সেদিন মিস্টার বরাট টেলিফোনে এক গঙ্গা মিথ্যে কথা বললেন তা বোঝেননি?

—আই সী?

—আপনি বিশ্বাস করেন, এটা সম্ভবপর? স্যারকে উনি বড় ভাইয়ের মতো...দিকিকে বিধবা করা...

বাধা দিয়ে বিকাশ বলে, ধীর্জ অনিতা, থাম তুমি—

—না। আমাকে বলতে দাও বিকাশদা।

বাসু বলেন, এ প্রশ্নটাই অবৈধ। ডক্টর চ্যাটার্জি যখন খুন হন তখন বিকাশবাবু কলকাতায়।

—তাহলে? 'স্যার' কত লক্ষ টাকা রেখে গেছেন আমরা জানি না। কিন্তু তা থেকে কিছু খরচ করতে কেন দেনেন না আমাদের? লোকটা আপনাকে চিঠি লিখেছে একথাও যেমন সত্য, তেমনি আমাদের সর্বনাশ করে গেছে এটাও তো মিথ্যা নয়? আপনি একা কেন খরচ-পত্র করবেন। অ্যালাও আস টু হেল্প যু—

বাসু-সাহেব বললেন, অলরাইট। আই এগ্রি। লেটস ফর্ম এ টীম! আরও তিনটি লোকের কাছে আমি প্রতিক্রান্ত। তাদের সাহায্যও আমি নেব। তাদের অর্থ নেই তোমাদের মত, কিন্তু আন্তরিকতা একইরকম আছে।

—কোন তিনজন স্যার?—জানতে চায় বিকাশ।

—এক নম্বর, অধরবাবুর ছোট ছেলে সুনীল আঢ়া, দু নম্বর বনানীর পাণিপ্রার্থী অমল দত্ত আর তিন নম্বর বনানীর ছোট বোন ময়ূরাক্ষী।

বক্তৃত সেদিনই সকালে বাসু-সাহেব ময়ূরাক্ষীর একখানি চিঠি পেয়েছিলেন। মেয়েটি লিখেছে, “আপনি সেদিন আমাদের জবানবন্দি নিতে আসেননি। সত্যিই সেদিন আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। পরে পুলিশ আমাদের জবানবন্দি নিয়ে গেছে। সেসব কাগজপত্র আপনি এতদিনে নিশ্চয় দেখেছেন। কিন্তু তারপরে আমি কয়েকটি সংবাদ ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি। চিঠিতে তা জানানো সম্ভবপর নয়। প্রথমত অনেক অনেক কথা লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যাপারটা একটু ডেলিক্টে। আপনি ব্যস্ত মানুষ। আমিও যেতে পারছি না। বাবা-মাকে ছেড়ে এ সময় কলকাতা যাওয়া সম্ভবপর নয়। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন, আমাদের আর্থিক অবস্থাটা এখন...জানি না, পরীক্ষাটা দেবার চেষ্টা করব, না চাকরি-বাকরি ঝুজব। টিউশানি একটা ধরেছি। সে যাই হোক, আপনার অধীনে একজন মহিলা সেক্রেটারি আছেন শুনছি। তিনি কি আসতে পারেন একবার? মহিলা হলেই ভাল হয়। কারণ আগেই বলেছি, ব্যাপারটা ডেলিক্টে।”

এত কথা বাসু-সাহেব ভাগুলেন না অবশ্য। ডেকে পাঠালেন কৌশিক ও সুজাতাকে। স্থির হল, ওরা একটি বে-সরকারী অনুসন্ধান-সল গঠন করবেন। পরের সপ্তাহে রবিবার, বিশ তারিখে সন্ধ্যায় ঠিক বাড়িতে এই অনুসন্ধানকারী দলটির প্রথম অধিবেশন বসবে।

সুজাতা আর কৌশিক পরদিনই রওনা হয়ে গেল আসানসোল-ভায়া-বর্ধমান। তিনজনকে নিমন্ত্রণ জানাতে এবং সুনীল ও ময়ূরাক্ষীকে আসা-যাওয়ার রাহা-খরচ অজুহাতে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করে আসতে। ময়ূরাক্ষীর বক্তব্য সুজাতা একাই শুনবে।

## নয়

ঐ বারো তারিখ বিকেল সাড়ে চারটে। বিডন স্ট্রীটের বাড়ি।

কলিংবেল বাজাতে কুসমির মা সদর দরজাটা খুলে দিল। মৌ কলেজ থেকে ফিরে এল। খাতাপত্র নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, মুখোমুখি বসে আছেন ওর বাবা আর মা। বাবা ইজিচেয়ারে। তাঁর কোলের উপর একখানা ইংরাজি নভেল। খোলা অবস্থায় উপড় করে রাখা। তিনি কিছু তাকিয়ে বসেছিলেন নিষ্পন্দ সিলিঙ ফ্যানটার দিকে। মৌকে দেখে বললেন, আয়! আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?

মৌ জবাব দিল না। বইখাতা টেবিলের উপর রেখে ঘুরে দাঁড়াল মায়ের মুখোমুখি। তাঁরও কোলের উপর পড়েছিল একটা আখ-বোনা উলের সোয়েটার। নিটিং-এর সরঞ্জাম হাতে তুলে নিয়ে বললেন, মিট-সেফে তোর খাবার রাখা আছে। খেয়ে নে।

মৌ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ সচেতন। কলেজে যায় একটু সজেগুজে। আজ কিন্তু তার প্রসাধনের চিরুমাড় ছিল না—আটপৌরে একটা মিলের শাড়ি পরে কলেজে গিয়েছিল। সে মায়ের নির্দেশ মতো রান্নাঘরের দিকে গেল না। মুখ-হাত ধুতে কলঘরের দিকেও নয়। এসে বসল সামনের একটা সোফায়। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসু এক জোড়া চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন।

মৌ বলল, তোমাদের একটা কথা বলব?

কেউ জবাব দিল না। না অনুমতি, না আপত্তি।

—আমি যাদবপুরে ফিলজফি অনার্স নিয়ে পড়ি। আমার বয়স কুড়ি। আমি প্রাপ্তবয়স্ক। ডাক্তারসাহেব বইটা তুলে নিয়ে নীরবে পাঠে মন দেন। প্রমীলা তাঁর বোনার সরঞ্জামটা নামিয়ে রেখে বললেন, একথার মানে?

—হোয়াই ডোঙ্কু টেক মি ইন কনফিডেন্স? তোমরা নিজেরাই পাগল হতে চাও, না আমাকে পাগল করতে চাও?

কর্ডা-গিল্লির চোখাচোখি হল, গিল্লিই বললেন, কেন? আমরা কী পাগলামী করেছি?

—এক নম্বর: সকালে কলেজ যাবার সময় দেখে গেছিলাম বাপি তিল্লার পাতাটা পড়ছে। এখনও সেই পাতাটাই খোলা আছে। দু নম্বর: তোমার সেলাই এক-কাঁটাও আগায়নি। তিন নম্বর: আমার এক পিরিয়ড আগে ছুটি হয়েছে আজ। আমি সাড়ে পাঁচটায় সচরাচর ফিরে আসি। অথচ আমি ঢুকতেই বাপি বলল—আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?

এতক্ষণে কথা বললেন দাশরথী, কারণটা তো তুই জানিস মৌ! একটা জলজ্যান্ত বুড়ো মানুষ পাঁচ-পাঁচটা দিন নিখোজ। আমরা বিচলিত হব না? আমরা কী করতে পারি?

—যা তোমার করণীয়। থানায় রিপোর্ট করা। মিসিং স্কোয়াডে! তুমি তা কেন করতে পারছ না, তা আমরা তিনজনেই জানি। কিন্তু আমরা পরস্পর তা আলোচনা করছি না। তোমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছ কিনা তা আমি জানি না— আমাকে কেউ কিছু বলনি। চন্দননগর থেকে মাস্টার মশাই কেন ফিরে এলেন না, হঠাৎ কেন এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন...

দাশরথী বলেন, চন্দননগর নয়, শ্রীরামপুর।

—না। চন্দননগর।

—ওটা তোর ভুল আন্দাজ। যেহেতু তুই ভেবেছিস...

—কী?

—তা তো বুঝতেই পারছিস! আমার মুখ দিয়ে নাই বললি!

—অলরাইট! তোমাদের যখন এতই সন্ডো, তখন আমিই মুখ ফুটে বলি; হ্যাঁ। আমার সেটাই

আশঙ্ক। ঠর স্মৃতি মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায়। উনি মনে করতে পারেন না যে, একটা ফটো ছুক থেকে পেড়ে তাকে ছুরি বিদ্ধ করতে গিয়ে ঠর হাত কেটে গিয়েছিল...

ডাক্তার-সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন। প্রমীলা বললেন, হ্যাঁ, ওকে আমি বলেছি। ওর জানা থাকা দরকার। অনেক সময় একা একা থাকে... মাস্টারমশাই...

ডাক্তার দে চট করে উঠে পড়েন। বারকয়েক নিঃশব্দে পায়চারি করে বলেন, কুসুমির মা কি...

—চলে গেছে। আমি সদরে ছিটকিনি দিয়ে এসেছি। তুমি মন খুলে বল—বললে মৌ।

—তোমরা তুল করছ। ইয়েস্, আই অ্যাডমিট। ইতিপূর্বে তিনি মেটাল অ্যাসাইলামে দু'বছর ছিলেন। আমার জ্ঞাতসারে তিন-তিনবার মানুষের গলা টিপে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই প্ররোচনা ছিল।...না, না, প্রতিবাদ করিস না খুকু... আমি জানি, প্ররোচনাটা সামান্য। তোর-আমার দুঃস্থিতিতে। কিন্তু ঠর দুঃস্থিতি অন্য জাতের ছিল। পরীক্ষার খাতায় নকল করা, পূজামণ্ডপে মেয়েদের স্ত্রীলতাহানির চেষ্টা...এ গুরুমহারাজের ভগ্নমী ঠর দুঃস্থিতে ছিল হিমালয়ান্তিক অপরাধ! কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখছি, গায়ে মশা বসলে উনি চাপড় মারতেন না, হাত নেড়ে মশাটাকে উড়িয়ে দিতেন!...ইয়েস! আসানসোল আর বর্ধমানের ঘটনা দুটো যেদিন ঘটে উনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। নিতান্ত কাকতালীয় যোগাযোগ। বর্ধমানে উনি গেছিলেন সকালের ট্রেনে—তোর মার স্পষ্ট মনে আছে...

—কিন্তু চন্দননগর?

—আঃ! আবার বলছিস চন্দননগর! উনি সেদিন শ্রীরামপুরে গেছিলেন। অবশ্য বলতে পারিস আবার কোনও লোকাল ট্রেন ধরে...

—এক সেকেন্ড! আমি আসছি।

মৌ উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। একটু পরে ফিরে আসে একটা ডায়েরি হাতে। বললে, এই পাতাটা পড়ছি শোন...ছয়ই নভেম্বরের পাতা—

“চন্দননগর-ঘড়িঘর হইতে গঙ্গা ঘাট। ঝাঁহুতি প্রত্যেকটা দোকান ও বাড়ি।”

কুক্ষিত ভ্রূঙ্গ দাশরথী বলেন, কই সেখি ডায়েরিটা? ওটা তুই কোথায় পেলি?

—দিছি। সবটা আগে পড়ি। ঐ লাইনটা নীল কালিতে ফাউন্টেন পেন-এ লেখা। তারপর ডট-পেন-এ—মনে হয় অন্য সময়ে লেখা: “সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়। সাড়ে আট: পেলিল খোজা। পাইলাম না। পৌনে নয়টা: বৌমা বলিল, সাতাশ তারিখে সকালের ট্রেনে গিয়েছিলাম। এখন নয়টা চল্লিশ: এগারোটা চল্লিশের গাড়িতে রওনা হইতেছি। বাসযোগে হাওড়া স্টেশন যাইব।”

—তুই...তুই ওটা কোথায় পেলি?

মৌ সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। একই সূত্রে বললে, নেস্ট পেজ—

আবার নীল কালিতে ফাউন্টেন পেন-এ এন্ট্রি—মানে অনেক আগে—“সাতই নভেম্বর: ভূপ্পে কলেজ হইতে ফটকগোড়া—ঝাঁহুতি সব কয়টি দোকান ও বাড়ি। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন।” এর পর বাকি পাতা সব খালি।

এবার সে ডায়েরিটা বাপের হাতে তুলে দেয়। তিনি নিজেও আশ্চর্য পড়লেন। আগেকার কিছু পৃষ্ঠাও উন্মোচন দেখলেন। সম্ভবত আসানসোল ও বর্ধমানের বিশেষ দিন-দুটির পাতা। প্রমীলাও দেখছিলেন ঝুঁকে পড়ে।

কন্যার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে বললে, তোমার প্রশ্নটার জবাব মূলত্বি আছে। এটা খুঁজে পেয়েছি তিনডলার চিলে-কোঠার ঘরে। তোমাদের কিছু বলিনি। যেহেতু তোমরা আমাকে কনফিডেন্সে নিচ্ছ না! বেশ বোঝা যায়, মাস্টারমশাই নিজেও নিজের স্মৃতির উপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। আশঙ্কা হয়েছিল—নিজের অজান্তেই তিনি খুনগুলো করেছেন। আই গ্রীন, হ'তারিখের কাগজ পড়েই হয়তো একথা মনে হয়। তাই ছয় তারিখে ঐ আপাত-অসঙ্গত কথাটা লেখা—“সকাল আটটা দশ:

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

খবরের কাগজ ক্রয়।”আধঘণ্টা চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন, তাই “পেনসিল খোঁজা, পাইলাম না!” ঠুর হয়তো একটু একটু মনে পড়ছিল—পেনসিল কাটতে গিয়ে হাত কাটেনি। কাউকে খুন করতে গিয়েই ওভাবে হাতটা কেটেছে। কিন্তু কে সে? ঠুর মনে পড়েনি। স্থির করেছিলেন, আর স্থিতির উপর নির্ভর করবেন না। চন্দননগরে যাচ্ছিলেন তিনি—সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রতি দশ মিনিট অন্তর ডায়েরিতে লিখবেন, কখন কী করছেন। যাতে পরদিন যদি দেখেন চন্দননগরে কেউ খুন হয়েছে তখন স্মৃতিনির্ভর সমাধান নয়, ডায়েরির মাধ্যমে উনি জানতে পারবেন—হত্যাযুগ্মে তিনি ঠিক কোথায়, কী করছিলেন। অথচ ভুলোমানুষের মতো যাবার সময় ডায়েরিটা ফেলে যান।

ডক্টর দে বললেন, তাহলে তিনি আমাদের কেন মিছে কথা বলে গেলেন? কেন বললেন, শ্রীরামপুর যাচ্ছি!

—‘গিট কনশাস্’ মাইন্ডের জন্য। তিনি যে তখন নিজেই জানেন না, তিনিই ঐ ‘হেমিসাইডাল ম্যানিয়া’ কি না। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে বাপি! তুমি এবার থানায় গিয়ে রিপোর্ট কর।...তাবছ কেন? তুমি তো শুধু বলবে যে, তোমার বাড়ি থেকে একজন বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধ নিখোজ হয়েছেন। আর তো কিছু বলবে না তুমি।...না হয় চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। দাশরথী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ডগবান আমার প্রার্থনাটা শুনলেন না তাহলে?

মৌ বেন ছোট ছেলেকে আদর করছে। বাপের মাথায় ব্যাকব্রাশ চুলগুলোর উপর হাত বুলিয়ে সেও ধরা-গলায় প্রহর করে, কী? কী প্রার্থনা করছিলে এ কয়দিন?

মেয়ের চোখে চোখ রেখে প্রৌঢ় বলে ওঠেন, একটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট...মাস্টারমশাই...ইন্সট্যান্ট ডেথ!

প্রমীলা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। তিনি জানতেন, ঐ বৃদ্ধ ছিলেন তাঁর বিকল্প স্বশুর।

## দশ

তের তারিখ সকাল আটটা।

আজও ব্রেকফাস্ট-টেবিলে এসে কৌশিক দেখে চতুর্থ চেয়ারখানি শূন্যগর্ভ। বললে, কী ব্যাপার? বাসুসামু এখনো ফেরেননি?

রানী দেবী টোস্টে জ্যাম মাখাছিলেন। বললেন, ফিরেছেন। ঘণ্টাখানেক আগে। স্টাডিজ-রুমে ঢুকেছেন।

সুজাতা বলে, ডেকে আনি?

রানী বলেন, না থাক। আমিই যাচ্ছি—

—কেন? আপনি কেন আবার কষ্ট করবেন?

রানী তাঁর ব্রুইলচেয়ারে ইতিমধ্যেই একটা পাক মেরেছেন। থমকে থেমে গিয়ে বলেন, তোমাদের মামুর ভাষায় ‘নাইন্টি-নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট চান্স’—চতুর্থ চিঠিখানা এসেছে।

কৌশিক চমকে ওঠে। বলে, মানে? আপনি কী করে জানলেন?

—আমি একে ব্যারিস্টারের বউ তার উপর গোয়েন্দার মামী। আমাকেও একটু-একটু ডিডাকশান করতে হয় কৌশিক। উনি সব বিষয়েই ওভার-পাঙ্খুয়াল। ঘড়ি ধরে সাড়ে ছয়টায় মর্নিং-ওয়াকে গেলেন, কিন্তু এক ঘণ্টা বেড়ালেন না। ফিরে এলেন সাতটায়। ঢুকে গেলেন স্টাডিজ-রুমে। সেখানে সচরাচর মিনিট পনের থাকেন। আজ আছেন এক ঘণ্টার উপর।

সুজাতা বলে, তাই যদি হয়, তবে আপনাকেই যে চাকা-সেওয়া গাড়িতে ডাকতে যেতে হবে তার মানেটা কী?

—বুঝলে না? স্বাউনড্রেলটা এবার আরও অবমাননাকর ভাষায় লিখেছে। মহাদেবের ত্রিনয়ন থেকে যখন অগ্নিফুল্লিঙ্গ বার হয় তখন ত্রিনয়নী শিবানীই তাঁকে ঠাণ্ডা করতে পারেন।

সুজাতা ও কৌশিক বসল নিজ নিজ আসনে। রানী দেবী তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে চলে এলেন স্টাডি-রুমে। দ্বারপ্রান্ত থেকে বললেন, ব্রেকফাস্টে আসবে না?

বাসু-সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, এগিয়ে এস। দেখ, তোমার কর্তার রাইভালটার খানদানি বদনখানা!

মেলে ধরলেন সংবাদপত্রটা।

প্রথম পাতায় শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর একটি আলোকচিত্র। নিরীহ গোবেচারী ইন্সুলমাস্টার-মার্কা চেহারা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী—যেটুকু সংগৃহীত হয়েছে এ পর্যন্ত—তা প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে:

হেমাসিনী বয়েজ স্কুলের খার্ড মাস্টার। অঙ্কের টীচার ছিলেন। বদমেজাজী। এ পর্যন্ত তিনবার তিনি মানুষ খুনের চেষ্টা করেছেন এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত। তিনবারই গলা টিপে। পরে তাঁর চাকরি যায়। মানসিক চিকিৎসালয়ে বছর দুই ছিলেন। যে মানসিক চিকিৎসালয়ে বন্দী ছিলেন তার ডাক্তারের ইন্টারভু নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে বৃদ্ধ ‘মেগালোম্যানিয়া’! মনে করতেন তিনি ছত্রপতি শিবাজী অথবা চিতোরের রাণাপ্রতাপের সমপর্যায়ের এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। সমাজ-সংসার এটা বুঝতে পারছে না। এটাই তাঁর পাগলামি। ঐ সঙ্গে ছিল মৃগীরোগ ও ‘ক্রনিক অ্যামেনশিয়া’—দীর্ঘস্থায়ী ‘অস্মার রোগ’—অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিশেষ সময়ের স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া। গোয়েন্দা বিভাগ ও আরক্ষা বিভাগের মতে সাম্প্রতিক কালের তিন তিনটি বীভৎস খুনের ইনিই হচ্ছেন নায়ক। প্রথমে আসানসোলার অধর আত্ম, তারপর বর্ধমানের বনানী ব্যানার্জি এবং শেষে চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়। ঐ তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের পরেই আততায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর পরিধানে ছিল...ইত্যাদি ইত্যাদি।

রানীর প্রত্যাবর্তনে দেরি হচ্ছে দেখে কৌশিক ও সুজাতাও গুটিগুটি এসে জুটেছে।

টোস্ট-ডিম-কফির কথা আর কারও মনেই রইল না। তিন-চারখানি কাগজ ঠুঁরা ভাগাভাগি করে পড়তে থাকেন।

রানী বলেন, তোমাদের বিশ্বাস হয়?

কৌশিক বলেন, বলা কঠিন। লোকটা ব্যাগে করে বই ফিরি করত—আসানসোল ও চন্দননগরে হয়তো সে উপস্থিত ছিল। এছাড়া তো সবই খবরের কাগজের রিপোর্টারের আশুবাঁকা।

হঠাৎ বন্ধন করবে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু তুলে নিয়ে আত্মপরিচয় দিতেই ও প্রান্ত থেকে রবি বোস বলে, গুডমর্নিং স্যার। খবরের কাগজ দেখেছেন? আততায়ীর ছবি?

—দেখছি। কিন্তু এভিডেল কোথায়? লোকটার একমাত্র অপরাধ তো দেখছি বই ফিরি করা।

—না স্যার। ক্রিমার কেস! এভিডেল সূর্যোদয়ের মতো স্পষ্ট। এখন আসছি আমি।

রবি বসুর কাছ থেকে বিস্তারিত অনেক কিছু জানা গেল। ঐ শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তির পূর্ব-ইতিহাস। অনেকটাই অবশ্য এখনো কুয়াশা ঢাকা।

গতকাল সন্ধ্যা ছটা নাগদ বিডন স্ট্রিট থানাতে এক ডাক্তার ভদ্রলোক আর তাঁর কন্যা মিসিং স্কোয়াডে একটা এজাহার দিতে আসেন। হারিয়েছেন একজন বৃদ্ধো মানুষ, ঠুঁর বাড়ির তিনতলার চিলে-কোঠার ঘরে ভাড়া ছিলেন। একাই। তিনকূলে তাঁর কেউ নেই। জগদ্ধাত্রী পূজার দিন চন্দননগর যান, তারপর থেকে নিখোঁজ। তাঁর বিবরণ এবং তিনি ফেরি করে বই বেচতেন শুনে থানা অফিসার সন্দেহ হন। লালবাজারে জানান আর রবিকেও টেলিফোন করেন, কারণ প্রতিটি থানায় জানানো হয়েছিল, রবি বোস ঐ ‘এ. বি. সি.—হত্যা’ রহস্যের ‘অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি’ রবি বারবার বাসু-সাহেবকে টেলিফোনে খবর দেবার চেষ্টা করে কিন্তু টেলিফোনে কিছুতেই লাইন পায় না। ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর বরাট বারবার তাগাদা দেওয়ায় তাকে যৌথ ভদ্রস্বে যেতে হয়।

## কাটার-কাটার-২

ডাক্তার দাশরথীর কাছ থেকে ঠুং পূর্ব-ইতিহাস যা জানা গেছে তার বেশির ভাগই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। বাড়তি খবর—যেটা প্রকাশ করা হয়নি, তা বৃদ্ধের এমপ্লয়ারের পরিচয়। পণ্ডিতের একটি আশ্রম থেকে এই চাকরিটি দিয়েছিলেন। পার্সেলে বই আসত। মাসে মাসে মনি-অর্ডারে ঠুং মাহিনা আসত। রবি আর ইন্সপেক্টর বরাট ঠুং ঘরটা সার্চ করে। ঠুং ঘরের একটি আলমারিতে থরে থরে প্যাক করা বই ছিল। সবই ধর্ম বা ধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্যপুস্তক। সর্বসমেত একশ তেরটি। তার ভিতর প্যাকেট না খোলা একটি বাতিলে পাওয়া গেছে একটি মারাত্মক এভিডেন্স 'সুকুমার সমগ্র' রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড। তার তিনশ-আশি নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ব্রেন্ড দিয়ে নিপুণভাবে দুখানি ছবি কেটে বার করা। কী ছবি ছিল জানা গেছে। অন্য একটি কপি দেখে। উপরের ছবিটি 'ল্যাংড়াধেরিয়ামের' এবং নিচে 'ব্যাকারিথেরিয়াম' আর 'চিল্লানোসরাসের' ছবি। শেষের ছবি দুটি ব্রেন্ড দিয়ে যেভাবে কাটা তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে দুটিই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে সরাসরি আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছিল। তৃতীয় ছবিটি 'L'-অক্ষর দিয়ে। সেটা কেন কাটা হয়েছে বোঝা যায়নি। আরও একটি মারাত্মক এভিডেন্স। ঠুং টেবিলে ছিল দামী একটা টাইপ-রাইটার। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ যে, এ যন্ত্রটি দিয়েই তিনখানি চিঠি টাইপ করা।

সব কিছু এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করে ইন্সপেক্টর বরাট নিয়ে যান। রবি প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল পি. কে. বাসু সাহেবকে না জানিয়ে এ সব বই, টাইপ-রাইটার, ঠুং কাপড়-জামা ইত্যাদি সরানো-নড়ানো উচিত নয়, কারণ আই. জি. ক্রাইম সাহেবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে দুটি টীম সমান্তরালে কাজ করবে, একে অপরকে সাহায্য করবে।

তার জবাবে ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, এখন পরিস্থিতিটা নাকি পাল্টে গেছে! বাসু-সাহেব সবই দেখতে পাবেন আদালতে। যখন পিপলস্ এক্সিবিট হিসাবে সেগুলি দাখিল করা হবে।

বাসু প্রশ্ন করেন, এ বুড়োটাকে এখনো ধরা যায়নি?

—না। আজই তার ছবি ছাপা হয়েছে কাগজে। আজ সন্ধ্যায় টিভিতেও দেখানো হবে। বিকৃতমস্তিষ্কের মানুষ। পকেটে টাকা-পয়সা বোধহয় সামান্যই আছে। আমার তো ধারণা ওকে ধরা এখন—

বাসু-সাহেব বলেন, 'ছেলেখেলা!'

রবি হাসল। বলল, অনেকটা তাই স্যার। আমরা তো তাই আশা করছি... দুই কি তিন দিন!



বাস্তবে ব্যাপারটা হল উল্টো। একটার পর একটা বিশ্রি ঘটনা! মারাত্মক ও বেদনাদায়ক। রবি বোসের ঘোষণা অনুসারে তিন দিনের মধ্যে লোকটা আসৌ ধরা পড়ল না—কিন্তু সাতজন নিরীহ লোক গণখোলাইয়ের শিকার হল। তাদের অপরাধ—তাদের দেহাকৃতি এবং জীবিকা ঐ অজ্ঞাত আততায়ীর মতো। ঐ সাতজনের মধ্যে দুজন মারাই গেল। তাদের একজন ফিরি করত ধূপকাঠি, দ্বিতীয়জন বেচত না.. কিনত—পুরনো খবরের কাগজ!

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বেতারে বিবৃতি দিলেন। দূরদর্শনে উপস্থিত হয়ে বিশেষ ঘোষণায় অতি-উৎসাহী জনগণকে অনুরোধ করলেন—যা করণীয় তা পুলিশকেই করতে দিন। সরকার জনগণের সহযোগিতা

## অ-আ-ক-খুনের কাটা

ান—নিশ্চয়ই চান—তবে সীমিত ক্ষেত্রে। সম্ভবজনক কিছু নজরে পড়লে জনগণ যেন অনুগ্রহ করে গানায় খবর দেন। সরকার জনগণের কাছে আর কোন সক্রিয় সাহায্য কামনা করছেন না।

এতে লাভবান হল কিছু সাময়িক পত্রিকা—যারা মুখরোচক স্টাট নিউজ ছাপাতে ওস্তাদ। পত্রিকার টিপিপত্র-বিভাগের বৃকোদর অংশ দখল করল 'এ. বি. সি...হত্যারহস্য'। কাগজ খুলে কেউ দেখতে পায় না জরুরী খবরগুলো: ভারত এশিয়াডে কত নিচে নামল, প্রধানমন্ত্রীকে কী জাতের স্বর্ধনা করা হল অথবা পূর্তমন্ত্রী কোন মূর্তিকে কবে মাল্যভূষিত করলেন। সকলেই সর্বপ্রথমে জানতে চায়: লোকটা রো পড়েছে কি না।

এই যখন সারা দেশের অবস্থা তখনই ডাকযোগে এসে পৌছলো সেই দুঃসাহসী হত্যাবিলাসীর চতুর্থ প্রেমপত্র। এবারও খামের উপর ভুল ঠিকানা। পোস্টাল জোনটায় একটিমাত্র শ্রান্তি; প্রথম সংখ্যাটা সাত-এর বদলে 'এক'। অর্থাৎ পোস্টাল জোন: 100053। চিঠিখানা চন্দননগরের ডাকঘরের ছাপ নিয়ে চলে গিয়েছিল শ্রীনগর। সেখান থেকে পুনর্নির্দেশিত হয়ে বাসু-সাহেবের হাতে এসে পৌছলো ষোলো তারিখে। একই রকম খাম, কাগজ, একপিঠে আঁক-কষা, অপর পিঠে—না, এবার দুটি ছবি। টিটিই একরঙা লাইন ব্রক। অন্য কোন বই থেকে কেটে আঁটা দিয়ে সঁটা:



### D-FOR DIPLDOCUSAIH NAMAHI!

পি. কে. বাসু বার-আট-ল্যাংড়াধেরিয়ামেবু,

মহাশয়, কী মমবিদারক! দৃশ্য! বিশালকায় ব্যারিস্টার ল্যাংড়াধেরিয়ামকে একজন সামান্য মানুষ—যাহাকে কেহই চেনে না, যাহার ক্ষমতাকে কেহই স্বীকৃতি দেয় না—গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

অহেতুক জীবহত্যা করিতেছেন কেন? সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়া নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয় নহে কি? আপনার দম্ভ কি এতই আকাশচূষী? ইহা আপনারকে সুমতি দিন, এই কামনা।



### D FOR DIGHA!

তাং : ষ্টিশে ডিসেম্বর।

ইতি —D. E. F.

## এগার

পরদিন সকালে রবি বোস এসে হাজির। বললে, এক এক সময় ইচ্ছে করে বিজুইন দিয়ে ঐ নরক থেকে বেরিয়ে আসি। পুলিশের চাকরি তারাই করে যারা গতজন্মে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিল! বাসু-সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, কেন হে! এমন ক্ষেপে গেলে কেন?

রবি বুঝিয়ে বলে তার অভ্যুদাহের ইতিকথা। গতকালই সন্ধ্যায় বাসু-সাহেবের ঐ চতুর্থ পত্রখানি তার হস্তগত হয়েছিল। এবার বাসু-সাহেব নিজে যাননি, রবিকে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা বিভাগে বরাট-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এবং অনুরোধ করে—ঐ দিনই আবার একটা কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে। ডক্টর ব্যানার্জি, ডক্টর মিত্র এবং বাসু-সাহেবকে ঐ চতুর্থ পত্রটি বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে। বরাট সরাসরি অস্বীকার করেন। বলেন, ও সব থিওরিটিক্যাল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পার হয়ে গেছে। এখন শুধু অ্যাকশন! সে কাজ গোয়েন্দা বিভাগ যথারীতি করছে। ঐ তিনজন বিশেষজ্ঞকে নাকি ইতিপূর্বেই ফর্মাল ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তারপর রবি স্বয়ং আই-জি-ক্রাইমের সঙ্গে লডন স্ট্রীটে গিয়ে দেখা করেছিল। তিনি বলেছেন, অফিশিয়াল স্পিকিং—বরাট-এরই যা কিছু করণীয়। সে যেভাবে অগ্রসর হতে চায়, হোক। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাসু-সাহেবকে একটি ধন্যবাদপত্র পাঠিয়েছেন।

বাসু-সাহেব পত্রখানি নিয়ে পড়লেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, মিস্টার বরাটকে বলেছিল যে, আমি ঐ সীজ করা জিনিসগুলো দেখতে চাই?

—বলেছিলাম। তাতে উনি বললেন, একটিমাত্র শর্তে উনি তা আপনাকে দেখতে দেবেন। যদি আপনি কথা দেন, লোকটা ধরা পড়লে আপনি তার ডিফেন্স কাউন্সেল হবে না।

—অল রাইট। তখনই না হয় দেখব।

—তখনই মানে? কখন?

—যখন ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে আদালতে দাঁড়াব। পিপল্‌স এক্সিবিট হিসাবে সবই ওরা আমাকে দেখাতে বাধ্য হবে।

—তার মানে আপনি ঐ লোকটার...

হ্যাঁ রবি। আমি চেষ্টা করব প্রমাণ করতে যে, সে সজ্ঞানে হত্যা করেনি! সে পাগল!

—আপনি তাই মনে করেন?

—আমি তাই মনে করি। মানসিক চিকিৎসকের ডাক্তারের রিপোর্টটা দেখনি? ও ‘অস্মার’ রোগে ভুগছিল। ওর স্মৃতি মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। তখন যদি সে কাউকে...আর তাছাড়া বনানীর ‘লাভার’ হিসাবে ঐ বড়োটাকে তুমিই কি কল্পনা করতে পারছ?

—না। কিন্তু ওর ঘরে ঐ টাইপ-রাইটার? আর পাতা-কাটা ঐ ‘সুকুমার রচনা সংগ্রহ’?

—ডাক্তার দাম্পত্যী সের বয়স কত? তার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? তুমি কি বোঝ নিয়ে জেনেছ, ঐ অন্ধের মাস্টার প্রাইভেট টাইশানি করতেন কি না? ওর ঘরে কোনও কলেজের অল্পবয়সী ছেলে সন্ধ্যার পর এসে ওর প্রাইভেট টাইশানির ক্লাস করত কিনা? এলে, সে টাইপ-রাইটিং জানে কি না? টাইপরাইটারটা ব্যবহার করত কি না?

—মাই গড! এ সব কথা তো...

—গুডবাই মাই ফ্রেন্ড! আজ তোমার ‘বস’-এর কাছে রিপোর্ট কর—আমার সহকারী হিসাবে আর তোমাকে কাজ করতে হবে না। আই ফায়ার ব্লু! তার মানে এই নয় যে, আমি তোমার উপর রাগ করেছি। প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু এরপর থেকে তুমি আর আমি ভিন্ন ক্যাম্পে। তোমার চাকরির নিরাপত্তাও তো আমাকে দেখতে হবে।

রবি বোস এগিয়ে এসে বাসু-সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।





ডাক্তার দাশরথী দে বাড়ি ছিলেন না। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। প্রমীলা গুঁদের সাদরে বসতে দিলেন। প্রমীলা এবং মৌ দুজনেই বাসু-সাহেবকে ভালভাবে চেনেন—মানে ব্যক্তিগতভাবে নয়, তাঁর কীর্তিকাহিনীর জন্য। প্রমীলা বললেন, উনি বাড়িতে নেই তাতে কী হয়েছে? আপনি খরটা যদি দেখতে চান...

—ঘরটা তে দেখবই। তার আগে বলুন, কাগজে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে। তার বাইরে গুর সন্ধ্যাে কী জানেন?...আচ্ছা, আমি বরং একে একে প্রশ্ন করে যাই—উনি কবে প্রথম আসেন, কী ভাবে? তার আগে কোথায় ছিলেন?

—এ বাড়িতে উনি এসেছেন বছরখানেক আগে। গুর ডিসপেনসারিতে একদিন এসেছিলেন একটা চাকরির খোঁজে। উনি চিনতে পারেন। সে সময় মাস্টারমশাই ছিলেন বেকার। কোথায় থাকতেন জানি না। তবে উনি একাধিক ডিসপেনসারিতে কম্পাউন্ডারের কাজ করেছেন। যদিও পাস-করা কম্পাউন্ডার নন। মাঝে কিছুদিন নাকি কোন এক ছাপাখানায় প্রুফ-রিভারের কাজও করেছেন। তখন এ প্রেসেই থাকতেন। কোথাও বেশি দিন টিকে থাকতে পাননি। বারে-বারে চাকরি খুঁয়েছেন। হাইকোর্টের কাছে পথের ধারে বসে টাইপিংও করেছিলেন কিছুদিন—কিন্তু তাতে পেট চলে না। মাথা গোঁজার আশ্রয়ও তখন ছিল না।

—উনি বারে-বারে চাকরি খুঁয়েছেন কেন? গুর পাগলামীর জন্যে?

—হয়তো তাই।

মৌ উপরপড়া হয়ে বললে, গল্পছলে মাস্টারমশাই আমাকে দুটি কেস-হিস্ট্রি বলেছিলেন। সে দুবার কেন তাঁর চাকরি যায়। একবার একটি ডিসপেনসারিতে ক্যাশ থেকে কিছু টাকা চুরি যায়। দোকানের সবাই বলেছিল, তারা টাকা নেয়নি; আর মাস্টারমশায়ের বস্তব্য ছিল আমার মনে নেই! দ্বিতীয়বার প্রেস-এর চাকরি খোওয়া যায় সম্পূর্ণ অন্য কারণে। একটি অঙ্কের বই ছাপা হচ্ছিল। উনি প্রুফ-রিডার। ধুম তরক বাধিয়েছিলেন লেখকের সঙ্গে। গুর মতে লেখকটি অঙ্কের কিছুই বুঝতেন না। যেভাবে তিনি পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কগুলি কষেছিলেন তার চেয়ে সহজ পদ্ধতিতে সেগুলি নাকি কষা যায়। কবে নাকি দেখিয়েও দিয়েছিলেন। লেখক ছিলেন অঙ্কের একজন অধ্যাপক। তর্কাতর্কির সময় তিনি নাকি এ অধ্যাপকের গলা টিপে ধরেন। ফলে চাকরি খোয়ান।

—উনি কি টাইপ-রাইটিং জানতেন?

হ্যাঁ। বেশ ভালই। আমি গুর কাছেই শিখেছিলাম।

—শিশু সাহিত্য পড়তেন? পড়তে ভালবাসতেন?

—যথেষ্ট। বরং বড়দের চেয়ে শিশু ও কিশোর সাহিত্যই বেশি করে পড়তেন।

বাসু হঠাৎ মৌ-এর দিকে ফিরে বললেন, তুমি এদুটি শব্দ কখনো শুনেনা? 'ব্য্যচারার্থেরিয়াম' আর 'চিল্লানোসরাস'?

## কটায়-কটায়-২

এমন অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে মৌ একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। সুকুমার রায়ের একটা হাসির গল্পের দুটি নাম। বইটিতে ছবিও আছে ঐ জীবের। 'চিল্লানোসরাস্' ব্যাচারাতেরিয়ামকে কামড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামড়ালো না। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু বললেন, ঐ গল্পটা, বা ঐ জন্তু দুটোর নাম নিয়ে কখনো মাস্টারমশায়ের সঙ্গে তোমার কোন আলোচনা হয়েছে? তোমার মনে পড়ে?

মৌ একটু ভেবে নিয়ে বললে, মনে পড়ে না। হঠাৎ ঐ জন্তু দুটো—

বাসু-সাহেব প্রমীলা দেবীকে বললেন, এবার চিলে-কোঠা ঘরটা দেখি।

ঘরটা উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। আলমারি হাট করে খোলা। বই বা টাইপ-রাইটার নেই। মাস্টারমশায়ের কাগজপত্র, জামাকাপড়, কলম-কলমদানি-পিনকুশান-পেপারওয়েট কিছু নেই। এ ঘরে এখন তল্লাসী করা নিরর্থক। ওঁরা নেমে আসছিলেন, হঠাৎ বাসু-সাহেব দেওয়ালের একটা অংশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, এখানে দীর্ঘদিন একখানা ছবি টাঙানো ছিল, ফ্রেমে বাঁধানো। মাস্টারমশায়ের নিশ্চয়। সেটাই আপনারা খুলে পুলিশকে দিয়েছেন?

মা-মেয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। প্রমীলা জবাব দেবার আগেই মৌ বললে, না। আমাদের ফ্যামিলি-অ্যালবাম থেকে খুলে মাস্টারমশায়ের ছবিখানি দেওয়া হয়েছে।

—আই সী! তাহলে ওখানে যে ফটোটা ছিল, সেটা—কার ফটো ছিল ওখানে? ফটো না ছবি?

মৌ-ই জবাব দিল। ফটোটা কার তা শুনে বাসু বললেন, আই সী! কাগজে ওঁর নামে যেসব কথা বেরিয়েছে তারপর ছবিখানা নামিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সরিয়েছেন কে? আপনারা কেউ, না শিবাজীবাবু নিজেই?

—নামিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। সরিয়ে রেখেছেন মা।

আই সী!

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু ফিরে এসেছেন। ঝিলে কুসুমির মায়ের কাছে খবর পেয়ে উঠে এসেছেন চিলে-কোঠার ঘরে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বনানীর প্রেমিক হওয়ার সম্ভাবনা অল্প!

ওঁরা আবার ফিরে গিয়ে ঝিলের ঘরে বসলেন।

ডাক্তার-সাহেব আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হলেন। বিশেষ করে মাস্টারমশায়ের বর্তমান নিয়োগ-কর্তা সম্বন্ধে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পতিচরী থেকে একখানি চিঠি আসে 'মাতৃসদন' থেকে। কী এক মহারাজ শিবাজীবাবুকে পত্র লেখেন। পত্রটা, বন্ধুত গোটা ফাইলটাই পুলিশে 'সীজ' করেছে। তবে প্রথম চিঠিখানির বয়ান ডাক্তারবাবুর স্পষ্ট মনে আছে। মহারাজ জানিয়েছিলেন, তাঁর এক ভক্ত—যিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক—কিন্তু শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর ছাত্র—মহারাজকে তাঁর মাস্টারমশায়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। 'মাতৃসদন' ঠেকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে শিবাজীবাবুকেও মাতৃসদনের সেবা করতে হবে। ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মপুস্তক বিক্রয় করে আসতে হবে। সাড়ে চারশ টাকা মাসে মাহিনায়। মাস্টারমশাই সাগ্রহে চাকরিটি গ্রহণ করেন। মাসে মাসে মনি-অর্ডারে টাকা আসত।

—মনি-অর্ডারে? চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট-এ নয়?

—না। বরাবর মনি-অর্ডারে টাকা আসতে দেখেছি। আর মাঝে মাঝে পোস্টাল পার্সেলে বই।

—মাতৃসদনের ঠিকানাটা দিন দেখি?

সেখা গেল, ওদের কাছে তা নেই। ঐ ফাইলেই সব কিছু ছিল। ডাক্তারবাবু ওদের লেটার-হেড প্যাডের চিঠি বহুবার দেখেছেন। অপ্রয়োজনবোধে ঠিকানা টুকে রাখেননি।

ইতিমধ্যে চা-পানের পাট চুকেছে। বাসু-সাহেব গাঢ়োখানের চেষ্টা করতেই ডাক্তারবাবু বললেন, একটা অনুরোধ করব স্যার?

—কী বলুন?

—মাস্টারমশাই দু-চার দিনের মধ্যে নিশ্চয় ধরা পড়বেন। আপনি কি তাঁর ডিফেন্সটা নিতে পারেন না? ব্যারিস্টার দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি অবশ্য আমার নেই। কিন্তু ঠর কয়েকজন খনী ছাত্রকে আমি চিনি—মানে আমারই সব ক্লাস-ফ্রেন্ড। আমরা চাঁদা তুলে...

বাসু বলেন, দেখুন ডক্টর দে, টাকার জন্য আটকাবে না, কিন্তু কৈসটা আমি নেব কি না তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের উপর।

—জানি। শুনছি আপনার কথা। আপনি নিজে যাকে মনে করেন ‘নির্দোষ’ তার কেসটি আপনি গ্রহণ করেন। যাকে মনে করেন দোষী, তাকে পরামর্শ দেন ‘গিলটি প্রীড’ করতে। কিন্তু এ কেসটা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, বাসু-সাহেব। মাস্টারমশাই তো নিজেই জানেন না—তিনি ‘গিলটি’ না ‘নট গিলটি’।

বাসু বললেন, আগে তিনি ধরা পড়ুন। তবে আপনার অনুরোধটা আমার মনে ধাক্কাবে।

পরদিন সকালে বাসু-সাহেব চন্দননগরে একটা ফোন করে জানানেন যে, তিনি বিকেলে ওখানে আসবেন। টেলিফোন ধরেছিলেন বিকাশবাবু। তিনি আগ্রহ দেখালেন, বললেন, তাহলে মধ্যাহ্ন আহরটা এখানেই করে যাবেন, স্যার। বিকালের বদলে এবেলাই—

—না। কারণ আমার একটা লাক্স অ্যাপার্টমেন্ট আছে। আমি গিয়ে পৌছাব বিকেল চারটে নাগাদ। মিস গাঙ্গুলীকে কি তখন পাওয়া যাবে?

—আমি খবর পাঠাচ্ছি।

—তোমার দিদি কেমন আছেন?

—দিন দিন খারাপের দিকে।

বাসু-সাহেব এবার রিভলভারটা সঙ্গে নিলেন কিনা সূজাতা জানে না; কিন্তু ঠর ক্যামেরা, টেলি-ফটো লেন্স, বাইনোকুলার, কম্পাস ও মাপবার ফিতে যে নিয়েছেন তা টের পেল। এসব সরঞ্জামের কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হল না। ইতিমধ্যে কৌশিক আসানসোল থেকে যে ফটো তুলে এনেছে সেগুলোও সঙ্গে নিয়েছেন।

বিকাশ ওদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালো বৈঠকখানায়। অনিতা গাঙ্গুলীও ছিল। বাসু ঠর সব সরঞ্জাম টেবিলে সাজিয়ে রেখে প্রথমেই স্টাডি-রুমটার মাপজোক নিলেন। কত লম্বা, কত চওড়া, জানলাগুলি মেঝে থেকে কত উপরে। ঠর নির্দেশ মতো সূজাতা একটা খাতায় মাপগুলি লিখে নিল। গেট থেকে সদর দরজার দূরত্বটা মাপতে গিয়ে প্রাণান্ত হল কৌশিকের। দারোয়ান আর বলাই সাহায্য করল ওকে। বাড়িটার একগাদা ফটো নিলেন। যে বেঞ্চিটার নিচে মৃতদেহটি আবদ্ধিত হয়েছিল তারও বেশ কয়েকটি ফটো! বাগিচাটির উপর থেকে টেলিফোনে লেন্স লাগিয়ে দূর থেকে অনেকগুলি ফটো।

কারও সাহস হল না প্রশ্ন করতে এসব কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ লাগবে। বারে বারে বাইনোকুলার দিয়ে গঙ্গার ওপারে কিছু খুঁজলেন তিনি। কম্পাস বার করে নির্ধারণ করলেন বাড়িটি ঠিক পূর্বমুখী নয়—সাত ডিগ্রি দক্ষিণপূর্ব দিকে সরে আছে।

এরপর অনিতা এসে বলল, আপনারা ভিতরে এসে বসুন। আফটারনুন টি রেডি।

ঠরা ঘরে এসে বসলেন। বাসু বললে, চা নিশ্চয়ই খাব, কিন্তু এ যে হাই-টি!

এরপর কিছুক্ষণ শিবাজী চক্রবর্তীর বিষয়ে আলোচনা হল। কী অপরিসীম আশ্চর্য! লোকটা এখানে ধরা পড়লো না। পুলিশ কোন কর্মের নয়। বাসু খবরটা প্রকাশ করলেন—ইতিমধ্যে উনি চতুর্থ পত্রটি পেয়েছেন—‘D FOR DIGHA’!

বিকাশ এবং অনিতা দুজনেই আঁৎকে ওঠে। বিকাশ বলে, সর্বনাশ! তারিখটা?

—পঁচিশে ডিসেম্বর!

অনিতা বললে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবেন।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

বিকাশ বলল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ইচ্ছা করেই দিয়েছে। জগদ্ধাত্রী পূজায় যেমন চন্দনগরে ভীড় হয়, ঠিক তেমনি বড়দিনে ভীড় হয় দীঘাতে। 'ডি' নাম বা উপাধির কে-কে আসবে পুলিশ তা কেমন করে জানবে? আপনি কবে চিঠিটা পেলেন? কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন নিশ্চয়। কবে ছাপা হবে? বাসু বলেন, এনি ডে। আজ বের হয়নি, কাল পরশু বের হবে। তোমার দিদিকে কি খবরটা জানানো হয়েছে?

—না। ডাক্তার বলেছে ম্যাক্সিমাম এক মাস। কী দরকার?

—অসুখটা কী?

—ক্যানসার। ঠুকে বলা হয়েছে জামাইবাবু হঠাৎ বিশেষ কাজে দিল্লী যেতে বাধ্য হয়েছেন। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ফিরবেন।

বাসু-সাহেব অনিতার দিকে ফিরে বলেন, সেদিন একটা প্রবন্ধ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চটা কী জাতের ছিল? তুমি বলেছিলে, তিনি একটি 'রবীন্দ্র অভিধান' রচনা করছিলেন। তার মানেটা কী?

অনিতা ঠুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। এটা শেষ পর্যন্ত একটি অভিধানের রূপ নিত। প্রতিটি শব্দ রবীন্দ্রনাথ কোথায়, কী অর্থে ব্যবহার করেছেন তার খতিয়ান।

—সেটা কী কাজে লাগবে?

—অনেক কাজে লাগতে পারে। ধরুন, আপনাকে প্রবন্ধ করলাম, 'করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ'—এই পংক্তিটা রবীন্দ্রনাথ কবে, কোথায় এবং 'অপাবৃত' শব্দের কী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আপনি বলতে পারেন?

—না। কোথায়?

—আমার মুখস্ত নেই। কিন্তু অভিধান দেখে বলতে পারব। 'আলোক' 'সূর্য' কিংবা 'অপাবৃত' এই তিনটে 'এন্ট্রি' যে কোন একটাতে পাওয়া যেতে পারে। এইটে 'অ'-ফাইল। এই দেখুন—

ফাইল থেকে দেখালো লেখা আছে : "অপাবৃত—অনাবৃত। তৎ ত্বং পুষ্পপাবু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। ইশ ১৫৫। "করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ"। জন্মদিনে/ ১৩/ ১১ই মাঘ/ ১৩৪৭ উদয়ন/ সকাল"।

—তার অর্থটা কী দাঁড়ালো?

—'জন্মদিনে' কবিতাগ্রন্থের তের নম্বর কবিতা। ১১ই মাঘ, ১৩৪৭ তারিখের সকালে 'উদয়ন'-এ বসে কবি ঐ পংক্তিটি রচনা করেছিলেন। 'অপাবৃত' শব্দের অর্থ 'অনাবৃত করা'। কবির ঐ পংক্তিটির মূল ভাবের উৎস হচ্ছে ঈশোপনিষদের পঞ্চদশ মন্ত্রটি, 'তৎ ত্বং পুষ্পপাবু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।'

বাসু বললেন, দারুণ কাজ করেছিলেন তো ডক্টর চ্যাটার্জি! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি ঐ 'অপাবৃত' শব্দটা অন্য কোথাও ব্যবহার করেননি?

—হয়তো করেছেন। সেটা বোঝা যেত গ্রন্থটা সম্পূর্ণ হলে। কারণ উনি প্রতিদিনই ছোট ছোট কাগজে এইসব নোট লিখে দিতেন, আর আমরা সেগুলি বিভিন্ন ফাইলে অভিধানের রীতিতে পর পর গোঁথে রাখতাম। কম্পাইলেশন শেষ হলে বোঝা যেত 'অপাবৃত' শব্দটা কবি কতবার, কোথায় কোথায় কী অর্থে ব্যবহার করেছেন।

এই সময় একজন যুনিফর্মধারী নার্স এসে অনিতাকে জানালো, মিসেস চ্যাটার্জি তাকে ডাকছেন। 'এক্সকুজ মি' বলে অনিতা উঠে গেল দ্বিতলে। একটু পরেই ফিরে এসে বাসু-সাহেবকে বলল, দিদি টের পেয়েছেন যে, আপনি এসেছেন। শুরুর ঠুকে জানিয়েছে।

—শুরুর কে?

—এ।

মিসেস চ্যাটার্জির ডে-টাইম নার্স যুক্তকরে নমস্কার করল।

—উনি আপনার কীর্তি-কাহিনীর কথা জানেন। বস্তুত উনি আপনার একজন ‘ফ্যান’। আমাকে দিয়ে অনুরোধ করেছেন, যাবার আগে যেন আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান।

—তা আমার এখানকার কাজ তো মিটেছে। মাপজোক সবই নেওয়া হয়েছে। চল যাই—বিকাশ বলে, কিন্তু স্টাডিরুমের মাপটা কোন্ কাজে লাগবে?

বাসু হেসে বললেন, ট্রেড-সিক্রেট কি কেউ জানিয়ে দেয়? চল, দোতলায় যাই।

### বারো

মিসেস চ্যাটার্জির বয়সটা আন্দাজের বাইরে। ‘কর্কটিকা-ডাস্টার’ গুঁর তনুদেহের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা কৈশোরের স্বপ্ন, তারুণ্যের উদ্দামতা, যৌবনের নিভৃতকুজনের সব ইতিকথা লেপে মুছে দিয়েছে! ব্ল্যাকবোর্ড ব্ল্যাক! কঙ্কালসার দেহটি বিরাট ডবল্-বেড শয্যায় অর্ধশায়িত! পিঠের দিকে একাধিক উপাধান। হাত দুটি সবল, কারণ যুক্তকরে নমস্কার করে অন্নান হেসে বললেন, ‘ওয়েস্ট-এর ওয়েস্ট’ থেকে আজ প্রথম দেখলাম ‘প্যারী ম্যাসন্ অব দ্য ঈস্টকে’ বসুন।

প্রথম ‘ওয়েস্ট’-এর স্বরাস্ত্র এবং দ্বিতীয় ‘ওয়েস্ট’-এর দীর্ঘায়ত উচ্চারণে বাসু-সাহেবের মনে হল—এই শয্যালীন মহিলাটি এক কালে বেবী দুলিয়ে স্কিপিং করতেন—কোনও কনভেন্ট স্কুলে। আর গুঁর অন্নান হাসিটি দেখে অনুভব করলেন—যন্ত্রণাদায়ক ক্যানসার রোগও পারেনি গুঁর সব কিছু মুছে দিতে। আরও মনে হল, ডক্টর চ্যাটার্জি ‘প’ অক্ষর পর্যন্তই লিখে গেছেন। ‘ম’ অক্ষরে উপনীত হয়ে তিনি লিখে যাবার সময় পাননি: ‘আমি ‘মৃত্যু’ চেয়ে বড়। এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে!’

বাসু-সাহেব গুঁর শয্যাপার্শ্বে বসে পড়লেন। কঙ্কালসার হাত দুটি তুলে নিয়ে বললেন, ‘ওয়েস্টের ওয়েস্ট’ কেন বলছেন মিসেস চ্যাটার্জি? সূর্য তো প্রতিদিন অস্ত যায়, উদিত হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এই তো কদিন আগে জগদ্ধাত্রীর বিসর্জন হল। কিন্তু ‘বিসর্জন’ তো ‘নেমসিস’ নয়—‘বি পূর্বক সৃজ্-ধাতুর অনট’—বিশেষ রূপে জন্ম নেওয়া। ধাতুটা ‘সৃজ্’! বিসর্জনের ময়: পুরাণামনায় চ।

মনে হল, ভারী তৃপ্তি পেলেন ভদ্রমহিলা। মিনিটখানেক চোখ বুজে স্থির থেকে বললেন, আমার নাম রমলা। আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

বাসু বলেন, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, রমলা?

—এখন হচ্ছে না। যখন ‘স্প্যাঞ্জম’ আসে, তখন হয়। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা গাপন কথা আছে, বাসু-সাহেব। ওদের যেতে বলুন।

বাসু এদিকে ফিরলেন। ঘর ছেড়ে একে একে সকলে বার হয়ে গেল। এমনকি শুল্কা, অনিতাও।

—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে বসুন।

বাসু গুঁর আদেশ তামিল করার পর রমলা দেবী বালিশের তলা থেকে একগোছা চাবি বের করে বললেন, ঐ গোদরেক্স-এর আলমারিটা খুলুন। এইটা বাইরের চাবি, এইটা সিক্রেট-ড্রয়ারের।

বাসু বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশমতো কাজ করার পর মহিলা বললেন, একটা চন্দন-কাঠের বাস্ম আছে না? ঠা দিকে। উপরে হাতির-দাঁড়ের কাজ-করা। পেয়েছেন? ওটা নিয়ে আসুন।

দেখা গেল তাতে খান কয়েক গিনি আছে। আর একটা ফর্দ। গহনার ফর্দ।

রমলা গুকে জানালেন—এই গহনাগুলি আছে গুঁর কলকাতার সেফ-ডিপজিট ভন্টে। সব তাঁর স্বীধন—বিবাহের যৌতুক, অথবা পরে উপহার পাওয়া, বা ক্রয় করা। বললেন, প্রতিটি গহনার পাশে তিনি এক-একজনের নাম লিখে সই করে দিতে চান, যাতে তাঁর অবর্তমানে...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, এতদিন এসব করে রাখেননি কেন?

তিনি যে মহিলাটির ব্যক্তিহে অভিভূত হয়ে নিজের অজান্তেই আবার ‘আপনি’-তে ফিরে গেছেন, তা টের পাননি।

—উনি রাজ্ঞী ছিলেন না। সুপারস্টিশান! ওটা লিখলেই নাকি আমি মরে যাব। ওটা লেখা হয়নি,

একথা যতদিন আমার মনে থাকবে ততদিন মনের জোরেই আমি নাকি বেঁচে থাকব! আচ্ছা বলুন তো! এসব নিছক পাগলামি নয়? তাছাড়া এই যন্ত্রণা নিয়ে পঙ্গু হয়ে আমি কি বেঁচে থাকতে চাই?

বাসু-সাহেবের মনে পড়ে গেল, —এ প্রশ্নটা তিনি জীবনে এই প্রথম শুনছেন না। সে প্রিয়জনটি কিছু ক্যাঙ্কারে ভুগছিল না। উনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক কী করতে চাইছেন?

—এ লিস্ট—এ প্রতিটি গহনা কাকে দিচ্ছে তা লিখে আমি সই করে দেব। কাগজখানা আপনার কাছে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর আমার গহনার ভাগ কীভাবে হবে তার বিলিব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। আর একথা আপনি ঠেকে জানাবেন না। উনি দিল্লী থেকে ফিরে আসতে আসতেই আমার যদি কিছু হয়ে যায়...

বাসু অন্ধকারে একটা ঢিল ছুড়লেন, উনি কবে ফিরছেন? আপনাকে কিছু বলে গেছেন?

—না! সে সময় আমার একটা ক্রাইসিস চলছিল। যাবার সময় দেখা করেও যেতে পারিনি। তবে দিল্লীতে পৌঁছে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, সেন্ট্রাল গার্ডনমেন্ট থেকে ওর রবীন্দ্র অভিধান বাবদে একটা 'গ্র্যান্ট' না 'রিসার্চ-স্কলারশিপ' দেবার সম্ভাবনা আছে, ও তাই নিয়ে দরবার করতে গেছে। ফিরতে কিছু দিন দেরী হবে। তার আগেই যদি...

এ সংবাদটা চমকপ্রদ বৈকি। দিল্লী থেকে স্বর্গীয় চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রপ্রেরণ। কিন্তু কৌতুহল দেখানো চলে না। বাসু বলেন, সেন্ট্রাল গার্ডনমেন্ট-এর কোন ডিপার্টমেন্ট? রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সেন্টারের এত দরদ...

—এই দেখুন না।—অগ্নানবদনে বালিশের তলা থেকে একটি খাম বার করে দিলেন।

খামের উপর টাইপ করা মিসেস রমলা চট্টোপাধ্যায়ের নাম-ঠিকানা। পোস্টাল হাণ্টা পরিষ্কার নয়াদিল্লীর। বাসু ইতস্তত করে বলেন, ঠুর আপনাকে লেখা চিঠি আমি পড়ব?

—এমন কিছু প্রেমপত্র নয়। আমাদের বিয়ে হয়েছে একুশ বছর আগে। পড়ুন।

খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বার করলেন। টাইপ করা চিঠি। আদ্যন্ত ফরাসী ভাষায়। সাহেবদনেই হোচট খাবার অভিনয় করে বললেন, 'মঞ্চারি' মানে? আপনার আর এক নাম কি 'মঞ্চারি'?

হাত বাড়িয়ে খামটা ফেরত নিলেন রমলা দেবী। হাসতে হাসতে বলেন, 'মঞ্চারি' নয়, Mon Cheri—ফরাসী শব্দ একটা। আদরের ডাক: 'আমার প্রিয়!' আদ্যোপান্ত চিঠিটাই ফরাসী ভাষায় লেখা!

বাসু বলেন, আপনারা কি ফরাসী ভাষায় প্রেমপত্র আদান-প্রদান করতেন?

—উপায় কি? আমি স্থূল-কলেজে পড়েছি পারীতে। আমার বাবা ছিলেন পারীর ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে, করেন সার্ভিসে। ইংরাজীটা পরে শিখেছি। আর উনি যেটায় ডক্টরেট করেছেন সেই বাঙলা সামান্যই জানি। যাক কাজের কথায় আসুন। এ লিস্টটা বানিয়ে আপনি আমার এক্সিকিউটার হিসাবে কি...

—নিশ্চয়ই করব। বলুন আপনি একে একে।

লিস্টে ষয়ত্রিশটা আইটেম! প্রত্যেকটি গহনার নিখুঁত বিবরণ ও ওজন উল্লিখিত। উনি একে একে বলে গেলেন—কে কোনটা পাবে। অনিতা পাবে হীরের নেকলেস-ছড়া, আর মকরমুখী বালা। শুল্লা ছ-গাছা চুড়ি। উমা (বলাইয়ের স্ত্রী) মফচেনটা, সুধির-মা (ঝি) কানবালা, সীতা (দরোয়ানের ঘরওয়ালী) দুগাছা চুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশই বাসু-সাহেবের অপরিচিতা—তাদের বিশদ পরিচয়ও লিখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, বিকাশবাবুর ভাবী বধূকে কিছু দিচ্ছেন না?

—বাকি সম্পত্তিটাই তো তার। উনি যাবতীয় সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিয়েছেন। আমি আর কতদিন? আর আমার একমাত্র ওয়ারিশ তো খোকনই, আই মীন, বিকাশ! দিন এবার, সই করে দিই।

বাসু বলেন, না! এখনই নয়। অন্তত দুজন সাক্ষীর সামনে সইটা করবেন। আমি সূজাতা আর বিকাশবাবুকে ডাকি বরণ।

—বিকাশের বদলে অনিতাকে ডাকলে হয় না?

—না। হয় না। অনিতা একজন ‘বেনিফিশিয়ারি’, মানে তাকেও আপনি কিছু দিচ্ছেন যে।

অগত্যা এরপর বিকাশ ও সূজাতাকে ডেকে উনি ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিলেন। সাক্ষী হিসাবে ঠুঁদের দুজনকে সই দিতে হবে। রমলা সই দিলেন। বাকি তিনজনও দিলেন। এরপর বাসু-সাহেব সূজাতাকে বলেন, ডক্টর চ্যাটার্জির স্টাডিক্রমে একটা স্ট্যাম্প-প্যাড দেখছি। ওটা নিয়ে এস। চারজনের টিপছাপও নিতে হবে।

বিকাশ বললে, টিপছাপের কী দরকার? সই করেই দিলাম তো?

বাসু তার দিকে তাকিয়ে বলেন, এম.এ. পাস করার পর কিছুদিন ‘ল’ পড়েছিলে বুঝি?

—না তো! কেন?

—স্নাক টাকার উপর যার মূল্যমান তেমন দলিলে সইয়ের সঙ্গে টিপছাপও দিতে হয়। ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, 1935, অ্যামেন্ডেড ইন্ 1955, ধারার নং 135(c).

বিকাশ আর উচ্চবাচ্য করল না। সূজাতা স্ট্যাম্প-প্যাডটা নিয়ে এল। সকলের টিপছাপ নিয়ে কাগজখানা পকেটস্থ করলেন বাসু! রমলা বললেন, খোকন, তোরা আবার বাইরে যা। ঠুঁর সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা আছে।

দ্বিতীয়বার ঘর নির্জন হলে রমলা তাঁর চন্দনকাঠের বাস্র থেকে তিনখানি গিনি তুলে নিয়ে বাসু-সাহেবকে দিলেন, বললেন, দুটো আপনার ‘ফি’ আর একটা সূজাতাকে আমার উপহার। এবার আলমারিটা বন্ধ করে চাবিটা আমাকে দিয়ে যান।

## তেরো

ফেব্রার পথে বাসু-সাহেব বললেন, চল শেয়ালদার কাছে ‘সুইট হোম’-এ একটা টুঁ মেরে যাই।

—‘সুইট হোম’! কেন?

—বিকাশবাবুর অ্যালেবাইটা পাকা কিনা যাচাই করতে। অর্থাৎ ছ তরিখে সম্ভায় ও ঐ হোটোলে চেক-ইন করেছিল কিনা।

কৌশিক বলে, কিছু মনে কয়বেন না মামু, আপনার সম্ভেহের লিস্টে কি রানু মামীমাও আছেন? তাঁর অ্যালেবাইটাও যাচাই করবেন?

সূজাতা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

বাসু বলেন, এইমাত্র জেনে এলাম যে, লোকটা ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল! ‘ভাল’র জন্য যে এমন কৌশল করতে পারে, প্রয়োজনে ‘খারাপের’ জন্যও...

—কী জেনে এসেছেন?

বাসু গাড়ি চালাতে চালাতে বর্ণনা দিলেন—স্বর্গীয় চন্দ্রচূড়ের প্রেমপত্রখানির। বিকাশকে পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন—চিঠিখানির ইংরাজি বয়ান বিকাশের, অনুবাদ ডুপ্রে কলেজের এক অধ্যাপকের, যিনি ভাল ফ্রেঞ্চ জানেন। অনিতা সুযোগ মত আলমারি খুলে জেনে নিয়েছিল, চন্দ্রচূড় তাঁর ধর্মপত্নীকে প্রেমপত্রে কী জাতীয় মধুর সম্বোধন করতেন। চন্দ্রচূড়ের সইটা জাল করা হয়েছে। তারপর ঐ খামটা আর একটা বড় খামে ভরে বিকাশ তার দিল্লীবাসী এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দেয়, দিল্লীর ডাকঘরে ‘পোস্টিং’ হতে! আদ্যন্ত পাকা ক্রিমিনালের কাজ। রমলা কিছুমাত্র সম্ভেহ করেননি।

সূজাতা বলল, কিছু বিকাশবাবুর স্বাথটা কি? চন্দ্রচূড় খুন হন বা না হন—তিনি তো সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

—তা ঠিক। তবে এ পথ দিয়েই যখন যাচ্ছি তখন সুইটার হোমে পৌঁছনোর আগে সুইট-হোমটায় একটু টুঁ দিতে দোষ কী?

## কাটায়-কাটায়-২

মনোহরবাবু অমায়িক লোক। হাত জোড় করে বললেন, ছরি ছার! আমার গোটা হোটেল এখন বুকট। একটা ঘরও খালি নাই।

বাসু-সাহেব আত্মপরিচয় দিলেন। তাতে মনোহর বিগলিত হলেন ঐ 'বার-অ্যাট-ল' অংশটায়। মনে হল না তিনি বাসু-সাহেবের নাম জীবনে কখনো শুনেছেন। বাসু বললেন, আমরা একটা 'ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন' করছি...

—কী করতাহেন? বাড়ুলায় কয়েন মোশাই! ইঞ্জিরি আমি ভাল বুঝি না—

—একজন অপরাধীকে খুঁজছি আর কি। আপনার হোটেল-রেজিস্টারটা যদি কাইন্ডলি একবার দেখতে দেন?

মনোহরবাবুর মূর্তি 'অন্যরকম' হল। বললেন, আজে না। চোর-ছ্যাচড় বদমাইশ আমার হোটেলে ওঠে না। সবই ভদ্রলোকের পোলা।

বাসু বললেন, অ। তা তিন কাপ চা হবে? বসে খেতাম?

—তিন কাপ ছাড়া হয় কাপ খান না—কিছু খাতা-পত্র দ্যাখন চলব না।

—আর কাইন্ডলি যদি একটা টেলিফোন করতে দেন—

—ক্যান দিমু না? আঠানা লাগব কিছু।

—শ্যুর! —হিপ পকেট থেকে একটা আধুলি বার করেন বাসু-সাহেব।

মনোহর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ চোখ লাল। বললেন, আপনি আমারে গাইল দিলেন?

—গালি? ও আই সী। না না, শুরোর কই নাই! SURE—যারে 'শিয়োর' কয় আর কি! আমার কিছুটা উরুশ্চারণের দোষ আছে।

মনোহর শান্ত হলেন। আধুলিটা পকেটস্থ করে ছোকরা চাকরটাকে বললেন, বাইরে তিনখাপ ছা।

কৌশিক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, কত নম্বর স্যার?

—45-7586; ওটা D.I.G./ C.I.D.-র পার্সোনাল লাইন। সুকোমল যদি থাকে তবে আমার নাম করে বল সুইট-হোমের নামে একটা সার্চ-ওয়ারেন্ট পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। আমরা এখানেই বসে চা খাচ্ছি।

অতি ধীরে গাত্ৰোত্থান করে মনোহর বলেন, ব্যাপারটা কী? D.I.G./ C.I.D. আবার কেডা?

—ডেপুটি আই. জি., ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেন্ট। সার্চ-ওয়ারেন্ট ছাড়া যখন খাতাপত্র দেখা যাবে না...

তিনটে ডিজিট ডায়াল করা হয়েছিল। বাকি কৌশিক করতে পারল না তার হাতটা মনোহরবাবু বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরায়।

একেবারে অন্যমূর্তি। সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।

হ্যা... বিকাশবাবুকে উনি চেনেন... চন্দননগরের বিকাশ মুখুজে... ছয়ই নভেম্বর কইলেন না? হ্যা, আইছিলেন। রাত্রে থাকছিলেন। খায়েন 'নাই। পরদিন তাঁর ফোন আইল... চন্দননগরে সেই চন্দ্রচূড়... নাম শুনছেন না? ঐ যে 'এবিছি' হত্যার কেস! অরই তো বুনাই... সেই ফোন পাইয়াই ছুটল... তখন কয়ডা? আই নয়ডা ইইব মনে লাগে।

আরও অনেক তথ্য অযাচিতই বলে গেলেন। বিকাশ এসেছিল গাড়িতে। গাড়ি খরাপ হয়। সারাত্রে দেয়। প্রথমে মনোহরবাবু ঠেকে সীট দিতে রাজি হননি। কারণ পোতলার তিন-নম্বর ঘরে কলে কী গণ্ডগোল হয়েছিল। অ্যাক্সে পানি আসছিল না। আর সব সীট ভর্তি। তা বিকাশবাবু কইলেন, রাতটুকু তো থাকুম। পানি লয়্যা কী করুম? এক বালতি পানি বাধরুমে দিয়া দ্যান, তাতেই ইইব।

বাসু প্রশ্ন করেন, তা কলটা রাত্রে সারানো গেল না?



—না, রাতে পেলামবার পাইব কোই? পরদিন সারাইলাম।

কৌশিক বুঝে উঠতে পারে না এসব খেজুরে আলাপ করে কেন উনি সময় নষ্ট করছেন।



সুজাতা ইতিমধ্যে বর্ধমান থেকে ঘুরে এসেছে ময়ুরাক্ষীর গোপন বার্তা নিয়ে। এক বাঙাল প্রেমপত্র। সর্বসমেত সত্তর খানি। তার ভিতর সাতখানি অমল দস্তের। ছ-খানি যিনি লিখেছেন—বাঙলায়, তাঁর নাম-ঠিকানা-পরিচয় নেই। প্রতিটি পত্র শেষে ‘ইতি তোমার মাল্যাকার’। এর প্রথম পত্রটিতেই এই নামের গঙ্গোত্রী ইতিহাস আছে। প্রথম পত্রে প্রেমিক একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন: ‘আমি তব মাল্যেব হব মাল্যাকার।’ বাকি চারখানি ইংরেজিতে টাইপ করা।

ইনিও সাবধানী। ভাষা মার্জিত। পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। পত্রশেষে লেখা আছে—‘Yours Ever Mugdha-Bhramar’ এই ‘মুগ্ধ ভ্রমর’-টির ইংরেজিতে বেশ মূল্যায়না আছে। টাইপিং-এও ভুল কম! বেশ বোঝা যায়, এ লোকটা বনানীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না—ওরা শুধু প্রেম করতে চেয়েছিল, অথবা ফুটি। ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সম্ভাব্য বিড়ম্বনা এড়াতে আত্মগোপন করেছে।

কৌশিক বললে, আমার ধারণা—যে লোকটা বাসুমামুকে চিঠি লেখে সে প্রথম খুনটা করেছে এবং শেষ খুনটা। কারণ এ দুটির কোন মোটিভ নেই। খুন করে কেউ লাভবান হয়নি। খুনের জন্যই খুন। আর বনানীকে যে হত্যা করেছে সে ওর কোন প্রেমিক। লোকটা হয় স্যাডিস্ট, অথবা দ্বৈর্য অন্ধ হয়ে...

সুজাতা বলে, কিন্তু ‘নাম’ আর ‘স্থান’? নিতান্তই কাকতালীয়?

—হতে পারে। অথবা বনানীর হত্যাকারী এ অ্যান্‌থ্রোপোজেনিক্যাল সুযোগটা নিয়েছে! যাতে পুলিশ মনে করে, এটা এ অ্যান্‌থ্রোপোজেনিক্যাল হত্যাবিলাসীর কাণ্ড! এমনটা কি হতে পারে না? বাসুমামু কী বলেন?

বাসু বলেন, এখনো সিদ্ধান্তে আসার মতো ‘ডাটা’ পাইনি।

রানু বলেন, তুমি কি সেই বড়দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও?

বাসু চটে ওঠেন, তা আমি কী করতে পারি? পুলিশ পর্যন্ত এখন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। সেই বুড়ো ইন্সপেক্টরটা ধরা পড়লেও হয়তো কিছুটা ধারণা করতে পারি। এখন তো যোর অন্ধকর। পণ্ডিতের ফাইলটাও যে দেখতে পেলাম না! মহারাজজী একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কৌশিক বলে, আপনি কি তাঁকে সন্দেহ করেন?

—করব না? মাস-মাস সাড়ে চারশ টাকা মনি-অর্ডার করত। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট বা ক্রস-চেক-এ টাকা পাঠালে অনেক কম খরচ পড়ত। কিন্তু ‘চেক’ মানেই একটা ক্ল—ব্যাঙ্ক রেকর্ডেশন! রহস্যটা পণ্ডিতেরীতে। কিন্তু পুলিশ আমাদের সেসব কাগজ দেখতে দেবে না।



অবশেষে বুড়ো ইস্কুল-মাস্টারটা ধরা পড়ল।

চন্দননগরে। ঘোল তারিখ সকালে।

বলাই বাজার করে ফিরছিল! হঠাৎ নজরে পড়ে একজন বুড়ো ডিখারী দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে ওভারকোট নয়—ছেঁড়া শাট। পায়ে ক্যান্সিসের জুতো—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা বেরিয়ে আছে। বলাই স্বপ্নেও ভাবেনি এই সেই লোক। খবরের কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে এই কল্লাসার ডিখারীর কোন সাদৃশ্যই নেই। বলাই বললে, এগিয়ে দেখ বাপু, এখানে ভিক্ষা হবে না। বাড়িতে অসুখ।

—না বাবা, ভিক্ষা চাইছি না। ...মানে এটাই কি ডক্টর চন্দ্রচূড় চট্টোজের বাড়ি?

—হ্যাঁ, কাকে চাই? বিকাশবাবুকে?

—না বাবা, চাইছি না কাউকে। আচ্ছা ডক্টর চ্যাটার্জি যে বেকিটার সামনে খুন হয়েছিলেন তুমি সেটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা সম্ভাবনা বলাইয়ের মনে জাগল। একটা 'হিন্দি পিকচারে' ডিটেকটিভ বলেছিল—খুনী প্রায়ই খুনের জায়গাটা দেখতে আসে।

বলাই ওখান থেকে চিৎকার করে ওঠে—দারোয়ানজী!

দারোয়ান তার গুমটিতে বসে আটা মাখছিল। বলাইয়ের চিৎকার শুনে সে বেরিয়ে আসে।

অনিতা আর বিকাশ বাগানে গল্প করছিল। তারাও দৌড়ে আসে।

বৃদ্ধ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! বিকাশ দারোয়ানকে প্রশ্ন করে, পহছনতেহ?

বৃদ্ধ সে কথা শুনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে আর্থকন্ঠে বলে ওঠেন, না, না, আমি ... আমি ঠেকে খুন করিনি!

দারোয়ান লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে শুধু বললে, কিভাবেবাবু!

বিকাশ প্রচণ্ড জোরে বৃদ্ধের চোয়ালে একটু ঘষি মারল।

যে ভঙ্গিতে চন্দ্রচূড় উবুড় হয়ে পড়েছিলেন ঠিক সে ভঙ্গিতেই হাত-পা ছড়িয়ে ছিটকে পড়লেন হেমঙ্গিনী স্কুলের থার্ড-মাস্টার।

অনিতার কী হল—সে লাফ দিয়ে পড়ল বৃদ্ধের উপর। তাঁকে আক্রমণ করতে নয়, রক্ষা করতে। চিৎকার করে বলে, কেউ ওর গায়ে হাত দিও না! মরে গেলে কিন্তু তোমরাও খুনের দায়ে পড়বে!

বিকাশের তখনও রাগ পড়েনি। সে দারোয়ানের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নেয়। কিন্তু আঘাত করা সম্ভব হয় না। অনিতা বৃদ্ধকে আঁকড়ে উবুড় হয়ে পড়েছে। তখনও সে বলাই, বিকাশদা! ঠাণ্ডা হও! যু কাষ্ট টেক ল ইন য়োর ওন হ্যান্ডস্!

বিকাশ সশ্বিৎ ফিরে পেল। তার ডান হাতটা ঝনঝন করছে। সে বাড়ির দিকে ফিরল থানায় ফোন করতে। অনিতা দেখল, বৃদ্ধ জ্ঞান হারিয়েছেন। নিজের দাঁত দিয়ে জিবটা বোধহয় কেটে গেছে। মুখ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বললে, দারোয়ান জল, জল নিয়ে এস। বলাই দৌড়ে যা! ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন শিগগির!



পরদিন সকালে চার-পাঁচখানি কাগজ নিয়ে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ঠাণ্ডা ভাগ্যভাগি করে পড়ছিলেন। সব কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটা বেরিয়েছে। অনেক ছবিও। সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে দুটি পত্রিকায়। বিশু এসে খবর দিল—একজন বাবু আর একটি মেয়েছেলে দেখা করতে চাইছেন। সুজাতা উঠে দেখতে গেল এবং ফিরে এসে বললে, ডক্টর দাশরথী দে আর তাঁর মেয়ে।

বাসু বললেন, এখানেই ডেকে নিয়ে এস।

ডাক্তার দে বললেন, তিনি পুলিশে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে জানানো হয়েছে এ অবস্থায় বাইরে কোনও লোকের সঙ্গে আসামীকে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

—উনি আছেন কোথায়? হাসপাতালে না হাজতে?

—হাজতে। ফার্স্ট-এড দিয়ে ঝুঁকে হাজতেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাসু বললেন, একটা টাকা দিন তো?

—আজ্ঞে?

—একটা ভাঙতি টাকা, কয়েন বা নোট।

এবারও প্রশ্নটা বোধগম্য হল না তাঁর। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। মৌ তার ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে।

বাসু বলেন, টাকাটা তোমার বাবাকে দাও। ...ইয়েস্! দ্যাটস্ কারেক্ট। এবার আপনি আমাকে ঐ টাকাটা দিন? ...হ্যাঁ আমাকেই।

সুজাতা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে রসিদ বইটা। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, রসিদটা কার নাম হবে?

—ডাক্তার দাশরথী দে, ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অব শিবাজীপ্রতাপ বোস, লীগ্যালি ইনসেন্।

ডাক্তার দে বলেন, ওটা ...মানে ...ঐটুকুই আপনার রিটেইনার?

—হ্যাঁ! আপনার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হাজতের ভিতরে দেখা করার ছাড়পত্র। এখন আইনত আমি তাঁর লীগ্যাল কাউন্সেল। আপনাদের কিছুতেই হাজতে ঢুকতে দেবে না; কিন্তু আমাকেও কিছুতেই আটকাতে পারবে না।

### চোদ্দ

হাজতের একান্তে একটি কোনায় বসেছিলেন বৃদ্ধ। কান-মাথা দিয়ে একটা ব্যাভেজ্ঞ ঝাঁঝ। যেন কানকাটা ভিলেট ভাঁ গম্! বাসু-সাহেবকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে গ্রহসী বাইরে গেল। শ্রুতিসীমার বাইরে, দৃষ্টিসীমার নয়। আসামী আগন্তুকের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে। পরক্ষণেই নড় করে তার দৃষ্টি। তার মুখ ভাবলেশহীন।

## কাটার-কাটার-২

—আপনি আমাকে চেনেন? —মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রহ্লাদ নিষ্কেপ করলেন বাসু।  
কথা বলতে ঠর বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল। মনে হয় জিবটা কেটে গেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে ভবু বললেন,  
চিনি। উকিলবাবু।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার নামটা জানেন?

শিবাজীপ্রতাপ নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করলেন। মেদিনীনিবন্ধদৃষ্টি।

—আমার নাম: পি. কে. বাসু।

—ও।

—আমার নাম ইতিপূর্বে কখনো শুনেননি?

আবার ঘড়ির পেডুলামের মতো মাথাটা নড়ল। নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি।

—প্রসন্নকুমার বাসু, 'পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল'-এর নাম কখনো শোনেননি?

এতক্ষণে উনি আগন্তুকের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি  
ছদ্মপতি শিবাজীর নাম শুনেননি? চিতোরের রাণা প্রতাপের?

—হ্যাঁ শুনছি। নিশ্চয় শুনছি।

—আপনি কি মনে করেন, আপনি ঠন্ডের মত একজন কেওকেটা?

—না, তা মনে করি না! কিন্তু তাহলে আপনি কেমন করে জানলেন যে, আমি উকিল!

—সহজেই। আমার মতো কপদিকহীন আসামীর জন্য আদালত থেকে সরকারী খরচে উকিল  
দেওয়া হয় এটা জানি বলে।

—না! ওখানে ভুল হচ্ছে আপনার। আমি সরকার-নিযুক্ত নই। আমাকে নিযুক্ত করেছেন ডক্টর  
দাশরথী দে। তাঁকে চেনেন?

হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বুদ্ধ, বাঃ! দাশুকে চিনব না? কেমন আছে ওরা? দাশু, বৌমা, মৌ?

—ওরা সবাই ভাল আছে। শুনুন, আমি আপনার পক্ষের উকিল, মানে আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ যে  
অভিযোগ এনেছে আমি হচ্ছি তার...

—বুঝেছি, বুঝেছি! যু আর দ্য ডিফেন্স-কাউন্সেল!

—আমাকে সব কথা খুলে বলবেন তো? সব, স—ব কথা?

বুদ্ধ উর্ধ্বমুখে অনেকক্ষণ কী-যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, বলব, তবে এক শর্তে!

—শর্ত। কী শর্ত!

—আপনি কথা দিন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন যেন আমার ...আমার ফাঁসি হয়। যাবজ্জীবন  
নয়! কথা দিন!

বাসু একটু থমকে গেলেন। বৃদ্ধের কথাবার্তা, ব্যবহারে পাগলামির কোনও লক্ষণ তো নেই!  
বলেন, কেন? কেন নয় বেকসুর খালাস?

—সেটা অসম্ভব! আর তাছাড়া তাহলে তো আবার সেই রেকারিং ডেসিমেল?

—তার মানে?

—নিজেকে ঝুঞ্জে ফেরা। কিছুতেই নিজের নাগাল পাব না ...'ঝুড়ের কল'-এর মতো...

—অথবা সেই চিল্লানোসরাস-এর মতো...

—একজ্যাস্টিলি! যে কোনদিনই ব্যাচারথেরিয়ামের নাগাল পাবে না।

—তাহলে ছবিটা কেটে ফেললেন কেন?

—কেটে তো ফেলিনি। ছুরি মেরে ছিলাম! ...ও ইয়েস্ অ্যান্ডিনে ঠিক মনে পড়েছে। এই দেখুন  
দাগ!

ডান হাতের তালুটা মেলে ধরেন। সত্যিই তাতে একটা কাটা দাগ। বেশি পুরানো নয়।

বাসু প্রশ্ন করেন, কাকে ছুরি মেরেছিলেন? চিল্লানোসরাসকে?

—দূর! তাকে মারব কেন? সে তো কামড়ায় না। শুধুমুখু হাঁ করে! ভয় দেখায়।

—তবে কাকে ছুরি দিয়ে মেরেছিলেন?

—ভুলে গেছি।

বাসু কোন নাগালই পাচ্ছেন না। সবই ধোয়াশা। আবার প্রশ্ন করেন, আপনার ঘরে একটা টাইপ-রাইটার দেখলাম। সেটা কত দিয়ে, কোন দোকান থেকে কিনেছিলেন মনে আছে?

—কিনি নি তো। আমার এক ছাত্রের উপহার দিয়েছিল। তার নামটা ভুলে গেছি।

—নাম তো ভুলে গেছেন, চেহারাটা মনে আছে?

—হুঁ! কদিন তাকে দেখি নাই।

—নাম তো মনে নেই, উপাধিটা মনে আছে। বামুন না কায়েত, হিন্দু না মুসলমান...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বলাতে মনে পড়ল, ছেলেটি মুসলমান। আর কিছু মনে নেই।

বাসু এবার অন্যদিক থেকে প্রশ্নবাণ নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। বলেন, এই নামগুলোর একজনকেও চেনেন? অধর, বনানী...

—বাঃ! ওদের খুন করলাম, আর নাম জানব না? আসানসোলের অধর আঢ়ি, উনিশে অক্টোবর; বর্ধমানের বনানী বনাজী, সাতাশে অক্টোবর; নেত্রট চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি... সাতই নভেম্বর!

—আর পঁচিশে ডিসেম্বর?

—পঁচিশে ডিসেম্বর! সেটা তো লর্ড খীসাস্-এর জন্মদিন! সেদিন আবার কাউকে খুন করতে যাতে হবে নাকি? আঃ—ছি-ছি-ছি! অমন পুণ্যদিনে! কই কোন নির্দেশ তো পাইনি?

বাসু হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, যাঃ! এটা কি ভোলা যায়? ঐ একই লোক তো ইনস্ট্রাকশান দিল?

—কোন লোক?

—সেটা তো আপনি বলবেন! কোন্ লোক?

বৃদ্ধ আগ্রাণ চেষ্টা করলেন মনে হল। অথবা অপরূপ অভিনয়! মনে হল, তিনি অজ্ঞকারের ভিতর হাংড়াচ্ছেন—কে সেই লোকটা, যে বারে বারে শুঁকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, আসানসোলের অনাদি আঢ়ি, বর্ধমানের বনানী বনাজী, চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি—

শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আয়াম সরি। একদম মনে পড়ছে না।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আমি আবার আসব। মনে করবার চেষ্টা করুন। কে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল : ‘এ’ ফর আসানসোল, ‘বি’ ফর বার্ডওয়ান; ‘সি’ ফর চন্দননগর, অ্যান্ড ‘ডি’ ফর...

—কী? ‘ডি’ ফর কী?

—ভাবুন ভাবুন। ‘ডি’ ফর কী হতে পারে? ক্লু তো দিয়ে গেলাম। একই লোক নির্দেশ দিল। পঁচিশে ডিসেম্বর! এই নিন, এই নোট বই আর পেনসিলটা রাখুন। যখন যেটা মনে পড়বে চট করে লিখে ফেলবেন, ‘ডি’ ফর কী? কে আপনাকে টাইপ-রাইটারটা উপহার দিয়েছিল, কে আপনাকে এতগুলো নির্দেশ একের পর এক দিয়ে যাচ্ছিল ... কেমন?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে।

বৃদ্ধও উঠে দাঁড়ালেন। বাসু-সাহেবের হাত দুটো ধরে বললেন, আমি আমার কথ...  
আপনিও আমার অনুরোধটা রাখবেন তো?

—কোনটা?

—যাতে ওয়া যাবজ্জীবন না দেয়! তিন তিনটে খুন: ফাঁসী না দেবার কোন যুক্তি নেই। নয়?

—বাসু-সাহেব ফিরে আসতেই কৌশিক এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল, শিবাজীবাবুর সঙ্গে দেখা হল?

—হল! কিছু কিছুই ওর মনে পড়ছে না। তুমি ইতিমধ্যে কতদূর কী করলে বল?

## কাটায়-কাটায়-২

কৌশিক তার রিপোর্ট দাখিল করল। খবরের কাগজে যে মেটাল হস্পিটালের উল্লেখ আছে সেখানে সে গিয়েছিল। মানসিক চিকিৎসালয়টি ভাল। ডাক্তারবাবুও বেশ সজ্জন। শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর কেস-হিস্টরি তিনি রেজিস্টার খুলে দেখিয়েছিলেন। কৌশিক সেটা আদ্যন্ত টুকে এনেছে। মাস্টারমশাই কবে ঐ মানসিক হাসপাতালে প্রথম আসেন, কতদিন ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা রোগীর অবচেতন মনের জট ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে যেসব প্রয়োজ্য করা হয়েছে তাও। তাতে ঊর পূর্বকথা অনেক কিছু জানা গেল। বাসু-সাহেব অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ লাক্ষ্যে ওঠেন: এই তো! নামটা পাওয়া গেছে। হানিফ মহম্মদ!

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বলে, হ্যাঁ। পরীক্ষার হলে উনি যার গলা টিপে ধরেন তার নাম হানিফ মহম্মদ। এটাই প্রথম কেস। তারপর...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, হানিফ মহম্মদ! আশ্চর্য! তাহলে আমি যে পথে ভাবছি...

আবার চুপ করে যান উনি। বাসু-সাহেব কোন পথে কী ভাবছেন তা কৌশিকের জানা নেই কিন্তু এটুকু জানে যে, এখন নীরবতা ভঙ্গ করতে নেই।

বাসু হঠাৎ তুলে নিলেন টেলিফোনের রিসিভারটা। একটা নম্বর ডায়াল করলেন।

—হ্যালো, আমি পি. কে. বাসু। বলছি, তোমার বাবা কি বাড়ি আছেন? ...ও নেই বুঝি... হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। উনি ভালো আছেন, শারীরিক ও মানসিক। তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন ...হ্যাঁ আমাকে তাঁর ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসেবে মেনে নিয়েছেন। আচ্ছা শোন, একটা কথা বলতে পার? ঊর ডান হাতের তালুতে একটা কাটা দাগ দেখলাম—হাতটা কী ভাবে... ইয়েস, বল?

কৌশিক নীরবে অপেক্ষা করে। বুঝতে পারে ও প্রান্ত থেকে মৌ একটা দীর্ঘ ইতিহাস বলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ একটানা শুনে বাসু-সাহেব বললেন, তা সেদিন এসব বলনি কেন? ...আই সী! ঠিক কথা! সেদিন আমি ঊর ডিফেন্স-কাউন্সেল ছিলাম না। তা সেদিন আর কিছু গোপন করেছিলে নাকি? ...বাসি জোভ! ডায়েরী! ঊর নিজের হাতে লেখা! সেটা পুলিশে সীজ করেনি? ও! তুমি আগেই লুকিয়ে ফেলেছিলি! শোন, কৌশিক, রিপ্রেজেন্টিং 'সুকৌশলী' আধঘণ্টার মধ্যে তোমার কাছে যাচ্ছে। তার আইডিটিটি চেক আপ করবে প্রথমে; তারপর আমার ভিজিটিং কার্ডের পিছনে তোমাকে লেখা একখানা চিঠি পেলে কৌশিকের হাতে ডায়েরিটা দিয়ে দিও। কেমন? ...কী? বাঃ! আমার লাইন কেউ ট্যাপ করছে কি না তার গ্যারান্টি কী? ঐ ডায়েরিটা ভাইটাল এভিডেন্স!

নিজের ভিজিটিং কার্ডের পিছনে মৌকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে কার্ডখানা কৌশিকের হাতে দিয়ে বললেন, কী করতে হবে বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়িটা নিয়ে ডক্টর দাশরথী...

—আজ্ঞে না! ট্যাক্সি নিয়ে যাও। গাড়ি নিয়ে আমি ঐ মেটাল হস্পিটালে যাব।

—কেন মামু?

—যে ভাইটাল ক্লুটা তুমি জেনে আসনি, সেটা জানতে! অফ্‌ যু গো!

দুজনে দুদিকে রওনা হয়ে গেলেন আবার।

বাসু-সাহেব যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখটা ধ্বংস করছে। ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সুজাতার সঙ্গে। বাসু প্রশ্ন করেন, কৌশিক ফিরেছে?

—হ্যাঁ! ডায়েরিটা আপনার স্টাডিরুমের টেবিলে...

—থ্যাঙ্ক! শোন! আমাকে কেউ যেন এখন ডিসটার্ব না করে! ও. কে.?

উনি স্টান চুকে গেলেন ঊর চেম্বারে।

ঘণ্টাখানেক পরে ইস্টারকমে উনি রানী দেবীকে খুঁজলেন, রানু, উড্‌ যু কাইভলি হেল্প্‌ মি এ বিট? এ যারে চলে এস মীজ।

হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রানু প্রবেশ করলেন ঊর খাশ-কামরায়।

বাসু বলেন, ডায়েরিটা পড়া হয়ে গেছে। এখন আমার দুটো কাজ। এক নম্বর একটু নিরিবিচি চিঠা করা; দুঃস্বপ্ন—একগাদা টেলিফোন করা। তুমি দ্বিতীয় কাজের দায়িত্বটা নাও। একে একে ডায়াল করে লোকগুলোকে ধর। লাইন পেলেই আমাকে দিও। একটা কাগজে নামগুলো লিখে নাও। এই পর্যায়ে : রবি বোসকে তার অফিস নাম্বারে, চন্দননগরে বিকাশকে, ‘কুশীলব’—এর দপ্তরে যাকে পাওয়া যাবে, আর স্যারকে।

রানী দেবী খুশি হলেন কিছু করতে পেয়ে। টেলিফোন গাইড আর নেটবই দেখে একে একে নম্বরগুলো ডায়াল করতে থাকেন। ‘স্যার’ বলতে কার কথা বলতে চেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রানুর, অশীতিপন্ন ব্যারিস্টার এ. কে. রে, যার অধীনে প্রথম জীবনে জুনিয়ার হিসাবে বাসু-সাহেব ব্যারিস্টারি শুরু করেছিলেন।

প্রথমেই রবি বাসু। লাইনটা পেতেই রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন রানী দেবী।

—শোন রবি। আমি বাসু বলছি। আমি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছেছি A. B. C.-র মধ্যে একটা অ্যালফাবেটের জন্য S. P. C. দায়ী নন! ...সরি, টেলিফোনে আর কিছু বলা যাবে না। তুমি কখন আসতে পারবে? ...না, না, অত তাড়াতাড়ি নয়। কারণ এখানে আসার আগে তোমাকে আর একটা কাজ করে আসতে হবে। তোমার সন্ধান কোন ‘এ-ওয়ান-গ্রেড’-এর পকেটমার আছে? ...হ্যাঁ গো! ‘পকেটমার’! ...কী আশ্চর্য! পুলিশের লোক আর ‘পিকপকেট’ চেন না? ...হ্যাঁ! এক সন্ধ্যার জন্য তাকে নিয়ুক্ত করতে চাই! ...যাকে পাও ...মকবুল, ছোট থোকন, যোসেফ যাকে হয় ...তবে পাকা হাত হওয়া চাই ...ও.কে.! আমি অপেক্ষা করব। ...হ্যাঁ, এ ‘কনোসার অফ পিক-পকেট’কে সঙ্গে নিয়ে আসা চাই।

রিসিভারটা ফেরত দিয়ে উনি পাইপ ধরালেন। রানী দেবী জানতে চাইলেন না পকেটমারের কী প্রয়োজন হল। চন্দননগরে ডায়াল করতে থাকেন।

বিকাশ জানালো, তার মনে আছে। রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা। হ্যাঁ, অনিতাকে নিয়েই সে আসবে। তার দিদি একটু ভাল আছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে নস্যাত্ত করে। বোধ করি, স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের অপেক্ষায় তিনি এভাবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন। হ্যাঁ, উনি স্বামীকে চিঠি লিখেছেন। ইংরাজিতে। ডিক্টেশন দিয়েছেন। শুরুর লিখে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, সে চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি। বিকাশ আরও বলল, এখন কি আর রবিবারের মিটিংয়ের আদৌ কোন মানে হয়?

বাসু-সাহেব জবাবে বললেন, আসানসোল থেকে সুনীল, বর্ধমান থেকে অমল দত্ত, মনীশ সেনরায় আর ময়ূরাক্ষী আসছে। ওদের দুজনকে মৃত ব্যক্তিত্বের দুটি ফটো আনতে বলা হয়েছে। বিকাশও যেন চন্দ্রচূড়ের একটি আলোকচিত্র নিয়ে আসে। ঘরোয়া পরিবেশে পরস্পর পরস্পরকে সান্বনা জানানো আর স্বগতঃ আত্মার শান্তিকামনা। অপরাধী যখন মৃত তখন আর তো কিছু করার নেই!

‘কুশীলব’—এর দপ্তরেও একই বার্তা জানানো হল। আরও অনুরোধ করা হল, রবিবারের এই যৌথ শোকসভায় ‘কুশীলব’—এর তরফে কেউ যেন বনানীর অভিনয়-প্রতিভার বিষয়ে কিছু বলেন, আর উষা বাগচী যেন অবশ্যই আসে। দুটি গান গাইতে। উদ্বোধনী আর সমাপ্তি সঙ্গীত। বাসু-সাহেব জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন উষার বাড়িতে টেলিফোন আছে। অতঃপর তাকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে ফোন করে অনুরোধ করলেন। জানতে চাইলেন, তোমাকে এ জন্য যে সম্মান-সন্নিধান...

উষা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, কী বলছেন স্যার! বনানী আমার বন্ধু, সহকর্মী! তার স্মরণশতায় আমি পয়সা নিয়ে গান গাইব? আপনি নিশ্চিৎ থাকুন, আমি আসব, স-তবল্চি।

রানী জিজ্ঞাসা করেন, তোমার লিস্ট খতম। আর কাউকে ফোন করতে হবে কি?

—হ্যাঁ, ডক্টর মিত্র, ডক্টর ব্যানার্জি আর টেম্পল চেম্বারে নিবিকে।

—‘নিবি’ কে?

—ভাল নামটা মনে নেই, ‘মজুমদার নিবি’তে এন্ট্রি আছে আমার ‘ফোন-বুকে’।

## কাটায়-কাটায়-২

ক্রিমিনোলজি এক্সপার্ট ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতটিকে একই আমন্ত্রণ জানানো হল।

নিবি মজুমদার ব্যক্তিটিকে রানী চিনতে পারলেন না। কিন্তু বাসু-সাহেবের একতরফা আলাপচারী শূনে ঠুর মনে হল তিনি কোনও প্রখ্যাত সলিসিটর ফার্ম-এর পার্টনার।

—কে নিবি? হ্যাঁ, আমি বাসুই বলছি। আমার মনে হয় সময় হয়েছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি দলিলটা নিয়ে রবিবার বিশ তারিখ সন্ধ্যা ছটার সময় আমার বাড়িতে চলে এস। ... হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি উত্তরপ্রান্তে থাক। বাড়ি ফিরতে রাত হবে। তা হোক না একদিন। গিল্মিকে বলে এস যে, আমার বাড়িতে আসছ! না হয় বল আমিই আরতিকে ফোন করে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি তার কর্তাকে আটকে রাখার জন্য!

ও প্রান্তবাসী কী বললেন তা শুনতে পেলেন না রানী। তবে হাসির কথা নিশ্চয়ই। কারণ হেসে উঠলেন বাসু-সাহেব। বললেন, সেম টু য়ু!

রানী দেবীর ডিডাকশান—ঐ অজ্ঞাত নিবি মজুমদারের শেষ শব্দটা ছিল ‘গুড-বায় স্যার!’ বাসু-সাহেব হেসেছেন। ‘পর্বতো খোশমেজাজ হাস্যাত্’ তাই রানী এতক্ষণে সাহস করে বললেন, তিনটে খুনের অন্তত একটা মাস্টারমশাই করেননি, নয়?

বাসু পাইপে একটা টান দিয়ে বললেন। কারেঙ্ক! আর কোন ডিডাকশান?

—এবং সেই খুনের নায়ক রবিবার সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হলেন? ঠিক বলেছি?

—সুপার্ব! এ না হলে পি. কে. বাসুর বউ!

—এবং সেই একমাত্র খুনটা হচ্ছে : বনানী?

—পার্টলি কারেঙ্ক!

—‘পার্টলি কারেঙ্ক’ মানে? হয় ‘কারেঙ্ক’ নয় ‘ইনকারেঙ্ক’। তিনটে খুনের একটা...

—এ ধাপার সমস্যা পি. কে. বাসুর বউয়ের স্বামী ছাড়া কেউ সমাধান করতে পারবে না! ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। রানী দেবী তুললেন, শূনে নিয়ে যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, লডন স্ট্রীট থেকে আই. জি. ক্রাইম তোমাকে খুঁজছেন।

বাসু রিসিভারটা গ্রহণ করে তার ‘কথা-মুখে’ বলেন, শুভ সন্ধ্যা ঘোষাল সাহেব! বলুন?

—আজ সন্ধ্যায় আপনার প্রোগ্রাম কী?

—নিত্যকর্মপদ্ধতি-অনুসারে গৃহাবরোধে মদ্যপান।

—একটু পরিবর্তন করা যায় না? না, না, প্রোগ্রামটা বদলাতে বলছি না, ‘ভেনুটা—অর্থাৎ নিত্যকর্মপদ্ধতিটা যদি আমার গৃহাবরোধে সারতে আসেন? অ্যারান্ড সাড়ে আটটায়?

—ম্যাগনিফিক! কিছু হেঁচুটা?

—কাল হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, আমার ‘সেলারে’ একটা ‘রয়্যাল-স্যালুট’ বন্দিনী অবস্থায় প্রতীক্ষারত। ও বস্তুটা একা একা উপভোগ করা যায় না, আবার উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়াও শক্ত। আপনি কি আমাকে সঙ্গ দিয়ে কৃতার্থ করতে পারেন না?

—আসতে! আমি রাজী। কিন্তু একটি শর্ত আছে ঘোষাল-সাহেব!

—হুকুম করুন।

—‘রয়্যাল-স্যালুট’-এর সঙ্গে আপনি প্যারীচরণ সরকারকে পাঞ্চ করবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—প্যারীচরণ সরকার? অসম্ভাব্য?

—প্যারীচরণ ছিলেন ‘The Arnold of the East!’ তাঁর করুণাভেই প্রথম A.B.C.D. শিখেছিলাম!

টেলিফোন রিসিভারে ভেসে এল ঘোষাল-সাহেবের অট্টহাসি। বললেন, কিন্তু ‘প্যারীচরণ’কে ‘রয়্যাল স্যালুট’-এর সঙ্গে কেন পাঞ্চ করা যাবে না, তার কারণ তো একটা দেখাবেন?



—শ্যুওর! প্যারীচরণ সরকার শুধু 'ফার্স্টবুক' লিখেই কাণ্ড হননি—তিনি আরও একটি পাপ কাজ করেছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণ সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা!

আবার অটোহাস্য। ঘোষাল বললেন, চট্জল্দি জবাব সব সময়ে আপনার ঠোটের আগায়। অলরাইট! আমরা বরং 'এ.বি.সি.ডি.'র বদলে 'অ-আ-ক-খ' পাঠ করব। ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়। বিদ্যাসাগর মশাইও জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছেন, কিন্তু মদ্যপানের সহ্য করতেন—না হলে মাইকেল তাঁর Vid-এর করুণালাভ করতেন না।

রাত পৌনে নটা। ঘোষাল-সাহেবের ড্রইংরুম। স্তিমিত আলোক। টিপয়ের উপর সদ্য-বন্ধনমুক্ত রয়্যাল স্যালুটের বোতল, দুটি গ্লাস, বরফের কিউব, স্ম্যাক্স—আর দু-প্রান্তে দুই প্রৌঢ়।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, আপনি হয় তো বরাটের উপর রাগ করছেন বাসু-সাহেব, কিন্তু... বাধা দিয়ে বাসু বললেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা ঘোষাল-সাহেব। বরাটের উপর আমাদের রাগ করিনি। সে আমাদের 'ফেয়ার অফার' দিয়েছিল। আমি যদি ঐ পাগলটার ডিফেন্স দেব না বলে প্রতিজ্ঞা দিই তাহলেই সে পুলিশের 'সীজ' করা জিনিসগুলো আমাকে দেখতে দেবে। ন্যায় কথা। পুলিশ এখন চার্জ-শ্রেম করতে ব্যস্ত। প্রতিবাদী পক্ষের বরাট তার হাতের তাস আগে-ভাগেই দেখিয়ে দিতে পারে না। অধিকার-বহির্ভূত সে কিছু করেনি।

—তার মানে আপনি শিবাজীপ্রতাপের ডিফেন্স দিতে মনস্থ করেছেন?

—ইয়েস! আমি ইতিমধ্যে তার কেসটা নিয়েছি। হাজতে তার সঙ্গে দেখাও করে এসেছি।

—আপনার কি ধারণা লোকটা সত্যিই পাগল? সে স্বজ্ঞানে খুনগুলো করেনি? ওর পিছনে আর কোনও ক্রিমিনাল লুকিয়ে রয়েছে?

বাসু স্মিত হাসলেন। জবাব দিলেন না।

—অলরাইট! অলরাইট! আই অ্যাডমিট! আপনিও আপনার হাতের তাস আগে-ভাগে দেখাতে পারেন না। ঠিক আছে। আমিই খুলে বলি। বুঝতেই পাচ্ছেন, একটা বিশেষ বার্তা আপনাকে জানাতে চাই বলেই এই নিভৃত সাক্ষাতের আয়োজন। আমি মন খুলে আমার বক্তব্য রাখি। আপনি আপনার হাত এক্সপোজ না করে যতটুকু সম্ভব আপনার মতামত জানান। প্রথম কথা: আমার বিশ্বাস—তিনটে খুনই শিবাজীপ্রতাপ করেনি। লোকটার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো নিশ্চিত—ওর টাইপ-রাইটার, ওর আলমারিতে সাঞ্জানো ধর্মপুস্তক এবং সবার উপরে না-খোলা প্যাকেটে ঐ সুকুমার রায়-এর বইটা, যা থেকে তিন-তিনটে ছবি কেটে তিনটি চিঠিতে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছিল। ডক্টর মিত্র অজ্ঞাত হত্যাবিলাসীর বিষয়ে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সবগুলোই মিলে গেছে। এক নম্বর, লোকটা অঙ্কের মাস্টার; দু: নম্বর সে শিশুসাহিত্য পড়তে ভালবাসে; তিন নম্বর, ভাল টাইপিং জানে; চার নম্বর সে 'মেগ্যালোম্যানিয়াক'; পাঁচ নম্বর সে হত্যাবিলাসী! কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ঐ লোকটা দ্বিতীয় খুনের জন্য দায়ী। আই মীন, বনানী ব্যানার্জি। মনীশ সেনরায় যাকে ঐ ফার্স্টব্রুস কামরায় আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখেছিল সে লোকটা ঐ বাট বছরের আধা-পাগলা বুড়ো হতে পারে না। শুধু এই কারণেই শিবাজীপ্রতাপের বিরুদ্ধে চার্জটা ফ্রেম করা যাচ্ছে না। বরাটও এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। খুব সম্ভবত পুলিশ শিবাজীপ্রতাপের বিরুদ্ধে দুটো খুনের চার্জই আনবে। বনানী-মার্ডার নিয়ে আমরা এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

ঘোষাল-সাহেব থামলেন। বাসু নিঃশব্দে এক চুমুক পান করে নিরুত্তরই রইলেন।

আই. জি. ক্রাইম আবার শুরু করেন, আপনি কি বনানী হত্যার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত? যেহেতু আপনার ক্রায়েন্টের বিরুদ্ধে ও চার্জটা নেই?

বাসু বললেন, আমি গোটা কেসটাকে এ-ভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে প্রস্তুত নই। আমার মতে তিনটি হত্যা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। তাদের পৃথক করা সম্ভবপর নয়।

## কাটায়-কাটায়-২

—কেন নয়? ধরা যাক, দ্বিতীয়টা অন্য লোকের হাতের কাজ। সে নাম-উপাধির সুযোগ নিয়ে বর্ধমানের কেসটাকে অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের একটা সেকেন্ড টার্ম হিসাবে চালিয়ে দিতে চাইল?

—কিন্তু বনানী যখন খুন হয় তখনো তো আমরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিইনি? বনানীর হত্যাকারী তো জানে না যে, আমরা ঐ জাতের চিঠি পাচ্ছি?

—ধরুন কোন সূত্রে সে তা জেনেছে। আমরা সত্য-আটকনে বসে কনফারেন্স করেছি। ঘরে স্টেনে' ছিল। ঐরা সকলেই অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, কিন্তু বাড়ি ফিরে এমন মুখরোচক গল্পটা নিজ-নিজ ধর্মপত্নীকে যে গল্প করে শোনানি তার গ্যারান্টি নেই। আর মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না এটা তো প্রবাদবাক্য!

বাসু বলেন, তা সত্ত্বেও আমি যা বলেছি সে অসুবিধেটা থেকেই যাচ্ছে। তিনটি কেসকে পৃথক করা যাচ্ছে না। একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন আমি জেনেছি, এ টাইপ-রাইটারটা শিবাজীবাবুকে যে উপহার দিয়েছিল তার নাম হানিফ মহম্মদ। কিন্তু লোকটা কে, কোথায় আছে তা জানি না। আমি জেনেছি, পণ্ডিচেরীর এক অজ্ঞাত মহারাজ শিবাজীবাবুকে মাস মাস টাকা পাঠাতেন এবং পার্সেলে বই পাঠাতেন; অথচ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আমি কোনও অনুসন্ধান করতে পারিনি। আমি জানি না, এগুলো আপনারা জানান কি না, পুলিশ কোনও তদন্ত করেছে কি না। করে থাকলেও পুলিশ তা আমাকে জানাতে পারে না; কারণ আমি শিবাজীবাবুর ডিফেন্স-কাউন্সেল। এক্ষেত্রে আমি কেমন করে...

বাধা দিয়ে ঘোষাল-সাহেব বলেন, জাস্ট এ মিনিট। আমি জবাব দিচ্ছি। পুলিশ এ সব তদন্ত শেষ করেছে। তার ফলাফল আমিই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। শুনুন মিস্টার বাসু। লোকটা যদি সত্যি নিরপরাধ হয় তাহলে তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বুলিয়ে দেবার ইচ্ছা আমাদের কারও নেই। ... ই্যা, ওকে যে লোকটা টাইপ-রাইটার উপহার দিয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে তার নাম হানিফ মহম্মদ। হোমিস্ট্রী বয়েজ স্কুলে তার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস পুলিশে জোগাড় করেছে। লোকটা মারা গেছে। বছর দশেক আগে। আপনি তো জানেনই যে, প্রতিটি ঘড়ির পিছনে যেমন ম্যানুফ্যাকচারার-এর দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা থাকে, তেমনি প্রতিটি টাইপ-রাইটার যন্ত্রেরও তাই থাকে। সেই সূত্র থেকে আমরা একথাও জেনেছি যে, ঐ যন্ত্রটা রেমিটেন কোম্পানীর ডালহৌসি-স্কোয়ার কাউন্টার থেকে দেড় বছর আগে বিক্রয় হয়—হানিফের মৃত্যুর বহু বছর পরে। যে লোকটা কিনেছিল সে নগদ মূল্যে খরিদ করেছিল। ক্রেতার হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে শিবাজীপ্রতাপের ও কথাটা ভুল—উপহারটা হানিফ পাঠায়নি।... তিন-নম্বর: পণ্ডিচেরীতে তল্লাসী চালিয়ে একথাও জানা গেছে যে, 'মাতৃসদন' এবং তার 'মহারাজ' সবই অলীক। সুতরাং একটি সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে নেওয়া চলে: 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'টাকে দিয়ে একের পর একটি খুন করলেও সমস্ত পরিকল্পনার পিছনে আর একটি ব্রেন কাজ করে চলেছে। কে, কেন, কীভাবে তা আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। এবার বলুন বাসু-সাহেব? আপনি কি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত?

—বাসু বলেন, আপনার ও কথার জবাব দেবার আগে আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে। পুলিশের মতে এক নম্বর: শিবাজীপ্রতাপ প্রথম ও তৃতীয় খুনটা স্বহস্তে করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় খুনটা করেননি। দু নম্বর: সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে একটি অজ্ঞাত অভি-ধূর্ত পাকা ক্রিমিনালের হাত আছে—যে লোকটা শিবাজীপ্রতাপকে (i) টাইপ-রাইটারটা উপহার দিয়েছে (ii) মাস-মাস মহিনা দিয়েছে (iii) তাঁর 'হোমিসাইডাল' মনোবৃত্তিকে উসকিয়ে এক ও তিন নম্বর খুন দূটি করিয়েছে। এবং তিন নম্বর: সেই পাকা-ক্রিমিনালটির পাশা আপনারা পাচ্ছেন না। কেমন তো? এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন: সেই পাকা ক্রিমিনালের মূল উদ্দেশ্যটা কী? কোনটা তার টার্গেট? কী কারণে দেড় বছর ধরে সে এই বিরীট পরিকল্পনা ফেঁদে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে?

—এর একটাই জবাব হতে পারে, বাসু-সাহেব! সেই অজ্ঞাত লোকটাই আসলে হচ্ছে 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'! মানুষ খুনকরাতেই তার তৃপ্তি। এবং সেই পাকা ক্রিমিনালটি কোন কারণে

আপনাকে শত্রুপক্ষ মনে করে। হয়তো আপনার হাতে তার কোনও হেনস্থা হয়েছে; তাই আকাশচুম্বী আত্মজড়িতা নিয়ে আপনাকে ডিফেন্স করে কুখ্যাত হতে চাইছে। শিবাজীপ্রতাপকে সে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করেছে শুধু। নিজে হাতে সে একটি মাত্র খুন করেছে—এ দু'নখর হত্যাকাণ্ড : বনানী ব্যানার্জি। বাকি দু'টি শিবাজীকে প্ররোচিত করে তার হত্যাবিলাস চরিতার্থ করেছে। এই আমার থিয়োরি। আপনি কী বলেন?

বাসু-সাহেব আর এক চুমুক পান করে বললেন, মিস্টার ঘোষাল! আপনি আপনার সবক'টি হাতের তাস টেবিলে বিছিয়ে দিয়েছেন। আয়াম এক্সট্রিমলি সরি—আমি এখন, এই মুহূর্তেই আমার সবগুলো তাস মেলে ধরতে পারছি না। কিন্তু অধিকাংশ তাসই আমি বিছিয়ে ধরছি। দেখুন, তাতে যদি কোনও সুরাহা হয়। প্রথম কথা: সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমানে আমার কাছে ন্যূনতম স্বচ্ছ—কোথাও কোনও অবিলম্ব নেই!

—মানে?

—মানে, আপনার বর্ণনা অনুযায়ী নেপথ্যচাষী হত্যাবিলাসীর পরিচয় আমি জানি।

—জানেন! আপনি জানেন লোকটা কে?

—জানি। তাকে আপনিও চেনেন। আপনারা অনেকেই চেনেন। সে আমাদের অতি নিকটেই রয়েছে। লোকটা আদৌ 'হেমিসাইডাল ম্যানিয়াক' নয়। তা সত্ত্বেও সে যে কেন পরপর তিনটি খুনের পরিকল্পনা করেছে তাও আমার জানা—

ঘোষাল-সাহেব উৎসাহে বাসুর হাতটা চেপে ধরে বলেন, আপনি জানেন? কে? কেন?

—জানি। কে এবং কেন।

—তাহলে কেন আমাদের বলতে পারছেন না?

—একটিমাত্র কারণে। আপনাকে যদি এখনই নামটা বলে দিই, তাহলে কোনদিন তার 'কনভিকশন' হবে না!

—কেন? কেন?

—কারণ যে-যে ক্ষুর সাহায্যে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করেছি তা জানালে আপনি বাধ্য হবেন এখনি তাকে গ্রেপ্তার করতে। আর এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার হলে তাকে আদালতে চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণ করা যাবে না। আমি তাকে আর একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে চাই। তার কনভিকশন হবার মতো আর একটি প্রমাণ আমি হাতে পেতে চাই...

—আমরা কি যৌথভাবে সে-কাজে এগিয়ে যেতে পারি না? পুলিশের সহায়তায় কি আপনি সেই নিশ্চয় প্রমাণটি সংগ্রহ করতে পারেন না?

—নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটিকে চিহ্নিত না করে!

—কেন?

—এখনি তা আমি বলেছি—সে ক্ষেত্রে আপনি তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবেন। আমার হৃদে পা দেবার দুর্ভাগ্য থেকে সে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। আমি সুযোগ হারাব!

ঘোষাল-সাহেব আর এক চুমুক পান করলেন।

বাসু বললেন, এবার আমার প্রস্তাবটা শুনুন ঘোষাল-সাহেব। রবিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে একটি শোকসভার আয়োজন করেছি। তিনজন মৃত ব্যক্তির প্রতি আমরা পর্যায়ক্রমে সম্মান জানাবো—প্রত্যেকটি মৃতব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে কেউ না কেউ আসবেন। পরস্পরকে সাবুনা দেবেন। এটাই হচ্ছে বাহ্যিক আয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই পরিকল্পনার মূল নায়কও ঐ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং আমার আশা—সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে ঐ সভাতেই আমি তাকে চিহ্নিত করে ফেলব। 'কনভিকশন' হবার উপযুক্ত এজিডেল ঐ সভাতেই আমাদের হস্তগত হবে। আপনি আসুন, রবি বোসকেও আমি ডেকেছি—ইন অ্যান্টিসিপেশন অব হোর এনভোর্সমেন্ট—বলেছি,

## কাটার-কাটার-২

শর্মা বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি লকার থেকে নগদ টাকা নিয়ে যান!

—একজ্যাস্টিলি! তাহলে দোশরা ঠর ডস্টে ছিল 5,700+43,800 একুনে 49,500 টাকা; নয়? এবং তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও আছে আট হাজারের উপর। সে-ক্ষেত্রে তিনি কেন তাঁর একান্ত সচিবকে স্নেনের ভাড়া দিয়ে দিল্লি পাঠাবেন? তাঁর কাছেই তো রয়েছে নগদে সাতান্ন হাজার টাকা?

—কিন্তু তিনি তো তা সন্তোষে গঙ্গারামকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন, দ্বিতীয়ত ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার মিস্টার সোম্বী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন যে, মহাদেও যখন ভস্টে গেলেন তখন তাঁর হাতে ছিল ফোলিও ব্যাগ, যার ভিতরে ছিল ঐ ফিফ্‌ড-ডিপসিটগুলো! তাই নয়? এখন বলুন, উনি তখন ব্যাগ হাতে লকার খুলতে গেলেন কেন?

—আমি তো ভেবেছিলাম ঐ ছয়-সাত হাজার টাকা লকার থেকে বার করে আনতে!

—হয় নয়, ছায়ায় হাজার। ঐ লকারে তখন ছিল একশ টাকার নোট ঠিক এক লাখ টাকা। ব্র্যাক মানি। যার সন্ধান সুরযও জানে না, জানেন গঙ্গারাম। একটু অঙ্ক কষে দেখুন, মানে বাম্বাজীর ডেবিট ক্রেডিট:

অমরনাম তীর্থে থেকে ফেরার পথে ঠর কাছে	
নগদে ছিল, আপনার আদ্যাজমত	... 200
মৃত্যুর পরে তাঁর মানিব্যাগে ছিল	... 300
ঐ স্টকেসে ছিল	... 5,400
নগদে একটি ময়না কেনা বাবদ	... 200
গঙ্গারামকে হাতখরচ দেন (গঙ্গারামের কথামত)	1,000
দোশরা থেকে পাঁচই ঠর হাতখরচ আদ্যাজ	... 100
	7,200
লকারে পরে নগদে পাওয়া গেছে	... 43,800

51,000

হিসাবটা ঠিক মিলছে না, নয়? ব্র্যাকমানি লোকে নগদে লুকিয়ে রাখে, দশ-হাজারের গুণিতকে। সুতরাং ঐ ডেবিট-ক্রেডিটে হাজার টাকার গরমিল হচ্ছে। কেন? হাজার টাকার একটাই 'এন্ট্রি' আছে। সেটাই ভুল। অর্থাৎ মহাদেও, তাঁর প্রাইভেট-সেক্রেটারীকে নগদ হাজার টাকা দেননি। সে গ্যাটের পরস্যা খরচ করে দিল্লি গেছে তার অ্যালেবাই-র খাতিরে। ঐই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরও অনেকগুলি যুক্তি রয়েছে যে। গঙ্গারামের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী—দোশরা তারিখে মহাদেও তাকে বলেছিলেন ক্যান সার্টিফিকেটগুলি বাড়িতে রাখতে। কারণ তিনি অন্য কোন সূত্র থেকে 50,000 টাকা যোগাড় করবেন। দেহাৎ না পেলে তিনি টেলিফোনে নির্দেশ দেবেন যাতে গঙ্গারাম দিল্লি গিয়ে ড্রাক্টটা নিয়ে আসে। সে-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কি মহাদেও দোশরা দুপুরের বাসে টাউন্ট-প্যারাদাইসে চলে যেতে পারেন? সেখানে টাউন্ট মাছই শুধু পাওয়া যায়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার লোন পাওয়া যায় না। শর্মাজী বলেন, তা ঠিক।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ঐ লকারে নগদ এক লাখ টাকা ব্র্যাকমানি ছিল। যে-কথা সুরয জানত না, কিন্তু গঙ্গারাম জানত। এবং এটাও সে জানত যে, মহাদেও 'অ্যালিমনি'র টাকা যেটাবেন ব্র্যাক-মানিতে। কারণ সুরমা নগদই চেয়েছেন, ঐ দু-নশ্বর খাতার অতগুলি টাকার সচিবহার নিশ্চয়ই করবেন মহাদেও। সেটা জানা ছিল বলেই গঙ্গারাম ঐ পরিকল্পনা করে। গঙ্গারাম জানত—মহাদেও অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি বেঁচে থাকলে প্রতিশোধ নিতেনই। সোজা পথে না হলে বাঁকা পথে। এজন্য টাকাটা হজম করতে হলে মহাদেওকে হত্যা করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। মহাদেও আত্মহত্যা করেছেন এটা প্রমাণ করা

শত। পুলিশ সহজে সেটা বিশ্বাস করত না। হেতুর অভাবে। তার চেয়ে অনেক সহজ: অপরাধটা সুরমার কাছে চাপানো। কারণ 'রমা' দেবীর কথা সে জানত না।

যে-হেতু একমাত্র গঙ্গারামই হত্যাকারী হতে পারে, তাই আমি ধরে নিলাম হয় তো দোশরা সেন্টেম্বর ওর লকারে ছিল নগদে এক লাখ টাকা। তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায়:

মৃত্যুর পরে লগ্-কেবিনে পাওয়া গেছে (মানিবাগ ও সুটকেসে)	... 5,700
একটি ময়না কেনার খরচ	... 200
দোশরা থেকে পাঁচই ওর হাতখরচ (একশ নয়, কিছু বেশি)	... 300
গঙ্গারামকে 'অ্যালিমনি' মেটাতে দেওয়া	50,000
লকারে নগদে পাওয়া গেছে	... 43,800

1,00,000

আমার এই হাইপথেসিসটা ঠিক কিনা যাচাই করতে আমি একটা ফাঁদ পাভলাম—গঙ্গারামের উপস্থিতিতে সুরমকে জানালাম, সুরমা দেবীর একটা বস্ত্র-বীথুনি 'অ্যালেবাই' আছে। এক-কথা বলার আগেই আমি কিছু মুদ্রাকে রমার বাড়ি থেকে সরিয়ে দ্বিতীয় পাখিটকে ওখানে রেখে এসেছি। আর ঐলসে কায়দা করে জানিয়ে দিলাম, মুদ্রা আছে রমার বাড়িতে, পহেলগাওয়ায়ে, মেথডিস্ট চার্চের পিছনে দ্বিতীয় বারান্দায়, অরক্ষিত অবস্থায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হত্যাকারী প্রাণধান করেছে—সে সুরমই হোক, অথবা গঙ্গারামই হোক, মুদ্রার ঐ বোলটা এখন পুলিশের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে। যেহেতু 'রমা' বা 'সুরমা' হত্যাকারী নয়, তখন স্বভাবতই পুলিশ ভাবতে শুরু করবে যে, মুদ্রাকে সে ঐ বোলটা টিউটার করিয়েছে, শিখিয়েছে। আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, খবরটা শোনার পরেই প্রকৃত হত্যাকারী এই সুযোগে নেবে, আমার ফাঁদে পা দেবে—অর্থাৎ মুদ্রাকে হত্যা করতে ছুটবে। ওরা আমাদের হাউসবোট থেকে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যা ছটায়। তার ঘণ্টাখানেক পরে টেলিফোন করে দেখলাম সুরম বাড়িতে আছে, কিন্তু গঙ্গারাম কোথায় বুঝি 'নেশ' নিমন্ত্রণ রাখতে গেছে। তার ফিরে আসতে রাত প্রায় এগারোটো হল। গঙ্গারাম বাস-এ যায়নি, নিজস্ব মোটরবাইকে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তেই হত্যাকারী চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। হত্যাকারী চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হওয়ার মানেই হচ্ছে তার মোটিভ রূপে আমি যা অনুমান করেছি তা সত্য। মুশকিল হচ্ছে এই যে, মোটিভটা আমি প্রমাণ করতে পারতাম না কোনদিনই। যেহেতু ব্ল্যাকমানির হিসাব থাকে না। তাই আমি আপনাদের জানাতে পারিনি আমার সিদ্ধান্তটা। ভেবে দেখলাম, ওর অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে হলে কিছু দাটকীয়তার আশ্রয় আমাকে নিতে হবে। এজন্য সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে তিলতিল করে সমাধানটা দাখিল করতে থাকি: আমি জানতাম, যে-মুহূর্তে মৃত্যুর সময়টা ছয় তারিখ সকাল থেকে পাঁচ তারিখ বিকালে আমি সরিয়ে নিয়ে যাব, সেই মুহূর্তে গঙ্গারাম নার্সাস হয়ে পড়বে। আর তারপর যখন তিলতিল করে হত্যাকারীর পরিচয়টা স্পষ্ট করতে থাকব তখন আতঙ্কের তাড়নায় গঙ্গারাম পালাবার চেষ্টা করবে। আর তাতেই তার হত্যাপরাধটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঘটনাও ঠিক সেই খাতে বইল।

শর্মাঝী বলেন, গঙ্গারাম ধরা পড়বেই। আজকালের মধ্যেই। কিন্তু অপরাধটা আমরা প্রমাণ করব কী করে? কোন প্রমাণ তো নেই।

বাসু বললেন, সম্ভবত আছে। গঙ্গারামের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সে মহাদেও প্রসাদের টেলিফোন পায় পাঁচ তারিখ রাত আটটায় এবং পরদিন সে সকালের ফ্লাইটে গিমি চলে যায়। দেখুন এজন্য সে বলেছে লগ্-কেবিনের টেলিফোনটা ডেড হয়ে গিয়েছিল। কারণ সে জানত, লগ্-কেবিন থেকে যা টেলিফোন করা হয় তার লিস্ট থাকে; তার বিল বোর্ডারকে মেটাতে হয়। কিন্তু এই সিজনটাইমে অত অল্প সময়ে মেনে সীট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া তার নিজস্ব 'অ্যালিবাইট'টা পাকা করতে সে নিশ্চয় অনেক আগেই সীটটা বুক করেছিল। সে অনেক আগে থেকেই ঐ পরিকল্পনা করেছিল। একটু খোঁজ নিলেই

## কাটায়-কাটায়-২

হ্যান্ডকাফ নিয়ে সে যেন সশস্ত্র আসে। কিছু প্লেন-ড্রেস সশস্ত্র পুলিশও থাকবে সভায়। যদি ঐ দিন সর্বসমক্ষে শয়তানটাকে আমি হাতে-নাতে ধরতে না পারি তাহলে—কথা দিচ্ছি—আমি আমার হাতের সব কয়খানা তাসই আপনার সামনে বিছিয়ে দেব। ডাক্স দ্যাট স্যাটিসফাই য়ু?

—পারফেক্টলি! আই উইশ য়ু অল সাকসেস!

‘ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল’টাকে চলে সাজানো হয়েছে। খাবার টেবিলটি অপসৃত। অন্যান্য ঘর থেকে চেয়ার এনে ঘরটা পৃথকভাবে সাজানো হয়েছে। একপ্রান্তে একটি টেবিলে পাশাপাশি তিনখানি মালাড়ুবিজ আলোকচিত্র। রবি বসু বাদে নিমন্ত্রিতরা সবাই এসে পৌঁচেছেন। শোকসভাটি পরিচালনা করছেন বাসু-সাহেবের গুরু—অতিবৃদ্ধ এ. কে. রে।

উষা বাগচী উদ্বোধনী-সঙ্গীতটি গাইল দরদভরা গলায় :

“অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়  
কণাটুকু যদি হারাই তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।”

অনেকের চোখই অজস্রজল হয়ে উঠল। সুনীল দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। তার পিঠটা মাঝে মাঝে কৈপে-কৈপে উঠছে। ময়ূরাক্ষীও বারে বারে চোখ মুছছিল। আর মৌ, মৃত ব্যক্তিত্বের একজনকেও যে দেখেনি, সেও বারে বারে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

অনিতা তার মাস্টারমশায়ের অর্থাৎ ডক্টর চ্যাটার্জির কথা কিছু বলেন।

ময়ূরাক্ষী মাথা নেড়ে অস্বীকার করায় ‘কুশীলব’-সংস্থার তরফে অন্য একজন বনানীর অভিনয়-প্রতিভা ও অমায়িক স্বভাবের সম্বন্ধে কিছু শোনালেন। সুনীল আত্ম কিছু বলার অবস্থায় নেই। তাই বাসু-সাহেব নিজেই স্বর্গত আচ্যমশায়ের বিষয়ে যেটুকু জানেন তা জ্ঞানালেন—সৎ, সম্মান, ধর্মভীরু, মানুষ্যের পরিচয়।

প্রয়াত ব্যক্তিত্বের আত্মার শান্তি কামনায় সকলে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করলেন। উষা আবার হারমনিয়ামটা টেনে নিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বাসু বলেন, না, না, সভার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আরও একজনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। দৈহিক বিচারে তিনি জীবিত, মস্তিষ্কের পরিমণ্ডলে মৃত। আমি হেমাসিনী বয়েজ কুলের প্রাক্তন শিক্ষকটির কথা বলছি। আমরা সবাই জানি—তিনি এক বিকৃতমস্তিষ্ক হতভাগ্য। সম্মানে তিনি হত্যা করেননি কাউকে। দু-চার মাসের মধ্যেই অনিবার্যভাবে তাঁর ফাঁসি হবে। আশ্চর্যভাবে মৃত মাস্টারমশায়ের সম্বন্ধে আমি ডক্টর দাশরথী সেকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

বিকাশ একটু ক্ষুদ্র স্বরে বলে ওঠে, এ সভায় কি সেটা প্রাসঙ্গিক? শোকসভায় একজন ক্রিমিনাল...

এ. কে. রে. বলে ওঠেন, না! তিনি ক্রিমিনাল না, বর্তমানে তিনি অভিযুক্ত মাত্র।

আই. জি. সি. ঘোষাল-সাহেব সংক্ষেপে শুধু বলেন, কারেন্ট!

অনিতাও বলে ওঠে, আমি বরং শুনতেই চাই। দুদিন পরে তো তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলিয়েই দেওয়া হবে। আমরা জানতেও পারব না, কী-জন্য কী করে তিনি পর পর তিনজনকে...

দেখা গেল, সভায় অনেকেই শিবাজীপ্রতাপের পঞ্চাৎপট বিষয়ে আগ্রহাঙ্কিত।

অন্তঃপর ডক্টর দে তাঁর মাস্টারমশায়ের বিষয়ে অনেক কথা বলে গেলেন। যতটুকু তাঁর জানা! ইতিপূর্বে তিনি কতবার মানুষের গলা টিপে ধরেছিলেন, তাঁর কম্পাউন্ডারির চাকরি, প্রুফরিডারি, হাইকোর্টের রেলিং যেঁবে টাইপ-রাইটিং করে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রচেষ্টা এবং ‘প্রাচীন ভারত গণিতচর্চা’ বিষয়ে তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থের কথা।

উনি থামতেই বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর গোটা ইতিহাসটাই আপনারা শুনলেন। তিনি জীবনে বার্থ, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে মানুষের গলা টিপে ধরতেন। তাঁর নামের

ভিতরেও পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত একটা 'মেগালোম্যানিয়াক' ইঙ্গিত। তিন তিনটি হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁকে অকুস্থলের কাছাকাছি দেখা গেছে! কাকতালীয় ঘটনা তিন-তিনবার ঘটে না। তাছাড়া তাঁর ঘরে যে টাইপ-রাইটার আর সুকুমার রচনা-সমগ্র সেগুলিও তাঁর বিরুদ্ধে মোক্ষম প্রমাণ। কিন্তু একটা কথা—আমি যখন হাজতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন বেশ বুঝতে পারি 'পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল' এই নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত। এক্ষেত্রে তিনি কেমন করে আমার নামে তিন-তিনখানি চিঠি...

ডক্টর ব্যানার্জি বাধা দিয়ে বলেন, সেটা ঠর নিখুঁত অভিনয় হতে পারে। আপনি ধরতে পারেননি।

—দ্বিতীয় কথা: পুলিশ আবিষ্কার করেছে—এ টাইপ-রাইটারটি রেমিংটন কোম্পানির ডালহৌসী-স্টোয়ারের দোকান থেকে দেড় বছর আগে নগদ মূল্যে কেউ খরিস করেছে। সে সময় দেখছি শিবাজীপ্রতাপ কর্পর্দকহীন। তিনি কেমন করে ওটা ঐ সময় নগদ দামে কিনলেন?

ডক্টর ব্যানার্জি পুনরায় প্রশ্ন করেন, এ বিষয়ে তিনি নিজে কী বলেন? যন্ত্রটা কী সূত্রে তাঁর হেপাজতে এল, এ কথা কি তাঁর মনে পড়ে না?

—পড়ে, তিনি বলেন—এটি ঠেকে উপহার দিয়েছিল ঠর এক ছাত্র: হানিফ মহম্মদ।

ব্রিকশ বলে, তবে তো ল্যাটা চুকেই গেল। কীভাবে কর্পর্দকহীন মাস্টারমশাই...

—না, চুকলো না। তথ্য বলছে যে, হানিফ মহম্মদ দশ বছর আগে মারা গেছে।

সকলে নীরব। বাসু-সাহেব আবার শুরু করেন। সুভরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেউ নাম ভাড়িয়ে যন্ত্রটা ঠকে উপহার দিয়েছিল। যাতে ঐ এভিডেন্সটা ঠর হেপাজতে থাকে। বাড়ি সার্চ করার সময় যেন টাইপ-রাইটারটা পুলিশে উদ্ধার করে।

অ্যাডভাইজার মনীশ সেন রায় জ্ঞানতে চায়, তিনটি চিঠিই যে ঐ টাইপ-রাইটারে ছাপা এটা কি প্রমাণিত হয়েছে?

—হ্যাঁ, তিনটিই। কিন্তু আদ্যন্ত নয়। প্রতিটি চিঠির শেষের দিকে ঐ স্থান আর তারিখের অংশটুকু বাসে।

—তার মানে?

—তার মানে, হানিফ মহম্মদের নাম করে যে ঠকে যন্ত্রটা উপহার দেয় সে নিজেই চিঠিগুলি টাইপ করেছে, কিন্তু স্থান ও তারিখটা তখন বসায়নি। সে লোকটা দেড় বছর আগে জানতো না—কোন তারিখে, কোথায় কোন খুনটা হবে!

অমল দত্ত বলে বসে, স্ট্রেঞ্জ!

—হ্যাঁ। শুধু ঐটুকুই নয়। পণ্ডিচেরীর যে মহারাজ ঠকে মাস-মাস মনি-অর্ডার করতেন, আর বইয়ের পার্সেল পাঠাতেন তিনিও অলীক। তাঁর পাস্তা পুলিশে পায়নি!

ডক্টর ব্যানার্জি বলেন, এ থেকে কী প্রমাণ হয়?

—আমি জানি না। আপনার বিবেচনা করে বলুন।

—আপনি কি বলতে চাইছেন যে, শিবাজীপ্রতাপকে শিখণ্ডী খাড়া করে আর কোনও 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' এ কাজগুলো করছিল?

বাসু বলেন, সেটা আপনারদের বিবেচ্য। আমি ঐটুকু বলতে পারি যে, তিনটি খুনের একটি যে শিবাজীপ্রতাপ করেননি এটুকু আমি জানতে পেরেছি।

এ. কে. রে. বলেন, তোমার কাছে কোনও এভিডেন্স আছে?

—আছে স্যার! অকাটা প্রমাণ!

—কোন কেসটা?

—বলছি স্যার। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব চাই—আপনাকেই আমি বিশেষভাবে প্রশ্ন করছি ডক্টর ব্যানার্জি। কারণ অপরাধ-বিজ্ঞানে আপনি পণ্ডিত। এমন কি হতে পারে না যে, নাম ও

স্থানের কোয়েন্সিডেল-এর সুযোগ নিয়ে একজন খুনী তার পথের কাটা সরিয়ে ফেলল—এই স্থির বিশ্বাসে যে, পুলিশ কেসটাকে ঐ ‘অ্যালফাবেটিকাল সিরিজের একটা টার্ম বলে ধরে নেবে?

—এমনটা হতেই পারে। আপনি কোনও সূত্র পেয়েছেন?

—পেয়েছি। যাকে সন্দেহ করেছি তিনি এ ঘরেই বর্তমানে উপস্থিত। আমার প্রস্তাব—এ ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে আমি এক-একটি প্রশ্ন করব। জবাবে তারা নিছক সত্য কথা বলবেন, অথবা বলবেন, ‘আমি জবাব দেব না।’ তাহলেই সেই আততায়ীকে আমি চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করতে পারব। আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি?

প্রায় বিশ সেকেন্ড ঘর নিস্তব্ধ।

ডক্টর মিত্র বললেন, এতে আমাদের আপত্তি করার উপায় নেই। প্রতিবাদ যে করতে যাবে, সে নিজেই তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত হয়ে যাবে। আপনি শুরু করুন।

—আমি আপনাকেই প্রথম প্রশ্নটা করছি: আপনাকে আই. জি. ক্রিমিন্যাল-সাহেব কয়েকবার এক্সপার্ট হিসাবে কনফারেন্সে ডেকেছিলেন। সেজন্য মন্যবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু আপনার মনে হয়েছিল, এজন্য আপনার একটা ‘প্রফেশনাল ফি’ প্রাপ্য ছিল।—ইয়েস অর নো?

ডক্টর মিত্র গম্ভীরভাবে বললেন, আমি জবাব দেব না।

—নেক্সট সুনীল! তুমি একদিন লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলে; হঠাৎ বাবার সামনে পড়ে গিয়ে সিগারেট লুকিয়ে ফেল। বাবা দেখতে পাননি।—ইয়েস অর নো?

সুনীল মাথা নিচু করে বললে, ইয়েস।

—থার্ড! মিস্টার অমল দত্ত। আপনি এজাহারে বলেছিলেন—বনানী যে ট্রেনে আসছিল তার আগের লোকালে আপনি বর্ধমান আসেন। অথচ বর্ধমানের একজন রিকশাওয়ালা—যে আপনাকে চেনে, যাকে আপনি চেনেন না—বলছে যে, ঐ শেষ লোকালেই আপনি এসেছিলেন। রিকশাওয়ালাটা কি মিথ্যা কথা বলেছে?

অমল দত্তের মুখটা শাদা হয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, ইয়ে ...মানে, এক কথায় এর জবাব হয় না। আমি বুঝিয়ে বলছি, শুনুন।

গর্জে ওঠেন বাসু-সাহেব : কৈফিয়ৎ দেবার অবকাশ নেই।—ইয়েস অর নো?

অমল দাঁতে দাঁত দিয়ে বললে, আমি জবাব দেব না।

—ফোর্থ! মনীশবাবু! বনানীর বাস্কে কিছু প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। তার একটা সিরিজ টাইপ-রাইটারে ছাপা। আমার বিশ্বাস সেই চিঠিগুলি অ্যান্ড্রুইয়ুল কোম্পানির কোন টাইপ-রাইটারে ছাপা। পুলিশ-তদন্ত হলে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।—ইয়েস অর নো?

মনীশ স্বলভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ইয়েস... বাউ...

—নো ‘বাউ’ প্রীজ। পঞ্চম সাক্ষী ময়ূরাক্ষী। তুমি ‘বাউ-ফাউ’ বলবে না। ‘হ্যাঁ, না,’ অথবা ‘বলব না’-র মধ্যে তোমার জবাব সীমাবদ্ধ করবে। প্রশ্নটা এই—সুজাতা ফিরে এসে আমাকে বলেছিল যে, অমল দত্ত তোমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিল এবং তুমি তা প্রত্যাখ্যান কর—

—ইয়েস!

বাসু হেসে বললেন, প্রশ্নটা আগে আমাকে শেষ করতে দাও। ওটা তো ফ্যাক্ট। প্রতিষ্ঠিত সত্য। আমার প্রশ্নটা এই : তুমি ওর কাছে আর্থিক সাহায্য নাওনি এই কারণে যে, অমল তোমার দিককেই ভালোবাসত, এ কথা জেনেও যে বনানী তাকে ভালবাসত না; অথচ তুমি অমল দত্তকে ভালবাসতে এবং ভালোবাস।...

ময়ূরাক্ষী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। যেন সর্বসমক্ষে বাসু-সাহেব তার ব্লাউজটা টেনে ছিড়ে ফেলেছেন। তার চোঁট দুটি খর খর করে কাঁপতে থাকে। বলে, এসব... আপনি... কী বলছেন?

—‘ইয়েস, নো’ অথবা ‘বলব না’ প্রীজ!



দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ময়ূরাক্ষী। তিনটে জবাবের একটাও যোগালো না তার মুখে।

সুজাতা নিঃশব্দে তার বাহুমূলটা ধরে বললে—বাহরুমটা ঐ দিকে।

হাত ধরে সে সভাস্থল থেকে ময়ূরাক্ষীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে আলপিন-পতন নিঃশব্দতা।

—সিন্ধু—অনিতা! তোমাকে যে প্রপ্নটা করছি তা এই: যদিও বিশ বছরের বয়সের ফারাক এবং যদিও তুমি মিসেস চক্রবর্তীকে নিজের দিদির মত ভালোবাস, তবু মিসেস চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর যদি ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি তোমাকে বিবাহ-প্রস্তাব দিতেন তাহলে তুমি সম্মত হতে! —ইয়েস অর নো?

অনিতাও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। যেন ময়ূরাক্ষীর পর এবার তার বস্ত্রহরণ পালা শুরু হল! তারও চোঁটদুটি নড়ে উঠল—বাক্যযুগ্মি হল না।

ঠিক তখনই কক্ষের ও-প্রান্ত থেকে এ. কে. রে. বলে ওঠেন, অবজেক্শান সাসটেইন্ড! ইররেলিভেন্ট অ্যান্ড আর্গুমেন্টেটিভ! কী হলে কী হত, তা সাক্ষী বলতে বাধ্য নয়, এমনকি ‘আমি বলব না’—তাও নয়। তুমি বাসে পড় অনিতা।

কীপতে কীপতে অনিতা বসে পড়ে।

—সেভেন, মিস্টার নিবি মজুমদার! তোমাকে দীর্ঘদিন পূর্বে ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি তাঁর উইলটা সেফ-কাস্টডিটে রাখতে দিয়েছিলেন। তাতে স্ত্রী, শ্যালক, অনিতা এবং অন্যান্যদের জন্য যথাযোগ্য কী-গাসির ব্যবস্থা করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একটি ট্রাস্ট বোর্ডকে দিয়ে গিয়েছিলেন—কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার দায়িত্ব দিয়ে। —ইয়েস অর নো?

নিবি মজুমদার উঠে দাঁড়ালো। খ্রি-শীস স্যুট পরা একটি সুদর্শন যুবক। তার বয়স যে চল্লিশের কোঠায় তা বোঝা যায় না। ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম পি. কে. বাসু! তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র!

নিবি হেসে বললে, ইয়েস! ওর উইল আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

বাসু বললেন, অষ্টম সাক্ষীকে প্রপ্ন করার আগে আমি একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। ধরুন আমি যদি বলি, ‘এখানে একটা আলপিন রয়েছে’ অমনি আপনাদের দৃষ্টি যাবে মেঝের দিকে। মনে হবে কারো পায়ে না ফোটে, তারপর সোফা বা সেটিগুলোর দিকে তাকাবেন। তারপর টেবিলের উপর দৃষ্টি বুলিয়েও যখন আলপিনটা নজরে পড়বে না, তখন হয়তো বলবেন, ‘কই?’ টেবিলের উপর পিন-কুশানে গাঁথা আমার সেই বিশেষ আলপিনটা দেখেও নজর করবেন না। এটা ‘হিউম্যান-সাইকলজি’। আমরা কি এখানে ঐ জাতের ভুল করছি? মনে করুন, একজন লোক দীঘার ধীরে ধীরে ধরকে কোন কারণে খুন করতে চায়। কিন্তু সে জানে—পুলিস এসেই খোঁজ করবে ধীরেনবাবুর মৃত্যুতে কে সবচেয়ে লাভবান হল? কে সম্ভাব্য খুনি হতে পারে? এই জন্যে সে ‘ধীরেন ধর-নামক’ আলপিনটাকে পিন কুশানে গেঁথে ফেলতে চাইল। সে যদি পর পর চারটি খুন করে—প্রথমে আলমবাজার, আলিপুর বা আগরতলার অসীম আচার্য, অনিমা আগরওয়াল ইত্যাদি নামের যে-কোন একজনকে; এবং তারপর বাটাগনর, ব্যারাকপুর, বেহালার ‘বি’ নাম-উপাধির কাউকে, এবং তারপর ‘সি’-য়ের খাট পার হয়ে দীঘার ধীরেনবাবুকে খুন করে? আর ঐ সঙ্গে যদি হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াকের ছদ্মবেশে পি. কে. বাসুকে ক্রমাগত পত্রাঘাত করতে থাকে তাহলে...

বাধা দিয়ে ডক্টর ব্যানার্জি বলে ওঠেন, কিছু সে-ক্ষেত্রে ‘পি. কে. বাসু’কে কেন? সে তো সরাসরি ঘোষাল-সাহেবকেই চ্যালেঞ্জ প্রদান করবে। ‘পি. কে. বাসু’ বিখ্যাত ডিফেন্স কাউন্সেল—অপরোধী ধরে বেড়ানো তাঁর পেশা নয়?

—তার হেতুটা যদি এই হয় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিকানায় ভুল-জোনালা নম্বর দিয়ে কোন একটা বিশেষ চিঠি ডেলিভারি হতে দেরি করাতে চায়? ‘আই. জি. ক্রিমিনাল, কলকাতা’ লেখা খাম পরদিনই

এগারো-এ লডন স্ট্রীটের ঠিকানায় পৌছে যাবার সম্ভাবনা—জোনাল নাথারে অন্য কিছু থাকা সম্ভবও!

সকলেই একমনে চিন্তা করছেন—এটা একটা নতুন ধরনের যুক্তি।

বাসু বলেন, সে-ক্ষেত্রে ঐ আততায়ীকে এ. বি. সি. নামের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে খুঁজে উপযুক্ত লোকের নাম এবং কে কখন—কোথায় ভালনারেবল্ সে খবরগুলো জানতে হবে। এটা তার পক্ষেই সম্ভব যাকে চাকরির প্রয়োজনে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে হয়। যেমন ধরুন একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। যার এলাকা, বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর।

এবার বিকাশ হেসে ওঠে। বলে, আপনার যুক্তিটা যেন আর নৈর্ব্যক্তিক থাকতে চাইছে না বাসু-সাহেব। সচীমুখ হতে চাইছে যেন? তাই নয়?

—ইয়েস! যেমন কথার-কথা হিসেবে ধরুন আপনার চাকরি। আপনাকে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। আপনার পক্ষে আরও একটা সুবিধা আছে। আপনি ক্রমাগত ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি সাইকিয়াট্রিস্টদের সঙ্গেও। ফলে ‘অস্বাভাবিক’ রোগে ভুগছে—অর্থাৎ মাঝে-মাঝে যার স্মৃতি হারিয়ে যায় এমন রুগীর নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা সহজ। কারণ শেষ পর্যন্ত একটা ‘ফল গান্ধী’, মানে ‘রাঙা-মুলো’ তো পুলিশের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। যে লোকটা আপনার বদলে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলবে! তার নাম যদি ‘শিবাজীপ্রতাপ রাজ চক্রবর্তী’ হয়, তাহলে তো সোনার সোহাগা। স্বভাব মনে হবে, পৈত্রিক সূত্রে সে মনে করে যে, সে একজন মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি! লোকটার যদি পূর্ব-ইতিহাসে বাম-বামে মানুষের গলা টিপে ধরার তথ্যটা থাকে তাহলে আরও ভালো। ধরুন আপনি ঘটনাক্রমে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটা জেনে ফেললেন—তাহলে কিছু ফিনিশিং টাচ দেওয়া দরকার। লোকটা শিশু সাহিত্য পড়তে ভালবাসে, ফলে সুকুমার গ্রন্থাবলী থেকে কেটে নিয়ে আর একটা এডিডেশনও যোগ করা যেতে পারে। লোকটা অন্ধের মান্দার? তাহলে একপিঠে অন্ধকথা-কাগজে চিঠিগুলো টাইপ করলে...

বিকাশ অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, বাসু-সাহেব! আপনার বিশ্লেষণটি প্রাঞ্জল! প্রাণ জল হয়ে গেল সকলের! তা আমি সে-ক্ষেত্রে তিনটির ভিতর কোন খুনটা করব বলে সেড়-দু-বছর ধরে এতবড় পরিকল্পনাটা ফেঁদেছি?

—সেটা তো আপনিই আমাদের বলবেন বিকাশবাবু! কারণ আপনিই আমার অষ্টম সাক্ষী। আপনাকে আমার প্রশ্ন: ফিল্ম-প্রডিউসার-এর ভেক ধরে আপনি কি বনানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেননি? নির্জন ফার্স্টক্লাস কামরায় আপনি ওকে গলা টিপে মেরে রাত বারোটা পাঁচে চন্দননগরে ট্রেন থেকে নেমে যাননি? —ইয়েস্ অর নো? নাকি ‘বলব না?’

—আজ্ঞে না মহাশয়! আমি বলব: বনানী ব্যানার্জিকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি!

—তার মানে: নো?

—আজ্ঞে না, তার মানে ‘অ্যান এফাটিক্ নো’!

—থ্যাঙ্কু!

বাসু-সাহেব থামলেন। ঘরের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এখন বিকাশের দিকে। সে নড়েচড়ে বসল। বাসু-সাহেব বলেন, আমার নবম সাক্ষী উষা বাগচী। যার গান আপনারা শুনলেন। উষা, তোমাকে আমার প্রশ্ন: তুমি সূজাতাকে বলেছিলে—বনানীর অনেক বয়-ফ্রেন্ডকে চিনতে। তুমি কি কখনো ঐ বিকাশ মুখুজে-মশাইকে সেখান বনানীর সঙ্গে?

উষা বললে, ওঁর নাম বিকাশ মুখার্জী কি না তা আমি জানি না। কিন্তু সেদিনই তো ফটো দেখে বলেছিলাম—ঐ ভদ্রলোক একজন ফিল্ম প্রডিউসার। বনানীকে ফিল্মে নামার সুযোগ দিতে চাইছিলেন।

বিকাশ রুখে ওঠে, ফটো দেখে? কোন ফটো? কার ফটো?

বাসু তাঁর পকেট থেকে একটি ফটো বার করে দেখান: এইখানা। তোমারই! এই ফটোটা তোমাকে ছুকিয়ে তুলতে হবে বলে সেদিন কম্পাস-টেলিফটো-লেপ ইত্যাদি নিয়ে আমি চন্দননগরে গিয়ে একটা হচপচ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম।

বিকাশ দৃঢ়স্বরে বলে, রঙ আইডেন্টিফিকেশন! এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না! আমি কেন তাকে খুন করব? কী স্বার্থ আমার যে, বোনানীকে খুন করব বলে দেড়-বছর ধরে...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, কিন্তু বোনানী যদি পিন-কুশনের একটা ছোট্ট পিন হয়?

—তার মানে? তাহলে কে আমার মেন ট্যাগটি? ধরপীথর অব দীঘা?

—না! ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি অব চন্দননগর!

—জামাইবাবু! আপনি বন্ধ উদ্ভাদ! যাঁর সম্পত্তির আমি একমাত্র ওয়ারিশ?

—তা যে তুমি নও সে-কথা তো-আমরা সবাই জেনেছি বিকাশবাবু! এটাই ডক্টর চ্যাটার্জির জীবনের সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি—মন্ত্ৰগুপ্তি! সমস্ত সম্পত্তিটা যে তিনি উইল করে একটা ট্রাস্ট-বোর্ডকে দিয়ে গেলেন সেটা তোমাকে না জানানো! তাহলে তাঁকে এভাবে বেঘোরে মরতে হত না!

বিকাশ কুণ্ঠে ওঠে, মিস্টার বাসু! আপনার যুক্তির আর পারস্পর্য থাকছে না কিছু! মন্ত্ৰেলের মতো আপনিও এবার পাগলামি শুরু করেছেন! হয় আমি জানতাম ঐ উইলের কথা, অথবা জানতাম না। যদি সেটা আমার জানা থাকত তাহলে ঐ বীভৎস হত্যার কোনও মোটিভ থাকে না! আর যদি সেটা আমার না-জানা থাকত তাহলেও কোনও মোটিভ থাকে না, যেহেতু আমার বিশ্বাস অনুযায়ী—আমিই তাঁর ওয়ারিশ!

শিহ্ন থেকে কে যেন বলে ওঠেন, কারেন্ট!

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, না! তৃতীয় একটি বিকল্পও যে রয়ে গেল...

—তৃতীয় বিকল্প? আমার জানা এবং না-জানার মাঝামাঝি? —জানতে চায় বিকাশ।

—হ্যাঁ তাই! তুমি জানতে যে, ঐ রিসার্চের ব্যাপারে চন্দ্রচূড় আর অনিতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছিলেন; জানতে যে, তোমার দিমির প্রয়াণের পর চন্দ্রচূড়ের সংসারের দায়িত্ব বর্তমানে অনিতা দেবীর উপর। তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতেন। ক্রমে তাঁদের সম্ভ্রানাদি হত। ডক্টর চ্যাটার্জির প্রথমপক্ষের শ্যালকের তখন মঞ্চ থেকে নিঃশব্দে প্রস্থান অনিবার্য হয়ে পড়তো! রে-সাহেব বাধা দেওয়ায় অনিতা যে প্রশ্নটার জবাব দিল না সেই জবাবটা অনেকদিন আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে, বিকাশবাবু! তাই নয়?

বিকাশ জ্বলন্ত একজোড়া চোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে বললে, কিছু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বাসু-সাহেব—হত্যা যখন সংঘটিত হয় তখন আমি ঘটনাস্থল থেকে অনেক-অনেক দূরে। শেয়ালদহ-র কাছাকাছি সুইট-হোমে!

—আহ! দ্যাট'স য়োর ডিফেন্স! বজ্রবাহুনি অ্যালেবাসি! তাই নয়? বিকাশবাবু! তুমি দু-বছর ধরে এডভসব কিছু করলে অথচ ঐ সামান্য ব্যাপারটার কথা ভুলে গেলে? বেশিনের কলটার দিকে নজর গেল না তোমার?

—মানে?

—হোটলে চেক-ইন করে রক্তদ্বারকক্ষে তুমি মেক-আপ নিলে, যাতে পথে-ঘাটে বা চন্দননগরে কেউ হঠাৎ দেখলে চিনতে না পারে। তারপর রাত দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলে হাওড়া-স্টেশন। রাত এগারোটা সাতের লোকাল ধরে পৌছালে চন্দননগর। তুমি জানতে তোমার ভমিগতি ঠিক কয়টার সময় মর্নিংওয়াকে বার হন, কতদূর যান এবং কোন্ বেকিতে বসে বিশ্রাম করেন। জানতে যে, খবরের কাগজটা তিনি দেখেননি, কারণ আগেই সেটা সরিয়ে ফেলেছিলে তুমি! প্রত্যাশিতভাবে ডুমিকট-চাবি দিয়ে গেট খুলে তিনি যে ওখানে ভোররাত্রে উপস্থিত থাকবেন এটা তোমার জানা ছিল। তাই কাজ

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

হাঁসিল করে ভোর পাঁচটা সাতাশের লোকাল ধরে ফিরে আসাটা কোনও অসুবিধাজনক হয়নি। তাই নয়? নাকি ছয়টা এগারোর লোকালটা ধরতে হয়েছিল?

বিকাশ উঠে দাঁড়ায়। অনিতার হাতটা বঙ্কমুঠিতে ধরে বলে, চলে এস অনিতা! এইসব পাগলের বক্বকানি শুনতে হবে জানলে আমি এ শোকসভায় আসী আসতাম না।

অনিতা জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, না! আমাকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে দাও বিকাশদা। বাসু-সাহেব, আপনি বলুন, এসব আন্দাজ আপনি করছেন কী সূত্রে?

বাসু বলেন, আন্দাজ নয় অনিতা, ফ্যাক্ট! ঐ যে একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছিল তোমার বিকাশদা! ক্রিমিনোলজি বলে—‘পারফেক্ট-ক্রাইম বলে কিছু হতে পারে না।’ বিকাশবাবু সব কিছু ঠিক ঠিক করল, কিন্তু হোটেল ছেড়ে যাবার সময় বেসিনের কলটা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেল। সে সময় কলে জল আসছিল না! জল আসতে শুরু করে রাত দুটোয়। শুধু ঐ ঘর নয়, করিডরটাও জলে থৈ থৈ! নাইট-ওয়াকম্যান বাধ্য হয়ে ম্যানেজারকে ডেকে তোলে। ডাকাডাকি করে বোর্ডারের সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে ড্রাম্বেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে কলটা বন্ধ করা হয়। সে-রাত্রে বিকাশবাবু যে ঐ ঘরে ছিল না তার তিনটি সাক্ষী আছে। ম্যানেজার মনোহরবাবু, দরওয়ান রঘুবীর আর হোটেলবয় মন্দা!

বিকাশ যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত। হঠাৎ সখিত পেয়ে সে অনিতাকেই বলে ওঠে, তুমি না যাও তো এইসব আশাড়ে গল্প শুনতে থাক। আমি চললাম।

বাধ্য দিলেন আই. জি. ক্রাইম, জাস্ট এ মিনিট বিকাশবাবু! আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যেখানে হচ্ছে যাবার স্বাধীনতা আপনার এই মুহূর্তে আছে। কিছু আমার একটি পয়েন্ট-ব্ল্যাক প্রস্নের জবাব না দিয়ে গেলে আপনার সেই স্বাধীনতাটুকু আর থাকবে না। বলুন: সে-রাত্রে কি আপনি ঐ হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন?

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথাটা নিচু হয়ে যায় তার। কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, না স্যার! রাতটা আমি প্রস্টিটুট-কোয়ার্টার্সে কাটিয়েছি!

ঘরে পুনরায় নিস্তব্ধতা ফিরে আসে।

বাসুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠেন, সে সম্ভাবনার কথাও আমি ভেবেছি। ব্যাচিলার মানুষ! এমনটা তো হতেই পারে। সেজনা আমি বিকল্প আর একটি প্রমাণ নিয়ে এসেছি। একজোড়া ফিস্কার-প্রিন্ট। ডক্টর ব্যানার্জি, আপনি ফিস্কারপ্রিন্ট-এক্সপার্ট! অনুগ্রহ করে দেখুন তো, এই দুটি টিপছাপ কি একই ব্যক্তির?

দুখানি পোস্টকার্ড-সাইজ ফটোগ্রাফ তিনি বাড়িয়ে ধরেন ডক্টর ব্যানার্জির দিকে। তারপর এদিকে ফিরে বললেন, উনি ততক্ষণ পরীক্ষা করুন, আমি ইতিমধ্যে আপনাদের শোনা—কীভাবে ঐ ফিস্কার-প্রিন্ট দুটি সংগ্রহ করেছে। একটি পাওয়া গেছে শিবাজীপ্রতাপের আলমারিতে রাখা বইয়ের বাউল থেকে। যে প্যাকেটে স্কুমার রায়ের বইটি ছিল, সেই না-খোলা প্যাকেটের উপর। প্যাকেটটা পণ্ডিতেরী থেকে পোস্টাল পার্সেলে এসেছে। যে শিয়ন বিলি করেছে, যে-সব পোস্টাল কর্মচারী হ্যান্ডল করেছে তাদের কারও আঙুলের ছাপ নয়, কারণ কালিটা হচ্ছে সেই কালি যাতে ঠিকানাটা লেখা। অর্থাৎ যে লোকটা শিবাজীপ্রতাপকে পার্সেলে বইটা পাঠিয়েছিল।

বাসু-সাহেব থামলেন।

ডক্টর ব্যানার্জি সেই অবকাশে বলেন, পয়েন্টস্ অব সিমিলারিটি বোলো, না, সন্তের... না, না আরও নজরে পড়ছে...

—আপনি দেখতে থাকুন ডক্টর ব্যানার্জি...

—না, না আর দেখার দরকার নেই। দুটি আঙুলের ছাপ একই ব্যক্তির।

বোধ করি কথাটা কানে গেল না বাসু-সাহেবের। তিনি একই ভঙ্গিতে বলে চলেন, আর দ্বিতীয়খানি

আমি সংগ্রহ করেছি নিত্য ঘটনাচক্রে। চন্দননগরে। যেহেতু ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যান্ড, 1935, অ্যামেন্ডেড ইন 1955, ধারা নং 153(c)-তে বলা হয়েছে যে, লাখ টাকার উপর যার মূল্যমান তেমন দলিলে সহায়ের সঙ্গে টিপছাপও দিতে হয়...

— নেভার হার্ড অব্‌ ইট! ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্টের কত ধারা বললে যেন? জানতে চাইলেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে।

বাসু হাসলেন, আপনাকে ধাধা দিচ্ছি না স্যার; কিন্তু ঐ ধারাটা আউড়ে সম্ভবতাজন একটি ব্যক্তিকে সেদিন ধাধা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। না হলে তার নিখুঁত ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা আমার পক্ষে...

কথাটা শেষ হল না। হঠাৎ বিকাশ লাফ দিয়ে ঘরের ও-প্রান্তে সরে গেল।

ঘরসুদ্ধ সকলের দৃষ্টি গেল তার দিকে।

বিকাশের হাতে একটি উদাত্ত রিভলভার!

প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, ছয়টা চেয়ারে ছয়টা বুলেট! আই কনগ্র্যাচুলেট য়ু মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল! দুঃখ এটুকুই যে, ফিসরি দড়িটা আমার গলায় পরানো গেল না; আর কী অপরিণীম দুঃখ! আমার সঙ্গে তোমার খেলাও শেষ হয়ে গেল! ছয়-নম্বর বুলেটটা আমার পঞ্চমটা তোমার! বাকি চারজন কে কে আমাদের সঙ্গে যাবে তুমিই নির্বাচন করে দাও বাসু-সাহেব।

প্রত্যেকটি মানুষ যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে স্তম্ভপতন নিস্তব্ধতা।

পরিস্থিতি যে একমুহুর্তে এভাবে বদলে যেতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

বাসু-সাহেব দু-হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্বাক। নিষ্পন্দ। ভয় কতটা পেয়েছেন বোঝা গেল না। অসীম আত্মসংযম তাঁর। কিন্তু কথা যখন বললেন তখন তাঁর গলাটাও কেঁপে গেল। বললেন, আমিই তোমার একমাত্র রহিতাল বিকাশ! বাকি কজন নিরীহ প্রাণিকে...

— সে কী! সে কী! তুমিই না প্রমাণ করেছ আমি 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'! ...ভোট মুভ! আই ওয়ার্ন য়ু!

শেষ সাবধানবাণীটা ঘোষাল-সাহেবকে। তিনি তিলমাত্র নড়েছিলেন।

বিকাশ আরও এক পা পিছিয়ে গেল। যাতে এক লাফে কেউ তার নাগাল না পেতে পারে। সেখান থেকে বলল, না, বাসু-সাহেব তোমার জন্য পঞ্চম বুলেটটা জমিয়ে রাখলাম। প্রথম বুলেটটা তোমার ঐ পদ্ম স্ট্রীকে উপহার দিই বরং...

কিন্তু ট্রিগার টানবার অবকাশ সে পেল না। চকিতে কিন্তু শাদুল-শাবকের মতো তার দিকে লাফ দিল সুনীল। ঘোল বছরের তারুণ্যে ভরপুর কিশোর! এক লাফে বিকাশের কাছে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব! কারণ দূরত্ব যথেষ্ট! বিকাশ বিদ্যুৎগতিতে পাশ ফিরে সুনীলকে লক্ষ্য করে ফায়ার করল। আশ্চর্য! তবু শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে সুনীল উলটে পড়ল না। তার বজ্রমুষ্টির আঘাতটা গিয়ে লাগল বিকাশের নাকে। নাকটা ধোঁতে গেল। দরদর ধারে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকাশ ভূপতিত হয়নি। টাল সামলে নিয়ে সে পর পর তিনটি ফায়ার করল সুনীলকে লক্ষ্য করে। পয়েন্ট-ব্ল্যাক রেঞ্জ!

চার-চারবার ট্রিগার টানা সত্ত্বেও ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেল না একবারও।

এতক্ষণে পিছনের পর্দা সরিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকেছে রবি বোস, তার সাক্ষোপাক সমেত। রবি বজ্রমুষ্টিতে ধরে ফেলেছে বিকাশের দুই বাহুমূল। পিছন থেকে। বিকাশ আগ্রাণ চেষ্টার নিজেই ছাড়িয়ে, বাসু-সাহেবকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করতে চাইছে।

বাসুর হাতদুটি তখনো মাথার উপর তোলা। ঐ অবস্থাতেই বললেন, ওর চেয়ারে আরও দুটি বুলেট

## কাটার-কাটার-২

বাকি আছে, রবি। ওকে বাধা দিও না। ওকে আশ্ মিটিয়ে প্রতিশোধ নিতে দাও!

রবির হাত ছাড়িয়ে বিকাশ আবার ফায়ার করল। এবারও শব্দ হল না কিছু।

পিছনের পর্দা সরিয়ে ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছে মকবুল। সে বলে ওঠে, ব্রেখাই হাকপাক করতিছান কত! নাই! আড্ডাও গুলি নাই। ছয়টা বুলেটই আমার জেব-এ। দু-দুবার পাকিট মারছি! পেত্যর না হয়, অ্যাই দ্যাহেন!

তার প্রসারিত তালুতে ছয়টি তাজা বুলেট।

বাসু এতক্ষণে উর্ধ্ববাহুমুদ্রায় ক্লান্ত দিলেন। বললেন, আয়াম সরি ফর যু মিস্টার এ. বি. সি. ডি.! ফাঁসির দড়ি ছাড়া তোমার আর বিকল্প রইল না কিছু!

সকলের দিকে ফিরে বলেন, রবি তার ডিউটি করুক। আপনারা বসুন। উষার সমাপ্তিসঙ্গীতটা বাকি আছে!

রানী দেবী বলেন, শোকসভা। তাই সামান্য একটু মিটিমুখের আয়োজন করেছি। বেশি কিছু নয়।

মনীশ বলল, এ-ছাড়া আমাদের মনে এখন যে প্রশ্নের পাহাড় জমে আছে! আপনি কী করে বুঝলেন?

রবি হারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকাশের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বললে, বাঃ! আমি একাই ডিউটি করব? শুনতে পাব না?

—কেন পারবে না? ওর মাজার দড়িটা ঐ স্টীল আলমারির পায়ের সঙ্গে বেঁধে দাও! শুধু তুমি কেন, বিকাশবাবুরও ব্যাপারটা জেনে যাবার অধিকার আছে। আফটার অল, সেই তো নিয়োগ করেছিল আমাকে। পুলিশের উপর আস্থা না থাকায়।

কৌশিক জানতে চায়, ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে আপনি নিঃসন্দেহ হলেন?

—যে মুহূর্তটিতে সেই মেটাল অ্যাসাইলারের ডাক্তারবাবু বললেন, চন্দননগরের মেডিক্যাল-প্রিন্সিপেজেণ্টটিজ বিকাশ মুখার্জীকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। বছর-দুই আগে একদিন তিনি বিকাশবাবুর সঙ্গে ঐ কেসটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। শিবাজীপ্রতাপের গোটা কেস হিস্তি—হানিফ মহম্মদের গলা টিপে ধরা থেকে সব কিছু।

সুজাতা বলে, কিন্তু আপনি সুইট-হোমের ঐ জলপ্লাবনের কথাটা কখন শুনলেন?

—শুনিনি তো! কিন্তু এটুকু জানতাম যে, মনোহর ঐ ঘরটা বিকাশবাবুকে সেরায়ে ভাড়া দিতে চায়নি—কলে জল নেই বলে! অর্থাৎ বিকাশ জানত, কলে জল আসছিল না। ঘটনাটা সে রাতে ঘটেনি কিন্তু আমার বর্ণনা শুনে বিকাশের ধারণায় ওটা ঘটেছিল! সুইট-হোমের তিন-তিনটি প্রত্যক্ষদর্শীকে রুখতে সে প্রস্ কোয়ার্টাসে যাওয়ার আশায়ে গল্পটা ফেঁদে ফেলল। একবারও মনে হল না—প্রস্ কোয়ার্টাসে রাত কাটাতে হলে হোটেলের আশ্রয় খোঁজা তার পক্ষে অযৌক্তিক!

—আর ফিঙ্গার-প্রিন্ট? পুলিশের 'সীল' করা প্যাকেটটাও তো আপনি দেখেননি।

—না, আমি দেখিনি। কিন্তু বিকাশও জানে না যে, আমি দেখিনি। ইনকোয়িট—দুটো ফিঙ্গার-প্রিন্টই মিসেস্ চ্যাটার্জির সেই লিস্ট থেকে ফটো নেওয়া। ওটা ছিল আমার শেষ অস্ত্র! ততক্ষণে বিকাশবাবু মরিয়া হয়ে উঠেছে। পাচ-পা পিছিয়ে গেছে। তোমরা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু তখন ওর ডান-হাত ছিল পকেটে। বেচারি তো জানে না, ইতিমধ্যে মকবুল দুবার তার পকেটে মেরেছে! একবার বুলেটগুলো বার করে নিড়ে, একবার ফাঁকা অস্ত্রটা ওর পকেটে ঢুকিয়ে দিতে!

এবার প্রশ্ন করে রবি, আপনি কী করে আন্দাজ করলেন যে, শোকসভায় ও রিভলভার নিয়ে আসবে?

—চন্দননগরে ইচ্ছাকৃতভাবেই ওর সঙ্গে আমার একবার থাকা লাগে। ওর ধারণা অনিচ্ছাকৃতভাবে। আমি অনুভব করেছিলাম—তার ডান পকেটে সব সময়েই একটি রিভলভার থাকে। তাই এই

সমাজসেবীটির সাহায্য নিয়েছিলাম। মক্‌বুল নাকি শহর-কলকাতার চ্যাম্পিয়ান—‘ইয়ে’।

মক্‌বুল ঘোষাল-সাহেবের দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বলে, আর লজ্জা দিয়েন না হার!

সুনীল জানতে চায়, আমার সিগারেট খাওয়ার কথা?

—শ্রেফ আন্দাজ! ও বয়সে আমার জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আন্দাজটা দ্রাস্ত হলে তোমার জবাব হত—‘নে’। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হত না কিছু। কিন্তু সুনীল, তুমি ওর হাতে উল্লত রিভালভার দেখেও কী ভাবে অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লে?

সুনীল লজ্জা পেল। বললে, বাবার সেই উবুড় হয়ে পড়ে থাকা চেহারাটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, স্যার! নিজের মৃত্যুর কথাটা তখন আর আমার খেয়াল ছিল না। মনে হল, মরার আগে ওর নাকটা অন্তত খেঁৎলে দিয়ে যাব আমি!

ঘোষাল-সাহেব বলেন, কাজটা তোমার হঠকারিতা হয়েছিল সুনীল। যাহোক, রবি ওর নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিও তো।

অমল দত্ত বলে, আমার একটা প্রশ্ন আছে। মনু সেদিন আমার কাছে কেন টাকা নেয়নি—

—আহ! অমলদা! কী পাগলামো করছ!—চাপাকঠে ময়ুরাঙ্গী প্রতিবাদ করে।

বাসু বলেন, হ্যাঁ। ওসব অবাস্তব আলোচনা না করাই ভালো। অনেকের অনেক গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে। এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, কাউকে বেইজ্জত করা বা অপমান করার উদ্দেশ্য আমার একতিলও ছিল না। আমি শুধু ‘টেম্পো’-টা তুলতে চাইছিলাম। উদ্বেজনা আর কনফেশনের টেম্পোটা। জাল গুটিয়ে তোলার আগে এমনভাবে একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। যাতে প্রকৃত অপরাধী ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ে; ডানে-বায়ে ক্রমাগত সকলের গোপন-কথা ফাঁস হয়ে যেতে দেখে! না হলে বিকাশ আমার শেষ খালাটি ধরে ফেলতো। ঐ ফিল্মার-প্রিন্টের ব্যাপারটা। কিন্তু ততক্ষণে তার উদ্বেজনা তুঙ্গে উঠে গেছে। ওর বুদ্ধি আর কাজ করছে না। ও নিজেও ওর শেষ অস্ত্রটার উপর নির্ভর করতে শুরু করল। তাই বারে বারে পিছু হঠে যাচ্ছিল—সকলের নাগালের বাইরে। ডান হাতটা ওর অনেক আগেই পকেটে ঢুকেছে। কিন্তু এসব বিশ্লেষণ এখানেই বন্ধ থাক। আবার বলি, যদি কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি অসৌজন্যমূলক প্রশ্ন করে, তবে আমি ক্ষমা চাইছি!



মূল কাহিনী শেষ হয়েছে। উপসংহারে বছর-দুয়েক পরেকার কয়েকটি তথ্য পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একদম্বর : শিবাজীপ্রতাপ এখন ঐ চিলে-কোঠার ঘরে থাকেন। ডক্টর পলাশ মিত্রের চিকিৎসায় তিনি দিন দিন সুস্থ হয়ে উঠছেন। অন্য কোন চাকরি করেন না। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছেন। চন্দননগরে একটি ট্রাস্ট-বোর্ড তাঁকে নাকি রিসার্চ স্কলারশিপ দিয়েছেন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য : ‘প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা।’

ঐ ট্রাস্ট-বোর্ডে যে মহিলা সেক্রেটারী মোটা মহিনায় নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর নাম : অনিতা সেনরায়। শোনা যায়, তিনি ছিলেন ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চ-অ্যাসিস্টেন্ট। তখন উপাধি ছিল গাঙ্গুলী। জটনৈক ‘মুক্তভ্রমরের’ কৃতিত্বে বর্তমান উপাধি—সেনরায়।

স্বর্গত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী মিসেস রমলা চট্টোপাধ্যায়ের সধবা অবস্থায় সেহাস্ত ঘটেছে।

## কাটায়-কাটায়-২

সুনীল আঢ়া এখন তার বাবার দোকানে বসে। সেকেন্ড ডিভিশনে সে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পড়াশুনাটা আর চালায়নি।

গতবছর সাহসিকতার জন্য সে একটি পুলিশ-মেডেল পেয়েছে।

একটা দুঃখের খবর : ময়ুরাক্ষীর এবছর বি.এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। অর্থাভাবে নয়। হেতুটা এই : পরীক্ষার সময় মিসেস ময়ুরাক্ষী দস্ত ছিলেন আসন্ন সন্তানসম্ভবা!



## সারমেয় গেণ্ডকের কাঁটা



## সারমেয় গেণ্ডকের কাঁটা

রচনাকাল : এপ্রিল ১৯৮৮

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৭

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীধীরেন শাসমল

উৎসর্গ : \* প্রবোধচন্দ্র বসু

চিঠিখানা যেদিন আমাদের এই নিউ আলিপুরের বাড়িতে এসে পৌঁছালো তখন বাড়ি ফাঁকা। রানীমামীমাকে নিয়ে আমার স্ত্রী সুজাতা গেছে গোপালপুরে। সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলের পাশাপাশি দু'খানি ঘর 'বুক' করেছে। একটা মামা-মামীর, আর একটা আমাদের দুজনের। কিন্তু বাসুমামার কী-একটা কেস-এর শুনানির দিন বেমক্লা এসে পড়ল মাঝখানে। উপায় কী? বাধ্য হয়ে ওঁদের দুজনকে পৌঁছে দিয়ে আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। আগামীকাল, বিশেষ জুন মাসের হিয়ারিং। সে বখেড়া মিলে আমরা দুজন ফিরে যাব গোপালপুর-অন-সিতে। কাল বাদে পরশু। এমনই এক ব্রাক্সমুহুর্তে ঐ অনুক্ষণে চিঠিখানা এসে পৌঁছল এ বাড়িতে।

জুন মাসের শেষার্শেয়। বেশ গরম পড়ে গেছে। মন উড়ু-উড়ু, মানে গোপালপুর-মুখো। কিন্তুকে বলে রেখেছি, কোনো লোক টেলিফোন করলে বা দেখা করতে এলে যেন স্রেফ হাঁকিয়ে দেয়। না হলে আবার কোনও 'কেস'-এ ফেঁসে যাবেন উনি। ভালোয় ভালোয় এ দুটো দিন কাটলে ঠাটি।

সকালবেলা প্রাতরাশের টেবিলে এসে দেখি বাসুমামা অনুপস্থিত। এমনটা কখনো হয় না। উনি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জীবনের ছককে বেঁধে ফেলেছেন। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে কবাইল-হ্যাড-বিশু জানালো, বড়-সাহেব এখনো বাইরের ঘরে।

উঠে ডাকতে যাব, তখনই এসে গেলেন উনি: সরি! আয়াম লেট বাই সেভেনটিন মিনিটস। বাসু-সাহেবকে খারা চেনেন না, তাঁদের মনে হতে পারে এটা বাড়িবাড়ি। উনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। তাছাড়া আমি কিছু এ বাড়ির অতিথি নই। পি.কে.বাসু, বার-অ্যাট-ল হচ্ছেন প্রখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। সম্ভাবনা নেই। প্রোট মানুষটি সতীক বাস করেন এই বাড়িতে। আমরা দুজন ওঁরই আশ্রয়ে 'সুকোশলী' নামে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস খুলে বসছি। ফলে, সতের মিনিট দেবী হওয়ার জন্য ওঁর মার্জনা ভিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এসব বিলাতি-কেতা ওঁর মজ্জায় মজ্জায়।

## কটায়-কটায়-২

প্রাত্ররাশের টেবিলে বসে জোড়া-পোচের প্লেটটা উনি টেনে নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ভাবছে?

সত্যি কথাই বলি, ভাবছি কাল বাদে পরশু আমাদের গোপালপুর যাওয়াটা না ভেঙ্গে যায়!

—ভেঙে যাবে! কেন? এ কথা মনে হল কেন তোমার? কালকেই তো কেসটার ফাইনাল হিয়ারিং?

—সেটা নয়। আপনার সতের মিনিট দেরি হওয়ার সূত্র ধরে আমার আশঙ্কা হচ্ছে—হয়তো আজকের ডাকে আপনি এমন কোন চিঠি পেয়েছেন—

উনি প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, করেস্ট! দারুণ ডিডাক্ট করেছ! 'বাসুমামু লেট—পত্রাং!' হেত্যাং পঞ্চমী! আজকের ডাকে তেমনই একটা বিচিত্র চিঠি পেয়েছি বটে।

—মার্ডার কেস?

—আরে না, না। সেসব কিছু নয়। পড়েই দেখ না—

পকেট থেকে বার করে খামখানা বাড়িয়ে ধরেন আমার দিকে। নিতে হল। বলি, পড়ার কী আছে? আপনি মুখে-মুখে বলুন না—ব্যাপারটা কী?

—না, তা হয় না কৌশিক। তোমার সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে। নাও, পড়—

অগত্যা। দামী লেফাফা। মোটা লেটার-হেডের বন্ড কাগজ। হস্তাক্ষর অতি বিচিত্র—গোটা গোটা, ঝরঝরে। দেখলে মনে হয়, পত্রলেখক দেড়-দুশ বছর আগে তালপাতার ঝুঁথিতে মকসো করে হাত পাকিয়েছেন :

সবিনয় নিবেদন,

অনেক সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার বাধা অতিক্রমণান্তে আপনাকে এই পত্রটি লিখিতে বাধ্য হইতেছি শুধুমাত্র এই আশায় যে, আপনি আপনার ভূয়োদর্শনের প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই একান্ত গোপনীয় বিষয়টির রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হইবেন। স্বীকার্য, যদিচ আপনার সহিত কখনো আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি আপনি আমার সুপরিচিত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড নিবাসী জগদানন্দ সেন মহোদয়ের নিকট আপনার সংবাদ প্রাপ্ত হই। আপনার সুপরিচালিত প্রচেষ্টায় তিনি বিপদমুক্ত হইয়াছিলেন। অশিচ তাঁহার পারিবারিক মর্যাদাদটুকু আপনি কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। আমি অবশ্য জানি না, সেন মহাশয়ের সমস্যাটি কী জাতের ছিল। কৌতুহলী হওয়াও কুকটির পরিচায়ক। পরন্তু এটুকু অনুধাবন করিয়াছি যে তাহা ছিল গোপন ও বেদনাদায়ক....

মাকড়সার জালের মতো—পত্রলেখকের ভাষায় 'লুতাতত্বসদৃশ' ঐ হাতের লেখার ব্যুহ ভেদ করে আর অগ্রসর হতে পারছিলাম না আমি। বলি, এ ভদ্রলোক তাঁর মূল বস্তুব্যাটা কোন প্যারাগ্রাফে বোলেছেন সেটুকু যদি দেখিয়ে দেন—

বাসুমামা কফির পট্টা টেনে নিতে নিতে বলেন, লিঙ্গে ভুল হল। ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা।

চিঠির পাদদেশে নজর গেল আমার : 'বিনতা পামেলা জনসন'।

—আর 'মূল বস্তুব্যাটা' ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। চোখ থাকলে দেখতে পাবে। পড়ে যাও। অগত্যা তাই। স্বীতিমত বানান করে করে এগিয়ে যেতে থাকি :

আমার আন্তরিক বিশ্বাস: বক্ষ্যমাণ সমস্যায় আপনি আমাকে অনুরূপভাবে সাহায্য করিতে সক্ষম। যদিও অনুসন্ধান সমাপনাতে আপনি এই সিদ্ধান্তে আইসেন যে, আমার রক্তচাপে সর্পগ্রম হইয়াছে, তাহা হইলে আমিই সর্বাপেক্ষা পরিতৃপ্ত হইব। বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করিতে আমার মন সরিতেছে না। পরন্তু দ্বিতীয় কোনও ব্যাখ্যাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। সারমেয়-গেণ্ডকের বিষয়টি এমনই জটিল, এমনই সঙ্গোপন যে, মেরীনগরে কাহাকেও কিছু বলা যায় না।

এবার চিঠির উপর দিকে নজর পড়ল আমার। ছাপা হরফে লেখা আছে ঠিকানা: 'মরকতকুঞ্জ, মেরীনগর' এবং পোস্টাল জোন নাম্বার। তার নিচে চিঠি লেখার তারিখটা। 17.4.70.

আপনি নিশ্চয় অনুমান করিতেছেন যে, আমি নিরতিশয় দৃষ্টিভ্রান্ত, বস্তুত আতঙ্কগ্রস্ত! বিগত দুই দিবস আমি মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি যে, আমার আশঙ্কা অমূলক, কিছু কার্য্যকারণ সম্পর্কের কোনও সূত্র দিয়া এই দুর্ঘটনার কোন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাইতেছি না। চিকিৎসক বলিয়াছেন মনকে দৃষ্টিভ্রান্ত রাখিতে। বর্তমান অবস্থায় তাহাও অসম্ভব। অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে আমাকে জ্ঞাত করিবেন—এ বিষয়ে গোপন তদন্ত করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণের জন্য আপনাকে কী সম্মানমূল্য প্রদান করিতে হইবে। বলা-বাহুলা, এখানে কেহই কিছু জানে না, জানিবে না। পত্রোত্তরের প্রতীক্ষারতা

বিনতা পামেলা জনসন।

আদ্যোপান্ত পড়ে বলি, ব্যাপারটা কী? কী চাইছেন ভদ্রমহিলা? আর মিস্ বা মিসেস জনসন 'এবম্বিধ দুস্পাচ্য বস্তুভাবায় পত্রাখ্যাত করিলেন' কোন হেতুতে?

বাসুমামু শুধু কাঁধ ঝাকালেন।

—এ তো আদ্যন্তু পাগলের প্রলাপ।

—হু! তুমি হলে কী করতে? পত্রপাঠ ছেঁড়া কাগজের ঝুলি?

—তাছাড়া কী?

—তার হেতু, ঐ চিঠিতে যেটি সব চেয়ে রহস্যময় দিক সেটা তোমার নজরেই পড়েনি!

—সবটাই তো রহস্যময়। তার ভিতর 'সবচেয়ে' বড় কোনটা?

—চিঠির তারিখটা। যা এখনো খেয়াল করে দেখনি তুমি।

তারিখ? তা বাটে! চিঠির মাথায় তারিখ দেওয়া আছে: 17.4.70.

আর আজ হচ্ছে জুন মাসের উনত্রিশ তারিখ। দু'মাসের বেশি।।

আমি লজ্জা পাই। এ দিকটা নজরে পড়িনি। সামলে নিয়ে বলি, তার অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। ভদ্রমহিলার মাথায় দু-একটি স্ক্রুপ যে ডিলে সেটা চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায়। হয়তো '17.6' লিখতে '17.4' লিখে বসে আছেন।

—কাঁচড়াপাড়া থেকে নিউ আলিপুর্নে চিঠি আসতে দিন-দশ বারো লাগে না।

—ডাক বিভাগের দয়ায় তাও হয়, বাসুমামু। কেউ নিজের কাজ করে না—

—বাটেই তো! কেউ নিজের কাজ করে না! পোস্ট-অফিসকে দোষ দেওয়ার আগে পোস্টাল ছাপটুকুও নজর করে দেখে না কেউ!

এবার নিরতিশয় লজ্জায় পড়ি। নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমার। দুটো ছাপই স্পষ্ট। প্রেরক ও প্রাপক পোস্ট-অফিসের। যথাক্রমে 26.6.70 এবং 29.6.70।

আমি সলজ্জ কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই উনি বলে ওঠেন, বাট হোয়াই? অমন আতঙ্কগ্রস্ত এক বৃদ্ধা এমন একটা জরুরী চিঠি কেন দু-মাস পরে ডাকে দিলেন?

আমি বলি, বৃদ্ধা?

—নয়? হাতের লেখায় বুঝছো না!

এবার বলি, ঠিকানা তো রয়েইছে। একটা চিঠি লিখে সেটা জানতে চাইলেই—

—নো! দু'মাস আগে পেলে চিঠিতেই জবাব দিতাম। বাট ইটস টু লেট নাউ!

—তাহলে? মানে, কী করতে চান আপনি?

—আমার মামলা তো কালকে। চল ঘুরে আসি। আজ তো আমি ফ্রি!

—ঘুরে আসবেন? মেরীনগর? জায়গাটা চেনেন?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—না। তবে পোস্টাল-জোন নাহারা যখন আছে, খুঁজে পাবই। তৈরী হয়ে নাও।

আমি গ্রীষ্মের এই খরতাপের প্রসঙ্গটা তোলার আগেই উনি বিশৃঙ্খল ডেকে নির্দেশ দিলেন, এ বেলা আমরা বাইরে থাকো। তুই আর রামাবান্নার হাসামায় হাস না। এই টাকা ক'টা রাখ। হোটেল থেকে আসবি।



আমি একটা গোড়ায় গলদ করে বসে আছি। উনত্রিশে জুন নয়, আমার গল্পটা শুরু হওয়া উচিত ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি—বসন্ত গুড ফ্রাইডের আগের শূক্রবার থেকে। কিংবা মে মাস থেকে। পটভূমি হওয়া উচিত ছিল মেরীনগর।

মুশকিল কী জানেন? আমি পেশাগতভাবে সিভিল এঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে সত্ৰীক গোয়েন্দাগিরি করি। এককালে কবিতা-টবিতা লিখতুম। গল্প-উপন্যাস কদাচ নয়। পি.কে.বাসুর কাহিনীগুলি মুখে মুখে জানিয়ে দিতুম আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধাকে। সেই সাক্ষিয়ে-গুছিয়ে 'কাঁটাসিরিজ'-এর গোয়েন্দা গল্প লিখে ছাপতে দিতো। এবার সে বলেছে তার সময় নেই। সে নাকি কীটপতঙ্গ, কৈটো-বিছের জগতে ব্যস্ত—অর্থাৎ 'না-মানুষ' নিয়ে। 'মানুষ' জন্তুটার সম্বন্ধে আপাতত তার কোনও কৌতূহল নেই। তাই এ গল্পটা উত্তমপূর্ববে লিখতে বাধ্য হয়েছি। আর তাতেই এই বিপত্তি।

যাক, যা বলছিলাম—আমরা মেরীনগরে তদন্তে যাবার আগে সেখানে যা ঘটেছিল তার পূর্বকথন একটু শোনাই। এসব ঘটনার কথা অনেক পরে আমরা জানতে পারি—নানান সূত্র থেকে। ধরে নিন—এটাই আমার কাহিনীর এক নম্বর পরিচ্ছেদ :

মিস্ পামেলা জনসন দেহ রাখলেন পয়লা মে তারিখে। দীর্ঘ বাহাদুরটা বছর পাড়ি দিয়ে। শেষবার বিশেষ ভোগেননি। মাত্র দিন-চারেকের রোগ-ভোগ। জনডিস্। শেষ ক'বছর ঐ পীতরোগেই ভুগছিলেন। মিস্ পামেলা জনসনের মৃত্যুসংবাদে মেরীনগরে কেউ মর্মাহত হয়নি একথা স্বীকার্য। এমনটা যে-কোন দিনই ঘটতে পারত। তবে দীর্ঘাশ্বাস পড়েছিল অনেকেরই। সেবার গীর্জা-প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড শিশুগাছটা কালবৈশাখীর দাপট সহ্য করতে না পারায় যেমন বেদনাবোধ জেগেছিল সকলের। গাছটা ফল দিতো না, ফুল ফোটাতো না, তবু সেই আকাশস্পর্শী মহীরুহের ভূষায়াগ্রহণে বৃকের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা জাগেই। পামেলা মেরীনগরে একাডচারিগীর জীবন যাপন করে গেছেন—রাজনৈতিক, সামাজিক, মহিল্লমহলের ডামাডোলে সামিল হতেন না—তবু মেরীনগরে বুড়ো-বাচ্চা সবাই তাঁকে একটা সম্মানের আসনে বসিয়েছিল। ঐ শিশুগাছটার মগডাল দেখতে যেমন উর্ধ্বমুখ হতে হতো।

মিস্ পামেলা জনসন এই মেরীনগরের এক অতি প্রাচীন বাসিন্দা। প্রাচীনতমা হয়তো ছিলেন না—ডক্টর পিটার দত্ত অথবা উষা বিশ্বাস সম্ভবত তাঁর চেয়ে বয়সে বড়; কিন্তু পামেলাই এখানকার একমাত্র বাসিন্দা যিনি সেই বেণী-দোলানো কৈশোরকাল থেকে এখানে আছেন। জীবনের একটা সপ্তাহও এ গায়ের বাইরে কাটাননি।

মৃত্যু সময়ে তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ছিল শুধু বেতনভুক্ গৃহকর্মীর দল—সহচরী, রাধুনি, বি, ড্রাইভার আর বাগানের মালি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দিন দশ-বারো আগে ইস্টারের ছুটিতে সবাই জড়ো হয়েছিল। আর আত্মীয়-স্বজন বলতে আছেই বা কে? বাহাদুর বছর

বয়সের বৃদ্ধির বাপ-মা-মাসি-পিসি থাকার কথা নয়। বিয়ে করেননি যে, সন্তানাদি থাকবে। ঠর অবশ্য তিন বোন আর এক ভাই ছিল—তারা একে একে দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে ঠর আগেই। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে উনিই বয়সে সবার বড়—ওঁরই সবার আগে বিদায় নেবার কথা; কিন্তু মা-মেরীর বিধানে উনি টিকে ছিলেন দীর্ঘদিন ঐ মরকতকুঞ্জে, ভূষণীকাকের মতো। তিন কুলে থাকার মধ্যে কুলো টিকে আছে তিনটি প্রাণী—টুকু, সুরেশ আর হেনা। তারা সবাই এসেছিল ইস্টারের ছুটিতে। মায় হেনার স্বামী সদীর প্রীতম ঠাকুর। মৃত্যুর পক্ষকাল আগে।

বছর-দেড়েক আগে আরও একবার যমে-মানুষে টানাটানি গেছে। ডাক্তার পিটার দস্তের চিকিৎসাতেই শুধু নয়, নিজের মনের জোরে সেবার মরকতকুঞ্জের সিং দরোজার বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন যমরাজকে। এবার পারলেন না।

মেরীনগর একটি খ্রীস্টানপ্রধান গ্রাম। রোমান ক্যাথলিক। কাঁচড়াপাড়া রেল স্টেশন থেকে যে পাকা সড়কটা পাক খেতে খেতে জাগুলিয়ার মোড়ে এসে মিশেছে এন.এইচ.থান্ডিফোরে, তারই মাঝামাঝি একটা ফ্যাকড়া-সড়কে গড়ে উঠেছে এই গ্রামটা। 'গ্রাম' শব্দটা অবশ্য এখন আর সুপ্রযুক্ত নয়, ছোটখাটো শহরই বলা যায়। এসেছে বিজলিবাতি এবং দূরভাষণের লাইন। গড়ে উঠেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর সেকেন্ডারি স্কুল। কিন্তু পামেলা জনসনের পিতৃদেব যোসেফ হালদার যখন ওখানে এসে বসবাস শুরু করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে, তখন ওটা ছিল রীতিমতো জঙ্গল। হরিণ না থাকলেও হরিণ লুকিয়ে থাকার মতো বড় বড় বেনাঘাস ছিল আ-হরিণঘাটাতক ডাঙা জমিটায়। যোসেফ হালদারের যৌবন কেটেছে বিদেশে—বিলাতে না মার্কিন মুলুকে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় সেটা জানা যায় না। কী কারণে তিনি শ্রীচ বয়সে সে দেশ থেকে ঘিরে এসেছিলেন সেটাও ইতিহাসের এক অনুন্ধ্যাতিত অধ্যায়। তবে তিনি যে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হিসাবেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কারণ ঐ নির্জন আরণ্যক পরিবেশে বিরাট এক জমিদারি কিনে তিনি একটি গ্রামের পত্তন করেছিলেন—মেরীনগর। বানিয়ে ফেললেন একটি গির্জা। খুলে বসলেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নলকূপের সাহায্যে ব্যবস্থা করলেন জল সরবরাহের—অনাবাদী উষর জমি পরিণত হল কৃষিক্ষেত্রে। মার্কিন মুলুক থেকে আসুন না আসুন—তার পরিকল্পনা মার্কিনী রাঞ্চ-এর।

বছর কয়েকের মধ্যেই কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল। একটি দুর্ঘটনায়। একটিমাত্র কন্যা সন্তানকে রেখে স্বর্ণলাভ করলেন যোসেফ হালদারের সহধর্মিণী—মেরী জনসন। বাঙালির ছেলেকে বিবাহ করলেও তিনি তার পদবিটা বদলাননি। যোসেফ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন—এবার একটি বাঙালী মেয়েকে। তিনিও বেশিদিন ঠাচেননি। তবে যোসেফ হালদারকে ছেড়ে যাবার আগে তার সংসারকে ভরভরস্তু করে গিয়েছিলেন—তিন কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান।

বড় মেয়ে পামেলার নামের সঙ্গে মিল রেখে যোসেফ মেয়েদের ভারতীয় নাম দিয়েছিলেন—সরলা, কমলা আর বিমলা। শেষ সন্তানের নাম আবার বিলাতি কেতার : রবার্ট। বিমাতা যখন বিদায় নিলেন ততদিনে পামেলা কিশোরী; ফলে যোসেফকে তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহ করতে হয়নি। পামেলাই তাদের মায়ের স্থান অধিকার করেন।

তারা সবাই একে একে বিদায় নিয়েছেন মরকতকুঞ্জ থেকে। শূয়ে আছেন পাশাপাশি গির্জা প্রাঙ্গণে। পামেলা প্রতিটি মৃত্যুতিথিতে এসে কবরে সাজিয়ে দিয়ে যান ফুলের 'বুকে'। নিজস্ব মালিকে পাঠিয়ে সিমেন্টের আগাছা নিড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, মরশুমি ফুলের 'বেড' বানিয়ে দেন। ঝকঝক তক্তক করে এলাকাটা।

মরকতকুঞ্জের প্রকাণ্ড বাড়িটায় পরিচারক-বেষ্টিত একান্তবাসিনীর জীবনেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন। বৎসরান্তে ইস্টারের ছুটিতে—ঘটনাচক্রে সাতই এপ্রিল ঠর জন্মদিন—সেটা ইস্টারের ছুটির কাছাকাছি পড়ে—আসে এই একান্তচারী বৃদ্ধার স্বজনেরা—ভাইঝি স্মৃতিটুকু, ভাইপো সুরেশ. আর বোনঝি হেনা।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

পামেলা মর্মে মর্মে জানেন তাদের এই বৎসরান্তিক 'আদিখোতার' হেতুটা!

মুখে স্বীকার করেন না—সেটা তাঁর ধাত্বে নেই!

তিনি জানতেন, ওরা জানে—সাত বিঘে বাগান-ওয়ালা এই প্রকাণ্ড প্রাসাদটার বর্তমান বাজারদর কত। আর জানতেন, ওরা জানে না, আন্দাজ করে, বুড়ির কোম্পানির কাগজের পরিমাণটা!

ওরা সবাই হালদার, কেউই 'জনসন' নয়। পামেলাই একমাত্র জনসন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বাপের অনুমতি নিয়ে এফিডেবিট করে নামটা পরিবর্তন করেছিলেন—পামেলা হালদার হয়েছিলেন 'পামেলা জনসন'। মায়ের উপাধিটাই পছন্দ হয়েছিল তাঁর। তা হোক, তবু রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করবার মতো মানুষ ছিলেন না মিস্ পামেলা জনসন। ওর বাপের সলিসিটার ছিলেন 'চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড সন্স'। 'অ্যান্ড সন্স'দের মধ্যে বর্তমানে যিনি সিনিয়ার পার্টনার সেই প্রবীর চক্রবর্তীকে ডেকে উইল করে ওর যাবতীয় সম্পত্তি ঐ তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। সে আজ বছর-পাঁচেক আগেকার কথা।

পামেলার স্বাভাবিক মৃত্যুতে কেউই বিস্মিত হয়নি। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল ওরা—টুকু, সুরেশ, হেনা আর তার স্বামী। বুড়িকে সাড়স্বরে শুইয়ে দেওয়া হল চার্চের প্রান্তরে।

আর তার পরেই নটকের চরম ক্লাইমাক্স! বোমাটা ফাটলো!

আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করে পামেলার সলিসিটার প্রবীর চক্রবর্তী সদ্যস্বর্গগতার শেষ উইলখানি পড়ে শোনালেন।

বজ্রাহত হয়ে গেল সবাই।

মৃত্যুর মাত্র দশ দিন আগে মিস পামেলা জনসন তাঁর পূর্বকৃত উইলখানি নাকচ করে একটি নতুন উইল করে গেছেন। পার্চিকা, পরিচারিকা, বাগানের মালিকে কিছু অর্থদান করে, স্থানীর চার্চ ফাউন্ডেশন এবং পিতৃদেবের নামাঙ্কিত স্কুল ফাউন্ডেশন কিছু অর্থদান করে বাদবাকি স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু—মায় এই মরকতকুঞ্জটি—তিনি নির্বুদ্ধি স্বত্বে দান করে গেছেন এক অজ্ঞাতকুলশীলকে!!

শেষ উইলে তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের কাউকে কপর্দকমাত্র দিয়ে যাননি!

এমনটা যে ঘটিতে পারে তা ছিল সকলেরই দুঃস্বপ্নের আগোচর! সকলেরই আশা ছিল, বুড়ি মাটি নিলে সম্পত্তি তিন ভাগ হবে: টুকু, সুরেশ আর হেনা। পামেলার পাঁচ ভাইবোনের ঐ তিনটি শেষ খুদু-কুড়ো! আশ্চর্য! তিনি ওদের তিনজনকেই সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন! কেন? মৃত্যুর মাত্র দশদিন আগে?

গোটা মে মাসটায় মেরীনগরে ঐ একটাই ছিল আলোচ্য বিষয় : কেন? কেন? কেন?

কেউ কোন সম্ভাব্য হেতুর ইঙ্গিত দিতে পারেনি।

একথা স্বীকার্য যে, বুড়ির সঙ্গে ওদের কারও নাড়ির টান ছিল না। বৎসরান্তে ওরা ইস্টারের ছুটিতে এসে জমায়েত হত মরকতকুঞ্জে। সাড়স্বরে বুড়ির জন্মদিন পালন করত : 'হ্যাপি বার্থ ডে টু য়া!' কিন্তু পামেলার মতো মেরী নগরের সবাই বুঝতে পারতো এই বৎসরান্তিক আনন্দোদ্ভাসের অন্তর্নিহিত হেতুটা! 'ল্যাকল্যাকানির' কারণটা!

সে-কথা যেমন সত্য, তেমনই এটাই বা অস্বীকার করা যায় কী করে যে, পামেলা জনসন ছিলেন বিচক্ষণ জ্যাভিমানী এবং স্বজনপোষক। তাঁর পূর্বকৃত উইলের কথা তিনি কোনদিনই গোপন করেননি। বলেছেন ডাক্তার পিটার দত্তকে, উষা বিশ্বাসকে, নিজমুখে। তাহলে?

আর সবচেয়ে বড় বিষয়—যাকে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এককথায় দান করে গেলেন তাকে তিনি কতটুকু চিনতেন? মাত্র তিন বছর আগে সে বহাল হয়েছিল। নামটা গালভারী—'কম্পানিয়ান' বা 'সহচরী'। আসলে তো সে বেতনভুক পরিচারিকামাত্র! তিন কুলে তারও কেউ নেই। লেখাপড়া শেখেনি বিশেষ। দেখতে ভাল নয়, বিয়ে-থা হয়নি। পামেলার জীবনের শেষ তিন বছর সে ছিল তাঁর 'সহচরী'!

রীতিমতো বোকা-সোকা, মোটা-সোটা, গাবলু-গুবলু চেহারা। লোকে বলে মাধ্যম শূণ্য চুলই নয়,

‘গ্রে-ম্যাটারও’ কম। তার পক্ষে গৃহস্বামিনীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এমন একটা উইল বানিয়ে নেওয়ার কথা যে ভাবাই যায় না!

উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন মিনতি মাইতিও উপস্থিত ছিল সেখানে। বোধ করি তার আশা ছিল গৃহস্বামিনী তাঁর সহচরীকেও দিয়ে গেছেন দু-পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। যখন শুনলো সে নিজেই একমাত্র ওয়ারিশ, তখন সে বজ্রাহত হয়ে যায়। হাসবে না কাঁদবে স্থির করে ওঠার আগেই প্রবীর চক্রবর্তীমশাই উচ্চারণ করে বসলেন আর্থিক অন্তটা। হাসি-কান্নার রাজ্য পেরিয়ে মিনতি অজ্ঞান হয়ে গেল।

মিস পামেলা জনসনের অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যমান সাড়ে সাত লক্ষ টাকা! এ যেন সেই রূপকথার গল্পো! ঘুটেকুড়নির মেয়ে রাতারাতি হয়ে গেল রাজকন্যে!



গুড ফ্রাইডের আগের বুধবার সকাল। মিস পামেলা জনসন দাঁড়িয়েছিলেন মরকতকুঞ্জের পোটিকোর সামনে। যৌবনকালে নিচয় তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। সোনালী চুল, ঘন নীল চোখ আর টকটকে রঙ।

এখনো এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সুন্দরী—সৌন্দর্যের পরিণত সংজ্ঞায়। এখনো তিনি সোজা হয়ে হাঁটেন। লাঠি ব্যবহার করেন না। মেদ নেই দেহের কোনও প্রত্যন্তদেশে। শুধু টকটকে রঙে একটা হলুদের আভাস। দীর্ঘদিন তিনি ভুগেছেন জনডিস রোগে। এখনও তেল-মশলা বা ভাজা খাবার তাঁর বরদাস্ত হয় না।

মিনতিকে দেখতে পেয়েই গৃহস্বামিনী বলেন, ঘরগুলো সব ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে? পর্দা-টর্দা লাগানো হয়েছে ঠিকমতো?

প্রকাণ্ড প্রাসাদের অধিকাংশ ঘরই অব্যবহৃত পড়ে থাকে তালাবন্ধ হয়ে। বৎসরান্তিক এই অতিথি সমাগমের আগে তা ঝাড়পোঁছ করা হয়। সেসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে জেনে নিয়ে পামেলা বলেন, কোন্ ঘরে কাকে থাকতে দিচ্ছ?

—ডক্টর ঠাকুর আর হেনাদিকে ‘ওক-ক্রমে’, স্মৃতিটুকুদিকে দক্ষিণ-পূর্বের ‘দোলনা-ঘরে’ আর সুরেশবাবুকে পশ্চিমের ঘরখানায়—

পামেলা কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করেন, না! সুরেশ থাকবে ‘দোলনা-ঘরে’; আর টুকু ওই পশ্চিমের ঘরে—

মিনতি আমতা আমতা করে, ঠিক আছে, তাই হবে। আমি ভাবছিলাম দোলনা-ঘরটায় টুকুদির বেশি আরাম হবে, মানে....

—বেশি আরামের দরকার নেই তার!

পামেলার কালে পুরুষদের আরামে রাখার ব্যবস্থা হতো। ‘দোলনা ঘর’-এ প্রাসাদের সব সেরা গেস্ট রুম। সুরেশ অবিশ্যি নিতান্তই বখে গেছে, তা হোক, পুরুষ-প্রাধান্যের চিন্তাটা ওঁর মজ্জায় মজ্জায়। সব-সেরা ঘরখানা বংশের পুরুষেরাই ভোগ করবে, যতদিন তিনি জীবিত।

মিনতি বলে, কী দুঃখের কথা, হেনার বাচ্চা দুটো আসছে না—

আরও কঠিন শোনালো গৃহস্বামিনীর কণ্ঠস্বর, চারজন অতিথিই যথেষ্ট। হেনা তো আদর দিয়ে বাচ্চা দুটোকে মাথায় তুলেছে। ওরা না আসায় বেঁচেছি।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

মিনতি অবিহাতি, মাতুলস্নেহ তার অতৃপ্ত। সে বোধ করি মনে মনে মর্মান্বিত হলো। মুখে কিছু বলার সাহস হলো না। পামেলা বলেন, আমি একবার কাঁচড়াপাড়া যাবো। মোহনকে গাড়ি বার করতে বল। বাজারটা সেরে আসবো।

—কী দরকার মা? আমিই তো যেতে পারি। কী কী লাগবে লিস্ট করে দিন—

—তোমাকে দিয়ে যদি হতো তাহলে আমি যেতে চাইতাম না। যা বলছি করো। কই ফ্লিসি কোথায়? ফ্লি—সি!

পরমুহূর্তেই দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়ে দুন্দাড়িয়ে নেমে এল একটি স্পিৎজ। ধবধবে সাদা। লোমে ভর্তি তার সারা দেহ। পামেলা ওর কলারে চেনটা গলিয়ে নিলেন। একটু পরেই মোহন একখানা প্রাচীন মডেলের হুড-খোলা মরিস মাইনর নিয়ে এসে হাজির। আউট-হাউসে দুটি কামরা। একটায় থাকে ড্রাইভার মোহন একাই। দ্বিতীয়টায় মালি ছেদিলাল। মোহনের পাশের ঘরখানায় থাকে সতীক। ওর জেনানা সরযুবাই হচ্ছে ঝি। বাসন মাজা, কাপড় কাচা এবং যে কয়খানি ঘর নিত্য ব্যবহার হয় তা মোছার কাজ সরযুর। ওদের আদি নিবাস ছাপরা জিলা।

বাজারে দেখা হয়ে গেল উষা বিশ্বাসের সঙ্গে।

—গুডমর্নিং, পামেলা। নাইস টু মীট য়ু হিয়ার!

—মর্নিং উষা! কিসে এসেছো? রিক্সায়? ফিরবে কিন্তু আমার সঙ্গে।

—থ্যাঙ্কস্। অনেক বাজার করেছো দেখছি। ওরা আসছে তাহলে? কে-কে?

—সবাই। টুকু, সুরেশ, হেনা—

—হেনা তাহলে কলকাতায় এসেছে? তার কর্ডাটিও আসছে তো?

—হ্যাঁ।

—বাচ্চা দুটো?

—না।

উষা বিশ্বাস পামেলার বালা বাঙ্কবী। প্রায় ষাট বছরের সম্পর্ক। বৈটেখাটো মানুষ। কথা বলতে ভালবাসেন, কিন্তু ইদানীং কথা বলার মানুষ পান না।

দুজনেই জানেন দুজনের জীবনের ইতিহাস। উষা বিশ্বাস চিরকুমারী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পামেলার মতই। ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এখন অবসর নিয়ে পেনশন-নির্ভর। মেরীনগরের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসা করেন, হেনারা কোথায় থাকে যেন? পাটনায়?

—না। মজঃফরপুরে। প্রীতমের সেখানে প্র্যাকটিস্ জমছে না, কলকাতায় এসে নতুন করে শুরু করবে বলছে।

—মজঃফরপুরের মতো জায়গায় যার প্র্যাকটিক্ জমলো না, সে কি কলকাতার এই কম্পিটিশনে...

তাকে মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে পামেলা বলেন, সে চিন্তা তাদের। ওরা প্রাপ্তবয়স্ক।

—তা তো বটেই। —উষা বিশ্বাস গুটিয়ে নেন নিজেকে। তিনি জানতেন, হেনা যে একটি সর্দারজীকে বিয়ে করে বসেছে এটা পামেলা ভাল চোখে দেখেননি। প্রসঙ্গটা বদলে নিতে উষা বলেন, টুকুর সঙ্গে ঐ ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্তের এনগেজমেন্টটা কি পাকা খবর?

—হ্যাঁ, পাকা বইকি। তবে বিয়েটা পাকতে বেশ দেরি হবে মনে হয়। নির্মলের অবস্থাও অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ! প্রীতমের মতো!

উষা প্রতিবাদ করেন, কেন? টুকুর তো আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট!

পামেলা আড়চোখে বাঙ্কবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, যু থিংক সো?

হেসে ফেলেন উষা বিশ্বাস। তিনি জানতেন ভিতরের ব্যাপারটা। পামেলার ছোট ভাই ববের, মানে রবার্টের মৃত্যুর পর স্মৃতিটুকু আর সুরেশ বেশ কিছু নগদ টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। সে আজ দশ বছর আগে। এই দশ বছরে ভাই-বোন দুজনেই তা উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। সুরেশের অংশটা গেছে



ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো হয়ে, আর স্মৃতিটুকুর মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায়। পামেলা বলেন, টুকুর পাশ বইয়ে কত 'রেশ' আছে জানি না—কিন্তু সেইটের ভরসায় কি নির্মল বিয়ে করতে পারে এখনই?

উষা বলেন, আজকালকার ছেলেরা ক্রী-খনে ভাগ বসাতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

তা হবে! ফেরার পথে উষা বিশ্বাস সবিস্তারে আজকালকার ছেলেমেয়েদের মুণ্ডপাত করতে থাকেন।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা! কথটা গুর মস্তিষ্কের একটা অংশ কুরে-কুরে খেতে থাকে। বাড়ি ফিরে এসেও চিন্তাটা গেল না। উষা বিশ্বাসের ঐ কথটা। জেনারেশন-গ্যাপ! একালের ছেলেমেয়েদের সতিই বোঝা মুশকিল!

টুকুর কথাই ধর। পামেলার হাতের বাইরে সে। মরকতকুঞ্জে থাকতে সে রাজি হয়নি। বৎ অনেক আগেই মরকতকুঞ্জ ত্যাগ করে চলে যায়। সে ছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের গার্ড। থাকতো খড়গপুরে। বৎ এ সংসার যখন ত্যাগ করে যায় তখনো পামেলার তিন বোন বেঁচে। যোসেফ অবশ্য আগেই মাটি নিয়েছেন। বৎ মরকতকুঞ্জের অংশ আর্থিক মূল্যে গ্রহণ করেছিল বোনদের কাছ থেকে। কারণ তার বিবাহটা ঐরা কেউই মেনে নিতে পারেননি। সে বিধবা-বিবাহ করেছিল বলে নয়, বিধবাটিকেই বরদাস্ত করতে পারেননি গুর। টুকু আর সুরেশের মা হয়ে পড়েছিলেন ফার্স্ট ডিগ্রি মার্জার চার্জের আসামী। প্রথম স্বামীকে নাকি বিশ্বপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন—এই ছিল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। আজব কাণ্ড! রবার্ট, মানে বৎ তার হবিস পায় খবরের কাগজে! কাগজের কাটিং-এ তার ছবি দেখে নাকি মোহিত হয়ে যায়! দীর্ঘদিন দশকের আসনে বসে সে ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছিল কাঠগড়ার আসামীরূপে। বিচারে সে বেকসুর খালাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৎ তাকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি রাজি হয়েছিল, কিন্তু রাজি হতে পারেননি পামেলা, সরলা, কমলার দল!

বৎ আলাদা সংসার পাতে!

প্রথম স্বামীকে বিশ্ব প্রয়োগ করেছিল কিনা যীসাস জানেন, দ্বিতীয় স্বামীকে করেনি। ববের আগেই সে মারা যায় দুটি সন্তান রেখে—সুরেশ আর স্মৃতিটুকু। ববের মৃত্যুর পর পামেলা চেয়েছিলেন গুরা দুজনে মরকতকুঞ্জে এসে থাকুক। দুজনের কেউই রাজি হয়নি। তাদের হাতে তখন কাঁচা টাকা! ঐ জঙ্গলে এসে পড়ে থাকতে তাদের বয়েই গেছে!

স্মৃতিটুকু হয়ে উঠল গ্ল্যামার-গার্ল। সুরেশ কাপ্তেনবাবু!

হেনার ইতিহাসটা অবশ্য বেদনাশায়ক। বিমলা হালদারের একমাত্র সন্তান। সরলা যৌবনে পদার্পণের আগেই মারা গিয়েছিলেন, কমলা মারা যান বত্রিশ বছর বয়সে—অবিবাহিতা ছিলেন তখনও। কিন্তু ছোট বোন বিমলা বিবাহ করেছিলেন একজন রসায়নের অধ্যাপককে। গুরা থাকতেন পাটনায়। হেনা সুন্দরী নয়, লেখাপড়াতে মাঝামাঝি। বাপের ইচ্ছায় রসায়নে অনার্স নিতে হয়েছিল। বেচারি গ্র্যাডুয়েট হতে পারেনি—পর পর দু'বছর পরীক্ষা দিয়েও। অথচ পাস-কোর্সে নিশ্চয় সে উত্তরে যেতো!

পামেলার কেমন যেন মনে হয়—হেনা প্রীতমকে ভালবেসে বিয়ে করেনি। করেছে কিছুটা বাধ্য হয়ে। যৌবনের দিনগুলি ধুবড়ি থাকার পর তার অবস্থা তখন 'এনি পোট ইন দ্য স্টর্ম'। বাপ-মা-হারা মেয়েটা কিছুতেই মরকতকুঞ্জে এসে থাকতে রাজি হয়নি। পাটনাতেই একটি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেয়। পাটনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র প্রীতমের সঙ্গে হেনার ক্রীভাবে আলাপ হয় সেটা পামেলা জানেন না; কিন্তু পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় প্রণয়ে, পরিণাম পরিণয়ে।

ইদানীং পামেলার কী জানি কেন মনে হয়েছে—হেনা প্রীতমকে ভালবাসে না। ভয় করে।

অথচ ঘটনাটা উন্মোচন খাতে বইবার কথা। কারণ বিমলার মৃত্যুর পর হেনা যে ক্রী-খন পায় সেটাও যথেষ্ট। আর তা শেয়ার বাজারের দুঃসাহসিক ফটকা বাজিতে উড়িয়ে দিয়েছে ঐ পাঞ্জাবী ছেলোটি; ডাক্তার প্রীতম সিং ঠাকুর। পদবিটা রাজপুত্রের, আসলে সে খালসা শিখ।

গির্জা প্রাঙ্গণের ঋজু শিশু গাছটার মতো স্থির-স্থবির পামেলা জনসন দেখে গেছেন দুনিয়াদারীর এই

## কাটার-কাটার-২

বিচিত্র উত্থানপতন। মরকতকুঞ্জের দ্বার ওদের জন্য বরাবরই অব্যাহত ছিল। কেউ ফিরে আসেনি—প্রডিগাল সানস্ অ্যান্ড ডটার্স! অথচ তিনি নিজের, সরলার এবং কমলার অংশগুলি সুবিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রমাগত বর্ধিত করে গেছেন। এই যথের ধন তিনি কাকে দিয়ে যাবেন?

—মাঝে মাঝে সিমেন্টরিতে যান। পাশাপাশি শূয়ে আছেন যোসেফ হালদার, মেরী জনসন, সরলা আর কমলা। তাঁদের সঙ্গেই পরামর্শ করেন। ওদের কথা শুনতে পান তিনি। ওদের আশ্বস্ত করেন: আই নো! আই নো! ব্রাদ ইজ বিকার দ্যান ওয়াটার! ওরা আমাদের পথে—তোমাদের পথে চলে না—জেনারেশন গ্যাপ—তা হোক! হকের ধন আমি ওদেরই দিয়ে যাব! তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো! তবে হ্যা, হেনার অংশটা যাতে তার সেই দাড়িওয়ালা, পগগ-সাঁটা বিদেশী লোকটা না আবার উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়, এ ব্যবস্থাটা করতে হবে। একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে শ্রীর চক্রবর্তীকে।



পাচই এপ্রিল সকাল।

সুরেশ আর শ্বতিটুকু হালদার এল গাড়িতে—কলকাতা থেকে টানা ট্যাক্সিতে। হেনা আর তার স্বামীও এল ট্যাক্সিতে, তবে কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে। সুরেশ আর টুকুরাই এল প্রথমে। সুরেশ ছয় ফুটের মত লম্বা, পেশীবহুল সূঠাম দেহ। সূত্রী, সুন্দর। দেড় কুড়ি বছর যে পাড়ি দিয়েছে তা দেখলে বোঝা যায় না। ট্যাক্সি থেকে নেমে তিন লাফে উঠে এল বারান্দায় : হ্যালো, আশি! হাউজ দ্য গ্যেল! যু লুক ফাইন!

তার পিছনে ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে এসে গেল টুকু। বয়সে সুরেশের চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট। পামেলার মনে হল নিখুঁত মেক-আপের নিচে শ্বতিটুকুর মুখখানায় একটা বিবর্ণতার ছায়া। তার চোখের কোলে যেন কালিমার আলিম্পন-রেখা।

ড্রইংরুমে ওরা এসে জমিয়ে বসল। আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে গেল ঠাকুর দম্পতি। হেনা বয়সে টুকুর চেয়ে এক বছরের ছোট; কিন্তু দেখলে তাকেই দিদি বলে মনে হয়। একটু মোটাসোটা ঢিলে-ঢালা; কিন্তু উগ্রসাজের ঘটা। বাস্তবে সে টুকুর পোশাক ও প্রসাধন অবিকল নকল করতে চায়, যোঝা না—দীর্ঘঙ্গী, তব্বী, মধ্যাক্ষমা, নিম্ননাভির পক্ষে যে পরিচ্ছন্ন বা প্রসাধন সৌন্দর্যবর্ধক, শ্রোণীভারাদলসগমনা স্থলঙ্গীর কাছে সেটা পরিহাস। প্রীতম ঠাকুর তার দীর্ঘ শ্রবণ এবং দীর্ঘতর উজ্জীষ সঙ্কেত সুস্পষ্ট, সুসৌর, চিত্তাকর্ষক।

ইতিমধ্যে মিনতি আর বামুনদি টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে ব্রেকফাস্ট, 'কফি-কোজি' দিয়ে ঢাকা কফি আর চায়ের পট। মিনতি রীতিমতো ব্যস্ত, বারেবারেই এটা ধরে নাড়ছে, সেটা ধরে টানছে—কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষমেশ ফুলে ভর্তি ফুলদানি দুটো সে টেবিলের তলায় পাচার করতেই চাইছিল। পামেলার ধমক খেয়ে আবার সে দুটো তুলে আনলো টেবিলে। সুরেশ দু'একবার মহিলাটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল—বেশ বোঝা গেল, সেটা আবার মিনতির পছন্দ নয়। ধন্যবাদ দিল না সে।

চা-পানান্তে সবাই নেমে এলেন বাগানে। সুরেশ তখন জনান্তিকে টুকুকে বললে, মিনতি আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না! লক্ষ্য করেছে?

শ্বতিটুকু হাস্য গোপন করে বলে, দুনিয়ায় তাহলে অজ্ঞত একটি কুমারী আছে যাকে তুই সম্বোধিত করতে পারিসনি, সুরেশ।

সুরেশকে কোনদিনই টুকু 'দাদা' ডাকে না। তুই-তোকারি করে।

সুরেশ অফেন নিল না। সহ্যসহ্যেই ফিরিয়ে দিল জবাব, আমার সৌভাগ্য, দুনিয়ার সেই একমেবাবিধীয়মটি শ্রীমতী মিনতি মাইতি।

বাগানে মিনতি মাইতি হেনাকে গাছ-গাছড়া চিনিয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরেই এসে উপস্থিত হলো ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্ত। কাঁচড়াপাড়া থেকে সহীকেলে চলে এসেছে। সেখানে সে ডক্টর পিটার দস্তের ক্লিনিকে কাজ করে। তাকে দেখে স্মৃতিটুকু এগিয়ে এলো। নির্মল পামেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন করলো সৌজন্যবশত। তারপর টুকুর হাত ধরে বাগানের নির্জন একটা অংশে মিলিয়ে গেল।

পামেলা বেশিক্ষণ বাগানে থাকলেন না। ফিরে এসে ড্রইংরুমে ঢুকতেই তাঁর নজরে পড়ল সুরেশ ক্রিসির সঙ্গে খেলায় মেতেছে। ক্রিসি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়, মুখে বল, আর সুরেশ একতলায়।

—কাম অন, ওল্ড ম্যান!

ক্রিসির ধবধবে লেজটি তুড়তুড় করে নড়ছে। অতি সত্তর্পণে রবারের বলটা সে নামিয়ে রাখলো সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ। তারপর নাক দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই—থপ্-থপ্-থপ্। বলটা নিচে এসে পৌঁছতেই সুরেশ সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়লো ওপর দিকে। ক্রিসি নির্ভুল টিপে লুফে নিল বলটাকে। আবার সবত্রে নামিয়ে রাখলো সিঁড়ির মাথায়।

এই খেলা ক্রিসির দারুণ শ্রিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

পিসিকে ফিরে আসতে দেখে সুরেশ খেলায় ক্ষান্ত দিল। ক্রিসি মর্মহত।

পামেলা একটা ইজিচেয়ারে বসলেন। সুরেশও ঘনিয়ে এল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—সুরে গাছ-গাছালির ঝাঁক দিয়ে টুকু আর নির্মল বাগানে পায়চারি করছে। হাত ধরাধরি করে। পামেলা সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। সুরেশ বললে, ওরা দুজন যেন দুই ভিন্ন মেক্সর বাসিন্দা। অথচ...

পামেলা একটু অপেক্ষা করলেন। দেখলেন, সুরেশ বাক্যটা অসমাপ্তই রাখলো।...বললেন, তোর কী মনে হয়? টুকু কি সত্যিই সিরিয়াস?

—প্রেমের দুনিয়াটা বড় আজব, বড়পিসি—টোষকশক্তির মতো। এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। ঋণাত্মক আর ধনাত্মক শক্তির পারস্পরিক আকর্ষণ: নির্মল নিত্যন্ত মধ্যবিন্দু ঘরের মেধাবী ছেলে, আর টুকু ধনীর দুলালী। বেহিসাবী খরচের ওস্তাদ। বিয়ে করলে ওরা সংসার চালাবে কী করে?

পামেলা গম্ভীর হয়ে বললেন, টুকুর সামনে দুটোই অব্যবহৃত। নির্মলকে বিয়ে করে মিতব্যয়ী হওয়া, অথবা নির্মলকে ত্যাগ করে বকের সেওয়া শেষ ক'খানা কোম্পানির কাগজ উড়িয়ে-পুড়িয়ে সেওয়া—

একগাল হাসলো সুরেশ। বললে, তোমার বুঝি ধারণা শেষ ক'খানা কাগজ ফুলঝুরি হয়ে ফুল কেটে শেষ হয়ে যায়নি আজও।

—সেটা টুকুর জানার কথা।

রাতে ডিনার টেবিলে সবাই এসে বসেছেন। ওঁরা ক'জন তো বটেই, মায় ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্তও। তাঁকেও নেশাহার সেরে যেতে বলেছিলেন পামেলা। নির্মল মেসে থাকে। সে রাঙ্কি হয়ে যায়। সকলে গুছিয়ে বসলো। একমাত্র সুরেশই অনুপস্থিত। মিনতি তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছিলো; ঠিক তখনই ভিতর থেকে ছুঁড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলো সুরেশ। বললে, সরি, আশ্টি, আমার বোধহয় একটু সেমি হয়ে গেছে। তোমার কুকুরটা আমাকে জানে মেরে দিয়েছিল আর একটু হলে—সিঁড়ির মাথায় তার বলটায় পা পড়ে একেবারে উল্টে যাচ্ছিলাম।

পামেলা বললেন, জানি। ভারি বিপজ্জনক খেলা। মিষ্টি, বলটা ঝুঁজে বার কর। ড্রয়ারে সরিয়ে রাখ।

মিনতি মাইতি দ্রুতপদে নিজস্ব হলো আদেশ তামিল করতে।

সায়মাণের আসরটা শ্রীতম একাই জমিয়ে রাখল নানারকম 'জোকস্' শুনিয়ে। তার অধিকাংশই যে

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

গোষ্ঠীকে নিয়ে তাতে সে নিজেও সামিল। প্রতিবাদ করলেন পামেলা, জানি না কে বা কারা এসব গল্প সৃষ্টি করে। আমি তো মনে করি, শিখ হিসাবে তোমার গর্বিত হওয়া উচিত। ভারতের লোকসংখ্যার অনুশাতে প্রতি একশ জন ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র একজন শিখ, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়; ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে শিখ! যে কোন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের আধাআধি ছিল শিখ। এভারেস্টের চূড়ায় এ পর্যন্ত যে চারজন ভারতীয় উঠতে পেরেছে তার তিনজন হচ্ছে শিখ!

প্রীতম স্তম্ভিত হয়ে গেল বন্ধুর এ কথায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে, সসন্ত্রমে মাথা ঝুকিয়ে বললে, জোকস্ আর জোকস্ মাদাম! কিন্তু আপনি আজ আমাকে যে কথা বললেন, তা আমি সারা জীবনে ভুলবো না।

সুরেশের স্বভাবের একটা প্রবণতা হচ্ছে লেগ-পুলিং। ঠ্যাঙ টানার সুযোগ পেলে সে তাকিয়ে দেখে না, কার ঠ্যাঙ ধরে টানছে। ফস্ করে বলে বসে, বড়পিসি দেখছি প্রীতমকে কম্ব্লিমেটস্ দেবে বলে তৈরি হয়ে আছে! বুক-অব-রেকর্ডস্ দেখে মুগ্ধ করে রেখেছো সব কিছু।

পামেলার মুখমণ্ডল রক্তবরণ হয়ে উঠলো। তবে ভিক্টোরিয়ান যুগের শালীনতাবোধ তাঁর মজ্জায়-মজ্জায়। সংযত হলেন নিম্নেবই। হাসতে হাসতেই বললেন, তোর মতো শুধু এক জাতের বইই তো আমি পড়ি না। ‘বুক’ বলতে তুই তো শুধু বুকিস অস্বমেধ যন্ত্রের বংশতালিকা!

সুরেশের মুখখানা কালো হয়ে গেল!

বুঝলো, সাপের লেজে পা দেওয়াটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয়নি!

নৈশাহরের পর যে যার ঘরে চলে গেলেন।

রাত দশটা নাগাদ গৃহকর্তার দ্বারের সামনে শোনা গেল, বড় পিসি, ভিতরে আসবো?

পামেলা দৈনিক হিসাব লেখেন। এইটা তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর পেন-আলটিমেট কাজ। শেষ দৈনন্দিন কাজটি হচ্ছে শয্যার শীর্ষদেশে কুলুঙ্গিতে রাখা মা-মেরীর মূর্তির সামনে দিবসান্তের প্রার্থনা। হিসাবের খাতাটা সরিয়ে রেখে বললেন, আয়।

পর্দা সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলো সুরেশ। রঙের টেক্সটা নামিয়ে দিল প্রথমেই : বড়পিসি, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। তোমাকে নিয়ে রসিকতা করা আমার উচিত হয়নি।

পামেলা মিটি হেসে বললেন, আমারও ওভাবে আঘাত করাটা উচিত হয়নি রে। যাক দু’পক্ষেরই যখন অনুশোচনা জেগেছে তখন সব শোধবোধ হয়ে গেছে। বাস, ঠাড়িয়ে রইলি কেন?

—না পিসি। তোমার শূতে যাবার সময় হয়েছে। বসবো না আর। কথাটা না বলে গেলে আমার ঘুম আসতো না। সারারাত মন ঝুতঝুত করতো।

পামেলার কী যেন বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে গেল। বললেন, ঠিক বাপের মতো!

—বাপের মতো! মানে?

—বব্-এর সঙ্গে ঝগড়া হলে সেও রাগ পুষে রাখতে পারতো না।

পামেলার মুখের উপর একটা স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটে উঠলো যেন। সুরেশ এ সুযোগ ছাড়লো না। এই খণ্ড-মুহুর্তটির সুযোগ। বললে, তাহলে একটা কথা বলবো বড়পিসি?

—বল না? অমন আমতা-আমতা করছিস কেন?

—ইয়ে হয়েছে...আমি, মানে...আয়াম ইন-দ্য ডেভিল অব্ আ হোল। তুমি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারো? বেশি নয়, এই ধরো...হাজার দুই...

পামেলার বলিরেখাঙ্কিত মুখখানা থেকে সেই স্বর্গীয় জ্যোতিটা মিলিয়ে গেল। যেমনভাবে মিলিয়ে যায় ধূপের ধোয়া। না, উপমাটা ঠিক হলো না। ধূপের ধোয়া মিলিয়ে যাবার পরেও বাতাসে ভাসতে থাকে সৌরভের একটা রেশ। এক্ষেত্রে তা হলো না। নস্টালজিক অন্তরনুরাগে পামেলার স্নেহমতাববিক্ত অন্তরে যে অগুরুচন্দনের সৌগন্ধ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল তা যেন দপ কর শেষ হয়ে গেল। নিবাতনিকম্প দীপশিখার মতো স্বচ্ছ ভঙ্গিমায় তিনি সোজা হয়ে বসেই রইলেন। সুরেশ

ভাবান্তরটা লক্ষ্য করলো। বুঝলো, চিড়ে ভিজবে না, ভেজেনি। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে কোনক্রমে বললে, কই, কিছু তো বললে না, বড়পিসি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো পামেলার। বললেন, রাত হয়েছে সুরেশ। শূতে যাও।

তবু স্থান ত্যাগ করতে পারলো না সুরেশ। টাকা ক'টার সতিই ওর জরুরি দরকার। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বললো, যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলে যাওয়া দরকার, বড়পিসি। শুমু আমার স্বার্থে নয়, তোমার স্বার্থেও।

পামেলা ওর চোখের দিকে তাকালেন না। বললেন বলো?—‘বল’ নয়, বলো।

—কথাটা অপ্রিয়। তবু এটা তোমাকে জানিয়ে দেওয়াই মঙ্গল...

পামেলার কোন ভাবান্তর হলো না। না কৌতুহল, না অনাসক্তি।

—তোমার বয়স হয়েছে, তোমার শরীর দুর্বল। একা-একা থাকো। তুমি জানো, আমরাও জানি, তোমার অবর্তমানে আমরাই সব কিছু পাবো। আমরা তিনজন। তুমি একথাও জানো যে, আমাদের তিন জনের অবস্থাই খুব সসেমিরা। ছ-মাস বা এক বছর পরে যে আশীর্বাদ তুমি আমাদের দেবে, তা থেকে এখনই...

পামেলা একই সুরে বললেন, হয় বাকটা শেষ করো, নয় শূতে যাও সুরেশ।

এখনো তিনি সুরেশের দিকে তাকাননি। তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে শয্যার মাথার দিকের একটি কুলুঙ্গিতে। সুরেশ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। বললে, বুঝছো না কেন বড়পিসি? মরিয়া হয়ে গেলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। শেষে তোমার একটা ‘ভালমন্দ’ কিছু না হয়ে যায়। লোভে পাপ, পাশে ...

পামেলা এবার ভাইপোর দিকে ফিরলেন। চোখে-চোখে রেখে। বোধ করি এবার সুরেশ তার বাকটা যে অসমাপ্ত রাখেনি তা প্রনিধান করলেন বলেই। অতি পরিচিত প্রবাদবাক্যটি সমাপ্ত হবার অপেক্ষা রাখে না। পামেলা বললেন, তোমার সং পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, সুরেশ। ঠিক কথা, আমার বয়স হয়েছে, আমার শরীর দুর্বল! কিন্তু আমি সেকালের মানুষ। নিজেকে রক্ষা করতে জানি। এবার যাও তুমি, গুড নাইট।

সুরেশ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। তাঁর সোখ দুটো ছলে উঠলো। নিঃশব্দে তিনি দক্ষিণ হস্তটা প্রসারিত করে দিলেন। তর্জনী নির্দেশ করছে খোলা দরজাটা।

সুরেশ তার বড়পিসিকে চেনে। নিঃশব্দেই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।



পরদিন এপ্রিলের ছয় তারিখ সকালে সুরেশ যখন দ্বিতলে উঠে এসে টুকুর ঘরে টোকা দিল তার আগেই স্মৃতিটুকুর ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু তখনও সে শয্যা ত্যাগ করেনি। টুকুর ‘কাম ইন’ শব্দে সুরেশ ঘরে ঢুকল, বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

টুকুর পরনে একটা নীলরঙের ঢিলে-ঢালা সিঙ্কের নাইট। শূয়েই ছিল। চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে বললে, কী ব্যাপার? সাত সকালে?

—তোকে একটা কথা বলতে এলাম। কাল রাতেই এক দফা হয়ে গেল। চিড়ে ভিজলো না। বড়পিসি সোজা আমাকে দরজা দেখিয়ে দিল।

## কাটার-কাটার-২

—তুই বড় তাড়াহুড়া করিস সব কিছুতে।

—আমার উপায় ছিল না রে। ভেবেছিলাম, তোদের ওপর টেকা দেব। তুই বা হেনা মুখ খোলার আগেই। কেমন যেন মনে হল, প্রথম আবেদনটা বুড়ি শুনবে, তারপর ও সতর্ক হয়ে যাবে। কিছু বড়পিসি তৈরি হয়েই ছিল। ও জানে, কেন বছর বছর আমাদের দরদ উথলে ওঠে।

টুকু ঝিলঝিলিয়ে হেসে ওঠে।

—তুই হাসহিস যে, হেসে নে। তোকে যখন দরজা দেখিয়ে দেবে তখন হাসির পালা আসবে আমার। বুড়ি টাকার পাহাড় জমিয়েছে এর মধ্যে। পাঁচ-সাত লাখ হবেই। অথচ কী কল্পুস! মাজাতার আমলের মরিস মাইনর গাড়িখানা বেচে একটা ভাল গাড়িও কিনবে না।

টুকু বললে, ওরা বোঝে না রে সুরেশ। জীবনকে উপভোগ করতে ওরা জানে না। জানে না—একটাই জীবন, একটাই যৌবন! যে দিনটা গেল তা আর ফিরে আসবে না। পিসি যেন আশা করে বসে আছে, টাকার ষ্টুটিলা নিয়েই ও স্বর্গের পথে ইঁটা ধরবে।

—বুড়ির ভয়ভরও নেই রে। আমি কাল রাতে ওকে রীতিমতো শাসিয়েছিলাম...

—শাসিয়েছিলিস! মানে? বড়পিসিকে? কী বলে?

—বলেছিলাম, “তুমি দুর্বল মানুষ, একা-একা থাকো। তোমার কোন একটা ‘ভালমন্দ’ হয়ে গেলে...”

—ডাকাতি? তুই কি ভেবেছিল বড়পিসি তার টাকাকড়ি এখানে নগদে রেখেছে?

—না, তা নয়। আমি বলেছিলাম, “যারা তোমার ওয়ারিশ তাদের সকলেরই অবস্থা সঙ্গীন। মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে খুব বিপজ্জনক। তার চেয়ে আমাদের তিনজনকেই দু-শ হাজার এখনি যদি দিয়ে দাও...”

টুকু উঠে বসে খাটের ওপর। বলে, মাই গড! এই কথা তুই বলতে পারলি বড়পিসিকে?

—কথাটা তো মিথ্যে নয়, টুকু!

টুকু আবার শুরুর পড়ে। সুরেশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলি, তৈরি হয়ে নে। আমার তো হল না, তুই দ্যাখ চেষ্টা করে। উইশ যু অল সাক্সেস।

টুকু বললে, আমি অন্য দিক দিয়ে চেষ্টা করব। আমাকে বড়পিসি এক কানাকড়িও ঠেকাবে না, মানে বেঁচে থাকতে; কিন্তু নির্মলকে বুড়ি সাহায্য করলেও করতে পারে। নির্মল কী একটা আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছে। হাজার বিশেক টাকা হলেই ও সেই আবিষ্কারটা শেষ করতে পারে। পেটেন্ট নিতে পারে। বড়পিসি সেকালে মানুষ—জীবনকে উপভোগ করতে জানে না, কিন্তু বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করা ওদের পক্ষে সম্ভব।

সুরেশ বলে, হেনার কোন আশা নেই, কী বলিস?

—আমার তো বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া হেনা টাকা নিয়ে কী করবে। ও জানে না জীবনকে উপভোগ করতে। ও শুধু আমাকে নকল করে যায়—আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও সিকি দামে কিনে অনুকরণ করতে চায় শুধু।

সুরেশ বোনের কাছে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে এল।

ফ্রিসি বসেছিল সিঁড়ির নিচে। সুরেশকে নেমে আসতে দেখেই ডেকে উঠল, ঘো!

—কী ব্যাপার? তোমার আবার কী চাই?

ফ্রিসি তৎক্ষণাৎ চলে গেল হলঘরের ও প্রান্তে। সেখানে একটা চেস্ট-অব-ড্রয়ার্স। তার সামনে উঁচু হয়ে বসল। সুরেশ বুঝতে পারে—ঐ টেবিলের টানা-ড্রয়ারের ভিতর রাখা আছে রবারের বলটা। ফ্রিসি খেলতে চায়। সুরেশ এগিয়ে এসে উপরের ড্রয়ারটা টেনে খুললো।

চোখ দুটি বিক্ষারিত হয়ে উঠলো তার। উপরের ড্রয়ারে থাক দেওয়া একটা একশ টাকার নোটের বাড়িল।

সুরেশ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। না, কেউ নেই কাছে-পিঠে। কেউ ওকে নজর করছে না। নোটের বাস্তিলাটার পাশে পড়ে আছে ফ্লিসির রবারের বলটা। সুরেশ বলটাকে তুলে নিল। নিপুণ আঙুলে এই সঙ্গে তুলে নিল এক কেতা নোট। খান চার-পাঁচ। বাস্তিলের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কারও খেয়াল হবে না এত কম নিলে। নোটগুলো পকেটে রেখে বলটা ছুড়ে দিল ফ্লিসির দিকে। বেরিয়ে এল বাগানে।

সূর্যোদয় হয়েছে একটু আগে। তেরটা হয়ে শেষ বসন্তের রোদ এসে পড়েছে গাছ-গাছালিতে। প্রভাত পাখির কলরব এখনো থামেনি। বাতাসে কী-যেন একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ। সামনের লেনে দু'খানি বেতের চেয়ারে বসেছিলেন পামেলা আর ডক্টর ঠাকুর। ওদের কথোপকথন কানে আসছে। শ্রীতম বলছিল, না না, ওটা আপনি ভুল শুনছেন। মজঃফরপুরে প্র্যাকটিস গুটিয়ে নিয়ে কলকাতায় এসে বসবার কোন পরিকল্পনা নেই আমার। আমি শুধু মীনাকে কলকাতার কোনও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেবার কথা ভাবছি। ভাল হস্টেলে রেখে পড়াতে।

পামেলা বললেন, ভাল স্কুলে অ্যাডমিশন পাওয়া খুবই কঠিন। তাছাড়া হস্টেল...

—তা তো বটেই। তবে ঘটনাক্রমে একটা চান্স পাওয়া গেছে। আমার এক রিস্তাদার একটি ভাল গার্লস স্কুলের গভর্নিং বডিতে আছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর ইনফ্লুয়েন্সে মীনাকে ভর্তি করে নিতে পারবেন। হস্টেলেও সিট আছে—

—তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। তাই কর তোমরা। আমার এখানে তো ভাল স্কুল...

শ্রীতম ঠর বাঁকাটা শেষ করতে দিল না। বললে, মুশকিল কি বাৎ হচ্ছে এই যে, আমার রিস্তাদার বলছেন, এজন্য একটা হেভি ডোনেশন দিতে হবে। আই মিন...

সুরেশ এগিয়ে এলো। পামেলা চোখ তুলে চাইলেন। সুরেশ আলোচনাটার মোড় ঘুরিয়ে দিতে বলে বসলো, বড়পিসি, তোমাদের ব্রেকফাস্ট কটার সময়? আমার পেটে কিছু ইদুরে ডন দিতে শুরু করেছে!

পামেলা হেসে ফেলেন। বলেন, 'ফাস্ট' করলি কোথায় যে, 'ব্রেকফাস্ট' করবি? কাল রাত্রে ত গণ্ডপিতে গিলেছিস। এই তো ঘুম থেকে উঠলি। আচ্ছা, দেখছি আমি—

শ্রীতমের দিকে ফিরে বললেন, এক্সকিউজ মি—

পামেলা উঠে গেলেন ভিতর দিকে। শ্রীতম আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে দেখলো সুরেশের দিকে। সুরেশ খুশিয়াল—পিসিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। বড়পিসি হেসেছে। হয়তো কালকের সেই অপ্রিয় কথাগুলো মনে করে রাখেনি।

দ্বিতলের 'ওক-রুম'টি আকারে বড়। নাম শুনলে মনে হয় এটি বুঝি ওক কাঠের লগ-কেবিন। বাস্তবে ওক-কাঠের চিকুমাড় নেই। তবে পশ্চিমের দিকে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটা আরণ্যকদৃশ্য। খোদায় মালুম, তার ভিতর ওক গাছ আছে কিনা। সম্ভবত এ খয়ের ঐরকম বিচিত্র নামকরণ হয়েছে ভিন্ন কারণে। প্রাসাদটি যখন নির্মিত হয় তখন যোসেফ হালদার আর মেরী জনসন তাঁদের বৌবনকালের কোন একটি 'ওক-রুমের' স্মৃতিতে বিভোর ছিলেন। তাতেই এই নাম।

সে যাই হোক, এই ঘরখানাতে আশ্রয় পেয়েছিল শ্রীতম আর হেনা। দ্বিতলের পশ্চিমপ্রান্তের ঘর একটা। পূর্বপ্রান্তে গৃহমামিনীর কামরা। মাঝখানে সুরেশের 'সোলনা-ঘর', তারপর টুকুর ঘর আর পশ্চিমপ্রান্তে এই ওক রুম।

সেদিন রাত্রের কথা। হেনা ড্রেসিং টেবিলে নৈশ প্রসাধন সারছে। শ্রীতম তার প্যাট বদলে পায়জামা পরতে পরতে বললে, আমি মোটামুটি জমিটা তৈরী করে রেখেছি। এখন শেষ কিস্তি তুমি দেবে হনি।

হেনাকে শ্রীতম জনান্তিকে 'হনি' বলে ডাকে।

হেনা ব্রাউজটা খুলে রেখেছে। তাঁর উর্ধ্বাঙ্গে শুধু ব্রা। রাত্রে ও মাথায় কিছু বিচিত্র ক্রিপ লাগিয়ে শোয়—চুলটা তাতে স্মৃতিটুকুর চুলের মতো কোঁকড়ানো হয়ে যাবে। আয়নার দেখে দেখে ক্রিপ

## কাঁটার-কাঁটার-২

সাঁটছিল হেনা। একটু ইতস্তত করে বললে, ব্লীজ, আমাকে বোলো না। আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বড়মাসিকে টাকার কথা বলতে পারবো না।

প্রীতম সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে, কিন্তু তুমি তো নিজের জন্য চাইবে না, চাইবে মীনার জন্যে, রাকেশের জন্যে। তুমি তো জানই নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত শেয়ার বাজারে...

হেনা ঘুরে বসলো। প্রীতম তার চোখে-চোখে তাকাতে পারলো না। মাথার বিরাট পাগড়িটা খুলে চুলটা আঁচড়াতে থাকে। হেনা মিনতির সুরে বলে, বুঝছো না কেন? বড়মাসিকে বোঝা বড় শক্ত। সে কঞ্জু নয়, মাঝে মাঝে উপহারও দেয়, তা তুমি জানো; কিন্তু কেউ তার কাছে হাত পাতলে—

—ভিক্ষা তো নয়, ধার। আমরা ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

হেনা এ প্রসঙ্গ তুললো না যে, মজুমদারপুরের সংসারে তাদের নুন আনতে পান্ডা ফুরায়। বরং বললে, শোন; তুমি অন্য কোথা থেকে বরং টাকাটা ধার করার চেষ্টা কর। বড়মাসি দু'চোখ বুজলেই তো আমরা শোধ করে দিতে পারবো; সে আর কতদিন?

প্রীতমের কণ্ঠে এবার স্পষ্টই বিরক্তি, তুমি মাঝে মাঝে বড় অবুঝ হয়ে পড়, হেনা! মুখ ফুটে চাইতেই যদি না পারবে তাহলে এত খরচপাতি করে বিহার থেকে আমরা এলাম কেন? তোমার মাসির জন্মদিনে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু য়ু' গাইতে?

প্রীতম যে 'হেনার' বদলে ওকে 'হনি' ডাকছে না এটা খেয়াল করেছে সে। কিন্তু তবু সে জেদি মেয়ের মত বললে, আমি টাকা ধার চাইতে বাপের বাড়ি আসিনি।

—সে কথা আমিও বলছি না; কিন্তু এ কথা কি বলনি যে, আমাদের এই বিপদে তোমার আন্টিই শুধু আমাদের বাঁচাতে পারে? আর আমরা কিছু লাখ-বেলাখ টাকা ধার চাইছি না। স্ট্রেন খাউজেন্ট! তোমার বড়মাসির কারেন্ট অ্যাকাউন্টেই হয়তো সে টাকা পড়ে আছে। বিনা সুদে!

হেনার ক্রিপ আঁটা শেষ হয়েছিল। হাত-ব্যাগ খুলে সে বার করলো একটা হালকা রঙের সিল্কের নাইটি। ডিলে-ঢালা নয়, আঁটোসাঁটো। পাশের ঘরে যে নাইটি পরে অঘোর ঘুমে ঘুমোচ্ছে স্মৃতিটুকু হুবহু সেই রঙ; সেই মাপ। নাইটিটা মাথা দিয়ে গলিয়ে বললে, দেখাই যাক না। বড়মাসি হয়তো নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা তুলবে—মীনাকে ভর্তি করার কথাটা—

—আমার মনে হয় তার সভাবনা খুবই অল্প।

—রাকেশকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেই ভাল হত। চোখে দেখলে....কী ফুটফুটে হয়েছে ছেলেটা—

—তাতে লাভ হত খোড়াই! তোমার আন্টি ঝাজাঝাজা মানুষ। ছেলেপুলে একদম দেখতে পারে না।

হেনা একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে, ব্লীজ প্রীতম!

স্বামীকে নাম ধরেই ডাকে সে। এটাই ফ্যাশন। টুকু বিয়ে করলে নির্মলকে নিশ্চয়ই নাম ধরেই ডাকবে।

প্রীতম বলে, জানি হেনা, কথাটা তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু এটাই সত্যি কথা। তোমার মাসির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। টাকার কোনও প্রয়োজন নেই তাঁর। খরচ করছেন না, করতে জানেনও না। তবু যথের ধন আগলে বসে আছেন অনন্ত পরমায়ু নিয়ে। তিনি জানেন, তুমিও জানো আমিও জানি—বুড়ি চোখ বুজলেই এই মরকতকুঞ্জ সমেত সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক হবে তুমি। তাহলে আজই বা বুড়ি তা থেকে দশ-বিশ হাজার আমাদের ধার দেবে না কেন? না হয় তার উইল থেকে সে ক'হাজার কমিয়ে দিক...

হেনা সান্ত্বনাচানে বলে ওঠে, ব্লীজ প্রীতম! ওভাবে বল না! এবার আমি কিছুতেই টাকা ধার করার কথা ঠেকে বলতে পারবো না!

প্রীতম এক পা এগিয়ে আসে। হেনার কাঁধে একখানা হাত রাখে। বামের থাবা ঘেন। দুঃখের বলে, তুমি জান, শেষ পর্যন্ত আমার মতটাই তোমাকে চিরকাল মেনে নিতে হয়েছে। এবারও তাই হবে। হ্যাঁ, এবারও তাই করতে হবে তোমাকে। যা আদেশ করেছি আমি...

হেনা একেবারে ঝুঁকড়ে গেল।





এ ছয় তারিখেরই ঘটনা। সোমবার, রাত দশটা।

কাল পামেলার জন্মদিন, সাতই এপ্রিল। অতিথিরা যে ঘর ঘরে চলে গেছে। পামেলা তাঁর ঘিভলের ঘরে বসে নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে হিসাবের খাতায় সব কিছু লিখে নিচ্ছিলেন। সামনে একটা টুলে বসে আছে মিনতি। তার হাতে একটা নোট বই। কী কী খরচ হয়েছে তার হিসাব লেখা। গৃহস্থামিনী যোগটা শেষ করে বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকাটা তুলেছি সে টাকা কোথায় রেখেছ?

—নিচে হলঘরের ড্রয়ারে। যেখানে থাকে।

—না। টাকা-কড়ি অমন ছড়িয়ে রেখো না। হয় তোমার আলমারিতে রেখো, না হলে আমাকে রোজ দিয়ে যেও। বুঝলে?

মিনতি আদেশটা বুঝতে পারে, তার অন্তর্নিহিত বার্তাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তবে আদেশ তামিল করাতে সে অভ্যস্ত। বললে, আচ্ছা মা।

এবার গৃহস্থামিনী যা বললেন তাতে আদ্যোপাশ্চ গুলিয়ে গেল ওর। 'আচ্ছা মা'-ও জোগাগুলো না তার মুখে। এমন বিচিত্র কথা সে তার তিন বছরের চাকরি জীবনে কোনদিন শোনেনি। পামেলা বলছিলেন, কাল আমার জন্মদিন, মনে আছে নিন্দয়। কাল সকালে বুড়ো শিবতলায় আমার নামে বিশ টাকার পূজো দিয়ে আসবে। তোমরা সবাই বাবার প্রসাদ পেও—তুমি, মোহন, শান্তি, ছেদিলাল, সরযু, সবাই—মিনতিকে নিরুত্তর দেখে আবার বললেন, কী বললাম বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। না, মানে...আপনি তাহলে...ইয়ে, ঠাকুর-সেবতা মানেন?

—আমি যে মানি না, তা তুমি জান মিস্টি। কিছু এটা করলে তোমরা সবাই তৃপ্তি পাবে এটাও আমি জানি। এ বুড়ি পটল তুললে তোমাদের কিছু লাভ নেই, বরং চাকরি খোয়াবে—তাই তোমাদের আন্তরিক কামনাটা জোরদার করা আমার কর্তব্য।

কী নিদারুণ অভিমানে উনি কথাগুলো বললেন তা বুঝবার মতো মিনতির না ছিল বুদ্ধি না শিক্ষা। সে খুশিয়াল হয়ে ওঠে। কর্তী খেস্টান, তাঁর পরিচারকবৃন্দ অধিকাংশই হিন্দু। আগেকার দিন হলে খেস্টান-বাড়িতে অন্নগ্রহণ করায় ওদের সবার জাত যেতো। এখন দিন-কাল পালটেছে। জাত অত সহজে যায় না—এরকম আলোকপ্রাপ্ত শহরে।

মিনতি বললে, আপনার পেঁতায় হয় না, কিন্তু ঠাকুরমশাই সত্যিই পিচাশসিঙ্ক।

—কথাটা 'পিচাশ' নয়, 'পিশাচ'। তা তুমি কেমন করে জানলে?

—সেখিছি কিনা। প্ল্যানচেটে তিনি ভূত-প্রেত নামাতে পারেন। মানে ভূত ঠিক নয়, অশরীরী আত্মা সব। থারা একদিন এই আপনার-আমার মতো জীবিত ছিলেন।

প্ল্যানচেট ব্যাপারটা জানা ছিল পামেলার। প্রিয়জনরা একে একে বিদায় নেবার পর নিঃসঙ্গ পামেলা জনসন এককালে সেদিকে ঝুঁকেছিলেন। সরলা, কমলা, বিমলা অথবা বর-এর আত্মাকে নামিয়ে এনে এই মরকতকুঞ্জের নিভৃত কক্ষে দু-চারটে ভালবাসার কথা বলার প্রচেষ্টা। ইংরেজি বই এনে চেষ্টা করে দেখেছেন। কেউ কোনদিন আসেনি। বুকেছিলেন—এসব নেহাৎই বুজককি। বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ধান্দায় একজাতের সুযোগ-সজ্ঞানী এসব কথা প্রচার করে। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, আত্মীয়-স্বজনের নির্লজ্জ লোভশূভা দেখে তিনি হয়তো মনে মনে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েই ছিলেন। প্রশ্ন করেন, তুমি স্বচক্ষে দেখেছো?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

—সেখেছি মা। অনেক-অনেক বার।

—কী সেখেছ?

—ঠাকুরমশাই আর সতী-মা ঘর অঙ্ককার করে প্ল্যানচেট করেন। স্বর্গ থেকে এক এক দিন নেমে আসেন এক-একজন। ঠাকুরমশাই তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি জবাব দেন—

—মৌখিক জবাব?

—না। লিখে লিখে। আমি মিলিয়ে দেখেছি—সেসব কথা নিত্যস সত্য।

পামেলা যেন কী ভাবছেন। তাঁর দৃষ্টি একটি কুলুঙ্গিতে নিবদ্ধ। মিনতি সাহস পেয়ে বললো, গত মঙ্গলবারেই এসেছিলেন একজন। বিরাট পুরুষ। নামের আদ্য অক্ষরটুকু জানালেন তিনি—‘য’। ঠাকুরমশাই বলে না দিলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম তিনি কে—তিনি অনেক কথা বললেন, মেরীনগরের সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। আর একটা কথা বললেন যার মানে আমি তো ছার, ঠাকুরমশাই, নিজেও বুঝতে পারেননি। মনে হল উনি বললেন, ‘এক ঘরে বাবার ব্রহ্মতালুতে উকিলটা লুকিয়ে আছে!’

পামেলার কী যেন হলো। চট করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, রাত অনেক হল মিষ্টি। এবার আমি শোব। যাও, ঘরে যাও।

মিনতি শশব্যস্তে প্রস্থান করলো।

পামেলা প্রার্থনাস্ত্রে শয়ন করলেন তাঁর শয্যা। ঘুম এলো না কিছুতেই। এমন নিশ্রাহীন রাত্রি মাসে পাঁচ-সাতটা আসে। এতে উনি অভ্যস্ত। কিছুতেই ব্লিপিং পিল খাবেন না। বলেন, দুর্বল মানুষেরা ওসব খায়। দু’রাত্রি ঘুম না হলে মানুষ মরে যায় না। শরীরের নাম মহাশয়—বাকি দু’দিন বেশি ঘুমিয়ে শরীর তার পাওনাগুণা ঠিক পুষিয়ে নেবেই। এমন নিশ্রাহীন রাতে তিনি ঘাসের চটি পারে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান। এটা ঠিক করেন, ওটা সরিয়ে নাড়িয়ে দেন। পায়চারি করেন ক্রমাগত। তারপর ক্রান্ত শরীরে শেষ রাতের দিকে আপনিই ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ ঘুম না আসার অবশ্য খেঁচ কারণ আছে। আগামীকাল সেই তাঁর ক্লাস্তিকর জন্মদিন। ‘বাহাততুরে’ হবার শুল্ক। তাঁর মৃত্যুকামী একদল ‘ওয়ারিশ’-এর সেই বীভৎস গান—‘হাঙ্গী বার্থ ডে টু য়’ উপায় নেই, ভ্রমতার মুখোস এঁটে এ অভ্যাচার প্রতি বছর হয়েছেন, এবারও সেইবেন। কিছু মিষ্টি ওটা কী বলল?

‘এক-ঘরে-বাবার ব্রহ্মতালুতে—ওটা কি ‘একঘরের’ বদলে ‘ওক ঘরে’? ‘উকিল’টা কি ‘উইল’টা?

অনেক-অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল পামেলার। যোসেফের মৃত্যুর পর তাঁর কোনও উইল খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ তাঁর অ্যাটর্নি বলেছিলেন, যোসেফ একটি উইল করে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও ওঁরা ক-ভাইবোন সেই কাগজখানি উদ্ধার করতে পারেননি। তাতে অবশ্য প্রবেশ পেতে অসুবিধা হয়নি কিছু। ওঁরা কয়জনই ছিলেন আইনানুগ ওয়ারিশ। আর কোনও দাবিদার এসে উপস্থিত হয়নি মৃত যোসেফ হালদারের সম্পত্তি দাবি করে।

তার প্রায় দশ বছর পরে পামেলা উইলখানি খুঁজে পান। সম্মানসেরই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যোসেফ হালদার। ততদিনে সরলো গত। কিছু সেই উইলখানি খুঁজে পেয়েছিলেন এক বিচিত্র স্থান থেকে। ওক-ক্রমে ঠাকুরদার ছবিখানি পেড়ে নামিয়ে ঝাড়পোছ করতে গিয়ে দেখলেন অয়েল-পেটিংয়ের শিখনে একটা গুপ্ত বোতাম। সেটা টিপতেই একটা ছোট কুলঙ্গির পাল্লা খুলে গেল। আশ্চর্য। তার ভিতর যোসেফের একটি ডায়েরি, কিছু গিনি আর তাঁর স্বহস্তে লেখা উইল!

এই বিচিত্র ঘটনার কথা বুড়ো শিবতলার পুজারী ঠাকুরমশায়ের জানার কথা নয়। তাহলে কী ভাবে ঐ কথাটা লেখা হল প্ল্যানচেট কাগজে ‘এক ঘরে বাবার ব্রহ্মতালুতে...’

উঠে পড়লেন উনি। গায়ে একটা গাউন জড়িয়ে নিলেন—যদিও গরম পড়তে শুরু করেছে। পারে গলিয়ে নিলেন ঘাসের চটি-জোড়া। ওর হঠাৎ ইচ্ছা হল নিচের ঘরে বাবার অয়েল পেটিংয়ের সামনে

গিয়ে দাঁড়াবেন। নিঃশব্দে দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। স্তিমিত একটা বাষ্প জ্বলছে। এটা সারারাতই জ্বলে। নিচেও একটা লাইট জ্বলছে। মিনতি এ দুটো রাতে নেবায় না। সে জানে, মাসের মধ্যে পাচ-সাতদিন ঐ বৃদ্ধা নিঃশব্দে অবসর যাপন করেন অশান্ত পদচারণে।

উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন রেলিঙটা ধরবেন বলে, আর ঠিক তখনই... কার্যকারণসূত্র বোঝা গেল না, মনে হল তিনি শূন্যে ভাসছেন! দু-হাত বাড়িয়ে রেলিঙটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন... পারলেন না... উণ্টে পড়লেন সিঁড়ির ধাপে... গড়গড়িয়ে নিচের দিকে।

তার চিৎকারে এবং পতনজনিত শব্দে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। হয়তো অনেকে জেগেই ছিল—রাত সাড়ে দশটাও হয়নি। মুহূর্তমধ্যে সবাই ছুটে এল অকুস্থলে।

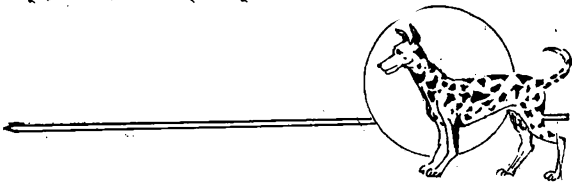
পামেলা জ্ঞান হারাননি। কিন্তু সর্বাস্থে তীব্র বেদনা! সিঁড়ির শেষ ধাপে পড়ে আছেন তিনি। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মুখ। মিনতি দু-হাত উৎক্লিষ্ট করে মড়াকান্না শুরু করেছে—তার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না।... টুকুর পরনে একটা নীল সিল্কের কী যেন... হেনার মাথায় একগাদ্য কী যেন... চোতনের শেষ প্রান্ত থেকে বৃদ্ধা শুনতে পেলেন সুরেশের কঠবর। সে একটা লাল বল উচু করে সবাইকে দেখাচ্ছে। বলছে, গ্লিসি হতভাগার কাণ্ড! এই দেখ বলটা! সিঁড়ির মাথায় পড়েছিল সেটা... বড়পিসি তাতে পা দিয়েই...

না, তখনও জ্ঞান হারাননি-উনি। এবার শুনতে পেলেন একটি আশ্চর্যতরঙ্গী কঠবর—তোমরা সবাই সরে দাঁড়াও। আমাকে দেখতে দাও।

ডক্টর প্রীতম ঠাকুর।

পামেলা আশ্চর্য হলেন সেই কঠবরে। প্রীতম পরীক্ষা করে বলল, মনে হয় হাড়টাড় ভাঙেনি। জ্ঞান আছে এখনো।

দু-হাতে পাজাকোলা করে বৃদ্ধাকে তুলে নিল সে।



ওরা কৈনও ঘুমের ঔষধ ঠেকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছিল কিনা জানেন না। টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা উনি অঁকোরে ঘুমিয়েছেন। তারপর আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল একটা পরিচিত শব্দে:

বৌ-বৌ নয়, কুই-কুই।

চোখ দুটি খুলে গেল বৃদ্ধার। লক্ষ্য হল পাশেই বসে আছে মিনতি। বসে বসেই ঘুমাচ্ছিল সে বাড় গুঁজে। গ্লিসির কুই-কুইটা তারও কানে গেছে। চট করে উঠে দাঁড়ালো সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই সদর-সরজা খোলার শব্দ। তারপর মিনতির চাপা কঠবর : হতভাগা! বাদর। কত্রীর এখন-তখন, আর তুই সারারাত পাড়া বেড়াচ্ছিল।

পামেলার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা; কিন্তু তার মস্তিষ্ক ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। গুর মনে পড়ে গেল—মাসের মধ্যে পাচ-সাত দিন তিনি নিজে যেমন নৈশবিহার করে থাকেন, তেমনই গ্লিসিও করে। তফাৎ এই, উনি নৈশবিহার সাজেন মরকতকুঞ্জের ভিতরে, গ্লিসি বাইরে। তফাৎ এই, গৃহকত্রী সে অন্য আদৌ লজ্জিতা নন, গ্লিসি সলজ্জ!

## কাটার-কাটার-২

এতক্ষণে বন্ধার মনে পড়লো—দুর্ঘটনার পর থেকে কিসের যেন একটা অভাব বোধ করছিলেন তিনি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বাড়িগৃহ সবাই জড়ো হয়েছিল, কিন্তু একটা অতি পরিচিত সারমেয় গরজন তিনি শুনতে পাননি। তার মানে ফ্লিসি বাড়িতে ছিল না। থাকলে, সবার আগে সেই পাড়া মাথায তুলতো!

কিছু! তা কেমন করে হয়? বলটা তাহলে কেমন করে...

মনে পড়ে গেল সুরেশের কথাটা। উনি সিড়ির নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন আর সুরেশ রবারের বলটা উচু করে দেখিয়ে বলছে, এইটার জন্যেই বড়পিসির পা হড়কেছিল।

তাই কী?

সেই খণ্ডমুহূর্তের কথাটা মনে করতে চেষ্টা করলেন পামেলা। পতনের পূর্বমুহূর্তটা। না, পায়ের তলায় নরম রবারের বলটার কোন স্পর্শের স্মৃতি তাঁর নেই। তাহলে হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন কী করে? কেন? না, পিছন থেকে কেউ তাঁকে ঠেলা দেয়নি। দ্বিসীমানায় তখন কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। না, পায়ের তলায় রবারের বলটাও ছিল না। তাহলে?

ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য!

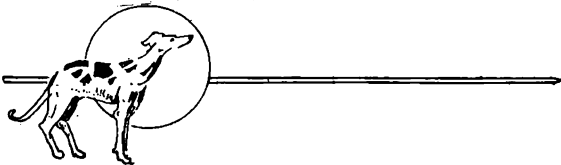
গুরু স্পষ্ট মনে আছে, রাতে সাইমাশের পর, সবাই যে যার ঘরে চলে যাবার পর তিনি আর মিনতি দোতলায় উঠে আসেন। সরষু ঐটো বাসনগুলো সরিয়ে টেবিলটা যখন সাফা করছে তখনো তিনি নিচে হুলাঘরে। গুরু স্পষ্ট মনে আছে, সরষু চলে যাবার পর মিনতি সদর বন্ধ করলো। গুরা দুজনে দোতলায় উঠে এলেন। তখন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গুরু নজরে পড়েছিল রবারের বলটা সিঁড়ির নিচে পড়ে আছে। নিচে অর্থাৎ দোতলায় নয়। ঠিক মনে পড়েছে না, উনি কি মিস্টিকে বললেন বলটা সরিয়ে রাখতে? নাকি বলবেন ডেবেছিলেন? বলেননি? সে যাই হোক, বলটা উপরে উঠে এল কীকরে? ফ্লিসি মুখে করে আনতে পারে না; কারণ তার আগেই রাতের মতো সদর দরজা বন্ধ হয়েছে। ফ্লিসি নিশ্চয়ই তার আগেই বেরিয়ে গেছে। এই শেষ রাতে ফিরলো! তাহলে কে বলটাকে উপরে নিয়ে এসেছিল। আসৌ এসেছিল কি?

না আসেনি। সুরেশের ডিডাকশানটা ভুল। পতনজনিত দুর্ঘটনার হেতু ঐ রবারের বলটা নয়। বল নয়, কলার খোসা নয়, পিছন থেকে ঠেলাও কেউ দেয়নি; তাঁর মাথাও ঘুরে ওঠেনি—তাহলে তিনি পড়ে গেছেন কী করে? কেন?

হঠাৎ একটা নিরতিশয় আতঙ্কের আভাস পেলেন যেন। আতঙ্কেরই শূন্য নয়, নিরতিশয় গ্লানির, লজ্জার।

তাই কি?

না, এখন নয়। এখন তাঁর স্নায়ু দুর্বল। শরীর অবশ। কিছু কথাটা ভুললেও চলাবে না। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে তাঁকে। সুসময়ে। একটু সামলে উঠেই!



সতেরই এপ্রিল। দশটা দিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে।

বাড়ি ফাঁকা। সবাই চলে গেছে যে যার পরিচিত গতিতে।

এবার এই বাহাস্তরের ঘাটে এসে ঠেকে আর সেই ক্লাস্তিকর ঘ্যানঘ্যানটা শুনতে হয়নি: হ্যাপি বার্থডে টু য়! অনিমিত্তিত এসেছিলেন দু'জন। শূভেচ্ছা জানাতে। পিটার দন্ত আর উবা বিশ্বাস। জন্মদিনের সন্ধ্যায় তিনি শয্যাশায়ী।

ওরা চারজনই—সুরেশ, টুকু, হেনা আর প্রীতম মরকতকুঞ্জে থেকে যেতে চেয়েছিল। সেবা-শুশ্রূষা করতে। গৃহকর্ত্রী সম্মত হননি। সবিনয়ে কিছু দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বাড়ির যেন ভদ্রলোকের এককথা: চিরটা কাল একলা-একলা কাটিয়েছি। ফাঁকা বাড়ি না হলে আমি শান্তি পাব না। আসিস, তোরা আবার আসিস, কিন্তু তার আগে আমাকে একটু সামলে নিতে দে।

অতিথিরা বিদায় হবার পর প্রথম কয়েকটা দিন পামেলা শুধু চিন্তা করেছেন। ডক্টর পিটার দন্ত ঠেকে বারণ করেছেন চিন্তা করতে, বলেছেন, মনটা প্রফুল্ল রাখতে। কারণ ইতিমধ্যে ঠর রক্তচাপটা—যেটা এতদিন কোনও বেয়াড়াপানা করেনি—নানারকম অব্যাহতা শূক করেছে। ডাক্তার দন্তের সঙ্গে ঠর সম্পর্কটা একটু অন্য ধরনের। দু'জনেরই সন্তরের ওপরে, দু'জনে দু'জনকে চেনেন পঞ্চাশ-ষাট বছর। ডাক্তার দন্তের চোখে যুবতী পামেলার সেই মোহিনী মুর্তিটা আজও মুছে যায়নি। তিনি বাল্যবান্ধবীকে নাম ধরেই ডাকতেন। বলেছিলেন, এগারোটা সিঁড়ির ধাপ গড়িয়ে পড়লে আর একখানাও হাড় ভাঙতে পারলে না পামেলা, ইটস শিয়ার ডিসগ্রেস! আশ্বাস দিতেন, কিছু হয়নি তোমার। পরের সপ্তাহেই আবার নিচে নামবে তুমি, আগেকার মতো আমাকে নেমস্তম্ব করে নিজে হাতে বানানো পাম-কেক খাওয়াবে।

ঠর অসুখটা এবার সারছে না শুধু ঐ দৃষ্টিস্তায়। ঘটনার পারস্পর্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিদিনই উবা বিশ্বাস এসে দেখা করে গেছেন, ফুলের তোড়া হাতে। ঠেকেও কিছু মন খুলে বলতে পারেননি। একথা কি মন খুলে বলার? তবে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজ সকালেই। কলকাতায় ঠর অ্যাটর্নি প্রবীর চক্রবর্তীকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করছেন, দু'চারদিনের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। কিন্তু তাতে ভবিষ্যৎকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অতীতটা উদ্ঘাটিত হবে না। অথচ বিগত ঘটনার রহস্যজ্ঞালটা ভেদ করতে না পারলে তিনি যে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছেন না। কেমন করে এমনটা হল? একতলা থেকে কী ভাবে রবারের বলটা দেতলায় উঠে গেল? যদি না গিয়ে থাকে—যায়নি বলেই তাঁর ধারণা, কারণ সেই বিশেষ খণ্ড-মুহুর্তে পায়ের তলায় একটা নরম রবারের বলের স্পর্শটাকে কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছিলেন না তিনি। তার একমাত্র অনুসন্ধান্ত...

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। অসতর্ক মুহুর্তে বলে উঠলেন: জগদানন্দ সেন।

মিনতি শুয়ে ছিল মাটিতে মাদুর পেতে। উঠে বসে বললে, কিছু বললেন মা?

—হ্যাঁ, আমার চিঠি লেখার সরঞ্জামটা নিয়ে এসো তো মিনতি। আর ঐ সঙ্গে টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা।

একটু পরেই ফিরে এল মিনতি হুকুম তামিল করে।

হাত বাড়িয়ে সব কিছু নিলেন। কিন্তু আবার নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন যেন। ঠর মনে পড়ে গেছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের জগদানন্দ সেন পরলোকগমন করেছেন। জগদানন্দই ঠকে বলেছিলেন সেই বিচিত্র বিচক্ষণ ব্যারিস্টারটির কথা। ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল। যিনি জগদানন্দের কেসটা জিতিয়ে দিয়েছিলেন, ফাঁসীর আসামী জগদানন্দকে মুক্ত করেছিলেন এবং কে তাঁর ভাইপো যোগানন্দকে হত্যা করেছিল তা খুঁজে বার করেছিলেন! তার চেয়েও বড় কথা, জগদানন্দের কী একটা পারিবারিক অত্যন্ত গোপন সমস্যা এমনভাবে সমাধান করেছিলেন যাতে-কেউ কিছু জানতে পারেনি। কী যেন নাম ব্যারিস্টারটির? কিছুতেই মনে পড়ল না। জগদানন্দের বাড়িতে টেলিফোন আছে, হয়তো জগদানন্দের নাতনিকে টেলিফোনে পাওয়া যায় কিন্তু মরকতকুঞ্জে টেলিফোন রাখা আছে একতলার হল-ঘরে। উনি প্রায় উখানশক্তি-রহিত। মিনতির দ্বারা একাজ হবে না। নাঃ! নামটা ঠকে মনে

## কাঁটার-কাঁটার-২

করতে হবেই। আপাতত মিনতিকে বললেন, থাক, এখন চিঠি লিখবো না। এগুলো রেখে এসো।

মিনতি হুকুমের চাকর। আবার সেসব সরঞ্জাম রেখে এল নিচের ঘরে। হয়তো এখনি কত্ৰী আবার চিঠি লিখতে চাইবেন, তাহলেও জায়গার জিনিস জায়গায় থাকবে, এই হচ্ছে মরকতকুঞ্জের আইন।

চিঠির সরঞ্জাম যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে মিনতি বললে, বই-উই পড়বেন? কোনও গল্পের বই এনে দেবো?

—লাইব্রেরি থেকে কিছু বই এনেছো? কই দেখি?

—হ্যাঁ, মা, এনেছি। আপনি যেগুলোর নাম লিখে দিয়েছিলেন তার একখানাও পাইনি। দাশুবাবু নিজে থেকেই এই গোয়েন্দা গল্পের বইটা দিল। বললে, খুব জমাটি বই।

—দাশু তো বলবেই। ও শুমু গোয়েন্দা গল্পের বইই পড়ে। কী নাম বইটার?

—দাঁড়ান, এনে দেখাই। আমার ঘরে আছে। ‘কিসের কাঁটা’ যেন— পি. কে. বাসু গোয়েন্দা সিরিজের...

—দ্যাটস্ ইট! —প্রায় লাফিয়ে উঠে বসেন পামেলা জনসন।

মিনতি চমকে ওঠে। সে নিজে গোয়েন্দা বইয়ের পোকা। কিন্তু কত্ৰী ডিটেকটিভ বই কদাচিৎ পড়েন। লাইব্রেরিয়ান দাশুবাবু প্রায় জোর করেই এ বইখানা গছিয়ে দিয়েছে। বলেছে, নিয়ে যান, আপনার তো ভাল লাগবেই, ম্যাডামেরও দারুণ লাগবে।

মেরীনগরে অনেকে পামেলা জনসনকে ‘ম্যাডাম’ বলে।

মিনতি বলে, নিয়ে আসি তাহলে?

—শ্যিওর! শূভস্য শীঘ্রং। এখনই বখেড়া চুকিয়ে দিতে চাই।

মিনতি ধাঁচেক পরে মিনতি নিজের ঘর থেকে লাইব্রেরির বইটা নিয়ে এল। তার মাঝামাঝি পড়া শেষ হয়েছিল। কিন্তু কত্ৰী যখন ‘দ্যাটস্ ইট’ বলে অমন লাফিয়ে উঠেছেন, তখন তিনিই আগে পড়ুন। বইখানা নিয়ে সে ফিরে এলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন পামেলা।

—এ কী? ইডিয়ট! বইটা নিয়ে আসতে কে বললো তোমাকে? আমার চিঠি লেখার প্যাডটা চাইলাম না আমি? প্যাড, কলম, কুইক!

মিনতি কোনক্রমে সামলে নেয় নিজেকে। আবার নিচে যেতে হয় তাকে। নিয়ে আসতে হয় লেখার সরঞ্জাম। হাত বাড়িয়ে সেগুলি গ্রহণ করে পামেলা বলেন, তোমার ঐ গোয়েন্দা গল্পের বইটার মাঝখানে একটা ‘চুলের-কাঁটা’ গোঁজা আছে। তার মানে তুমি ওটা আখাআখি পড়েছো! কারেন্ট?

মিনতি স্বীকার করে।

—দ্যাটস্ অল রাইট। বইটা নিয়ে যাও। ঘটনাক্রমে পরে আমার হরলিগটা নিয়ে এস। আর শোন, এই এক ঘটনার মধ্যে কেউ যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে। বুঝলে?

ষাড় নেড়ে সায় দিয়ে মিনতি চলে যাচ্ছিল। তাকে ফিরে ডাকলেন আবার : শোন।

মিনতি আবার এসে নতুনত্রে দাঁড়ায়, আদেশের অপেক্ষায়।

—এখনি তোমাকে গালমন্দ করেছি বলে রাগ করনি তো?

মিনতি লজ্জা পায়। মাথা নেড়ে জানায়—সে কিছু মনে করেনি।

—দ্যাটস্ আ গুড গোর্ল! বকে কে? বকে মা! কারণ মা ভালবাসে। নয় কি? যাও।

নিঃশেষে নিষ্কান্ত হয় মিনতি মাইতি। পামেলার কথটা তার মনে লাগে। কত্ৰী মাঝে মাঝে বেকিয়ে ওঠেন বটে; কিন্তু মনটা তাঁর সাদা। মিনতিকে ভালও বাসেন। ভালবাসা জিনিসটা মিনতি বড় একটা পায়নি। তিন কুলে তার কেউ নেই। শৈশবেই বাপ-মাকে হারিয়েছে। থাকার মধ্যে আছে এক খুড়তুতো দাদা—সে তো খোজ খবরই নেয় না। সৌভাগ্যই বলতে হবে—ঝি-গিরি করতে হচ্ছে না তাকে! ভদ্রঘরের মেয়েটিকে কত্ৰী একটা সম্মানজনক উপাধি পর্বস্ত দিয়েছেন: মিস্টি গুর ‘সহচরী’।

লেটার-প্যাডটা টেনে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানি লিখতে বসেন এবার। নামটা নিতান্ত ঘটনাচক্রে মনে

পড়ে গেছে ঠর: বাসু, প্রসন্নকুমার, বার-আট-ল। টেলিফোন গাইড খুলে তার নিউ আলিপুরের ঠিকানাটাও পেয়ে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল ড্রাফটটা ছকতে। অনেক কাটাকুটির পর মনে হল বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়েছে। এবার ধরে ধরে ফেয়ার কপি তৈরি করলেন। চিঠির মাথায় তারিখ বসালেন: 17.4.70। প্রথম ড্রাফটটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন এবার। একটি খাম বের করে চিঠিখানা ভরালেন, নাম ঠিকানা লিখে টিকিট স্টালেন। খামটা বন্ধ করে ঘড়িটা একবার দেখলেন। মিনতির হরলিঙ্গ নিয়ে আসার সময় হয়েছে। না, মিনতি মাইতির হাতে চিঠিখানা ডাক বাস্কে ফেলতে পারানো যাবে না। মিনতি গোয়েন্দা গল্পের পোকা। তাকে জানানো চলবে না—ব্যারিস্টার পি.কে.বাসুকে তিনি একটি চিঠি লিখছেন। বিকালোসরষ যখন ঘর মুছতে আসবে তখন তার হাতে চিঠিখানা ডাকে পাঠাবেন বলং। আপাতত ওটা তোষকের নিচে লুকানো থাক।



এতক্ষণে আমরা আবার সেই উনত্রিশে জুন তারিখে ফিরে যেতে পারি। অর্থাৎ সেই যেদিন বাসু-সাহেব মিস্ পামেলা জনসনের চিঠিখানি পেলেন।

জাগুলিয়ার মোড় পার হয়ে আমাদের গাড়িটা যখন মেরীনগরের খোয়া-বাঁধানো সড়কে এসে পড়ল তখন বেলা এগারোটো। পাকা রাস্তা থেকে এই খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় মাইল-খানের ভিতরে মেরীনগরের বসতি। বাসু-সাহেব পথ-চলতি একজনকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন ‘মরকতকুঞ্জ’টা কোন দিকে।

গায়ে ফতুয়া, চোখে নিচকলের চশমা, লোকটা সোজা কথায় জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলো: ‘আপনারা?’

এটাই-রওয়াজ। সর্বকালে। সে আমলে এর জবাবে বহিরাগতরা গ্রামবাসীকে জানাতো: ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা... অর্থাৎ, নিজের জাত। নাম বা নিবাসের প্রশ্ন পরে আসতো। এ যুগে ঐ প্রশ্নটির জবাবে বহিরাগতকে বলতে হয়: কংগ্রেস, সি.পি.এম. অর্থাৎ, ...নিজের জাত। নাম বা নিবাসের প্রশ্ন পরে আসবে।

বাসু-সাহেব কোন জবাব দেবার বদলে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিলেন।

বস্তুত ‘মরকতকুঞ্জ’টা ঝুঞ্জে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। মেরীনগরে সেটা আগার তাজমহল।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে দূর থেকে নজর হল—ঘিতলের জানালাগুলি বন্ধ। লাল ইটের টাক-পয়েন্টিং করা প্রকাণ্ড প্রাসাদ—দুর্গ যেন। বাগানটা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা। গোট তালারন্ধ। সেখানে একটি নোটিস বোর্ড—বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে: এই বাড়ি বিক্রয় করা হইবে।

নোটিসে কলকাতার একটি নামকরা রিয়াল এস্টেট এজেন্টের নাম লেখা আছে এবং তারপরের লাইনে: ‘স্থানীয় ক্রেতার মেরীনগরের অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরসের ব্রীডবান্দ দস্তের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারেন।’

সেই স্থানীয় দালালটির টেলিফোন নম্বরও লেখা আছে।

তখনই অন্তরীক থেকে দ্রুত হল এক সারমেয় গর্জন। অচিরেই আবির্ভাব ঘটল তার—কাঁটাতারের ওপারে। সাদা ধবধবে একটা স্পিঞ্জ। তবে অনেকদিন তাকে স্নান করানো হয়নি বলে গায়ের রঙটা ধূসর হয়ে গেছে। কাঁটাতারের এপারে আমরা, ওপারে সে। আমাদের কথা সে কোনেই তুললো না। এক নাগাড়ে বলে গেল, কে বট তোমরা? কী চাও? এগিয়ে এসো না কাছ?

## কাটায়-কাটায়-২

ত্রিসীমানায় লোকজন নজরে পড়ল না! মনে হলো বাড়িতে কেউ নেই।

বললুম, এবার কী করবেন? কিছুই তো নজরে পড়ছে না।

—একেবারে কিছুই পাইনি বল'না কৌশিক। অন্তত 'সারমের'কে পেয়েছি, তার 'গেথু'—এর দেখা না পেলেও। চল, দেখা যাক অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরসটা কোথায়।

গির্জাটা গণ্ডগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে ঘিরে কিছু দোকানপাট। অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরসও যুঁজে পেতে খুব কিছু অসুবিধা হল না। মনিহারি দোকান। বোধ করি মালিক জমি-বাড়ির দালালিও করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত মালিক অনুপস্থিত। দোকানে বসেছিল সতের-আঠারো বছরের একটি ছোকরা। স্পোর্টস গেম্জি, চোভা প্যান্ট। খন্দেরপাতি ত্রিসীমানায় নেই। হুদ হয়ে সে একখানা সিনেমা পত্রিকা পড়ছিল।

বাসু-সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন, ভবানন্দবাবু আছেন?

ছেলেটি মুখ তুলে তাকিয়েও দেখল না। বললে, না।

—কোথায় গেছেন তিনি? কখন ফিরবেন?

—জামে।

—আজ্ঞা, দত্ত তোমার কে হন?

এতকণ্ঠে ছেলেটি মুখ তুলে তাকায়। প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বলুন তো? সে খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার আগেই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বইটা উন্ড করে কাউন্টারের উপর রেখে ও এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, “হ্যালো!..না নেই...জামে, আই মীন, কখন ফিরবেন বলতে পারছি না...কী বললেন?...সেসব বাবা জানে...হ্যাঁ বলবো, ফিরে এলে আপনাকে ফোন করতে বলবো? কী? কে.পি.চ্যাটার্জী? হ্যাঁ! কে.পি.চ্যাটার্জী, শুনছি। কত নম্বর?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, 46-5126! গুণ্য? 47? ও, আচ্ছা 47-2156! ফাইভ-সিক্স নয়, সিক্স-ফাইভ? অল রাইট? 47-2165! ...না, না লিখে নেবার দরকার নেই, আমার মনে থাকবে। থ্যাঙ্কু। বলবো।”

টেলিফোনটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললো, কী বলছিলেন যেন?।

—মরকতকুঞ্জ একটা নোটসে বলা হয়েছে যে, ভবানন্দ দত্ত মশাই...

—ও! মরকতকুঞ্জ! কিছু বাবা তো নেই। আপনারা ওবেলা আসবেন।

বাসু-সাহেব জানালেন যে, ঐ বাড়িটা কিনবার ইচ্ছা নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এখানে থাকি না যে, ও-বেলায় আবার আসতে পারবো। জানতে চাইলেন, তুমি বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?

—আমি? মরকতকুঞ্জ? হ্যাঁ, শুনছি ওটা বিক্রি হবে। তা সেসব কথা বাবা জানে। আপনারা ওবেলা আসবেন।

—তুমি কখনও ঐ বাড়িটার ভিতরে গিয়েছো? মালিকের নামটা জানো?

—আমি? মরকতকুঞ্জ? হ্যাঁ গিয়েছি—কতবার! কিন্তু সেসব কথা বাবা জানে। আপনারা বিকালবেলা আসবেন...

নিতান্ত সৌভাগ্য আমাদের, তখনই একটি সাইকেল চেপে এসে হাজির হলেন একজন শ্রীঢ় ভদ্রলোক। সাইকেলটা লক করে এগিয়ে এসে বললেন, কী চাই স্যার?

—আমরা ভবানন্দ দত্ত মশায়ের খোঁজে...

—আমিই। বলুন স্যার?

—মরকতকুঞ্জের সামনে একটা নোটস বোর্ড দেখলাম...

—হ্যাঁ, আসুন। ভিতরে আসুন। মাঝ-সড়কে দাঁড়িয়ে ওসব কথা আলোচনা করা যায় না।



দোকানের পিছনে আর একখানি ঘর আছে। ভদ্রলোক পথ দেখিয়ে সেখানে আমাদের বসালেন। গুদাম ঘরই। তবে খানতিনেক চেয়ার আছে, একটা চৌকিও। তিনি নিজে চৌকিতে উঠে বসলেন। বললেন, কলকাতা থেকে আসছেন নিশ্চয়? ঐ গাড়িতে?

—হ্যাঁ। আমরা শুনছি, এই মেরীনগরে একটা বেশ বড় বাড়ি বিক্রি হবার সম্ভাবনা আছে। মরকতকুঞ্জ। আপনি নাকি তার হক-হদিস সব জানেন...

—ঠিক কথা! শুধু 'মরকতকুঞ্জ' নয়, অনেকগুলি বাড়ির সন্ধান জানি আমি। কাঁচড়াপাড়ায়, হরিণঘাটায়, কল্যাণীতে। বিভিন্ন দামের, বিভিন্ন মাপের—

বাসু পাইপটা ধরালেন। বললেন, আমরা একটু নির্জনতা খুঁজছি। কাঁচড়াপাড়া বা কল্যাণীতেই যদি হবে, তবে খালি কলকাতা কী দোষ করল?

—ঠিক কথা, ঠিক কথা। সে হিসাবে 'মরকতকুঞ্জ' আইডিয়াল প্রপার্টি। তবে প্রকাণ্ড বাড়ি, সংলগ্ন জমিও অনেক। দামটা ন্যাচারলি বেশিই হবে—

—পছন্দ হলে দামে হয়তো আটকাবে না। 'প্রকাণ্ড' মানে কত বড়? ক-তলা বাড়ি? ক-খানা ঘর? ভদ্রলোক সে-কথার জবাব না দিয়ে হাঁকাড় পাড়লেন, খোকা, মরকতকুঞ্জের ফাইলটা নিয়ে আয় তো।

দোকান থেকে সেই ছোকরা একটা ফাইল এনে বাবাকে দিলো। একটা কাগজের টুকরো দেখে দেখে বলল, ইয়ে হয়েছে... একটু আগে কলকাতা থেকে সাম পি. কে. ব্যানার্জি তোমাকে ফোন করেছিলেন। কী একটা বায়নানামার ব্যাপারে।

ভবানন্দের হুঁ যুগল ঝুঁচকে গেল। বললেন, পি. কে. ব্যানার্জি? ঠিক চিনতে পারছি না তো! কোন জমির বায়নানামার?

—জামে। উনি গুঁর টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাকে রিং-ব্যাংক করতে : 45-6521.

ভবানন্দ একটা কাগজে নম্বরটা টুকে নিয়ে ফাইলটা খুলতে থাকেন। বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কলকাতার সাম মিস্টার কে. পি. চ্যাটার্জির একটা টেলিফোন আসার কথা ছিল কি?

অবাক হয়ে ভবানন্দ বলেন, হ্যাঁ, একটা বায়নানামার ব্যাপারে। আপনি কী করে জানলেন?

—সে কথা থাক। ফোনটা তাঁকেই করবেন। তাঁর নাম্বার বোধহয় 47-2165!

ভবানন্দ তাঁর 'খোকা'র দিকে তাকাতাই ছেলেটি স্টু করে আড়ালে সরে গেল। মরকতকুঞ্জের যাবতীয় তত্ত্ব-তালাশ লেখা আছে ফাইলে। দ্বিতল বাড়ি। কোন তলার ক'খানা ঘর, কত কত মাপের, সব খবর। আউট-হাউসের বিবরণ ও প্ল্যান। সংলগ্ন জমি—কাঁচড়াপাড়ার দিয়ে ঘেরা। তার পরিমাণ, মায় বড় জাতের গাছের লিস্ট।

বাসু-সাহেব পাকা হিসাবীর মতো সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে বললেন, গৃহকর্তা কি বাড়িটা আপাতত ভাড়া দিতে রাজি হবেন, মাস ছয়েকের জন্য? তাহলে এখানে বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা বোঝা যেত।

—আজ্ঞে না। ভাড়া দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। শ্রেফ বিক্রি।

—বাড়িটা কি বারে বারে হাতবদল হয়েছে?

—আসৌ না। একহাতেই বরাবর আছে। তৈরী করেছিলেন একজন বিলাতী কেতার বাঙালী ক্রিস্টিয়ান—যোসেফ হালদার—বস্তুত এই মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছেলে-মেয়েরাই থাকতো এখানে। চারটি মেয়ে, একটি ছেলে। একে একে সকলেই স্বর্গত হয়েছে। শেষ মালিক ছিলেন মিস্ পামেলা জনসন। তিনি গত হয়েছেন মাস দুয়েক আগে—

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন, ব্যাপারটা তো ঠিক বোধগম্য হল না দত্ত মশাই। যোসেফ হালদারের অবিবাহিতা মেয়ের নাম—মিস্ পামেলা জনসন?

## কীটায়-কীটায়-২

দত্ত মশাই হাসলেন, বললেন, আপনি যে উকিল-ব্যারিস্টারের মত সওয়াল-জবাব শূক করলেন মশাই। তবে হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। মিস্ পামেলা জনসনের মায়ের নাম ছিল মেরী জনসন। মায়ের উপাধিটাই গ্রহণ করেছিলেন ম্যাডাম পামেলা।

—সুখলাম। তা মিস্ পামেলা জনসনও তো গত হয়েছেন বলছেন। সেক্ষেত্রে বর্তমান মালিক কে?

—মিস মিনতি মাইতি।

—আই সি। তিনি পামেলার বোনঝি না ভাইঝি? না, ভাইঝি হলে মাইতি হত না।

—দুটোর একটাও নয়। তিনি ছিলেন পামেলার 'সহচরী'—ইংরেজি কেতায় যাকে বলে 'কম্পানিয়ান'। তাঁকেই বাড়িটা দিয়ে গেছেন ম্যাডাম। এখন সেই মিনতি মাইতিই ঐ প্রপাটির মালিক। সমস্ত সম্পত্তি ঐ সহচরীকেই দিয়ে গেছেন মিস্ পামেলা জনসন।

—সুকেছি। পামেলার কোন ভাইপো-ভাইঝি অথবা বোনপো-বোনঝি ছিল না।

—না, তা নয়, ছিল। কিন্তু তাদের কাউকেই উনি প্রপাটিটা দিয়ে যাননি। উইল করে সব কিছুই দিয়ে গেছেন ঐ সহচরীকে।

বাসু বৈকে বসলেন এবার। আমরা যদি প্রপাটিটা কিনি সেই আত্মীয়-স্বজনেরা আবার মামলা-মোকদ্দমা করবে না তো?

—মাফ করবেন স্যার। এবার কিছু আপনার এ-কথাটা উকিলের মতো হল না। মিনতি মাইতি প্রবেট নিয়েছে। মালিক বনেছে। এখন যদি সে সম্পত্তিটা রেজিস্ট্রি করে বিক্রয় করে তাহলে কে বাধা দিতে আসবে?

—আমরা বাড়িটা একবার দেখতে যেতে পারি?

—পারেন। অবশ্যই পারেন। এখনই দেখতে যাবেন, না লাঙ্কের পরে?

—বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, লাঙ্কের সময় হয়ে গেছে। দুটি খেয়ে নিই কোথাও। ধরুন আমরা যদি আড়াইটে নাগাদ দেখতে যাই?

—তাই যাবেন। ও বাড়িতে টেলিফোন আছে। আমি খবর দিয়ে রাখছি। মিনতি মাইতি অবশ্য কলকাতায়, কিছু চাকর-বাকরেরা আছে। তারাই ঘুরিয়ে দেখাবে। আপনারা কোথায় লাঙ্ক সারবেন?

—আপনি স্থানীয় লোক। সাজেস্ট করুন।

—মেরীনগরে সবচেয়ে ভাল হোটেল: 'সুতৃপ্তি'—ঐ সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলি কি, কাঁচড়াপাড়ায় চলে যান। এটুকু পেট্রল পোড়ানো সার্থক হবে। 'সুতৃপ্তি'তে আর যাই পান, তৃপ্তি পাবেন না।

বাসু জানতে চাইলেন, মরকতকুঞ্জের দামটা কত হতে পারে আন্দাজ দিতে পারেন?

—ডুবানন্দ প্রায় কানে কানে বললেন, দু-দুটি পার্টি ইতিমধ্যেই বাড়িটা দেখে গেছেন—একজন রিটার্ডার্ড বিগ্রেডিয়ার, একজন রিটার্ডার্ড জজ। দুজনেরই পছন্দ হয়েছে। যে কোন একজন দর দিলেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাবে কিছু। গোপনে বলি, মিনতি মাইতি বাড়িটা কেড়ে দেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বেশি দরদাম করবে বলে মনে হয় না। তাই আমার পরামর্শ, পছন্দ হলে একটা 'অফার' দিয়ে যান। মিনিমাম 'অফার'ই দেনেন, একটু দরদাম করে—সেই যাকে বলে 'আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক' গোছের একটা রফা করে দেওয়া যাবে। আমাকে কোনও কমিশন দিতে হবে না। আমি ও তরফ থেকে তা পাবো।

বাসু একটু সম্পিঙ্ক চোখে তাকালেন। বললেন, সেই 'সহচরী' ভদ্রমহিলা এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন, বলুন তো মশাই। ভুতুড়ে বাড়ি-টাড়ি নয় তো?

—আরে না, না। সেসব কিছু নয়। মিনতি মাইতি অত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবে? চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, তিন কুলে কেউ নেই—বাড়িটা বিক্রি করে সে ঝাড়া হাত-পা হতে চায় আর কি।

বাসু আবার বলেন, শুনুন দত্তমশাই! বাড়িটা কিনলে আমিও কমিশন দেব আপনাকে। খোলাখুলি বলেন তো—ও বাড়িতে কোনও খুন-জখম, আত্মহত্যা-ফত্যা হয়েছে কখনও!

ভবানন্দ আবার ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, আমি চল্লিশ বছর এই মেস্ট্রী নগরের বাসিন্দা। মা-কালীর নামে দিবা করে বলছি, আমার জ্ঞানত সেরকম কোনও দুর্ঘটনা ওখানে ঘটেনি।

—পামেলা জনসন কীভাবে মারা যান? স্বাভাবিক মৃত্যু?

—বিলকুল। বাহান্ডর বছর বয়স হয়েছিল ম্যাডামের। শেষ তিন-চার বছর দুগুছিলেন জনডিস্-এ। তাতেই মারা যান মাসদুয়েক আগে।

—ঠিক আছে। আগে বাড়িটা তো দেখি। তারপর আপনার সঙ্গে কথা হবে।

—একটু চা-টা খাবেন না?

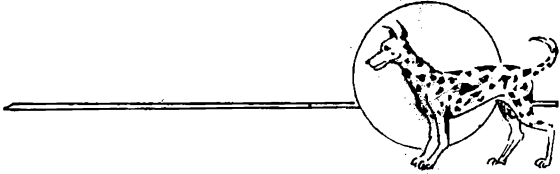
—থ্যাঙ্কু। না। লাক্সের আগে চা খেলে বিদেটা নষ্ট হবে।

বাসু-সাহেব গারোখান করতেই ভবানন্দ বললেন, আপনার নামটাই জানা হয়নি স্যার, যোগাযোগের একটা ঠিকানা—

—আমার নাম কে.পি.ঘোষ। ইন্ডিয়ান নেভিতে ছিলাম। রিটারায়র করেছি। আগে বাড়িটা দেখি।

মোটামুটি পছন্দ হলে আবার আসব। ঠিকানা, ফোন নম্বর আর আমার ‘অফার’ দিয়ে যাব।

—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।



অনন্ত স্টোরস্ থেকে বেরিয়ে এসে আমি প্রশ্ন করি, এবার কোথায়? ব্যাক টু ক্যালকাটা?

—সে কি! আড়াইটির ‘মরকতকুঞ্জ’ দেখতে যাবার কথা বললাম না?

—সে তো রিটার্ডার্ড নেভাল অফিসার কে.পি.ঘোষ বলেছেন আপনার তাতে কী?

—কিন্তু যে জন্যে আসা, তা তো এখনো সুস্পষ্ট হয়নি কৌশিক।

—আবার কী? শুনলেন না—আপনার ক্লায়েন্ট মিস্ পামেলা জনসন মারা গেছেন?

—একজ্যাস্টিলি!

যে ভঙ্গিতে উনি ঐ একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, তাতে একটু ঘাবড়ে বাই। গুছিয়ে নিয়ে বলি, মানে... আমি বলতে চাইছি—মিস্ পামেলা জনসন যে-কথা আপনাকে জানাতে চাইছিলেন তা আর জানা যাবে না। কী তাঁর সমস্যা ছিল তা যখন জানা যাবে না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে এ ব্যাপারটা এখনেই শেষ হয়ে গেছে।

—কী সহজে তুমি বলতে পারলে কথাটা! শুনো রাখো কৌশিক। পি. কে. বাসু যতক্ষণ না কোন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ তা শেষ হয়ে যায় না—

ওঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবু অন্তিম যুক্তিটা আবার দাবিল করি, কিন্তু বেহেতু আপনার ক্লায়েন্ট মৃত্যু—

—একজ্যাস্টিলি। কৌশিক—একজ্যাস্টিলি। সবচেয়ে দামী কথাটাই তুমি বারে বারে বলছ, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থটা প্রাণখান না করে।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। কুণ্ডে উঠি, কী বলতে চান আপনি? পামেলার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়? শুনলেন না ভবানন্দ দত্তের কথা—জনডিসে ভুগে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছেন, নিতান্ত পরিণত বয়সে?

—ভবানন্দ তো একথাও বলেছিল যে, একজন বিগ্রেডিয়ার আর একজন হাইকোর্টের জজ বাড়িটা কিনবার জন্য মুখিয়ে আছে। সেকথা বিশ্বাস করেছিলে তুমি? ভবানন্দ যুধিষ্ঠির?

এ কথার কী জবাব? বলি, তাহলে কি কাঁচড়াপাড়ার কোন রেস্টোরাঁয়...

—না। আমরা ঐ 'সুতৃপ্তি'তেই মধ্যাহ্ন আহার সারবো। ভবানন্দের ও-কথাটা অবশ্য মানি যে, সেখানে 'তৃপ্তি' পাব না; কিন্তু এই সুবাদে মরকতকুঞ্জ সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ হয়ত সংগ্রহ করা যাবে। এসো।

অগত্যা।

'সুতৃপ্তি' একটি ছোট্ট রেস্টোরাঁ। এত বেলাতেও কেউ কেউ আছে। আমরা দূরতম একটা পর্দা-ঘেরা কেবিনে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই একজন মাঝবয়সী 'বয়' এসে জিজ্ঞাসা করলো, কী খাবেন স্যার? ভাত?

বাসু বলেন, না। কী কী পাওয়া যাবে বল তো ঠিক। মুরগি হবে?

—হবে, কিন্তু একটু দেরী হবে স্যার। আধঘণ্টা লাগবে।

—তা হোক। আমাদের তাড়া নেই। টোস্ট নিয়ে এসো, আর স্যালাড। মুরগির রোস্ট বানাও। নাও, তোমার টিপসটা আগাম নাও দিকিন—বাসি মাল চালিও না।

লোকটা পাঁচ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বললে, সুতৃপ্তিতে বাসি মাল পাবেন না, স্যার। অন্তত আপনাকে সব টাটকা জিনিসই সার্ভ করবো। কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। অর্ডারটা দিয়ে ঘুরে এসো দিকিন। কথা আছে।

লোকটা গেল আর এলো। বললে, বলুন স্যার?

—তোমাকে বেশ চালাক-চতুর লাগছে। শোন, আমরা ঐ মরকতকুঞ্জটা কিনতে এসেছি, মানে যদি পছন্দ হয়—

—জানি, আন্দাজ করেছি। এখনই অনন্ত স্টোরস্ থেকে বার হলেন, না?

—হ্যাঁ। ও বেলায় বাড়িটা দেখবো। পছন্দ হলে মেরীনগরেরই বাসিন্দা হয়ে যাব। এখন দু'চারটে খবর বল দেখি। এখানে ভাল ডাক্তার আছে?

—আছেন স্যার। ডাক্তার পিটার দস্ত। সাক্ষাৎ ধ্বংসরি। সন্তরের ওপর বয়স। অতি বিচক্ষণ।

—মরকতকুঞ্জ বাড়িটার মালিক কে এক মিস্ মাইতি, নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্তমানে সেই হচ্ছে ছল্লড়ফোড় মালকিন!

—'ছল্লড়ফোড় মালকিন' মানে?

লোকটা একই কথা আবার জানালো। প্রাক্তন মালকিন মিস্ পামেলা জনসন তাঁর নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত করে একেবারে শেষ সময়ে বাড়িটা দিয়ে যান তাঁর সহচরীকে। রীতিমত উইল করে।

—মিনতি মাইতি বোধ হয় দীর্ঘদিন তাঁর সেবাস্বত্ব করেছে?

—মোটেনই নয়। মাত্র তিনবছর সে এই চাকরিতে বহাল ছিল।

—মাত্র তিন বছর! শুধু বাড়িটাই দিয়ে গেছেন, নগদ-টগদ সেননি নিশ্চয়—

আমি লক্ষ্য করেছি, কারও পেট থেকে খবর বার করতে হলে তাকে প্রতিবাদ করার সুযোগ দিতে হয়। ভবানন্দের কাছ থেকেই আমরা জেনেছি যে, পামেলা তাঁর সবকিছুই নির্বৃত্ত স্বত্ব দান করে গেছেন তাঁর সহচরীকে। বাসুমামু সেটাই করোবরেট করতে চান; কিন্তু তিনি এমনভাবে প্রব্র রাখেছেন যাতে বস্ত্র একটা প্রতিবাদের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। লোকটা সোৎসাহে বলল, আপনার ভুল ধারণা, স্যার! উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন নাকি সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বৃড়ি থাকত খুব সাধাশিখে—কিন্তু তার কোম্পানির কাগজই নাকি ছিল সাত লক্ষ টাকার!

—বল কী হে! এ যে রূপকথার গল্প! বুড়ির আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না বুঝি?

আবার প্রতিবাদের সুযোগ : এখানেও ভুল হল আপনার। ছিল; ভাইপো, ভাইঝি আর বোনঝি। বোনঝি হেনা অবশ্য একজন সদারজীকে বিয়ে করেছে—বুড়ির রাগ হতেই পারে; কিন্তু ভাইপো সুরেশ, আর ভাইঝি শ্রুতিটুকুকে কেন যে উনি এভাবে বঞ্চিত করে গেলেন তার কোন হিসসই কেউ বাতলাতে পারল না আজও।

বুড়ি মারা গেল কিসে?

—এ যে, ন্যাবারোগে। দু'তিন বছর ধরেই ডুগছিলেন। ডাক্তার দশ চেষ্টার ক্রটি করেননি। বুড়ি শুধু সেদ্ধ খেত—ভাজা-টাজা একদম নয়।

সূত্রস্থিতে মধ্যাহ্ন আহার সেরে মামু বললে, চল চাটটা দেখে আসি। এখনও দুটো বাজেনি। অগত্যা চাট দেখতে যেতে হল। রোমান ক্যাথলিক চাট। গথিক শৈলীর সঙ্গে ইভো-স্যারানেসিক শৈলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বাসুমামু সেসব নজর করলেন বলে মনে হয় না। উনি প্রবেশ করলেন সংলগ্ন সিমেটারিতে। পকেট থেকে নোটবই বার করে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। দু-একটা টুশ-স্টোনের তারিখ লিখে নিলেন খাতায়—যোসেফ হালদার, মেরী জনসন, সরল্যা এবং শেবমেশ মিস্ পামেলা জনসন :

SACRED  
TO THE MEMORY OF  
PAMELA HARRIET JOHNSON  
DIED MAY 1. 1970  
"THY WILL BE DONE"

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, পরলো মে! চিঠিটা লিখেছিলেন সতেরই এপ্রিল। আর আজ উনত্রিশে জুন আমি তাঁর চিঠিখানা পেলাম। বুঝলে? সমস্ত ব্যাপারটা ঝুটিয়ে দেখা দরকার।

আমি বুঝলাম—সমস্ত ব্যাপারটা ঝুটিয়ে দেখা দরকার!

অর্থাৎ বাসুমামু যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপারটা ঝুটিয়ে দেখে শান্ত হচ্ছেন ততক্ষণ আমাকে তার লগে-লগে থাকতে হবে। এই জুন মাসের খর-রৌদ্রতাপ অগ্রাহ্য করে!

মরকতকুঞ্জের বাগানের গেট-এ এবার আর তালা খুলছে না। গাড়ি থামিয়ে আমরা এগিয়ে যেতেই একটি হিশুহানী লোক ওপাশ থেকে এগিয়ে এল। আউট-হাউস থেকে। গেট খুলে সসন্ত্রমে বললে, আইয়ে সা'ব।

—তোম কৌন?

—ম্যাম হেদিলাল সা'ব। বাগিচাকে দেখভাল করতে থে।

আউট-হাউসের জানলা থেকে একটি অবগুহনবতীকে দেখা গেল, ছোমটা ডুলে দুটি কান্ডলকালো কৌতুহলী চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত হেদিলালের ঘরওয়ালী।

গেট থেকে আমরা তিনজনে প্রাসাদটির দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভেতর থেকে শোনা গেল পরিচিত সারমের গর্জন: কে বট তোমরা? ভেবেছ, আমাকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে বলে যা হচ্ছে নিয়ে পালাবে। সেটি হচ্ছে না...

হেদিলাল বললে, ডরিয়ে মং সা'ব, গিসি কিছু বোলবে না। বহুৎ আচ্ছা কুস্তা।

সবর দরজা খুলে একটি শ্রোড় বিধবা এগিয়ে এসে যুক্তকরে নমস্কার করে বললেন, আসুন। ভবানন্দবাবু টেলিফোনে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, আপনারা আড়াইটের সময় আসবেন।

বাসুমামুর সেই একই ট্যাকটিস: "আপনি ব্যক্তিটি কে?"—এই সিধাসাদা প্রশ্নটা না করে এমনভাবে সাজালেন যাতে বক্তা একটা প্রতিবাদের সুযোগ পায়, আপনিই বুঝি মিস্ মিনতি মাইতি?

## কাটার-কাটার-২

—আজ্ঞে না। আমি শান্তি, মিস জনসনের পাচিকা ছিলাম। মিস্ মাইন্ডি কলকাতায় থাকে। আসুন, ভিতরে আসুন। আমাদের 'তুমি'ই বলবেন।

এবার সব জানলা খোলা। প্রচুর আলো-হাওয়া। ঘরদোর ঝকঝক্ তকতক্ করছে। বাড়ির দেখভাল যারা করে তারা কাজে ঝাঁকি দেয় না, এটা বোঝা যায়।

—এটা বৈঠকখানা, ড্রইংরুম আর কি।

প্রাচীনযুগের আসবাবপত্র। ভারি পর্দা। কাচের আলমারিতে শৌখিন পোসেলিনের পুতুল। প্রকাণ্ড ফুলদানি, ফুল নেই অবশ্য। বাসু-সাহেব প্রশংসা করলেন গৃহসজ্জার। বললেন, খুব ঝকঝক্-তকতকে করে সাজিয়ে রেখেছে তো?

—আমি নয়। ঘর-দোর ঝাড়-পোছ করে সরয়—ঐ ছেদিলালের বউ।

—আমি যদি বাড়িটা কিনি, তোমরা তিনজনে এখানে থেকে যাবে তো?

শান্তি একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। একটু ভেবে নিয়ে বলে, ছেদিলালেরা কী করবে তা ওদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি আর চাকরি করব না। ম্যাডাম আমাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছেন, তারই সুদে আমার দিবা চলে যাবে। তবে লোকজন আপন পেয়ে যাবেন। আমি বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করে দেব।

—তা তোমার ম্যাডাম তো দু-মাস হল গত হয়েছেন, তুমি যদি আর চাকরি নাই করবে তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন?

—মিস্ মাইন্ডির অনুরোধে। ও বলল, গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, এবার বাড়িটা বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তা তাড়াতাড়ি তো কিছু নেই, আমি রাজি হয়ে গেছি।

একটা জিনিস বাসুমামু খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমার নজরে পড়ছিল। মিনতি মাইন্ডি আজ লক্ষপতি। কিছু মেরীনাশের কেউ তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটা দিচ্ছে না। ভবানন্দ, সুভৃষ্টির বয় এবং এখন এই শান্তি—কেউই মিনতির প্রসঙ্গে 'আপনি' বলছে না। বোধ করি সেজন্যই মিনতি এই প্রাসাদটা জলের দামে বিক্রি করে কলকাতায় চলে যেতে চায়। কলকাতায় একটা মানুষের মর্যাদা তার আর্থিক সঙ্গতিতে।

কুকুরের গর্জনটা তীব্রতর হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। বাসুমামু আমাকে বললেন, কৌশিক, তুমি বসে পড় তো ঐ চেয়ারটায়। নিজেও বসলেন তিনি। শান্তিকে বললেন, এবার খুলে দাও কুকুরটাকে। ও আসুক। আমাদের ঠিকে দেখে শান্তি হোক।

শান্তি বলল, ঠিক বলেছেন। বাইরের লোক বসে থাকলে ও কখনও তেড়ে যায় না।

শান্তি কুকুরটাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতেই সে তীরবেগে ছুটে এল। এখন আর সে ডাকছে না। আমাদের জুতো আর প্যাণ্ট ভাল করে ঠিকে দেখল। বাসুমামু একটা হাত বার করে বললেন, ঠিকে দ্যাখ! এখনও চিকেন রোস্টের গন্ধ লেগে আছে।

কুকুরটা সত্যিই গুর হাতটা ভাল করে ঠিকে দেখল।

—কী নাম ওর? কত বয়স?

—ওর নাম মিসি। মাসছয়েক বয়স। ভারি বুদ্ধিমান। কাউকে কখনও কামড়ায়নি। ওর একমাত্র রাগ পুখু পোস্টম্যানের উপর। কেন যে পোস্টম্যানকে দেখলেই ঝঁকিয়ে ওঠে, জানি না।

বাসুমামু বলেন, হেঁচুটা কিছু সহজবোধ্য। শোন, বুঝিয়ে বলি। তোমাকে বিচার করতে হবে কুকুরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে দেখেছে বাড়িতে দু'জাতের লোক আসে। একদল চোর-ডাকাত। তাদের ও কিছুতেই চুকতে দেবে না বাড়িতে। চোর-ডাকাত ও চেনে না, দেখেনি—কিন্তু ওর 'জিন'-এ আছে বংশানুক্রমিক নির্দেশ। পিণ্ডজ হচ্ছে জার্মান শিকারী কুকুর। শত্রুকে মোকাবিলা করার নির্দেশ ওর রক্তে মজ্জাজাত। দ্বিতীয় আর এক জাতের মানুষ বাড়িতে আসে—যাকে সাধারণে আহ্বান করা হয়। বসতে দেওয়া হয়। তারা গৃহস্থামীর বরণীয় ব্যক্তি। তাদের তেড়ে যেতে নেই। ওর সারমের্য দৃষ্টিতে পোস্টম্যান এমন একটা লোক যে, প্রায় প্রতিদিনই এসে বেল বাজায়—কিন্তু যাকে কোনদিনই ভিতরে চুকতে

দেওয়া হয় না। বসতে বলা হয় না। দোর থেকে তাকে বিদায় করা হয়। ফলে পোস্টম্যান হচ্ছে অব্যাহত ব্যক্তি!

শুধু শান্তি নয়, আমার কাছেও ব্যাখ্যাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হল। বেশ বোকা গেল কুকুরটা শান্তির প্রিয়। আমরা যে তাকে ভালবেসেছি এতে শান্তি খুশি হয়ে ওঠে। বলে, ওর দারুণ বুদ্ধি। বল নিয়ে এমন খেলে—

—গেলুক?

শান্তি বোধহয় ‘গেলুক’ শব্দটার অর্থ জানে না। বললে, না স্যার, গেলুক নয়, রবারের বল।

—কই দেখি! বলটা দেখি। ফ্লিসির কেরামটিটা দেখা যাক।

শান্তি একটু অবাক হল। তবু বৃদ্ধ খরিদারের এই অহৈতুকী কৌতুহল চরিতার্থ করল সে। টানা ড্রয়ার থেকে রবারের বলটা বার করতেই সচকিত হয়ে উঠল ফ্লিসি। লাফাতে লাফাতে উঠে গেল সিঁড়ির মাথায়। শান্তি বলটাকে উপর দিকে ছুঁতেই লাফ দিয়ে লুফে নিল ফ্লিসি। বার তিনচার খেলাটা দেখিয়ে বলটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

ফ্লিসি শান্ত হয়ে সোফার নিচে শুয়ে পড়ল। শান্তি বললে, এ খেলাটা কিছু বেশ বিপজ্জনক।

—বিপজ্জনক! কেন? বিপদ কিসের?

—একবার সিঁড়ির মাথায় বলটাকে রেখে দিয়েছিল ফ্লিসি। তখন গভীর রাত। ম্যাডাম কী কারণে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। ঐ বলে পা পড়তে একেবারে নিচে গড়িয়ে পড়েন! ডাক্তার দস্ত বলেন, তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারতো।

—সর্বনাশ! হাড়গোড় ভেঙেছিল নাকি?

—না! নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে। দিন সাতকের মধ্যেই সামলে নিয়েছিলেন।

—অনেকদিন আগের কথা নিশ্চয়?

সেই একই ট্যাকটিক্স। শান্তি প্রতিবাদ করে, না, স্যার! অতি সম্প্রতি। তারিখটা পর্যন্ত আমার মনে আছে। এ বছরের ছয়ই এপ্রিল। কারণ তার পরদিনই ছিল ঠর বাহাদুররতম জন্মদিন। আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই হাজির—তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। জন্মদিন তো মাথায় উঠলো।

—ভগবান রক্ষা করেছেন! বেচারি ফ্লিসি জানেও না কত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। তা অত রাতে বৃদ্ধা নিচেই বা আসছিলেন কেন? একা-একা নিশ্চয়?

—হ্যাঁ একা-একাই! ব্যাপার কি জানেন, ম্যাডামের ঘুম না হওয়ার রোগ ছিল—ঐ যে ইনসুমিয়া না কি—যেন বলে। মাসের মধ্যে পাঁচ-সাত রাত তিনি ঐভাবে সারা বাড়ি পায়চারি করতেন। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো শেষ রাতে ঘুমোতে যেতেন। কিছুতেই ঘুমের গুণ্ড খেতে চাইতেন না। সে যা হোক, আপনাদের আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। আসুন ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।

নিচেকার ঘরগুলো দেখা শেষ হলো। তারপর উপরের ঘরগুলি। নিচে ড্রইং, ডাইনিং, স্টোর, কিচেন, প্যান্ট্রি, বাড়তি গেস্টরুম। শয়নকক্ষগুলি সবই দ্বিতলে—তাদের সব গালভারি নাম। মাস্টার্স বেড রুম, ওক-রুম, দোলনা ঘর ইত্যাদি।

সিঁড়ি দিয়ে আমরা ভিতলে উঠে আসি। ফ্লিসি কোন আগ্রহ দেখালো না। একতলায় সোফার তলায় সে নিম্না দিচ্ছে। ধাপে ধাপে আমরা উপরে এসে পৌছাই। শেষ ধাপে পা দিয়ে বাসু-সাহেবের হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন সেই জিনিষটা। কিছুই নয়, ঠর গাড়ির চাবিটা। একে একে ঘরগুলি দেখলাম। বাসু-মামুর কী খেয়াল হলো, বললেন, এই ওক-রুমটার মাপ নিয়ে দেখতো কৌশিক। আমার বুককেসগুলো সব আঁটবে কিনা পরখ করে দেখতে চাই।

পকেট থেকে তিনি বার করলেন একটা গোটানো স্টীল-স্টেপ, নোটবই আর কলম। আমি আর শান্তি দেবী ঘরটার মাপ নিলাম, উনি নোটবইতে লিখে নিলেন। মাপ নেওয়া শেষ হলে নোটবইটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, দেখ তো, মাপ ঠিক লেখা হয়েছে?

## কাটার-কাটার-২

তাকিয়ে দেখি, নোটবইতে মাপ লেখা নেই আদৌ। বরং লেখা আছে ‘কোন ছুতায় শান্তিকে একতলায় নিয়ে যাও। আমি মিনিট-পাঁচেক একা একা এখানে থাকতে চাই। শোন, ফোনটা নিচে আছে। সেই অভ্যহাতে শান্তিকে সরিয়ে নাও।’

নোটবইটা ফেরত দিয়ে বলি, মাপ ঠিকই আছে। দুটো বুককেসই ধরে যাবে।

তারপর শান্তির দিকে ফিরে বলি, এখান থেকে অনন্ত স্টোর্সে একটা ফোন করা যাবে? আমরা ফিরবার পথে ভবানন্দবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কেন যাবে না। আমি ফোন করে বলে দেব? কটার সময়?

—না চলুন, আমিই যাই। দু-একটা কথা জানাবার আছে। আমাদের অ্যাজেন্সিটাও দেওয়া হয়নি।

—বেশ তো, আসুন।

শান্তিদেবীর পিছন-পিছন আমি নিচে নেমে এলাম। টেলিফোনে কী বলবো, মনে মনে ছক্কেতে ছক্কেতে। সৌভাগ্য আমার, ভবানন্দ সোকানে নেই। তাঁর পুত্রটি ফোন ধরলো, বাবা কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন প্রভৃতি প্রতিটি প্রশ্নের জবাবেই তার ভদ্রলোকের-এক-কথা: জামে।

টেলিফোন নামিয়ে ‘হলে’ ফিরে এসে দেখি বাসুমামু নিচে নেমে এসেছেন। হল-কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আত্মসম্মতি ভাবে।

আমাদের দেখে হঠাৎ শান্তিকে বলে ওঠেন, সিঁড়ির মাথা থেকে উল্টে পড়ে গিয়ে মিস জনসন নিম্চয়ই একটা মানসিক আঘাত পান, শারীরিক তো বটেই। তিনি কি তখন ঐ ফ্লিসি আর তার বল-এর কথা কিছু বলেছিলেন?

শান্তি রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, আপনি কেমন করে জানলেন? হ্যাঁ, বিকারের ঘোরে প্রায়ই বলতেন ফ্লিসি আর তার বলের কথা। এমনকি মৃত্যুর আগে, মানে ঘটনাক্ষণে আগে তাঁর শেষ কথাটিও ছিল ঐ। তখন অবশ্য তিনি ঘোর বিকারে আবোল-তাবোল বকছিলেন। তাঁর শেষ কথা: ‘ফ্লিসি... তার বল... চীনের মাটিতে ফুল দামি...’

—‘চীনের মাটিতে ফুল দামি!’ —তার মানে কী?

—কোন মানে নেই! ও তো ঘোর বিকারের মধ্যে বলা কথা!

বাসু-সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাইপটা ধরিয়ে বললেন, আর একবার উপরে যেতে পারি কি? আমি ঐ মাস্টার্স বেডরুমটা আর একবার দেখতে চাই।

—আসুন না। দেখুন—

শান্তিদেবী পথ দেখিয়ে আবার দ্বিতলে আমাদের নিয়ে এলেন। গৃহকর্তার শয়নকক্ষে। বাসু-সাহেব দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা কাচের আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে কিছু শৌখিন পোসেলিনের খেলনা সাজানো। তার মাঝখানে একটি কাচকড়ার ফুলদানি। তাতে একটা বিচিত্র ছবি। রক্তদ্বারের সামনে বসে আছে একটি কুকুর—নিচে লেখা : ‘Out all night and no key!’ বাসু-সাহেব বললেন, বিকারের ঘোরে তোমার কব্জী ‘চীনের মাটিতে ফুল দামি’ বলেননি। হয়তো বলেছিলেন, ‘চীনেমাটির ফুলদানি...’

শুধু শান্তি নয়, আমিও অবাক হয়ে যাই। বলি, একথা কেন বলছেন?

—মিস জনসন এ ঘরে থাকতেন। ঐ ফুলদানির ছবিটার কথা তাঁর মনে পড়েছিল। ওতে একটা ভিক্টোরিয়ান রসিকতার আভাস আছে। পোষা কুকুরটা বাড়ির বাইরে অভিসারে গেছিল আর তারপর সারা রাত বাড়ি ঢুকতে পারেনি। হয়তো ফ্লিসির ঐ জাতের বদভ্যাস আছে, তাই নয়?

শেষ প্রশ্নটা শান্তি দেবীকে। সে স্বীকার করলো, হ্যাঁ, মাসের মধ্যে দু-এক রাত সে পালিয়ে যেতো, সারা রাত বাইরে কাটাতে। ভোর রাতে ফিরে এসে বাড়ির সামনে কুইকুই করত। এটা শেষবার হয়েছিল যেদিন ম্যাডাম পড়ে যান। সে রাতে ফ্লিসি বাড়ি ছিল না। ভোর রাতে ফিরে এসে কুইকুই করছিল। মিস্ মাইতি চুপিসাড়ে নেমে এসে সদর-দরজা খুলে ওকে ভিতরে আনে—



—চুপসাড়ে? কেন? চুপসাড়ে কেন?

—হ্যাঁ। পাছে কবীর ঘুম ভেঙে যায়। ফ্লিসির এই বাইরে যাওয়াটা ম্যাডাম একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই মিস্ মাইতি আমাদের বারণ করে দিয়েছিল—আমরা যেন ঠেকে না জানাই যে, দুর্ঘটনার রাত্রে ফ্লিসি সারারাত বাড়িতে ছিল না।

—আই সি! উনি খুব হিসাবী ছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ, রোজ হিসাব রাখতেন। প্রতিদিন রাতে শোবার আগে দিনের খরচ লিখে রাখতেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে খুব ভুলো মানুষ ছিলেন তিনি। চিঠিপত্র লিখে পোস্ট করতে ভুলে যেতেন। এই তো দিন তিন-চার আগে আমি ঠর তেঁশকের নিচে থেকে একটা চিঠি উদ্ধার করি। চিঠি লিখে, খাম বন্ধ করে, ঠিকানা লিখে তেঁশকের নিচে গুঁজে রেখেছিলেন।

ম্যাজিসিয়ান যে কায়দায় পকেট থেকে খরগোশ বার করে দেখায় প্রায় সেই ক্ষিপ্ৰতায় বাস্-সাংহেব তার পকেট থেকে একটি খাম বার করে বললেন, এই চিঠিখানা কি?

শান্তিদেবী বজ্রাহত হয়ে গেলেন।

—আপনি, আপনিই সেই পি.কে.বাস্?

—হ্যাঁ, তুমি আমার নাম শুনেনি?

—শুনছি। কাঁটা-সিরিজের অনেক গল্প—

—শোনো শান্তি। এই চিঠিতে মিস্ পামেলা জনসন আমাকে একটি গোপন তদন্ত করতে বলেছিলেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্য, চিঠিখানা তিনি সময়ে ডাকে দিতে ভুলে যান। তুমি এটা শুরুরবারে পোস্ট করেছো, আর আজ সোমবার আমি তা পেয়ে এখানে ছুটে এসেছি। ইতিমধ্যে মিস্ জনসন মারা গেছেন। আমি বুঝে উঠতে পারছি না, একেত্রে তদন্তটা আমার পক্ষে চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য কি না।

শান্তি একটু ভেবে নিয়ে বললে, আমি জানি স্যার, ব্যাপারটা কী। মানে কী বিষয়ে তিনি আপনাকে তদন্ত করতে বলতেন। কিছু সেসব তো চুকেচুকেই গেছে—

—কী বিষয়ে তদন্ত? তুমি কতটা কী জান?

—সামান্য ব্যাপার। পাঁচখানা একশ টাকার নোট চুরি যায়। কে নিয়েছে তা আমরাও আন্দাজ করেছিলাম, ম্যাডামও করেছিলেন, কিন্তু সে সময় আত্মীয়-বন্ধনে ভরা বাড়িতে—

—কী ব্যাপার খুলে বল দিকিন?

শান্তি জানালো কীভাবে নোটগুলো খোয়া যায়। কাকে যে সন্দেহ করা হয়েছিল সে-কথা সে স্বীকার করল না কিছুতেই। বারে বারে একই কথা বলল—এ তদন্তের এখন আর কোন মানে হয় না।

মরকতকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বলি, মামু! এতকণে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, কৌশিক। আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

—বাচা গেল। তাহলে কাল বাসে পরশু আমরা গোপালপুর যাবি? সব সমস্যা মিটে গেছে। সারমেয় এবং তার গেণ্ডক—কেন চিঠিখানি ডেলিভারি হতে দু-মাস লাগল, কী তদন্ত তিনি আপনাকে করতে দিতেন, ইত্যাদি, প্রভৃতি। এবার কী? সোজা কলকাতা?

—না! তদন্ত আমার শেষ হয়নি এখনো।

মাক-সড়কেই ঠাঁড়িয়ে পড়ি, মানে! এই যে বললেন, আপনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন?

—তাই বলেছি। আমার স্থির সিদ্ধান্ত: মিস্ পামেলা জনসনের দুর্ঘটনার মূলে আর যাই থাক—ফ্লিসি নামক সারমেয় এবং তার রক্তবর্ণের গেণ্ডক নেই।

—তার মানে?

—তার মানে, আমি এমন একটা তথ্য জানি, যা তুমি জানো না এখনো।

—ই! সেটা কী?

## কাটার-কাটার-২

—মরকতকুঞ্জে কাঠের সিঁড়িতে, সোতলার ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপের কাছাকাছি স্মার্টিং-এ একটা পেরেক পোঁতা আছে! ধাপ থেকে নয় ইঞ্চি উচুতে!

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুই বোঝা গেল না। উনি অত্যন্ত গম্ভীর! বলি, রেশ তো! না হয় তাই আছে। তাতে কী হল?

—প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে একটা পেরেক পোঁতার কী হেতু থাকতে পারে?

—হাজারটা হেতু থাকতে পারে।

—তার একটা অন্তত আমাকে শোনাও। ল্যান্ডিং-এর কাছাকাছি, শেষ ধাপের সই-সই, দেওয়ালের দিকে, ধাপ থেকে নয় ইঞ্চি উচুতে পেরেক পোঁতার একটি সম্ভাব্য হেতু। শূন্য তাই নয়, পেরেকের মাথাটা ভাৰ্শিশ-করা, যাতে সহজে নজরে না পড়ে।

—আপনি কী বলতে চান? কেন শূঁতেছে আপনি জানান?

—‘কে’ শূঁতেছে জানি না। ‘কেন’ শূঁতেছে জানি।

—কেন?

—সে রাত্রে ও বাড়িতে একাধিক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন যারা বৃড়ির মত কামনা করছিলেন। কারণ বৃড়ি তখনো দ্বিতীয় উইলটা করেনি। সকলেই তার ওয়ারিশ। তারা জানতো, বৃড়ি সারারাত পায়চারি করে। সোতলা থেকে একতলার নতুন আসে। বৃড়িকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার সবচেয়ে সহজ পন্থা বাড়িনুদ্ধ সবাই শূয়ে পড়ার পর সিঁড়ির শেষ ধাপে আড়াআড়িভাবে একটা টোন সুতো বা তার বেধে দেওয়া। রেলিং-এর দিকে ঝাটটা সহজ, কিন্তু দেওয়ালের দিকে সেটাকে শক্ত করে বাঁধতে হলে ওয়াল-বোর্ড-এর গায়ে একটা পেরেক শূঁতে দিতে হবে। সহজে সেটা যাতে নজরে না পড়ে তাই তার মাথাটা ভাৰ্শিশ করে দিতে হবে। আর সারমেয় গেম্বুকটিকে সিঁড়ির শেষ ধাপে রেখে দিতে হবে।

—মাই গড! কী বলছেন আপনি?

—ইয়েস। এছাড়া ওখানে ঐ পেরেকের অস্তিত্বের আর কোন ব্যাখ্যা নেই। মিস্ পামেলা জনসন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পতনজনিত মৃত্যু হলে যা ঘটতো না, তাই ঘটলো। উনি ভাবতে বসলেন। দুখীনা ঘটে ছয় তারিখে, উনি চিঠি লেখেন সতেরো তারিখ। পাক্সা দশটা দিন তিনি শূন্য ভেবেছেন, আর ভেবেছেন। হয়তো স্মরণে আনবার চেষ্টা করেছেন পতনের পূর্বমুহুর্তে পায়ের তলায় রবারের বলের স্পর্শের স্মৃতিটা। মনে পড়েনি—এ আমার আশ্রয়—শূঁতে যাবার আগে ‘সারমেয় গেম্বুক’টি তিনি ড্রয়ারে তুলে রেখেছিলেন। সেটা কেমনভাবে সিঁড়ির মাথায় এল—মাথায় না হলেও পাদদেশেই, এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফ্রিসি আনেনি—কারণ ফ্রিসি সেরায়ে বাইরে ছিল। বোধ করি শেষ রাত্রে তার ঝুঁইঝুঁই উনি স্বকর্ণে শুনছেন—এটাও আমার আশ্রয়—আর তাতেই মৃত্যু সময়ে ওর মনে পড়েছে চীনে মাটির টবের ঐ ছবিটার কথা!

—হতে পারে, হতে পারে। কিন্তু—

—ভেবে বেধো কৌশিক, চিঠিতে ভদ্রমহিলা বারে বারে বলেছেন গোপনতার কথা, বলেছেন, ‘বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করিতে আমার মন সরিতেছে না’—নিজের পরিবারে এই রকম একটা ডেলিবারেট মার্ভারর আছে একথা মনে নিতে পারছিলেন না তিনি। অথচ আর কোনও সম্ভাব্যজনক ব্যাখ্যাও পাচ্ছিলেন না ঐ ‘সারমেয়-গেম্বুক’ সমস্যার। হয়তো বাকি যে-কটা দিন বেঁচে ছিলেন তার ভিতর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে সেই বিশেষ শরতানটিকে তিনি চিহ্নিত করে যেতে পারেননি—কিন্তু সে যে ঐ দলে আছে, এটা হির নিচয় বুঝেছিলেন। তাই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে।

আমি বলি, হয়তো তাই। কিন্তু এখন আর কী-করার আছে মামু?

—অনেক-অনেক কিছু! গোটা রহস্যটা উদ্ঘাটিত করতে হবে আমাকে। জানতে হবে—প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হত্যাকারী কি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করেনি?

আমি বাধা দিয়ে উঠি, নিশ্চয় নয়। উনি মারা গেছেন জনডিসে।

উনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলেন, জানতে হবে, মিস্ মাইতি কেন 'চুপিসাড়ে' ফ্রিসিকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিল, কেন সবাইকে বারণ করেছিল—কষ্টী যেন না জানতে পারেন, ফ্রিসি সে-সারে বাড়িতে ছিল না।

—তার মানে আপনি কি বলতে চান...

—আমি কিছুই বলতে চাই না কৌশিক—এই স্টেজে—আমি শুধু শুনতে চাই; কিন্তু একথাও তো ভুললে চলে না যে, সম্প্রতি লাভ করেছে মিস্ মিনতি মাইতি। যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল ফ্রিসির অভিসার-বার্তা গোপন রাখতে। নয় কি?

আবার সব গুলিয়ে গেল আমার।



নাটকের পরবর্তী দৃশ্য ডাক্তার পিটার দস্তের ডেরা।

—চল, দেখি তিনি কী বলেন। কী রোগে মিস্ জনসন ফৌত হলেন।

একাধিক ব্যক্তি বলেছে রোগটা 'জনডিস'— এই রোগে জীবনের শেষ তিনবছর কাবু ছিলেন বৃদ্ধা। কিন্তু সেকথা বাসুমামুকে বলতে যাওয়া বৃথা, কারণ আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, বক্তার ধর্মপুত্র নয়! ডক্টর দস্ত থাকেন মেরী নগরে, কিন্তু তাঁর ক্লিনিকটি কাঁচড়াপাড়ায়। একটা পুরোনো আমলের বোর্ড গাড়ি আছে; তাই চেপে তাঁতের মাকুর মতো তিনি এই পাঁচ-সাত মাইল পথ পাড়ি সেন নিত্যা ত্রিশদিন। নিজেই ড্রাইভ করেন। এখন বেলা চারটে, গেছো-সাদা কোথায় আছেন তা জানা নেই। মামু বললেন, টি-টাইম হয়ে গেছে; চল, সূতপ্তিতে গিয়ে এক-এক কাপ চা সেবন করা যাক। আর সেখান থেকে টেলিফোনে ডাক্তার-সাহেবের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে। ডাক্তার মানুষ—চেয়ারে এবং বাড়িতে টেলিফোন থাকবেই।

কিরে এলাম সূতপ্তিতে। হ্যাঁ, মামুর ডিডাকশান নির্ভুল—ডক্টর দস্তের চেয়ারে এবং বাড়িতে টেলিফোনের কানেকশন আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সূতপ্তিতে তা নেই। তা হোক, আমাদের সেই চালাক-চতুর বয়টি জানালো ডাক্তার-সাহেব চেয়ারে যান সজ্জা ছয়টায়। অর্থাৎ এখন তাঁকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। ঠর বাড়ির পথ নির্দেশ দিয়ে দিল এবং ঐ সঙ্গে আরও কিছু সংবাদ পরিকেশন করলো।

ডাক্তার পিটার দস্ত সস্তরের উপর। কাঁচড়াপাড়ায় ঠর ডাক্তারখানাটি বাস্তবে ক্লিনিক, প্যাথলজিক্যাল ইনভেস্টিগেটিং সেন্টার। রক্ত ও মলমূত্রাদির পরীক্ষা করা হয়, এক্স-রে ব্যবহৃতও আছে। দস্ত-সাহেব নিজে হাতে সব কিছু করেন না, বেতনভুক কর্মচারী আছে। উনি প্র্যাকটিস করেন, শুধু সন্ধ্যাবেলায় ঘট্টা-মুয়েক চেয়ারে গিয়ে বসেন। এই প্রসঙ্গে উঠে পড়লো ডাক্তারবাবুর দক্ষিণ হস্তের কথা—ডাক্তার নির্মল দস্তগুপ্ত। অল্প বয়স, মেধাবী। ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে। তবে রোগীপত্র দেখে না—সে নাকি ডাক্তারসাহেবের পরীক্ষাগারে কী-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। বাসু মামু আকুট হলেন যখন লোকটা বললো, ঐ নির্মল ডাক্তারের সঙ্গেই স্মৃতিচকুর বিবাহ পাকা হয়ে আছে।

## কাটার কাটার-২

—তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে?

—একথা কে না জানে? অ্যান্ডটুকুন শহর—সবাই সবার নাড়ির খবর রাখে।

—তাই বুঝি? তা মিস জনসনের চিকিৎসা ঠিক কে করতেন? ডাক্তার দত্ত, না কি নির্মল দত্তগুপ্ত?

—না স্যার। বড়ি সেদিকে ট্যান। পিটার দত্তের প্রেসক্রাইব করা ওষুধ ছাড়া আর কিছু খেতো না।

—তার মানে?

লোকটা সামলে নিল নিজেকে। বললে, মানে ঐ আর কি!

সবাই সবার নাড়ির খবর রাখে। তার মানে কি ঐ লোকটাও আন্দাজ করেছিল, মিস জনসন শেষ জীবনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন? স্বীকার করলো না সে কথা।

ডাক্তার দত্ত বাড়িতেই ছিলেন। কলবেল বাজাতে তিনি নিজেই দ্বার খুলে আমাদের বললেন, ইয়েস? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু?

বাসু-সাহেব হাত তুলে নমস্কার করলেন। বললেন, প্রথমই বলে রাখি ডক্টর দত্ত, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সাক্ষাৎ করতে এসেছি কোনও প্রফেশনাল কারণ নয়।

—শুনে সুখী হলাম। হ্যাঁ, আপনার দৃষ্টির দৃষ্টির স্বাস্থ্যই ভাল। অসুখের লক্ষণ কিছু দেখছি না।

—আপনার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলার আছে। যদি সময় না থাকে...

—বিলম্ব! আমার যথেষ্ট সময় আছে। আসুন, ভিতরে এসে বসুন। কলকাতা থেকে আসছেন? সোজা গাড়িতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে?

—আজ্ঞে না। আপনার কথা জেনেছি মেরীনগরে পৌঁছে।

আমরা গুঁর বৈঠকখানা গিয়ে বসি। গৃহস্বামী ফ্যানটা খুলে দিয়ে বসলেন। বলেন, এবার বলুন?

—আমার নাম টি. পি. সেন। আমি একজন সাংবাদিক—ফ্রি-ল্যান্স জার্নালিস্ট আর কি। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমি যোসেফ হালদারের একটি জীবনী লিখছি। তাই এসেছিলাম এখানে। মরকতকুঞ্জে গেছিলাম—কী আপসোসের কথা! কেউ কিছু বলতে পারছে না। আপনি মেরীনগরের একজন প্রাচীন সম্মানীয় সিটিজেন, তাই...

ডাক্তার দত্ত আকাশ থেকে পড়লেন। আমিও। মুহূর্তকাল পূর্বেও আমি অনুমান করতে পারিনি যে, রিটার্ডেড নেভাল অফিসার কে.পি.যোষ ইতিমধ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন টি.পি.সেন-এ! ডাক্তার দত্তের বিশ্বাস অন্য জাতের। কোনক্রমে বলেন, এ তো আশ্চর্য কথা শোনালেন মশাই! অফ অল পার্সেল আপনি এতদিন পরে যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে বসেছেন কেন? ব্যাপারটা কী?

—উনি বিদেশ থেকে বিদেশী জীকে নিয়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন একথা নিশ্চয় জানেন; কিন্তু তাঁর পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে আপনার?

—আসৌ না। উনি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন তাই তো জানে না কেউ?

—না! কেউ জানে না। উনি বোধ হয় 1914-এ ভারতে ফিরে আসেন? নয়?

তা হবে। হ্যাঁ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে, এটুকুই শুনছি।

—আপনি 'কোমাগাতামার' নামটা শুনছেন?

—'কোমাগাতামার'? হ্যাঁ, মনে পড়ছে—একটি জাপানী জাহাজের নাম। কী যেন হয়েছিল?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। জাহাজটিতে চেপে অনেক পাঞ্জাবী শিখ আমেরিকা আর কানাডা থেকে ভারতে ফিরে আসে। 'এমিগ্রেশন' আইন পাশ করে ঐ শিখ শ্রমজীবীদের ধনেপ্রাণে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। জাহাজটা যখন বজবজ্ঞে এসে নোঙর করল তখন ব্রিটিশ পুলিশ চাইলো সবাইকে বন্দী করতে। স্পেশাল ট্রেনে করে বন্দীদের পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সর্দার গুরুজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে যাত্রীরা পায়ে হেটে কলকাতার দিকে রওনা দেয়। বাধা দিল পুলিশ। শুরু হয়ে গেল

লড়াই। গদর-বিপ্লবীরা ঐ শিখ যাত্রীদের কিছু পিস্তল সরবরাহ করেছিল—কিন্তু রাইফেলের সঙ্গে পিস্তলের লড়াই চলে না। বহু শিখযাত্রী হতাহত হল। পুলিশের পক্ষেও দু'জন বাটশ অফিসার এবং তিনজন পুলিশ মারা যায়। যাত্রীদের বাটজনকে গ্রেপ্তার করে পাঞ্জাবে পাঠানো হয়; কিছু গুরুজিৎ সিং পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে পালিয়ে যান। যার মধ্যে একজনের নাম যোসেফ হালদার।

—মাই গড! কিন্তু আপনিই তো বললেন যে, ঐ জাহাজের যাত্রীরা ছিল নিঃশেষ। সেক্ষেত্রে যোসেফ হালদার অত সম্পদ পেলেন কী করে?

—ডক্টর দত্ত! সেটাই আমার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু! কিন্তু ব্যাপারটা মোস্ট কনফিডেনশিয়াল!

—সেটা সহজেই বোঝা যায়! তা বেশ, আপনি কী জনতে চান বলুন? আমি যোসেফ হালদারকে ছেলেবেলায় দেখেছি। তিনিই ঐ মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মেরীনগরের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে একজন। যোসেফ হালদারের বড় মেয়ে পামেলা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। আমরা একসঙ্গেই পড়াশুনা করেছি মিশনারি স্কুলে। সে আমার বাল্যবান্ধবী।

—যোসেফের সম্ভানাদি কী?

ডক্টর দত্ত হালদার-পরিবারের নানান তথ্য পরিবেশন করতে থাকেন। আমার পক্ষে সেসব কথা দ্বিতীয়বার বর্ণনা করা নিম্প্রয়োজন, কারণ পাঠককে আমি তা ইতিপূর্বে জানিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে ডক্টর দত্ত বললেন, মরকতকুঞ্জ পুরোনো কাগজপত্র আপনি কিছুই খুঁজে পাবেন না। পামেলার মৃত্যুর পর মিস্তি সব বাজে কাগজপত্র ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে।

বাসু-মামু ন্যাকা সাজলেন, মিস্তি কে?

ফলে আবার শুনতে হল একই ক্লাস্তিকর ইতিহাস। সেই সূত্র থেকে মামু প্রশ্ন করবার সুযোগ পেলেন, সূত্রটিতে একটা গুজব শুনলাম, অবশ্য গুজবে কান না দেওয়াই উচিত—ওঁর শেষ জন্মদিনে নাকি আত্মীয়স্বজনেরা সবাই জড়ো হয়েছিল, তখনই হয়তো কোন ঝগড়াঝাটি হয়ে থাকবে যেজন্য দ্বিতীয় উইল না করে—

—না না! অতীতিকর ঝগড়াঝাটি কিছু হয়নি। পামেলা সে রকম মেয়ে ছিল না। হলে, আমি খবর পেতাম—মেরীনগর ছোট জায়গা। ওর বাড়ির ঝি-চাকররা সেকথা রটিয়ে বেড়াত। তাছাড়া পামেলার মৃত্যুর দিন-সাতকে আগে আমি একটি ট্রেন্ড নার্সকে বহাল করেছিলাম। মৃত্যু সময়েও সে ছিল। তেমন কিছু ঘটে থাকলে আমি আশার কাছে খবর পেতাম।

—আই সি! তাহলে সেই সহচরী—কী যেন নাম—হ্যাঁ মিনতি মাইতি—সেই হয়তো সুযোগ বুঝে কত্রীকে দিয়ে নতুন একখানা উইল বানিয়ে নিয়েছে! বাহাণ্ডর বছরের একটি মৃত্যুপথযাত্রীগীক ভুলিয়ে ভালিয়ে—

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ডক্টর দত্ত। মাকপথেই বলে ওঠেন, আপনি ওদের দুজনের একজনকেও চেনেন না, তাই একথা ভাবতে পারছেন। পামেলা জনসনকে আমি ষাট বছর ধরে চিনতাম। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সই করানোর ক্ষমতা দুনিয়ায় কারো নেই। দ্বিতীয়ত মিস্তি মাইতি একটা নিটোল গবেষ্ট—নিনকম্পূ! বুঝেছেন? তার মাথাখ নিরেট গোবর। এমন একটা পরিকল্পনার কথা তার মাথাতেই আসবে না।

বাসু বললেন, দুনিয়ায় কত রকম রহস্যই তো অনুদঘাটিত থেকে যাচ্ছে। আর তা নিয়ে আমাদের কেন মাথা-ব্যথা বলুন?

—বটেই তো, বটেই তো!

—আপনি ঐ তিনজনের ঠিকানা আমাকে দিতে পারবেন? সুরেশ, স্মৃতিটুকু আর হেনার?

—বৃথা চেষ্টা! ওরা পুরোনো কথা কিছুই জানে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামায় না। আপনি বরং আর এক কাজ করতে পারেন। উষা বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সে এখানেই থাকে। পামেলার বান্ধবী। পারলে সে হয়তো কিছু বলতে পারবে।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

উষা বিশ্বাসের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বাসু বললেন, হয়তো তাঁর কাছে সুরেশ বা হেনার ঠিকানাটা পেয়ে যাব।

—সুরেশ বা হেনার ঠিকানা না দিতে পারলেও টুকুর ঠিকানাটা বোধ হয় আপনাকে দিতে পারবো। নির্মল জানে।

—নির্মল কে?

সূত্রান্তে ক্রান্ত সন্দেহটি করবরেটেড হল। ডাক্তার দত্ত তাঁর চেয়ারে ফোন করলেন, কিন্তু নির্মল দত্তগুপ্তকে পাওয়া গেল না। ও-প্রান্ত থেকে ঠেকে জানালো—কী একটা জরুরি প্রয়োজনে নির্মল সাইকেলে চেপে ঠর কাছের আসছে।

ডক্টর দত্ত বললেন, মিনিট পাঁচ-দশেকের মধ্যেই নির্মল এসে যাবে। একটু বসে যান।

তাই এল নির্মল দত্তগুপ্ত। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স। স্মার্ট, সুদর্শন। পিটার দত্ত তার সঙ্গে সাংবাদিক টি. পি. সেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেন-মহাশয় যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে ইচ্ছুক একথা শুনে তার চোখ কপালে উঠলো। ‘কোমাগাতামার্ক’র প্রসঙ্গটা উল্লেখিত না হওয়ায় ব্যাপারটা হয়তো তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল। আমাদের দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, সুরেশের ঠিকানা আমি জানি না। তবে টুকুর ঠিকানা জানি, সে নিশ্চয় তার দপ্তর পাওয়া জানে।

নির্মল একটি কাগজে স্মৃতিটুকুর ঠিকানা লিখে বাড়িয়ে ধরল। মামু তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গাঢ়াখান করলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বললুম, মামু, ‘কোমাগাতামার্ক’ সম্বন্ধে আপনি যেসব ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার্স বললেন, তা সত্যি?

—শিওর! ডক্টর দত্ত দু-চারদিনের ভিতরেই লাইব্রেরি থেকে বই এনে ভেরিফাই করবে। আমাদের সন্দেহ করেছে বলে নয়, মেম্বারগরের প্রতিষ্ঠাতার কোন হক-ইন্ডিস পাওয়া যায় কিনা যাচাই করতে। আমি যা বলেছি তা ঐতিহাসিক সত্য। তবে ঐ—ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন সামান্য একটু ভেজাল থাকে, এখানে তেমনি আছে যোসেফ হালদারের নামটা।

—হঠাৎ দুইয়ে দুইয়ে চার বানিয়ে ফেললেন কী করে?

—যেহেতু যোসেফ হালদার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে ভারতে ফিরে এসেছিলেন, এ খবরটা শুনলাম।

—ডক্টর দত্ত আপনাকে সন্দেহ করবে না কেন বললেন?

—সন্দেহ করার কী আছে? এমনটা তো নিত্য ঘটছে। একদল গণ্ডমূর্খ আর একদল গণ্ডমূর্খের জীবনী ক্রমাগত লিখছে।

আমি হেসে ফেলি। বলি, মামু! কথাটা কিন্তু আপনার নিজের তরফে ‘কমমিসিওন’ হলো না। বাসু-মামু চকিতে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, উটেটাও হলো না। আমি যোসেফ হালদারের জীবনী আদৌ লিখছি না। সেটা লিখছে টি. পি. সেন।

আমি বলি, কিন্তু ডাক্তার দত্তগুপ্তের চোখে আমি যে দৃষ্টি দেখেছি তাতে আশঙ্কা হয়, সে আপনাকেই সন্দেহ করছে, টি. পি. সেনকে নয়!

—ও ছোকরা স্বভাবগতভাবে সন্দেহবাদিকগ্রন্থ।

—তা যেন হলো। অতঃ কিম্ব?

—আর অবিশ্বাসীদের কাছে নয়। এবার আমাদের লক্ষ্যস্থল : উষা বিশ্বাস।



ছোট্ট একটা টালির শেড। সামনে এক-চিলতে বাগান। মরসুমি ফুল ফুটেছিল বিগত বসন্তে। তাদের শূকনো ডালপালা পড়ে আছে। গাঙ্গা অবশ্য এখনো ফুটেছে। কলবেল ছিল না, কড়া নাড়তে পাল্লাটা ইঞ্চি-দুয়েক ফাঁক হল। দেখা গেল, মোটা চশমা-পর্য্য একজোড়া কৌতুহলী কুংকুতে চোখ। মানুষটির সামান্য আভাস। উচ্চতা বোধ হয় পাঁচ ফুটের সামান্য কম—মাথার চুল ধবধবে সাদা। পরিধানেও একটা ধবধবে সাদা শাড়ি, নীলপাড়। বাঁ-কাঁধে প্রকাণ্ড একটা ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ব্রোচ—তাতে ইংরেজি দুটি অক্ষর ইউ এবং বি।

সেই দু-আঙুল ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, কী নাম?

বাসু-মামুকে এগিয়ে দিয়ে আমি পিছনে দাঁড়িয়েছি। বাসু-মামু হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, টি.পি.সেন।

বৃদ্ধা প্রতিনমস্কারের ধার দিয়েও গেলেন না। বলেন, কী বেচতে এসেছেন?

—বেচতে! না, বেচতে আসিনি তো কিছু!

—শ্যাম্পু, পাউডার, হেয়ার লোশন....মুখে মাখার হাবিজাবি।

—আজ্ঞে না। আমি সেলস্-রিপ্রেসেন্টেটিভ নই।

—অ! মার্কেট সার্ভেইং? আমার কত আয়, সংসারে ক-জন মানুষ, কী দিয়ে ভাত খাই, ভাজা মাছ উটে খেতে জানি কিনা?

—নো ম্যাডাম! আমি মার্কেট সার্ভে করতেও আসিনি।

—তবে আসুন, বসুন।

ফ্যানটা খুলে দিলেন। আমরা দুজনে দুটি বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসি। বৃদ্ধাও বসলেন। বললেন, একা মানুষ, সাবধান হতে হয়। বেগানা মানুষজন আসে, দিবা ভয়ালোকের মতো চেহারা, স্টেড-বুটেড, মুখে পাইপ, দ্যাখ-না-দ্যাখ, একগাদা হাবিজাবি গছিয়ে দেয়। ব্যাপার বুঝে নেবার আগেই দশ-বিশ টাকা হাওয়া।

—আজ্ঞে না, কিছুই বেচতে আসিনি আমরা।

—শুধু কি বেচা? আজকাল আবার ভুলুগ হয়েছে 'মার্কেট সার্ভেইং'। আপনার আয় কত? কি-চাকর ক'জন? হপ্পায় ক'দিন মাছ খান? —কেন রে বাপু?

—আজ্ঞে সেসব কিছু নয়, আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য জাতের। ডক্টর পিটার দস্তের কাছে আপনার নাম শুনে এসেছি।

—অ! দস্তটা তো একটা ক্যাবলা, তাকে কী গছালে?

বাসু-মামু শ্রাণ করলেন। তাঁর হাতে যে পাইপটা ছিল তা ইতিপূর্বেই পকেটজাত করে ফেলেছেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কী চাও বল?

বাসু-মামু নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন—অর্থাৎ টি.পি.সেন, সাংবাদিকের। উদ্দেশ্যটাও বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। 'কোমাগাতামার' প্রসঙ্গ তুলতেই বৃদ্ধা বললেন, ওটা জানি। তার সঙ্গে যোসেফ হালদারের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি চল্লিশ বছর ইয়ুনে ইতিহাস আর বাংলা পড়িয়েছি—ইদানীং আবার স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ানো ফ্যাশন হয়েছে। আমাকে 'কোমাগাতামার' গল্পো শোনাতে এস না। যোসেফের সঙ্গে গুরুজিৎ সিং-এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

## কটায়-কটায়-২

—আপনি নিশ্চয় জানেন?

—তুমি 'চার্ট-মাউস' কাকে বলে জানো?

—আজ্ঞে?

—জানো না। 'কোমাগাতামার' জাহাজে চেষ্টে যারা ভারতে এসেছিল তাদের আর্থিক সঙ্গতি ঐ চার্ট-মাউসের মতো! যোসেফ কোন মূল্য থেকে উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসেছিল জানি না, তবে তার এক্টিয়ারে ছিল আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা। আলাদীনকে চেন?

বাসুমামুকে বরাবর সওয়াল করতে দেখছি। আজ তাঁর জবাব দেওয়ার পালা। তিনি বেশ ধতমত খেয়ে গেছেন মনে হল। বুড়ি বললো, যাগগে মরুকগে, সে তোমার সমস্যা। তা বইটা লিখবে কি ইংরেজিতে না বাংলায়?

—আজ্ঞে বাংলায়।

—অ। 'পুন্ডানুপুন্ড' বানান করতে পারবে? 'আনুষঙ্গিক'—এ কোন 'ব'?' 'বিদ্যুদালোক' আর 'বিদ্যুদালোক'—এর মধ্যে কোন শব্দটা শুদ্ধ?

বাসুমামু নক-আউট!

বুদ্ধা বললেন, তুমি বলবে, সেটা যে প্রুফ-রিডিং করবে তার বিবেচ্য। তা তো বটেই! লেখক তো আর বাংলার পরীক্ষা দিতে বসেনি যে, বানান মুখস্ত করতে বসবে। তবু বলি ভাই, কিছু মনে কোরো না—হেটুভাই মনে করে বলছি—তোমার পোশাক-আশাক, চলন-বলন সবই ইংরেজি কেতায়। বইটা ইংরেজিতে লিখলেই ভাল করতে। যাক, আমার কাছে কী চাও?

—যোসেফ হালদারের পরিবার সম্বন্ধে যে-কোন তথ্য, সংবাদ। শুনেছি, মিস্ পামেলা জনসন আপনার বাঙ্কবী?

—ঐ দ্যাখো! শুদ্ধ বাংলায় বাক্যটা শেষ করতে পারলে না। একটা ক্রিয়াপদ থাকা উচিত ছিল, যাতে পাঠক বুঝতে পারে ব্যাপারটা অতীতকালের। লাইনটা হওয়া উচিত ছিল—'বাঙ্কবী ছিলেন?' তা ছিল। ঘনিষ্ঠ বাঙ্কবী। 'স্টে-ব্রাইট-স্টীল'—এর বাংলা কী হবে? সে তাই ছিল। মরচে লাগেনি কখনও তার গায়ে। নিখাদ সোনা। তেমনি দামী, তেমনি উজ্জ্বল।

বাসুমামু ফস করে বলে বসেন, মায় তাঁর শেষ উইলটাও?

—ওটা নেহে ইতি গজ।

—ইতি গজ! মানে?

—যুথিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র, স্বয়ং ধর্ম নয়, মহাকাব্যের একটি নয়রূপধারী চরিত্র। তাই অলঙ্করণের প্রয়োজনে পাকা সোনায় ওটুকু খাদ মেশাতে বাধ্য হয়েছিলেন বেদব্যাস। চাঁদে যেমন কলঙ্ক, সূর্যে যেমন...

—সূর্যে যেমন?

দমলেন না বুদ্ধা। তৎক্ষণাৎ বললেন, রাহুগ্রাস। প্রাকৃতিক নিয়ম! পামেলাও শেষমেশ রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। রাহুটি কে জানো? বুড়ো শিবতলার ঠাকুরমশাই। একটা ফেরেকবাজ বদমায়েশ, পরের মাথায় জ্যাকফ্রুট ভেঙে খাওয়া যার পেশা। পামেলা অবশ্য পড়েছিল—রাহু নয়, কেতুর পান্নায়। কেতুটি কে জানো? ঐ ঠাকুরমশায়ের একশ' আশি ডিগ্রি তফাতের অন্তরঙ্গ ধর্মপত্নী—সতী মা!

বেশ বোঝা যায়, বুড়ি কথা বলার লোক পায় না। একা-একা থাকে, তাতেই সে অভ্যস্ত; কিন্তু স্কুলে চাকরি করতো—ক্লাস নিতে হত, কথা বলতে ভালবাসে। একালে কারও সময় নেই যে, বুড়ির বকবকানি শোনে। যদি বা কেউ আসে সে সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ। আজ তাই সে প্রাণ খুলে বকবক করে গেল। তার 'সতী-মা'—এর কেচ্ছাটা সংক্ষেপ করলে এ রকম দাঁড়ায়:

মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে পামেলার নিমন্ত্রণ পেয়ে উষা বিশ্বাস এক মঙ্গলবার রাতে মরকতকুঞ্জে যান। গিয়ে দেখেন, সেখানে একটি প্ল্যানচেটের আসর বসেছে। ঠাকুরমশায়ের ধর্মপত্নী 'সতী-মা',



মিনতি মাইতি আর পামেলা বসেছিলেন প্ল্যানচেট করতে। উষাকে দশক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিস্ জনসন। জনান্তিকে মিস্ বিশ্বাসকে বলেছিলেন, আমি এটা বিশ্বাস করি না উষা, তবু খেলা মনে ব্যাপারটা যাচাই করতে চাই—তোমাকে ডেকেছি একটা বিশেষ কারণে। আমি জানি যে, এসেবে তুমি আসৌ বিশ্বাস কর না। তুমি শুধু লক্ষ্য করবে, ঐ সতী-মা নামের মেয়েটি আমাকে হিপনোটাইজ করছে কিনা। প্ল্যানচেট বৃজরুকি হতে পারে, ‘হিপনোটিক্স’ পরীক্ষিত সত্য! তাই আমি তোমার চোখ দিয়ে এই অপ্রাকৃত অপরাবিদ্যাটির পরীক্ষা করতে চাই।

উষা প্রতিবাদ করেছিলেন, কী দরকার এসব রিসক নেবার। তোমার শরীর দুর্বল...

—সেজন্যই তোমাকে ডাকা। শরীরটা যদি দুর্বল না থাকতো তাহলে আমি গ্যারান্টি দিতে পারতাম যে, ঐ অধর্শিক্ষিত মেয়েটা আমাকে সম্বোধিত করতে পারবে না। বুঝলে?

উষা তা সত্ত্বেও আপত্তি করেছিলেন, বুঝছি। কিন্তু তবু এটা আমার ভাল লাগছে না, পামেলা।

—জানি, তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান আমি করতে চাই। কিছুতেই সমস্যার সমাধান করতে পারছি না—যা যা করণীয় করেছি, কিছু... না, আমি দেখতে চাই পরলোক আছে কি না, তা থাকলে আমরা যা জানতে পারি না, বুঝতে পারি না, তার সমাধান তৈরি করতে পারেন কি না।

বাধ্য হয়ে উষা বিশ্বাসকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকতে হয়। ওরা তিনজনে যোসেফ হালদারের কথা চিন্তা করতে থাকেন। তিনজনের মধ্যে একমাত্র পামেলাই তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছেন, তাই বাকি দুজনের সুবিধার জন্য স্বর্গত যোসেফ হালদারের একটি ছবি টেবল-এ সাজানো ছিল।

ভূতের গল্প বলার ঢঙে মিস্ বিশ্বাস একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন। ফিস্ফিস করে বললেন, তারপর যা ঘটলো, তা তোমরা বিশ্বাস করবে না ভাই। কিন্তু একথা আদ্যন্ত সত্যি। আমি এক চুলও বাড়িয়ে বলছি না। আমি অবিবাসী, এসব বৃজরুকি বিশ্বাস করি না। করতাম না, এখনো করি না—কিন্তু এ এমন একটা অভিজ্ঞতা যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

—ঠিক কী দেখলেন আপনি?

—ঘরটা আধ-অন্ধকার। কিছু ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি একবারও ঐ সতী মায়ের চোখে-চোখে তাকাইনি, যাতে সে আমাকেও হিপনোটাইজ করতে না পারে। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম পামেলার দিকে। হঠাৎ সেখি পামেলার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে—মনে হল নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার—মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। আর ঠিক তখনই আমার মনে হল ওর মুখ থেকে একটা, না একটা নয়, দু-দুটো সাপের মত কী বেন বার হয়ে এল। ধূপের ধোয়ার মতো সে-দুটি কিতা ঠেকে থেকে ওর মাথার উপর উঠে যেন মিশে গেল। আমি প্রথমটা ভেবেছিলাম, ধূপেরই ধোয়া, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো তা নয়। প্রথমত, সেই রিবন দুটি স্পষ্টতই ওর মুখ থেকে বার হয়েছে, দ্বিতীয়ত, ধূপের ধোয়া হয় নীলচে-সাদা রঙের, এ-দুটি হলুদ রঙের; তৃতীয়ত, রিবন দুটি ‘হুমিনাস’—আই মীন, প্রোজ্জল, দীপ্তিযুক্ত,—ঝলমলে বা চকচকে নয়, স্নিগ্ধ দ্যুতিমান, প্রভাময়—জোনাকির আলো হলুদ রঙের হলে যেমনটা দেখাবে। ‘একটোপ্রাজ্জম’ বলে বোধহয় ওরা—অতীন্দ্রিয় লোক থেকে কোন বিদেহী আত্মা নাকি এভাবে কারাময় হতে পারে। আমি নাস্তিক, অবিবাসী, কিন্তু স্বীকার করব, ঐ খণ্ডমুহুর্তে আমি স্বীতিমতো ঝাবড়ে গিয়েছিলাম। চীৎকার করে উঠতে যাব, তার আগেই চেয়ার থেকে লাটিয়ে পড়ল পামেলা। ... আমি বাতি জ্বেলে নিলুম। টেলিফোনে পিটারকে তথক্ষণাৎ খবর দিলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে এসে পড়লো। এসব প্ল্যানচেটের আসর বসানোর জন্য আমাদেরই খামোখা গালমন্দ করলো। শুরু হল তার শেষ চিকিৎসা। এরপর মাত্র তিনটে দিন বেঁচেছিল সে।

বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, মোস্ট অ্যামেজিং! উনি কি সেদিন নিষিদ্ধ কিছু খেয়েছিলেন?

—ইম্পসিবল্। তার আগেই আশা বহাল হয়েছে। আশা পুরকারসহ, মানে ডক্টর দন্ডের নার্স। তার নির্দেশে ওর খাবার এবং ওষুধ দেওয়া হতো। বস্তুত সে নিজেই হাতে করে খাওয়াতো।

## কাটায়-কাটায়-২

—ডক্টর দত্ত কী বললেন?

—হঠাৎ ‘জনডিস’-এরই একটা অ্যাকিউট অ্যাটাক।

—আত্মীয়স্বজনকে খবর পাঠানো হল নিশ্চয়?

—তা হল। তবে ওরা তো আগের-আগের সপ্তাহে বারে বারে এসেছে। একবার হেনা-শ্রীতম যুগলে, একবার টুকু-সুরেশ একত্রে। এছাড়া শ্রীতম একাও একবার এসেছিল। আমি শেষ দিন পনেরো রোজই সম্ভ্রায় ওর কাছে যেতাম। কে-কবে এসেছে জানতে পারতাম। যা হোক, খবর পেয়ে সবাই যখন এলো তার আগেই পামেলা দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে।

বৃদ্ধার কাছ থেকে আর কিছু খবর পাওয়া গেল না।

আমরা যখন বিদায় নিয়ে চলে আসছি তখন বৃদ্ধা বললেন, চা-টা কিছুই তো খেলে না তোমরা। চা খাবে? জল বসিয়ে দেব? আমার নিজে হাতে বানানো কেকও আছে।

বাসুমামু হাত দুটি জোড় করে বললেন, আজ থাক দিদি। এইমাত্র সূতৃপ্তিতে চা-টা খেয়ে আসছি।

—থাক তবে। মনে হচ্ছে তোমাকে বারে বারেই আসতে হবে। বিপ্লবী যোসেফ হালদার সম্বন্ধে আজ তো আমরা প্রাথমিক আলোচনা করলাম শুধু। আবার এসো। খুব ভাল লাগল তোমাদের সঙ্গে গল্প করে।

পথে নেমে এসে বলি, বৃদ্ধি কিছু আপনাকে বাংলা বানান নিয়ে নাজোহাল করে ফেলেছিল। ‘আনুষঙ্গিক’-এ সত্যিই কোন ‘ষ’?

—‘ষ’। দিদিমশির ঐ রুডমেন্টারি তিনটি প্রশ্নেরই জবাব জানা ছিল আমার। তবে আমি না-জানার ভান করায় তিনি খুশি হলেন। সেটা দরকার ছিল। ঠুকে খুশি রাখা। না হলে সব কথা জানা যেতো না।

—কিন্তু বৃদ্ধি ও-কথা বললো কেন মামু? ও কি আন্দাজ করেছে যে, আপনি যোসেফের জীবনী লিখতে বসেননি আদৌ। বিপ্লবী যোসেফ হালদারের কথা তো...

অনেকক্ষণ পাইপ খাননি। এবার পকেট থেকে পাইপটা বার করতে করতে বাসুমামু বললেন, বৃদ্ধি একটি বাস্তবযু।

—সে যা হোক, এবার আমরা কোথায় যাবি?

—ব্যাক টু ক্যালকাটা। কাল আমি ‘কেস’ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তোমার দুটো কাজ, এখনি বলে রাখি, পরে হয়তো ভুলে যাবো। কাল সকালে গিয়ে আমাদের টিকিট দুটো ক্যানসেল করাতে হবে, আর তোমার মামীকে একটা টেলিগ্রাফ করে জানাতে হবে যে, আমাদের যেতে দু’চারদিন দেরী হবে।

তখন আমি কিছু বলিনি। ঠুকে তো জানি, রইয়ে-সইয়ে কথাটা পাড়তে হবে। এ একটা অহৈতুকী অ্যাডভেঞ্চার—যার কোনো মানে হয় না। ফেরার পথে প্রসঙ্গটা আবার উনিই তুললেন, গোপালপুর যাওয়া পিছিয়ে যাওয়ায় তুমি খুব মর্মান্বিত হয়েছো মনে হচ্ছে।

আমার আর সহ্য হল না। বলি, দারুণ ডিডাকশান করেছেন এবার। কারেই!!

—বৃদ্ধি যদি রোগে ভুগে মারা না যেতো, যদি তাকে কেউ খুন করতো, তাহলে নিশ্চয় তুমি এত উদাসীন থাকতে পেরতেন না, নয়?

—নিশ্চয় নয়। কিন্তু একত্রে তো মৃত ব্যক্তির কোনও উপকারই করতে পারবো না আমরা।

—কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু-তদন্ত করে গোয়েন্দা সেই মৃত ব্যক্তির উপকার করে?

—না, তা বলছি না। কিন্তু এখানে মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক।

—কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনোর চেঁচা এখানে কেউ একজন করেছে। সেটা মানো?

—কিন্তু সে সফলকাম হয়নি। ফলে...

—কে ঠুকে খুন করতে চেয়েছিল জানবার কৌতূহল নেই তোমার?

—আপনার ঐ ডিডাকশানের তো একটাই সূত্র—সেই পেরেকটা। হয়তো সেটা আবহমান কাল থেকেই ওখানে পোতা আছে।

—না নেই। ভার্শিটা টাটকা। আমি নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখছি। এখনো গন্ধ পাওয়া যায়।

—কিন্তু তার তো হাজারটা ব্যাখ্যা হতে পারে।

—একথা তুমি আগেও বলেছ কৌশিক, ন-শো' নিরানব্বইটাকে বাদ দিয়ে তার একটা আমি তোমাকে দাখিল করতে বলেছিলাম। তখন তুমি তা বলতে পারিনি। এখন পারো?

এর কী জবাব?

উনি এক নাগাড়ে বলেই চলেন, আমাদের গণ্ডিটা ছোট। সবাই শূতে যাবার পরে সুতোটাকে খাটানো হয়েছিল। ফলে, বাড়ির ভিতরে যে-কয়টি প্রাণী, তাদের মধ্যে একজন। তার মানে আমাদের সম্বেদজনক ব্যক্তিকে বেছে নিতে হবে ছয়জনের প্যানেল থেকে : শ্রীতম ঠাকুর, হেনা ঠাকুর, স্মৃতিটুকু, সুরেশ, মিনতি মাইতি আর শান্তি। মালি, ছেদিলাল, ড্রাইভার মোহন আর সরসু বাড়ির বাইরে শোয়।

—শান্তি দেবীকে আপনি বাদ দিতে পারেন মামু।

—পারি কি? সেও 'লিগালিস' পেয়েছে। যার জন্যে সে আর নতুন চাকরি করতে অনিচ্ছুক। কত টাকা পেয়েছে জানি না, কিন্তু তার সুদ থেকে একটা লোকের খরচ মেটানো যায়।

—কিন্তু তার জন্যে শান্তি দেবী এ খুনটা করবে এটা মেনে নিতে মন সরছে না।

—কারেস্ত। সম্ভাবনা কম। সে দীর্ঘদিন বহাল আছে। কিন্তু আমাদের সর্বকম সম্ভাবনাকেই বিচার করতে হবে।

—তাহলে আমি বলবো আপনার হিসাবে সাতজন হওয়া উচিত। কেন ধরে নিচ্ছেন যে, মিস্ পামেলা জনসন নিজেই ঐ তারটা খাটাননি অন্য কাউকে হত্যা করতে?

—একটি মাত্র হেতুতে। সেক্ষেত্রে তিনি ওটাতে পা জড়িয়ে উঠে পড়তেন না। তিনি সাবধানে তারটা ডিঙিয়ে যেতেন।

অপ্রস্তুত হতে হলো আমাকে। বলি, সবাই কিন্তু বলেছে উইলটা পড়ার সময় মিনতি মাইতি একেবারে বজ্রহত হয়ে যায়। সে নাকি জ্ঞান হারায়।

—বলেছে। সবাই না হলেও অনেকে। তা ছাড়া ডক্টর দত্তের মতে সে গবেট, নিনকম্পূ। এসবই অবশ্য শোনা কথা। আমি ভেরিকাই করে দেখিনি। আপাতত আমাদের শুধু তথ্য-নির্ভর হতে হবে। ওনলি ফ্যাক্টস্।

—অবিসংবাদিত তথ্য কী কী?

—এক, মিস্ জনসনের পতন, সেটা অনেকে নয়, সবাই বলেছে। দুই, পতনের হেতু একটি মৃত্যুকাঁদ, যা কেউ খাটিয়েছে—

—সেটা সবাই তো নয়ই, অনেকেও নয়, একজনমাত্র বলেছেন।

—না কৌশিক! তার 'এভিডেন্স' রয়েছে। প্রমাণ! পেরেকটা এখনো আছে, তার মাথায় ভার্শিয়ার গাছটা এখনো আছে, মিস্ জনসনের চিঠির ভাষাতে তার ইঙ্গিত, কুসুরটা সে রাতে বাড়িতে ছিল না, বলটা সে স্থানচ্যুত করতে পারে না—যে-কথা মৃত্যুপথযাত্রী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। অল দিজ থিংস আর ফ্যাক্টস্।

—সুতরাং?

—সুতরাং আমাদের ঝুঁকে দেখতে হবে—কে ঐ তারটা খাটিয়েছিলো। এরপর প্রচলিত পথ-পরিক্রমা। বৃদ্ধার মৃত্যুতে কে উপকৃত হলো?

—মিনতি মাইতি! অথচ যদি আপনার অনুমান সত্য হয়—অর্থাৎ সে রাতে কেউ সিঁড়ির মাথায় সুতো বেঁধে ঠেকে হত্যা করতে চেয়ে থাকে তাহলে মিনতি মাইতির কোনও উপকার হত না।

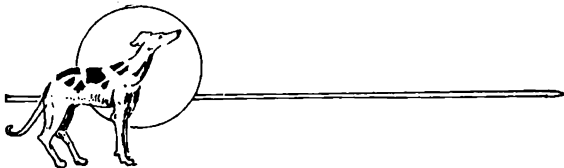
—ঠিক তাই! তাই ঐ ছয়জনই আমাদের সম্মুখের পাত্র-পাত্রী। এ কথা ভুললে চলবে না যে,

## কিটান-কিটান-২

সম্ভবত এ পতনজনিত দুর্ঘটনা থেকেই মিস্ জনসন তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর উইলটা বদলে ফেলেন। নয় কি?

—তার মানে এ রহস্যজ্ঞাল ভেদ না করে আপনি গোপালপুর যাচ্ছেন না।

—দারুণ ডিভাঙ্কি করেছে এবার কৌশিক। দ্যাটস্ অলসো এ ফ্যাক্ট! কারেক্ট!!



স্মৃতিচকুর অ্যাপার্টমেন্ট সাদার্ন অ্যাভিনিউর উপরে—প্রকাণ্ড এক প্রাসাদের সপ্তম ফ্লোরে। দক্ষিণ-খোলা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট, দারুণ পশ! লিফটে করে উঠে কল বেল দিতে একটি মেড-সার্ভেন্ট শিপ-হোল খুলে উকি দিল। বললে, কী চাই?

বাসু-মামু সেই গর্ত দিয়ে একটি ভিজিটিং কার্ড গলিয়ে দিলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর উনি নিশ্চয় সাংবাদিক বা রিটার্ডার্ড নেভাল অফিসারের জাল-কার্ড বানাননি। আন্দাজ হল এবার সঠিক পরিচয়ই দিয়েছেন। একটু পরে দরজাটা খুলে গেল। মেড-সার্ভেন্টটিকে এবার দেখা গেল—ব্রৌটা, পরিচ্ছন্ন। বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে বললো, বসুন। উনি আসছেন এখনই, ফ্যানটা খুলে দেব?

এয়ার-কন্ডিশন করা ঘর। বেশ ঠাণ্ডা। আমি বললাম, দরকার হবে না।

গতকাল মামলায় জিতেছেন বাসু-মামু। তাঁর মেজাজ শরিফ। আমি সাজেস্ট করেছিলাম, সবার আগে সেই অ্যাটর্নি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে—প্রবীর চক্রবর্তী। মামু রাজী হননি। বলেছিলেন, সে আইনজ্ঞ মানুষ। তার কাছে 'কোমাগাতামারু'র গল্প শোনানো চলবে না। সে রাজ্যে যেতে হলে পাসপোর্ট চাই। আই মীন 'ভিসা'।

বোধগম্য হয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর রাজ্যে ঢোকার ভিসা কোথায় পাবেন?

—সেই 'ভিসা' যোগাড় করতেই তো এসেছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গৃহস্থামিনী আবির্ভূত হলেন। বয়স আঠাশ-উনত্রিশ, যদিও সাজসজ্জার বাহরে আরও কম দেখায়, তবু চোখের কোলে আসল বয়সটা ধরা পড়ে ঠিকই। সুন্দরী খুব কিছু নয়, তবে সুতনুকা। দীর্ঘাঙ্গী, তরী, এক মাথা শ্যাম্পু-করা চুল, সিঁকের মতো নরম। পরনে একটা ঢিলেঢালা কিমোনো জাতীয় পোশাক। পায়ে হাভানা ঘাসের চটি। এই সাত-সকালেই নিখুঁত প্রসাধন সেরে রেখেছে। যে ভঙ্গিতে সে ভিতর থেকে সাবলীলভাবে এগিয়ে এল তাতে মনে হল, ও বিউটি কম্পিটিশনে এবার বৃষ্টি ডায়ালে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার হাতে বাসু-মামুর ভিজিটিং কার্ডখানা। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে সে স্থির করে নিল তার লক্ষ্য। ঠুর দিকে ফিরে বললে, আপনিই নিশ্চয়?

বাসু-মামু উঠে দাঁড়িয়ে ফরাসী কায়দায় 'বাও' করে বললেন, অ্যাট য়োর সার্ভিস মাদমোয়াজেলে। আপনার প্রভাতী অবসর বিনোদনে ব্যাঘাত ঘটাবি বলে দুঃখিত।

মেয়েটিও একই কায়দায় 'প্রতি-বাও' করে বললে, ঠাসাতে, মসিয়ো বাসু! বসুন। তারপর আমাকে। দেখে নিয়ে মামুকেই প্রশ্ন করে : ডক্টর ওয়াটসন?

বাসু সে প্রশ্নের জবাব দিলেন তির্যকভাবে, আমার পরিচয় জানেন দেখছি।

—আমাকে 'তুমি'ই বলবেন। আপনাকে কে না জানে? খুন্সী আসামীকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনাই আপনার পেশাগিটি।

—ভুল হল তোমার। ‘খুনী-আসামী’ নয়, খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত নির্দোষ আসামীদের!  
—সেটা হেয়ার-সে। ‘কাটা-সিরিজ’ বেছে বেছে সেই গল্পগুলিই ছাপা হয়, এইমাত্র! কী দুঃখের কথা—আমার অটোগ্রাফ খাতাখানা হারিয়ে ফেলেছি! যা হোক, আপনার এই প্রভাতী-হানার উদ্দেশ্যটা যদি ব্যক্ত করেন—

—পরশু দিন আমি তোমার পিসির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি।

স্মৃতিটুকুর ম্যাসকারা-করা আখিপল্লব কিছু বিস্ময়িত হল; বললে, আমার পিসি?

—তাই বলেছি আমি। তোমার পিতৃস্বসা, পিসি।

—আপনার কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে মিস্টার বাসু। আমার পিসিরা সবাই স্বর্গগতা। শেষ পিতৃস্বসা নিকৃতি পেয়েছেন মাস দুয়েক আগে।

—তার কথাই বলেছি আমি, মিস্ পামেলা জনসন।

—ওসব ভূতের গল্প পত্র-পত্রিকাতেই মানায় বাসু-সাহেব। স্বর্গীয় পোস্ট-অফিসের কাহিনী এমন প্রকাশ্য দিবালোকে বোমানান।

—জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তিনি চিঠিখানা লিখেছিলেন সতেরই এপ্রিল আমি তা পেয়েছি পরশু, উনত্রিশে জুন!

স্মৃতিটুকু একটি নড়েচড়ে বসলো। সামনের টি-পয়ের উপর থেকে টেনে নিল একটি সুদৃশ্য সিগারেট-কেস। বাড়িয়ে ধরল আমাদের দিকে। আমরা প্রত্যাখ্যান করায় সে নিজেই একটি ধরালো। তারপর এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বললে, তা আমার পূজ্যপাদ পিতৃস্বসা কী লিখেছিলেন?

—সেটা এখনই বলতে পারছি না, মিস্ হালদার। ব্যাপারটা নিতান্ত গোপন!

স্মৃতিটুকু নীরবে বার-দুই-তিন ধোয়া গিলল। তারপর বললে, তা আমার কাছে কী চাইতে এসেছেন?

—কয়েকটি তথ্য। তুমি অনুমতি করলে দু-একটি প্রদ্র করতে চাই।

—কী জাতীয় প্রদ্র?

—তোমাদের পারিবারিক বিষয়ে।

আবার মেয়েটি দু-চারবার ধোয়া টানলো। তারপর বলে, একটা নমুনা শোনাতে পারেন?

—নিশ্চয়। যেমন, তোমার দাদার বর্তমান ঠিকানাটা আমি জানতে চাই—সুরেশ হালদারের।

স্মৃতিটুকু তার সিগারেটের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, আয়াম সরি। তার বর্তমান ঠিকানা ঠিক জানি না। সে পশ্চিম ভারতে গেছে, বোম্বাই। কোন হোটেল উঠেছে তা আমার জ্ঞান নেই?

—কবে বোম্বাই গেছে?

—গতকাল। এটাই কি জানতে এসেছিলেন আমার কাছে?

—না। আরও অনেকগুলি প্রশ্ন ছিল আমার। যেমন ধর, আমি জানতে চাই : তোমার বড়পিসি যেভাবে তার সম্পত্তি এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে দান করে গেলেন তাতে কি তোমরা ক্ষুব্ধ নও? দ্বিতীয়ত : ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্তের সঙ্গে তোমার এনগেজমেন্ট কতদিন আগে হয়েছে?

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মেয়েটি। যেন মনস্থির করলো। দৃঢ়স্বরে বললো, দুটো প্রশ্নের একটাই জবাব : আমার ব্যক্তিগত জীবনে অপরের নাক গলানো আমি পছন্দ করি না, বিশেষ করে সে নাকটা যদি হয় কোন গোয়েন্দার !

বাসু-সাহেব হাসলেন। বললেন, আমি গোয়েন্দা নই। যা হোক, আমি তোমার মনোভাব বুঝেছি। আবার বলি, তোমার প্রভাতী অবসর-বিনোদনে ব্যাঘাত করে গোলাম বলে দুঃখিত। এস কৌশিক।

দুজনই উঠে পড়ি। ঘরের কাছাকাছি এসে পৌছাতেই শোনা গেল : শুনুন?

বাসু-সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন, নির্বাক।

—বসুন।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

পায়ে পায়ে ফিরে এসে একই আসনে বসলাম দুজনে। মেয়েটি বললে, দু-তরফাই খোলাখুলি হলে ভাল হয়। হয়তো আপনার মতো একটি মানুষেরই দরকার ছিল আমার। আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো অযাচিত এসেছেন। ফিরিয়ে দেওয়াটা হয়তো বোকামি হবে। বলুন, ঐ শেষ উইলটা বরবাদ করার কোন ব্যবস্থা করা যায়?

—উকিলের পরামর্শ নিয়েছো?

—একশিক! তারা একবারো বলেছে, বুড়ি বজ্র আঁটুনি দিয়েছে, কোনও ফস্কা গেরোর চিক্‌মায় কোথাও নেই।

—কিন্তু সেটা তুমি বিশ্বাস কর না?

—না, করি না। আমার ধারণা—এ দুনিয়ায় সব কিছুই সম্ভব যদি যথেষ্ট খরচ করতে কেউ রাজী থাকে, আর এমন সহকারী বেছে নেয় যার বিবেক পাণ্ডবাগ্রজের মতো সজ্ঞার কাঁটা নয়।

—অর্থাৎ তুমি যথেষ্ট খরচ করতে রাজী এবং তোমার অনুমান যে, আমার বিবেক সজ্ঞার কাঁটার মতো নয়?

—তেমন-তেমন অবস্থায় পড়লে স্বয়ং ধর্মপুত্রও 'ইতি গজ'র আড়ালে নিজের বিবেককে টেম্পারারিলি আড়াল করে রাখেন! নয় কি?

—কারেই! কিন্তু কী জাতীয় সমাধান সেই সহকারী দাখিল করবে?

—সেটা তার বিবেচ্য। মূল উইলটা চুরি যেতে পারে, তার পরিবর্তে একটা জাল উইল আবিস্কৃত হতে পারে; কিংবা মিন্‌তি মাইতিকে কেউ অপহরণ করতে পারে, হয়তো ভয়ে সে স্বীকার করবে যে, বুদ্ধিকে ভয় দেখিয়ে সে দ্বিতীয় একখানি উইল বানিয়ে নিয়েছিল—

—তোমার মস্তিষ্ক খুবই উর্বর দেখছি!

—আপনার কী জবাব, তাই বলুন? আমি খোলাখুলি আমার তাস বিছিয়ে দিয়েছি। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করতে চান, তবে উঠে পড়ুন, দরজাটা খোলাই আছে।

আমার কিম্বদের অবধি রইল না বাসু-মামুর জবাবে—আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছি না।

টুকু খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় বললে, আপনার চালা, ডক্টর ওয়াটসন বোধহয় মর্মান্বিত। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় বললে, আপনার চালা, ডক্টর ওয়াটসন বোধহয় মর্মান্বিত।

বাসু-মামু তার জবাবে ইংরাজিতে বললেন, ডক্টর ওয়াটসনকে আমি সামলাচ্ছি। ওর বিবেক মাঝে মাঝে সজ্ঞার কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার প্রতি ওর আনুগত্য অপরিবর্তনীয়। তুমি বরং তোমার মেড-সার্ভেটকে কোন ছুতোনাভায় বাইরে পাঠিয়ে দাও। মনে হচ্ছে, পাশের ঘরে সে উৎকর্ষ হয়ে উঠেছে।

টুকু সামলে নিল। উঠে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল সে। লক্ষ্য করে দেখলাম, সেই স্ট্রো মেড-সার্ভেটটি সদর-দরজা খুলে কী কিনতে বাইরে গেল। দরজাটা খোলাই রইল। হাট করে খোলা নয়। কিন্তু লক করাও নয়।

মামু আমার দিকে ফিরে বললেন, নিজেকে সংযত কর কৌশিক। আমরা বে-আইনি কিছু করছি না। কিন্তু আইনের ভিতরে থেকেও অনেক কিছু করা যায়।

টুকু বললে, টার্মসটা এই পর্যায় ঠিক করে নিলে ভাল হয় নাকি? অর্থাৎ আপনি যদি উইলখানা নাকচ করতে পারেন তাহলে আমাদের তিনজনের যৌথ শেয়ারের কত পার্সেন্ট দিতে হবে?

—তিনজনের তরফেই তুমি কথা বলবে?

—কেন নয়? তিনজনের একই অবস্থা—আমি, সুরেশ আর হেনা। উইলটা নাকচ হলে তিনজনের একই লাভ। তবে হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনার প্রস্তাবটা শুনলে আমি আলোচনা করে দেখতে পারি।

—বিতুইন ফাইভ টু ফিফটিন পারসেন্ট। পারসেন্টেজটা নির্ভর করবে আমার কাজের ওপর। আই মিন, আইনকে কতখানি নিজেদের স্বপক্ষে টেনে আনতে হবে, তার উপর।

—এগ্রীড!

—এবার মন দিয়ে শোন। সচরাচর—ধর শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে আমি আইনের অঙ্ক সেবক। কিন্তু শততম ক্ষেত্রে—আমি চক্ষুস্থান! প্রথম কথা, তাতে অর্থের পরিমাণটা যথেষ্ট হওয়া দরকার—এবার যেমন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমার সুনামে যেন কোনভাবেই আঘাত না লাগে—ব্যাপারটা বুঝলে?

—জলের মতো। এখন আপনি খোলাখুলি সব কথা জানতে চাইতে পারেন।

—ঠিক আছে। প্রথমত বল, কত তারিখে এই শেষ উইলটা হয়েছিল? কে-কে সাক্ষী?

—একশে এপ্রিল। প্রবীর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। সাক্ষী হিসাবে আছে দুজন—তাদের সঙ্গে করেই এনেছিলেন প্রবীরবাবু, ল-ক্লার্ক। স্থানীয় লোক নয়।

—আর আগের উইলখানা? কবে হয়? কী তার প্রডিশন?

—প্রায় বছর পাঁচেক আগে সেখানি তৈরি করেন বড়পিসি—ঐ প্রবীরবাবুকে দিয়েই। কে-কে সেবার সাক্ষী ছিল জানি না। তাতে বলা হয়েছিল, শান্তি আর সে-আমলের সহচরীকে দু-দশ হাজার দিয়ে ঠর সমস্ত সম্পত্তি তিন ভাগ হবে। পাব আমরা তিনজন—আমি, সুরেশ আর হেনা।

—কোনও 'ট্রাস্ট'-এর মাধ্যমে?

—না, সরাসরি আমরা তিনজনই।

—এবার সাবধানে জবাব দিও—তোমরা সকলেই কি জানতে সেই উইলের কথা?

—নিশ্চয়ই। মেরীনগরের অনেকেই জানতো। পিসিই গল্প করেছিল পীটার কাকার কাছে, উষা পিসির কাছে। বড়পিসি আমাদের বলে রেখেছিল। তার কাছে ধার চাইলেই সে বলতো, আমি দু-চোখ বুজলে তো তোরাই সব পাবি বাপু—এখন কিছু চাস না।

—তোমার কি মনে হয়—তোমাদের যদি নিতান্ত প্রয়োজন হত, ধর কোনও কঠিন অসুখ-বিসুখ, তাহলেও কি মিস জেনসন তোমাদের ধার দিতেন না?

—দিত, তবে প্রয়োজনের সত্যতা যাচাই করে। মুখের কথায় নয়! ঋণগ্রহণ নিয়ে যদি সেখত যে, সত্যিই আমাদের টাকার প্রয়োজন, তবেই সে সাহায্য করত। নচেৎ নয়।

—তার মানে ঠর ধারণা ছিল তোমাদের আর্থিক সঙ্গতি এখন যা, তাতে তোমাদের টাকা ধার দেওয়ার কোন মানে হয় না?

—ঠিক তাই।

—অথচ তোমার নিজস্ব ধারণা যে, তোমার আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট নয়?

আবার সোজা হয়ে বসল টুকু। বললে, খুলেই বলি শুনুন। আমার বাবা 'ব' হালদার আমাদের দু-ভাইবোনের জন্য যথেষ্টই রেখে গেছিলেন। মা আগেই মারা যায়। আমরা এক-এক জনে পাই দেড় লাখ করে। হয়তো তার সুদ থেকেই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন মিটত; কিন্তু তা হ'ল না। সুরেশ রেস খেলে টাকাটা ওড়ালো, আর আমি—

দক্ষিণের বড় জানালা দিয়ে টুকু লোক-এর গাছ-গাছালির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

—আর তুমি?

—লুক হিয়ার স্যার! আমি মনে করি ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সুইসাইড করা সহজ! একটাই জীবন, ক্ষণস্থায়ী যৌবন—আমি তার প্রতিটি মুহূর্তকে ভোগ করতে চাই। 'ভোগ' শব্দটা সবরকম অর্থে। তাই আমি করে এসেছি, তাই করে যাবো—

বাসু-মামু অকপটে প্রশ্ন করলেন, সেই দেড় লাখের মধ্যে তোমার অংশে কতটা বাকি আছে?

## কাটায়-কাটায়-২

—সতেরশ' তের টাকা আশি নয়! পয়সা—ব্যাক ব্যালেন্সে; লাস্ট উইথড্রয়ালের পর। এছাড়া হয়তো কিছু আছে আমার ভ্যানিটি ব্যাগে।

—এক্ষেত্রে তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হয়।

হঠাৎ বিলখিলিয়ে হেসে উঠল দুঃসাহসী মেয়েটা। বললে, শুমু আমার জন্য নয় বাসু-সাহেব। আপনার জন্যও—কারণ ব্যর্থ হলে আপনার খরচাপাতি মেটাবার ক্ষমতাও আমার নেই!

—তাইতো দেখছি। এখন বল তো, সিগ্রেট খাও, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। মদ খাও?

—খাই। দিশি নয়, খাটি বিলাতী হলে। প্রায়ই খাই। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায়।

—ড্রাগস্?

—কখনো নয়।

—প্রেম-ট্রেমের ইতিহাস?

—প্রচুর। সবক'টা ছেলের নামও মনে নেই। তবে এখন শুমু একজনই বয়স্কৃত: নির্মল:

—কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল সে তোমার ভিন্ন-মেরুর বাসিন্দা। তাই নয়?

—ঠিকই! আমাদের জীবনদর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু একমাত্র তাকেই আজ ভালবাসি।

—তার আর্থিক সঙ্গতি বোধহয় সামান্যই, নয়?

—দুর্ভাগ্যবশত তাই। টাকার কথা বিবেচনা করে আমরা কেউই পরস্পরকে ভালবাসিনি। ও জানে আমি প্রায়-নিঃশেষ। কিন্তু ও একজন জিনিয়াস! কী একটা আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছে। সাফল্যমণ্ডিত যদি হয়, পেটেন্ট যদি নিতে পারে—

—ও নিশ্চয় জানত যে, মিস জনসন মারা গেলে তুমি প্রচুর সম্পত্তি লাভ করবে?

—হ্যাঁ তাই। কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরেও আমাদের এনগেজমেন্টটা ভেঙে যায়নি। আপনি নির্মলকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি। মেরীনগরে। সেই তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিয়েছে। সুরেশের ঠিকানাটা সে জানে না বলল।

—সুরেশকে কেন খুঁজছেন আপনি?

বাসু-মামু জবাব দিতে পারলেন না। ঠিক তখনই সদর দরজাটা হাট করে খুলে গেল। একটি দীর্ঘকান্তি সুবেশ, সুন্দর, প্রাণবন্ত যুবক দ্রুত প্রবেশ করল ঘরে। বললে, সুরেশ! সুরেশের নাম শুনলাম যেন? স্পিক অফ দ্য ডেভিল, অ্যান্ড দ্য ডেভিল জাম্পস ইন!

স্মৃতিটুকু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চকিতে তাকিয়ে দেখল বাসু-মামুর দিকে। তারপর ভাইয়ের দিকে ফিরে বললে, তুই বসে যাসনি?

—বসে? মানে?

বাসু-মামু হঠাৎ বলে উঠলেন, ভালই হল তুমি এসে পড়েছ, সুরেশ। তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম আমরা।

—বাট হোয়াই?

স্মৃতিটুকু ফর্মাল ইনট্রোডাকশান করিয়ে দিল। আমাকে বাদ দিয়ে। বললে, ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। ইনি স্বীকৃত হয়েছেন, আমাদের স্বার্থে ঐ উইলখানি নাকচ করে দেবার ব্যাপারে উনি আমাদের সাহায্য করবেন। পারিভ্রমিক, পাঁচ থেকে পনেরো শতাংশ—আমরা সাফল্য লাভ করতে পারলে; ব্যর্থ হলে আমরাও ব্যর্থ হব শেমেট করতে!

সুরেশ দারুণ খুশিয়াল হয়ে ওঠে। বলে, গ্র্যান্ড আইডিয়া। তুই ঠর খোজ পেলি কী করে?

—না, আমি ঠকে ডেকে পাঠাইনি। উনি নিজে থেকেই এসেছেন।

—মোস্ট ইন্টারেস্টিং! কিন্তু আমি যতদূর জানি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু ক্রিমিনালদের বিপক্ষে থাকেন, তাদের পক্ষে তো ঠকে—



স্মৃতিটুকু মাঝপথেই বলে ওঠে, আমরা ক্রিমিনাল নই।

—কিন্তু প্রয়োজনে হতে স্বীকৃত! তাই নয়? তুই হয়তো মুখে স্বীকার করবি না, আমার কিন্তু সব খোলামেলা। বুকেছেন, বাসু-সাহেব, দু-একবার ছোটখাটো ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু হাত পাকিয়েছি। বড়পিসির একটা চেক নিয়ে একবার ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। আমি শুধু ঠুর লেখা সংখ্যাটায় একটা বাড়তি শূন্য যোগ করেছিলাম—শ্রেফ শূন্য! তার আর কী দাম বলুন? কিন্তু বড়পিসি ঠিক ধরে ফেললো। বৃড়ির দৃষ্টি ছিল ঈগলের মতো!

—তা ঠিক। —বললেন বাসু-মামু—এক বাস্তিল একশ টাকার নোট থেকে মাত্র পাঁচখানা খোয়া গেলেও তাঁর নজরে পড়ে!

—তার মানে?

—আমি ঠুর শেষ জন্মদিনের আগের দিনটার কথা বলছি। হলঘরের ড্রয়ারে, যাতে ক্রিসির বলটা রাখা ছিল!

ধীরে ধীরে সোফায় বসে পড়ে সুরেশ, বাই জোভা! আপনি তা কেমন করে জানলেন?

স্মৃতিটুকু বললে, উনি পিসির লেখা একটা চিঠি পেয়েছেন। পিসি ঠুকে জানিয়েছিল।

মামু প্রতিবাদ করলেন না। বললেন, শেষ দিকের ঘটনাগুলো তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে হবে। শূনেছি ঠুর জন্মদিনে তোমরা ঠুর কাছে গিয়েছিলে, কিন্তু জন্মদিনের আগের রাতে ছয় তারিখে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাই না?

সুরেশ বলে, হ্যাঁ। রাত সাড়ে দশটায় বড়পিসি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। ঠুর একটা কুকুর আছে—ও, আপনি তো! জানেনই—সেই ক্রিসির বলে পা দিয়ে হড়কে পড়ে যায়।

—খুব আঘাত পান তিনি?

—খুব কিছু নয়। দুর্ভাগ্যবশত মাথাটা নিচের দিকে রেখে পড়েননি তিনি। তাহলে না হয় বলা যেত মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। আর তাতেই দ্বিতীয় উইলখানা বানিয়ে ফেলেন।

—তা বটে! মাথা নিচের দিকে রেখে না-পড়ায় তোমরা মর্মান্বিত?

স্মৃতিটুকু প্রতিবাদ করে—কী যা তা বলছেন!

সুরেশ কিন্তু সহজ ভাবেই নিল ব্যাপারটা। বললে, তুই বুঝতে পারছিস না টুকু, উনি বলতে চাইছেন—সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় উইল বানানো ঠুর পক্ষে সম্ভবপরই হত না! অস্বীকার করে কী লাভ? তিন-হপ্তা বেঁচে থাকায় আমরা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছি!

—তোমরা তারপর কে-কবে কলকাতায় ফিরে গেলে?

—সবাই একই দিনে, শুক্রবার, দশ তারিখ সকালে।

—তারপর কবে তোমরা মেরীনগরে যাও?

—দু'হপ্তা বাদে মানে—পঁচিশে, শনিবার।

—আর মিস্ পামেলা জনসন মারা গেলেন পয়লা মে? শুক্রবার?

—হ্যাঁ, তাই।

—তারপর, তৃতীয়বার কবে গেলে?

—ঠুর, মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শনিবার সকালে, সোসরা মে।

বাসু-মামু এবার টুকুর দিকে ফিরে বললেন, পঁচিশে শনিবার তুমিও সুরেশের সঙ্গে গেছিলে?

—হ্যাঁ।

—সেটা ঠুর দ্বিতীয় উইল করার চারদিন পরে। তখন কি তিনি বলেননি যে, তিনি দ্বিতীয় একটা উইল করেছেন?

## কাটার-কাটার-২

আশ্চর্য! দুজনে প্রায় একই সঙ্গে জবাব দিয়ে বসলো। টুকু বললে—‘না’। আর সুরেশ বললে, ‘বলেছিলেন’।

বাসু-মামু সুরেশের দিকে ফিরে দ্বিতীয়বার বললেন, বলেছিলেন?

স্মৃতিটুকুও একই সঙ্গে বললে, সুরেশ!

সুরেশ দুজনের দিকেই তাকিয়ে দেখল। ছোট বোনকে বললে, তোর মনে নেই? আমার যতদূর মনে হচ্ছে তোকে তা আমি বলেছিলাম।

তারপর বাসু-মামুর দিকে ফিরে বললে, বুড়ি আমাকে দ্বিতীয় উইলখানি দেখিয়েও ছিল। ওর ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে বুড়ি উদগার-উমুখ আয়েয়গিরির মতো বসেছিল। বললে, ‘আমার বাবা, এবং বোনেরা শান্তি পাবেন না তাঁদের রক্ত জল করা টাকা কেউ যদি রেস খেলে বা ফুর্তি করে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়, অথবা প্রীতমের মতো ফাটকাবাজি করে। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি মিন্টিকে দিয়ে যাব বলে স্থির করেছি। মিন্টিটা বোকা, কিছু সং। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ’। তখন আমি বললাম, ‘এসব কথা আমাকে ডেকে কেন বলছ বড়পিসি?’ উনি বললেন, ‘আমার মৃত্যুর পর যাতে তোমরা নিরাশ না হও, অথবা আমার মৃত্যুর পর লাখ-বেলাখ পাবে আশা করে এখনই যাতে ধারকর্জ না কর, তাই।’

—উনি তোমাকে উইলের কথা মুখে মুখে বললেন, না দেখালেন?

—না, উইলখানা আমাকে দেখালেন।

টুকু আবার বললে, একথা আমাকে জানানসনি কেন?

—আমার যতদূর মনে পড়ছে, আমি তোকে বলেছিলাম।

বাসু-মামু টুকুকে ছেড়ে সুরেশকেই প্রশ্ন করেন, উইলটা দেখে তুমি বড়পিসিকে কী বললে?

—আমি প্রাণ খুলে হাসলাম। বললাম, ‘বড়পিসি, তোমার টাকা তুমি যাকে খুশি দেবে, এতে আমাদের বলার কী আছে? হয়তো একটা খাঙ্কা লাগলো, তা লাগুক—এই তো জীবন।’ শুনে বড়পিসি বললে, ‘ঠিক বাপের মতো। থরোব্রেড স্পোর্টসম্যান!’ তখন আমি বললাম, ‘পিসি, উইলে যখন আমাকে বকিতই করলে, তখন শ-শ্যাঁকে টাকা আমাকে ধার দাও।’ তা পিসি দিয়েছিল, ‘শাচশ’ নয়। ‘তিনশ’।

—তার মানে তুমি যে প্রচণ্ড একটা খাঙ্কা খেয়েছ, সেটা গোপন করতে পেরেছিলে?

—ইন ফ্যাক্ট আমি কোন খাঙ্কা খাইনি আসৌ, আমি ভেবেছিলাম এটা বড়পিসির একটা ফাঁকা হুমকি। ও শুধু আমাদের ভড়কে দিতে চেয়েছিল।

—ফাঁকা হুমকি দেখাতে কেউ ফি দিয়ে অ্যাটর্নিকে বাড়িতে নিয়ে এসে ওভাবে উইল তৈরী করে?

—করে। লোকটা যদি বড়পিসি হয়। আপনি তাকে চিনতেন না বাসু-সাহেব, আমি তাকে হাড়ে-হাড়ে চিনতাম! আমি আজও বলবো, বড়পিসি যদি হঠাৎ না মরে যেত তাহলে ঐ দ্বিতীয় উইলখানা ছিড়ে ফেলতো। এটা তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। হতে পারে না।

বাসু জানতে চান, তোমার সঙ্গে যখন মিস্ জবসনের এসব কথা হচ্ছিল তখন মিনতি কোথায়?

—খোদায় মালুম। কেন?

—এমন কি হতে পারে যে, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছে।

—পারে। খুবই সম্ভব। কারণ দরজাটা খোলা ছিল, আমরা কেউই ফিসফিস করে কথা বলিনি।

বাসু এবার স্মৃতিটুকুর দিকে ফিরে বললেন, এসব কথা তুমি কিছুই জানতে না? দ্বিতীয় উইল করার কথা?

সে জবাব দেবার আগেই সুরেশ বলে ওঠে, টুকু, মনে পড়ছে না? আমি তোকে বলেছিলাম কিছু।

স্মৃতিটুকু ওর চোখে চোখে তাকাল না। বাসু-সাহেবকে বলল, এমন একটা ব্যাপার ও যদি আমাকে বলে থাকে তা কি আমি ভুলে যেতে পারি?

—না। সম্ভবত না। আর একটা কথা, মিনতি মাইতিকে যদি সাক্ষীর মধ্যে তোলা যায়, তাহলে তাকে দিয়ে কি বলিয়ে নেওয়া যাবে—

তার ব্যাটটা শেষ হল না। সুরেশ সোৎসাহে বলে ওঠে, যাবে! আমি আপনাকে চিনি। আপনি অনায়াসে ওকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে পারবেন যে, তার জ্ঞান মতে কাক আর বক একই রঙের পাখি, তবে তাদের গায়ের রঙ টিয়া পাখির মতো লাল নয়!

বাসু হেসে ফেলেন। বলেন, উইলটা একবার দেখা দরকার। মিস্ হালদার, আমাকে একটা ইনট্রোডাকশান লেটার দিতে হবে।

—তাহলে এ ঘরে আসুন। আমার লেটার-হেডটা ওঘরে আছে।

ওরা তিনজনে পাশের ঘরে উঠে গেলেন। আমি গৌজ হয়ে বসেই রইলুম। সেটা কেউ গ্রাহ্যই করল না। মিনিট-পাঁচেক পরে বাসু-মামু ওঘর থেকে বার হয়ে এলেন। সোজা সদর দরজার দিকে গট-গট করে এগিয়ে গেলেন। সশব্দে দরজাটা খুললেন এবং সশব্দেই বন্ধ করলেন। তারপর ঐ শয়ন কক্ষের দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। আমি স্তম্ভিত!

ঠিক তখনই ঘরের ভিতর থেকে প্রায় আর্ডকটে স্মৃতিটুকুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : ম্ম ফুল।

এই সময়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে পরিচারিকাটি প্রবেশ করল। বাসু-মামু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে—নিঃশব্দেই বেরিয়ে এলেন করিডোরে।

করিডোরে বেরিয়ে এলে আমি বলি, মামু! শেষ পর্যন্ত আমাদের দরজায় আড়ি পর্যন্ত পাততে হবে?

—‘আমাদের’ বলছো কেন কৌশিক? আমিই কান পেতেছি। তুমি ঘটনাচক্রে শুনতে পেয়েছ মাত্র!

—মিস্ ইজ নট ক্রিকেট!

—নো, ইট ইজ নট! বাট, বডি-লাইন বোলিং ইজ নট ক্রিকেট আইদার।

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

—বলছি—‘হত্যা’ বস্তুটা ‘খেলা’ নয়, যে স্পোর্টসম্যানশিপের আইনকানুন সবসময় মনে রাখতে হবে।

—হত্যা! ‘হত্যা’ হলো কোথায়?

—তুমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছো? ‘হত্যা’ নয়?

—হত্যার চেষ্টা হয়তো হয়েছিল, মানছি, কিন্তু উনি মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে। জনডিসে।

—আই রিপিট: তুমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছো?

—সবাই তাই বলছে!

—আবার সেই একই কথা : ‘সবাই তাই বলছে’

আমি রুখে উঠি—একদ্রে শেষ কথা বলার অধিকার তাঁর চিকিৎসকের। ডক্টর পিটার দস্ত আমাদের তাই বলেছেন—পরিগত বয়সে জনডিস-এ ভুগে তিনি মারা গেছেন।

মামু আমাকে নিয়ে লিফটের খাঁচায় ঢুকলেন। স্বয়ংক্রিয় লিফট। তৃতীয় যাত্রী ছিল না, তাই উনি বললেন, হাজারকরা নশো নিরানন্দইটি কেন্দ্রে অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ানই শেষ কথা বলে, ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু বাকি একটি কেন্দ্রে সরকারি নির্দেশে কবর থেকে মৃতদেহকে খুঁড়ে বার করে তোলা হয়, exhum করা হয়—দেখা যায় ডাক্তার তার বিশ্বাস অনুযায়ী ডুল সার্টিফিকেট দিয়েছিল।

লিফট নিচে এসে থামলো। আমরা বের হয়ে আসি। পোর্টকোটাও তখন নির্জন। আমি বলি, মামু, এবার আমি আপনাকে ঐ একই প্রশ্ন করবো : আপনি নিজে কি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন? আপনি ‘ঘরপোড়া গরুর ভূমিকাটা অভিনয় করছেন না তো? সারা জীবন ‘খুন’ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যেখানেই ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখেন...

কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো, কৌশিক! ‘ঘর-পোড়া-গরু’! কিন্তু গোয়ালে দ্বিতীয়বার আগুন লাগার ক্ষীণ সম্ভাবনাও তো থাকে—হাজারকরা একবার?

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

আমি দৃঢ়ভাবে বলি, এখানে তা হয়নি! কোনও ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না আমি সে বিষয়ে।

—পাছো না? তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি—এক: শ্বুতিটুকু কেন বললো, সুরেশ বোম্বাই চলে গেছে আগের দিন? দুই: আমি প্রথমবছর ওর পারিবারিক বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই শুনেই সে কেন নার্সাস হয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিল? তিন: সে কেন স্বীকার করলো না যে, সুরেশ তাকে জানিয়েছিল দ্বিতীয় উইল করার কথা? এবং শেষ প্রশ্ন: নির্জন কক্ষে সে কেন তার দাদাকে তীব্র ভৎসনা করে বসল: যু ফুল!

আমি জানতে চাই: আপনি কী অনুমান করছেন?

বাসু-মামু জবাব দিলেন না। আমরা দুজনে গাড়িতে গিয়ে বসি। আমি এবার ড্রাইভারের সিটে। উনি পাইপ ধরালেন। বললেন, হ্যারিসন রোডে চল, মিস্ মাইতির হোটেলে।

মিনতি মাইতি লক্ষপতি, শ্বুতিটুকুর মতো অদ্যভক্ষ্যধনুর্ণ নয়, কিন্তু সে আছে শিয়ালদহর কাছাকাছি একটি মামুলি ছা-শোষা হোটেলে। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল হোটেলের এক ছোকরা চাকর। কড়া নাড়তে এক মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলা দ্বার খুলে দিতে ছোকরাটি বললে, ঐরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বকনা-বাছুরের মতো দুটি চোখ মেলে মহিলাটি আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। মামু নমস্কার করে বললে, আমার নাম পি. কে. বাসু।

—ও!

—আপনার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলার আছে, ভিতরে আসবো?

বেশ বোঝা যায়, মিনতি মাইতির মাধ্যমে ওঁর নামটা কোনও ধাক্কা মারেনি। সে বোধহয় ওঁর নামটা জীবনে শোনেনি। বললে, হ্যাঁ, আসুন, আসুন। বসুন।

আমরা ভিতরে গিয়ে বসি। ধরে একটাই চেয়ার। বাসু তাতে বসলেন। আমাকে বসতে হল খাটের প্রান্তে। মিস্ মাইতি ড্রেসিং টুলে বসে বললেন, আমার কাছে....?

—গত পরশু, আমরা দুজন মেরীনগরে মরকতকুঞ্জটা দেখে এসেছি। অনন্ত স্টোর্সের ভবানন্দবাবু আপনাকে কিছু জানাননি?

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। উনি কাল ফোন করেছিলেন। তা বাড়িটা আপনারদের পছন্দ হয়েছে?

—ভবানন্দবাবু কি টেলিফোনে আমার নামটা জানিয়েছিলেন?

—নাম? হ্যাঁ, আমি লিখেও রেখেছি। দাঁড়ান দেখি।

উনি এগিয়ে এসে একটি খাতা দেখে বললেন, হ্যাঁ, আপনার নাম কে. পি. ঘোষ। রিটার্ডার্ড নেভাল অফিসার।

—আমি কি সেই নামটাই আপনাকে এখনি বললাম?

ভদ্রমহিলা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, মাপ করবেন, তখন আমি খুবই অন্যানন্দ ছিলাম। ঠিক খেয়াল করে শুনিনি, কিন্তু আপনি তো কে. পি. ঘোষ। তাই নয়?

—না। আমি বলছি, আমার নাম পি. কে. বাসু। আমি নেভাল অফিসার ছিলাম না। আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করি, ব্যারিস্টার! এ আমার ঢালা কৌশিক মিত্র।

এবার চোখ দুটি বিস্ময়িত হয়ে গেল মিনতির। বললে, আপনিই কি সেই 'কাঁটা-সিরিজে'র পি. কে. বাসু?

—সে কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছি এতক্ষণ।

এরপর মিনটি-তিনেক মিনতি দেবী কী বললেন, কী করলেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। প্রথমেই গড় হয়ে প্রণাম করলেন মামুকে। তারপর আমাকে প্রণাম।

করার উদ্যোগ করতে আমি বাধা দিই; উনি সে-কথা শুনলেন না। আমারও এক খাবার পদমূলি নিয়ে বললেন, সে-কথা শুনছি না কৌশিকদা, সৃজাতা বৌদিকেও নিয়ে এলেন না কেন?

বেশ বোঝা গেল, কাঁটা-সিরিজের গল্পগুলি ঠর প্রিয়, বাসু-সাহেবের 'ফ্যান'। শেষমেশ যখন হোটেলের বয়টাকে ডেকে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে যাবেন তখন বাধা দিলেন বাসু-মামু, শোনো মিনতি, ও-দুটোই কেউ একসঙ্গে পান করে না। হয় চা, নয় ডাব।

হোটেল-বয়টাও হেসে ফেলেছিল। তাকেই বললেন মামু, তিনটে ডাবই নিয়ে এসো হে!

হোকরাটা চলে যেতে মিনতি বললে, আপনি যদি মরকতকুঞ্জটা কেনেন, তাহলে...

—না মিনতি। মরকতকুঞ্জটা কিনবার ইচ্ছে নিয়ে আমি মেরীনগরে যাইনি। আমি পরশু দিন মিস জনসনের একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে একটি বিষয়ে তদন্ত করতে বলেছিলেন...

আশ্চর্য! মিনতি মাইতি অবাক হলো না—পরশু চিঠি পাওয়ার কথায়। বরং বললে, সেই পাচশো টাকা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে?

—না! সেটা যে সূরেশ নিয়েছিল তা তিনিও জানতেন, তোমরাও বুঝতে পেরেছিলে, নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বলা তো যায় না—নিজের বাড়ির লোক...

—তা তো বটেই। মিস জনসন আমাকে লিখেছিলেন, অন্য একটি বিষয়ে তদন্ত করতে। ঠর সেই অ্যাকসিডেন্টটির বিষয়ে...

—তার মধ্যে তদন্তের কী আছে? সে তো ফ্রিসির সেই হতভাগা 'বল'টায় পা দিয়ে...

—কিন্তু 'ফ্রিসি' তো সে রাতে বাড়িতে ছিল না? ছিল?

—না, ছিল না। সারা রাত বাইরে বাইরে কাটিয়ে ভোর রাতে ফিরে এসেছিল। আমিই তাকে দোর খুলে চুপি-চুপি ভিতরে ঢুকিয়ে আনি।

—কেন, 'চুপি-চুপি' কেন?

—মায়ের যাতে ঘুম না ভেঙে যায়। তাম্বুড়া, ফ্রিসি রাতে বাইরে বাইরে কাটালে মা ভীষণ বিরক্ত হতেন। ঠর ঐ শারীরিক অবস্থায় সেটা ঠকে জানতে দিইনি।

—আই সি! আচ্ছা, তোমার মনে আছে মিনতি? মৃত্যুর আগে উনি কী একটা আত্মত কথা বলেছিলেন? চীনের মাটি...

মিনতি জানতে চাইলো না এ সংবাদ বাসু-মামু কোথা থেকে পেলেন। যেন ধরে নিল, মৃত্যু মুহূর্তে উচ্চারিত কথাটাও মিস জনসন আগেভাগেই ঠকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। বললে, হ্যাঁ, মনে আছে, উনি বলেছিলেন, 'চীনের মাটিতে খুব দামী ফুল কোটে'—কিন্তু সে তো বিকারের ষোরে।

—তোমার কোনও ধারণা আছে, কেন উনি ঠর উইলটা বদলে ফেলেন?

এই প্রথম মনে হল মিনতি সত্যক হল। 'উইল' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র। আমতা-আমতা করতে থাকে—উইল? মানে ঠর উইল?

—এ-কথা তো ঠিক যে, বছর পাঁচেক আগেই তিনি একটি উইল তৈরি করেছিলেন? মৃত্যুর মাত্র দশদিন আগে সেটা উনি কেন বদলে ফেললেন? তোমার কী মনে হয়?

মিনতি একটু ভেবে নিয়ে বললে, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। সত্যিই জানি না। উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন আমি একেবারে অষ্টমুগ্ধ হয়ে যাই। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, উনি সব কিছু আমাকেই দিয়ে গেছেন। আমার এখনো মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বপ্ন দেখছি না তো? এ কি হয়? ঠর তিন-তিনজন নিকট আত্মীয় রয়েছে, তবু উনি কেন সব কিছু আমাকেই দিয়ে গেলেন। প্রথম খাঙ্কাতা কেটে যাবার পর আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যেন পরের ধর চুরি করেছি। যা আমার হকের ধন. নয়, যাতে আমার অধিকার নেই...

—তুমি কি তোমার অগাধ সম্পত্তির কিছু অংশ ওদের তিনজনকে ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবছ এখন?

## কাটান-কাটান-২

খণ্ডমুহুর্তের জন্য মনে হল মিনতির ভাবান্তর হল। মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। যেন, সরল, নির্বোধ মেয়েটির ভেতর থেকে একটি বুদ্ধিমান মেয়ে উকি মেরে অভ্যুরালে সরে গেল। ও বললে, অবশ্য এর আর একটা দিকও আছে... প্রথমত, আমি যদি ঠুর দান গ্রহণ না করি, তবে তাঁর শেষ ইচ্ছাটায় বাধা দেওয়া হবে। ম্যাডাম অনেক বিবেচনা করেই এ-কাজটা করেছেন; হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, ঠুর বাবা এবং বোনেরা শান্তি পাবেন না তাঁদের রক্তজল-করা টাকা কেউ যদি উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়, অথবা শ্রীতমের মতো ফটকাবাজি করে...

—তিনি যে এই ক'... ভেবেছিলেন, ঠিক এই ভাষাতেই, তা তুমি কেমন করে জানলে?  
এবারে ও যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে জিব কাটলো। আবার শুরু হলো তার আমতা-আমতা:  
না, মানে আমি কেমন করে জানবো? এ আমার আন্দাজ আর কি! তাছাড়া কেন তিনি তাঁর উইলটা শেষমেশ এভাবে বদলে ফেলবেন?

—তা হতে পারে। সুরেশ রেস খেলে, স্মৃতিটুকু বেহিসাবি খরচে, কিছু হেনা..।

ইচ্ছা করেই উনি বোধহয় বাক্যটা অসমাপ্ত রাখলেন। মিনতি সেই অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করলো, না, হেনা মাটির মানুষ। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? সে শ্রীতম ঠাকুরের হাতের পুতুল। হেনাও অনেক টাকা পেয়েছিল—সব এ শ্রীতম উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। শ্রীতমকে হেনা ভীষণ ভয় পায়। সে যা বলে ও তাই করে। শ্রীতম হুকুম করলে ও বোধহয় মানুষ খুন করতে পারে! অথচ এমনিতে ও খুবই ঠাণ্ডা। ছেলেমেয়ে দুটোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। হেনাকে এভাবে বঞ্চিত করা আমার ভাল লাগেনি। টুকুকে কিছু সেননি, ভালই করেছেন—সুরেশকেও। বিশেষ সুরেশ যেভাবে ঠুকে ডয় দেখাতো...

—ভয় দেখাতো? মানে?

—একবার সে তার বড়পিসিকে বলেছিল : ‘মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে বড় বিপজ্জনক, তোমার ভালমন্দ কিছু না হয়ে যায়’

—তাই নাকি? কবে বললো এ কথা?

—এ উনি সিঁড়ি থেকে উণ্টে পড়ার আগে।

—তোমার সামনেই?

—না, ঠিক আমার সামনে নয়। তবে ওরা কিছু ফিসফিস করে কথা বলছিলেন না। আর আমার ঘরটা তো মায়ের ঘরের কাছাকাছিই।

এরপর বাসু-সাহেব উঁখা বিশ্বাসের কাছে সংগৃহীত সেই প্ল্যানচেষ্টার প্রসঙ্গ তুললেন। সেটাও করবোরেটেড হলো—এবার অবিবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, বিবাসীর তোছে। মিনতির বিশ্বাস—স্বয়ং যোসেফ হালদার এসে ভর করেছিলেন মিস জনসনের দেহে। মেয়েকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন।

বাসু জানতে চাইলেন, টুকু আর সুরেশ পঁচিশে এপ্রিল শনিবার মেরীনগরে এসেছিল, নয়?

—পঁচিশে কিনা মনে নেই, তবে শনিবারই। তার আগের শনিবারে হেনা আর শ্রীতম এসেছিল।

—সেটা তাহলে আঠারো তারিখ। আর উনি উইলটা করেন মঙ্গলবার, একুশে?

—হ্যাঁ, একুশে। উনি উইল করার আগের হুণ্ডায় হেনারা এসেছিল, পরের হুণ্ডায় টুকু আর সুরেশ। সেদিন শ্রীতমও এসেছিলেন, একা—

—তাই নাকি? শ্রীতম পঁচিশে মেরীনগরে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাতে থাকেননি। মায়ের সঙ্গে ষষ্ঠাখানেক কথাবার্তা বলে ফিরে গিয়েছিলেন।

—তখন সুরেশ আর টুকু মরকতকুঞ্জে?

—হ্যাঁ, কিন্তু তারা বোধহয় জানে না যে, হেনার বর এসে দেখা করে তখনই চলে গেছেন।

—আশ্চর্য! দেখা হলো না কেন?

—সবাই যে যার তালে এসেছিল। বুড়িমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে। ওরা একে-অপরকে এড়িয়ে চলতো। বুড়িমা সবই বুঝতেন, চূপচাপ থাকতেন।

—প্রবীরবাবু কেমন লোক?

—প্রবীরবাবু! তিনি কে?

—প্রবীর চক্রবর্তী, সেই যিনি উইলটা তৈরি করে সই করিয়ে নিয়ে যান?

—ও, উকিলবাবু? লোক ভালই, তবে কী-জানি কেন, আমাকে ভাল চোখে দেখেন না।

বাসু-মামু একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার মিনতি। আমি খবর পেয়েছি, টুকু আর সুরেশ ঐ উইলটা নাকচ করবার চেষ্টা করছে।

সীতিমত ভাবান্তর হলো এবার। গম্ভীর হয়ে বললে, জানি। হেনা বলেছে আমাকে। কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারবে না। আমি ভাল উকিলের পরামর্শ নিয়েছি। আপনি একবার দেখবেন উইলটা?

—তোমার কাছেই আছে সেটা?

—না, হোটেলে নেই। উকিলবাবু বারণ করেছিলেন ওটা নিজের কাছে রাখতে। আমার ব্যাঙ্ক-ভন্টে আছে। উনিই ব্যবস্থা করে ঐ ভন্টটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছেন।

—না, থাক। আমি আর দেখে কী বলব? তুমি তোমার উকিলের পরামর্শ মতো চলো।

মিনতি মাইতির হোটেলে থেকে বেরিয়ে এসে প্রসন্ন করি, কী বুঝলেন?

—এক নম্বর: মিনতি আড়ি পাতায় ওস্তাদ! দু নম্বর: সে হয় অতি নির্বোধ, না হলে অত্যন্ত চালাক এবং সুঅভিনেত্রী। দুটোর কোনটা ঠিক, তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের নেজট টার্গেট হেনা ঠাকুরের বাড়ি—ঠিকানা তো জানোই। চলো—

হ্যাঁ, হেনার ঠিকানা সরবরাহ করতে পেরেছে মিনতি। শ্রীতমের এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছে ওরা। এখনও সেখানেই আছে। ভবানীপুরে।

শঙ্কনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট যেখানে হরিশ মুখার্জি রোডে এসে পড়েছে সেখানে, শিখদের গুরুদ্বারার কাছাকাছি একটি ত্রিতল বাড়ি। গৃহস্থানী শিখ, শ্রীতমের আত্মীয়। তাঁর এক-সু-বানি ঘর দখল করে হেনা সাময়িক সংসার পেতেছে। মেজানাইন ফ্লোর। একতলায় গৃহস্থানীর মোটর-পার্টস্-এর দোকান। একটি ভূতা আমাদের শৌছে দিল মেজানাইন ফ্লোরে। কড়া নাড়তে যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। লোকটি আমাদের দেখিয়ে হিন্দিতে বললে, মাইজি, এঁরা দুজন আপনাকে খুঁজছেন।

—আমাকে? না ঠাকুর-সাহেবকে? —প্রশ্নটা সে করেছিল ঐ ভূতাস্থানীয় লোকটিকেই।

বাসু-সাহেব তাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বললেন, তুমিই হেনা ঠাকুর?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো আমি...

—না, আমাকে তুমি চেনো না। আমরা আসছি নৃত্যটুকু হালদারের কাছে থেকে।

—ওঃ! টুকু! হ্যাঁ, বলুন?

—তোমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলার আছে। কোথায় বসে কথাটা বলবো?

—আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

মেজানাইন ঘরটা আকারে মাঝারি। একটা ডবল-বেড খাট পাতা। খান-সুই চেয়ারও ছিল। ওপাশে একটি বছর-চারেকের মেয়ে বসে কী লিখছিল। সে চোখ তুলে আমাদের দেখতে থাকে। হেনা আমাদের বসতে দিল, নিজেও বসলো খাটের এক প্রান্তে: বলুন?

বাসু-মামু বললেন, আমি তোমার সঙ্গে মিস পামেলা জনসনের মৃত্যুর বিষয়ে দু-একটা কথা আলোচনা করতে চাই।

হতে পারে আমার দৃষ্টিভ্রম—হঠাৎ মনে হল, মেয়েটি যেন সাদা হয়ে গেল। কোনক্রমে বললে, হ্যাঁ, বলুন?

—মিস জনসন মৃত্যুর আগে হঠাৎ তাঁর উইলটা পরিবর্তন করেছিলেন। তোমাদের বঞ্চিত করে সব কিছু তাঁর সহচরীকে দিয়ে যান। একেই সুরেশ আর নৃত্যটুকু একটা মামলা আনতে চায়—উইলটা

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

পালটে ফেলতে। ন্যায্য উত্তরাধিকারীরাই যাতে ঊর সম্পত্তি পায়। তুমি কি ওদের সঙ্গে হাত মেলাবে?

হেনা রুদ্ধশ্বাসে কী-যেন ভাবছিল। বললে, কিছু তা কি সম্ভব? আমার স্বামী উকিলের পরামর্শ নিয়েছেন—তারা বলেছেন, মামলা-মোকদ্দমা করে কিছু লাভ নেই, অহেতুক অর্থব্যয়!

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে; কিন্তু এ সব ব্যাপারে অনেক কিছুই হয়ে থাকে। আমি উকিল নই, তাই অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখতে পাচ্ছি। মিস্ হালদার লড়তে প্রস্তুত, এ বিষয়ে তোমার কী মত?

হেনা আমতা-আমতা করল, আমি... মানে... এক্ষেত্রে কী করণীয় তা আমি জানি না। উনি জানেন।

—নিশ্চয়ই। ডক্টর ঠাকুরকে না জানিয়ে তুমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারো না; কিন্তু তোমার মনোগত ইচ্ছাটা কী? তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাটা?

হেনা যেন আরও বিব্রত হয়ে পড়লো। বললে, আমি... ঠিক জানি না। মানে, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা নোংরামি আছে, একটা অর্থলোলুপতা—

—তাই কি?

—নয়? বড়মাসি তার টাকা যাকে খুশি দিয়ে যেতে পারে, তাতে আমার আপত্তি করতে পারি না।

—তার মানে মিস্ জনসন তোমাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তুমি ক্ষুব্ধ নও?

—না, তা নয়। ক্ষুব্ধ তো বটেই। বড়মাসি অন্যায়ই করেছে—সে তো শুধু তার নিজের টাকাই দানছত্র করেনি, তার মধ্যে মেজ আর ছোটমাসির টাকাও আছে। তারা নিশ্চয় রাকেশ আর মীনাকে এভাবে পথে বসাতেন না। বড়মাসির এই শেষ পরিবর্তনটা বিস্ময়কর।

—তার মানে কি শেষ সময়ে তিনি সজ্ঞানে সব কিছু করেননি? কারও প্রভাবে পড়ে—

—কিন্তু মুশকিলের কথা এই যে বড়মাসিকে কেউ প্রভাবান্বিত করেছে এটা ভাবাই যায় না।

—সে-কথা সত্যি। শুনছি তাঁর খুব দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ছিল। আর মিস্ মিনতি মাইতির পক্ষে ও জাতীয় চক্রান্ত করা...

—না! মিষ্টিদি মোটেই সেরকম নয়। তাঁর মনটা সাদা। হয়তো একটু বোকাসোকা; কিন্তু... মানে, সেটাও একটা কারণ, যে-জন্য আমি উইল-বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার বিপক্ষে।

বাসু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তোমার কী মনে হয়? উনি হঠাৎ সবাইকে বঞ্চিত করে গেলেন কেন?

ওর গাল দু'টি একটু রক্তাভ হয়ে উঠল। অকুটে বললে, আমার কোন ধারণাই নেই।

বাসু বললেন, মিসেস ঠাকুর, আমি আগেই বলেছি যে, আমি উকিল নই। কিন্তু তুমি তো জানতে চাইলে না আমার পেশাটা কী?

হেনা জবাব দিল না। ঊর দিকে ফিরে তাকালো। তার চোখে জিজ্ঞাসা।

—আমার নাম শি. কে. বাসু। আমি একজন ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার। সাধারণের ধারণা আমি গোয়েন্দাও। কিছুদিন আগে আমি মিস্ জনসনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম—ঊর মৃত্যুর ঠিক আগেই লেখা। উনি আমাকে একজনের বিষয়ে তদন্ত করতে...

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেনা বললে, আমার স্বামীর বিরুদ্ধে...?

—সে-কথা বলার অধিকার আমার নেই।

—তাহলে নিশ্চয় প্রীতমের বিষয়ে! কী লিখেছিলেন তিনি? বিশ্বাস করুন, মিস্টার বাসু—এ সবই মিথ্যা। উনি এসব নোংরামির মধ্যে নেই—

—‘নোংরামি’ মানে?



সে প্রস্নের জবাব না দিয়ে হেনা বলে চলে, আর আমি জানি, কে বড়মাসির কান ভাঙিয়েছিল। সেজন্যও আমি ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে গররাজি।

—মাম্মি, আমার হাতের লেখা হয়ে গেছে।

বাক্সা মেয়েটা উঠে এসে তার খাটখানা মেলে ধরলো মায়ের সামনে। হেনা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, বাঃ! বেশ হয়েছে!

—এখন আমি কী করবো মাম্মি? —সব কথাই সে বলছে হিন্দিতে।

হেনা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একখানা এক টাকার নোট বার করে তার হাতে দিল। হিন্দিতেই বলল, নিচে দরোয়ানজিকে বল, সে ঐ স্টেশনারি দোকানে নিয়ে যাবে—একা-একা যেও না যেন। ওখান থেকে তোমার পছন্দমতো একখানা পিকচার পোস্ট-কার্ড কিনে নিয়ে এস। যমুনাকে তাহলে তুমি এখান থেকে একটা চিঠি লিখতে পারবে, ও-কে-?

টাকাটা নিয়ে মেয়েটা নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

মামু প্রশ্ন করলেন, তোমার ঐ একটিই মেয়ে?

—না। মীনীর একটি ছোট ভাইও আছে—রাকেশ। সে তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

—তোমরা যখন মরকতকুলে গেছিলে তখন ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলে?

—না! এবার ওরা এখানে ছিল, শ্রীতমের বোনের কাছে। বড়মাসি বাক্সাদের হৈ-হাঙ্গামা সহিতে পারতো না। তবে নাতি-নাতিদের ডালবাসতো খুবই। মাসির বলতে গেলে ঐ দুটিই তো নাতি-নাতি—আর কেউ তো নেই।

—তুমি শেষ কবে তাঁকে দেখেছ? আঠারই এপ্রিল?

—তারিখ মনে নেই, তবে সুরেশ আর টুকু যে শনিবারে যায়, তার আগের শনিবারে।

—তার আগেই কি উনি দ্বিতীয় উইলখানা করেছেন?

—না। তার পরের মঙ্গলবারে।

—উনি কি বলেছিলেন যে, নতুন একখানা উইল উনি তৈরি করতে যাচ্ছেন?

—না। কিছুই বলেননি।

—ওঁর ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখেছিলে কি?

হেনা একটু ভেবে নিয়ে বললে, না, আদৌ না। পরিবর্তন হবে কেন?

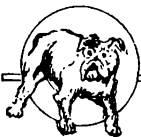
বাসু একটু উসকে দিলেন, টুকু আর সুরেশের কান-ভাঙানির কথা বলছিলে না তুমি?

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে পড়ে হেনা। বলে, ও হ্যা, বুঝেছি। ওদের কান-ভাঙানিতে বড়মাসি বেশ কিছুটা বদলে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ওঁর মন বিধিয়ে গেল। জানেন, শ্রীতম একটা গুণ্ডা প্রেসক্রাইব করলো—ওঁর হজমের গুণ্ডা—নিজে গিয়ে ডিসপেনসারি থেকে সার্ভ করিয়ে আনলো, আর বড়মাসি—আপনি বিশ্বাস করবেন না, সেটা মুখেই দিল না! ধন্যবাদ দিয়ে সরিয়ে রাখলো। শ্রীতম ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর, আমাকে দেখিয়ে দেবিয়ে ওয়াশ-বেসিনে শিশির গুণ্ডাটা ঢেলে ফেলে দিল। এ শুধু টুকুর শয়তানিতে।

বাসু-মামু একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কিন্তু তা কেমন করে হবে? তোমরা চারজন মেইনগর থেকে একই সঙ্গে ফিরে এসেছো, তার পরের হপ্তাতে আঠারোই শনিবার তোমরা দুজন গেছিলে। টুকু-সুরেশ তো সেখানে যায় তার পরের হপ্তায় পঁচিশে, তাই নয়?

হেনাকে জবাব দেবার কামেলা সহিতে হল না। দ্বারপ্রান্তে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে একজন দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবী পুরুষের আবির্ভাব ঘটলো।

নিঃসন্দেহে শ্রীতম ঠাকুর আর রাকেশ!



আমি মনে মনে শ্রীতম ঠাকুরের চেহারা যেরকম ভেবে রেখেছিলাম ঠেকে দেখতে সেরকম নয়। ঠুর উপাধি দেখছি ঠাকুর—ঠুর আদি নিবাস উত্তর ভারত না রাজস্থান জানি না, কাশ্মীরও হতে পারে—কারণ গায়ের রঙ খুব ফর্সা, একমুখ কুচকুচে কালো দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। মনে হল, ধর্মে উনি খালসা শিখ। অথচ পরিষ্কার বাংলা বলছিলেন। শ্রীতমের আবির্ভাবমাত্র হেনার একটা পরিবর্তন হল। যেন একটা পর্দার আড়ালে সরে গেল। সেখান থেকে সে অনাসক্তকণ্ঠে বাসু-মামুর পরিচয় দিল। আমাকে সে পাঠাই দিল না।

—আহ্। মিস্টার পি. কে. বাসু—বার-অ্যাট-ল! আপনি তো বনামখ্যাত। কিন্তু আপনার ভেঙ্কি তো শুনছি আদালতের চৌহদ্দিতে, এ গরিবখানায় পদার্ণ করে হঠাৎ আমাদের ধন্য করছেন যে? বাসু বললেন, আসতে হলো। এক বৃদ্ধা মক্কেলের প্রয়াণে। মিস্ পামেলা জনসন।

—হেনার বডমাসি? তিনি আপনার মক্কেল ছিলেন? কী ব্যাপার?

বাসু-মামু ধীরে ধীরে বললেন, তাঁর মৃত্যু-বিষয়ে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করতে...

হেনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তাঁর শেষ উইলটার বিষয়ে, শ্রীতম। মিস্টার বাসু আসছেন টুকু আর সুরেশের কাছ থেকে। ওরা আদালতে যেতে চায়।

আবার আমার দৃষ্টিবিভ্রম হল কি না জানি না, কিন্তু এসকটা পামেলার 'মৃত্যু' থেকে সরে গিয়ে তাঁর 'উইলে' পরিবর্তিত হওয়ার—আমার মনে হল—শ্রীতম আশ্চর্য হল। বললে, আহ্! সেই নিষ্ঠুর উইলখানা! কিন্তু সে-বিষয়ে আমার নাক গলানো বোধ হয় ঠিক হবে না।

বাসু-মামু স্মৃতিটুকু আর সুরেশের সঙ্গে তাঁর আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত সারাংশ দাখিল করলেন। সত্য-মিথ্যায় মেশানো। তির্যক ইঙ্গিত রইলো—উইলটা নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

—অস্বীকার করে লাভ নেই, আমি ইন্টারেস্টেড। তবে তার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। ইতিপূর্বে আমি একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছি।

মামু বললেন, উকিলরা সাবধানী, মামলায় হেরে যাবার সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা কেস নিতে চান না—এখনি আপনার স্বীকে সে কথা বলছিলাম। তবে আমার পদ্ধতি একটু অন্য জাতের। আমার তো মনে হয়েছে—উইলটা বাতিল করার বেশ কিছুটা সম্ভাবনা আছে। আপনি কী বলেন?

—আমি আগেই বলেছি, এ বিষয়ে নাক-গলানো আমার তরফে অশোভন। ব্যাপারটা হেনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তবে, একথাও বলবো, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু, সেটা মনে হয় অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ।

—এ যুক্তি মিস্ হালদারও দিয়েছিল—সে বলেছে, সাফল্যলাভ করলেই আমাকে 'ফিজ' দেবে। উইল নাকচ করতে না পারলে আমার এক্সপেন্সও মেটাবে না।

—আপনি তা সত্ত্বেও কেসটা নিয়েছেন। তার মানে, আপনি একটা কিছু পথের সম্ভাবনা নিশ্চয় দেখতে পেয়েছেন। শর্তটা সে-জাতের হলে আমাদের আপত্তি নেই, কী বল হেনা?—মিটি হেসে হেনার দিকে চাইলো শ্রীতম। হেনাও মিটি করে হাসবার চেষ্টা করলো—কিন্তু তা যেন যান্ত্রিক হাসি।

শ্রীতম জমিয়ে বসলো। বললো, আমি আইন জানি না, তবে আমার মনে হয়েছে—মিস্ জনসন

উইল্টা পালটে ফেলেন বেছায় নয়, ঠর ঐ সহচরীটির প্ররোচনায়—মিনতি মাইতি বোকা সেজে থাকে, আসলে সে অভ্যস্ত ধূর্ত আর শয়তানী বুদ্ধি তার পেটে পেটে।

মামু চট করে ঘুরে হেনাকে প্রণ করেন, তুমি এ বিষয়ে একমত?

হেনা একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। বলে, মিষ্টিদি আমাকে খুব ভালবাসে। তাকে বুদ্ধিমত্তী বলে আমার মনে হয়নি। আর শয়তানী...

কথাটা তার শেষ হয় না। প্রীতম মাঝখানেই বলে ওঠে, হ্যাঁ। মিস্ মাইতি তোমাকেই ভালবাসে। আমার প্রতি তার ব্যবহারটা অন্য রকম। শুনুন বাসু—সাহেব, একটা উদাহরণ দিই। বৃদ্ধা একবার সিঁড়ি থেকে উল্টে পড়েন, আমি ঠর কাছে থেকে যেতে চেয়েছিলাম—মানে ডাক্তার হিসাবে সেবা-শুশ্রূষা করত। তিনি রাজী হননি—সেটা বাতাবিক—ভদ্রমহিলা একা-একা থাকতেই অভ্যস্তা, কিন্তু ঐ মহিলাটি, আই মীন মিস্ মাইতিও আগ্রাণ চেষ্টা করেছিল আমাদের ত্যাগে। কারণ, এ নয় যে তার খাটনি বাড়বে। কারণটা এই যে, অসুস্থ বৃদ্ধাকে সে আগলে রাখতে চাইছিল—কাউকে কাছে ধেঁষতে দিত না।

একই ভঙ্গিতে বাসু-মামু হেনাকে প্রণ করলেন, তুমি একমত?

এবারও ত্রীক জবাব দেবার সুযোগ দিল না প্রীতম। বলে ওঠে, হেনার মনটা নরম। ও কারও মোহক্ৰটি দেখতে পায় না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। আরও একটা উদাহরণ দিই। বৃদ্ধি ভূত-প্রেত আত্মা-ফাফা বিশ্বাস করতো না, আর মিস্ মাইতি একজন লোকাল গুণিনকে আমদানি করে ঠর উপর প্রভাব বিস্তার করছিল—

—‘লোকাল গুণিন’ মানে? —বাসু-মামু যথারীতি ন্যাকা সাজলেন।

প্রীতম ঐ ঠাকুরমাশাই আর সতী-মায়ের গল্প শোনালো। তার বিশ্বাস—শয্যাশায়ী এক বৃদ্ধাকে এভাবে প্রভাবান্বিত করা খুবই সহজ। সম্ভবত একটি ডেলুকির মাধ্যমে বৃদ্ধির মতটা বদলে দেওয়া হয়—হয়তো প্ল্যানচেটে স্বর্গত যোসেফ হালদার এসে তাকে আদেশ করেছিলেন—সমস্ত সম্পত্তি ঐ শয়তানির নামে লিখে দিতে।

একই ভঙ্গিতে মামু হেনাকে প্রণ করেন, তোমারও তাই বিশ্বাস?

এবার প্রীতম আর বাধা দিল না। বরং একটু ধমকের সুরেই ত্রীকে বললো, মিনমিন কোরো না, হেনা। তোমার কী মতামত তা স্পষ্ট করে জানাও!

স্বামীর মর্মভেদী দৃষ্টির প্রতি নজর হেনার। সে যেন কঁকড়ে গেল। মিনমিন করেই বললে, আমি এসবের কী বুদ্ধি? আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলছো, প্রীতম!

প্রীতম খুশি হলো। বললো, আমি চিরকালই ঠিক বলি, হনি।

বিলাতী কায়দায় সর্বসমক্ষে ত্রীকে ‘হনি’ ডাকা শিষ্টাচারসম্মত—প্রীতম কিন্তু—আমার মনে হল—সে কায়দায় অভ্যস্ত নয়। তবে, হেনা যে অবাধ্যতা করছে না, এটা প্রণিধান করে সে হঠাৎ খুশিয়াল হয়ে উঠেছে।

বাসু প্রসঙ্গান্তরে চলে এলেন। প্রীতমকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিস্ জনসনের মৃত্যুর আগের শনিবারে আপনারা মেরীনগরে গিয়েছিলেন, নয়?

প্রীতম মনে করার চেষ্টা করছে। এতক্ষণে হেনা বাতাবিক হয়েছে অনেকটা। বললে, না। আমরা গেছিলাম তার আগের সপ্তাহে, তখনো উনি দ্বিতীয় উইল্টা করেননি।

বাসু-মামু একদুটো তাকিয়েছিলেন প্রীতমের দিকে। তাকেই বলেন, না। আমি পঁচিশে এপ্রিলের কথা বলছি। সেদিন আপনি কাঁচড়াপাড়া থেকে গোপাল মোদকের রিক্সা নিয়ে একাই মরকতকুঞ্জে গিয়েছিলেন। তাই নয়?

হেনা এবার তার স্বামীর দিকে ফিরলো, বললে, তুমি বড়মাসির কাছে গেছিলে? পঁচিশে?

যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। ত্রীকেই বললে, হ্যাঁ, কিরে এসে তোমাকে তো বলেছিলাম?

## কাটার-কাটার-২

ঘণ্টাখানেক আমি মরকতকুঞ্জে ছিলাম। ফিরে এসে বললাম, মিস্ জনসন ভালই আছেন। মনে নেই? এবার শুধু বাসু-মামু নয় আমিও একদৃষ্টে হেনার দিকে তাকিয়ে আছি। সে আচল দিয়ে মুখখানা মুছলো। প্রীতম তাগানা দেয়, মনে পড়ছে না? অঙ্কুর তোমার স্মৃতিশক্তি, বাপু!

যেন এককণ্ঠে হেনার মনে পড়লো। বললো, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার কিছুই মনে থাকেনা! ত্যাগড়া দু'মাস হয়ে গেল তো?

বাসু-মামু এবার প্রীতমকে বলেন, তখন ওরা দু'জন ছিল মরকতকুঞ্জে? টুকু আর সুরেশ?

—তা হবে। আমি ওদের দেখতে পাইনি। মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিলাম...

বাসু নির্নিমেধ নেত্রে তাকিয়েই আছেন। প্রীতম একটু নড়েচড়ে বসলো। বললে, অবীকার করে লাভ নেই, আমি ঠর কাছে কিছু টাকা ধার করতে গেছিলাম। ভবি ভুললো না!

বাসু একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করবো ডক্টর ঠাকুর?

প্রীতমের মুখে কি একটা আতঙ্কের ছায়া পড়লো? একটু সামলে নিয়ে বললে, স্বচ্ছন্দে!

—মিস্ স্মৃতিটুকু আর মিস্টার সুরেশ হালদারের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

ডক্টর ঠাকুরের একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো যেন। ক্রীর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ভাই-বোনদের সম্বন্ধে আমার 'ফ্র্যাঙ্ক ওপিনিয়ন' দিলে তুমি কিছু মনে করবে না তো?

হেনা জবাব দিল না। নিঃশব্দে নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করলো শুধু।

—তাহলে খোলাখুলিই বলি, ওরা দুজনেই একেবারে বখে গেছে। তবু সুরেশকে আমার ভাল লাগে। সে প্রাণবন্ত, স্পোর্টসম্যান, খোলামেলা। স্মৃতিটুকু অন্য জাতের মানুষ। গ্ল্যামারাস, বেহিসানি, ওভার-মার্চ—তার নানান পুঙ্খ নহু! সে বোধহয় প্রয়োজনে কারও পাশে অনায়াসে বিষণ্ণ মিশিয়ে দিতে পারে। সবটা তার নিছকের দোষ নয়—হেরিডিটি—ওর রক্তে হয়তো আছে এর প্রভাব। আপনি জানান কি না জানি না, ওর মায়ের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল—প্রথম স্বামীকে নাকি তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন—

—জানি। শুনছি, তিনি বেকসুর খালাসও পেয়েছিলেন। আর ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্ত?

—ডক্টর দত্তগুপ্ত? হ্যাঁ, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ব্রেন। লিভার এক্সট্রাক্ট নিয়ে সে একটা খেরাপিউটিক্যাল আবিষ্কার নাকি করে ফেলেছে। সে একদিন মরকতকুঞ্জে ডিনারে এসেছিলো। সেদিনই বললে—

—ব্যাপারটা কী? আই মীন, আবিষ্কারটা কী জাতীয়?

—সিরাম ইনজেকশানের একটা পেটেন্ট নেবে সে। তার এক্সপেরিমেন্ট নাকি সাকসেসফুল। অন্তত তার মতে। আশ্চর্য! সে যে কেমন করে স্মৃতিটুকুর প্রেমে পড়লো এটা আজও আমার মগজে ঢোকে না। দুজনের চরিত্র একেবারে বিপরীত।

ওপাশ থেকে মীনা বলে উঠলো, মা লাঞ্চে যাবে না? রাকেশের ভূখ্ লেগেছে।

মামু উঠে পড়েন, সো সরি! আপনাদের লাঞ্চে সরি করিয়ে দিলাম।

হেনা তার স্বামীর দিকে একটা চোরা চাহনি হেনে বাসু-মামুকে বললে, আপনারাও আসুন না। আমরা ঐ সামনের রেস্তোরাঁর লাঞ্চ করি। রান্নাবান্নার হাসামায় যাইনি। প্রীতমের বোন আর ভদ্রীপতি কদিনের জন্য বেড়াতে গেছে...

বাসু-মামু বললেন, গোপালপুর-জন-সীতে নয় নিশ্চয়?

প্রীতম অবাক হয়ে বললে, আশ্চর্য! আপনি কেমন করে জানলেন? রিয়ালি, আপনি একজন জিনিয়াস! অফ অল দ্য টুরিস্ট স্পটস...

বাসু-মামু তাঁর ভাগ্নের দিকে চোরা চাহনি হানলেন একবার। প্রীতমের টেলিফোন নাম্বারটা লিখে নিলেন। বললেন, প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন। তারপর বিদায় নিয়ে আমরা রান্নায় নেমে আসি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করি, কাঁচড়াপাড়ার রিকশাওয়ালা গোপাল মোদক—

—ও নামটা আবিষ্কার করলাম। নাহলে হয়তো শ্রীতম কবুল করতো না!

নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিচ্ছি, হঠাৎ নজর হলো, মিসেস ঠাকুর বেশ একটু দ্রুতপায়েই এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। বাসু-মামু আমার হাতটা চেপে ধরলেন। নজর হলো হেনা একাই আসছে। শ্রীতম বা ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে নেই। সে বারে বারে পিছন দিকে তাকাচ্ছে আর প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। ততক্ষণে আমরা দুজনেই গাড়ির ভিতর। আমি ড্রাইভারের সিটে। হেনা এগিয়ে আসতে মামু কাচটা নামিয়ে দিলেন। হেনা ঝুঁকে পড়ে বললে, মিস্টার বাসু, আপনাকে একটা কথা বলার আছে... অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গোপনীয়...

—বল? —বাসু-মামুও ঝুঁকে পড়েন।

হেনা চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কেউ তাকে নজর করছে কি না। তারপর আবার বললে, আপনি... আপনি... মানে, কাউকে বলবেন না তো?

—গোপন কথা কেন বলবো? বল, কী বলতে চাও?

—জানাজানি হলে কিছু সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—দেরি কোরো না হেনা। এখনই শ্রীতম নেমে আসবে। কথাটা কী?

শ্রীতমের নাম শুনেই মেয়েটি পিছন ফিরলো। তখনই নজর হলো ছেলেমেয়ের হাত ধরে শ্রীতম সদর দরজা দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বললে, আপনারা যাননি দেখছি!

হেনা সহজ গলায় বললে, আজ আপনারা এক কাপ কফি পর্যন্ত খাননি। তাহলে কবে আসবেন বলুন?

—ও। নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে?

বাসু বললেন, টেলিফোন করে জানাবো।

—তাহলে ঐ কথাই রইলো। এখনি যা বলছিলাম। টুকুকে বলবেন, আমরাও আছি তার সঙ্গে। নমস্কার।

আমি স্টার্ট দিলাম গাড়িতে। ঠাকুর দম্পতি সামনের রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। গাড়ি চালাতে চালাতেই বলি, হেনা কী বলতে এসেছিল বলুন তো? অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গোপন?

—শোনা হল না! শোনার দরকার ছিল।

—পরে টেলিফোন করলে জানা যাবে নিশ্চয়।

—যদি শ্রীতম সে সময় বাড়িতে না থাকে!



বাড়ি ফিরে দেখি সূজাতার চিঠি এসেছে। গোপালপুর-অন-সী থেকে। জানতে চেয়েছে, আর কদিন দেরি হবে আমাদের। আমরা কেন যেতে দেরি করছি।

আহারান্তে বিশ্রাম নেওয়া গেল না। বিশু এসে খবর দিল বড়কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন। ঠর ঘরে গিয়ে দেখি ইঞ্জিনেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। মুখে পাইপ।

আমাকে দেখেই বলে ওঠেন, অফ অল দ্য টুরিস্ট স্পটস্ লোকে কেন যে 'গোপালপুর-অন-সী'তে দৌড়য় বুঝি না।

## কাটার-কাটার-২

এই 'লেগ-পুলিং' আমার ভাল লাগে না। বলি, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? কিছু বলবেন?

—তোমার হাতে যদি সময় থাকে। আর যদি এই মণ্ডকায় চিঠির জবাবটা লিখে ফেলতে চাও তা হলে, এখন বরং থাক।

—চিঠির জবাব? কোন চিঠি?

—আজকের ডাকে গোপালপুর থেকে একখানা খাম এসেছে মনে হলো?

বলি, না, গোপালপুর থেকে নয়, ও আমার এক বন্ধুর চিঠি।—উনি যদি ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যেতে পারেন, তাহলে আমিই বা পারবো না কেন?

বলেন, বোসো। কেসটা একটু আলোচনা করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেসটার মধ্যে আমরা ডুবে গেলাম।

—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কৌশিক। আমি মিস জনসনের চিঠি পেয়েছি শূনে এক-একজনের এক-একরকম প্রতিক্রিয়া হল। শান্তি ধরে নিল—সেটা সুরেশের চৌর্যবৃত্তি—উদ্বাদটিত হল একটি নতুন অধ্যায়। টুকু বললে, স্বর্গীয় পোস্ট-অফিস থেকে কেউ চিঠি লেখে না—যেন, মৃত ব্যক্তি কোনও ফরিয়াদ আনতে পারে না। কিন্তু আমি যেই বললাম, তিনি মৃত্যুর পূর্বে চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলেন, অমনি সে নার্ভাস হয়ে সিগারেট ধরালো। আর মিনতি মাইতি এর মধ্যে কোন কিছু বিস্ময়ের দেখতে পেল না। হয় সে অত্যন্ত চুতর—তার বোকাসোকা চরিত্রটা সব সময় বিশ্বাসযোগ্য করে রাখতে সক্ষম, অথবা সে এতই বোকা যে, বুঝতে পারে না—মৃত্যু মুহূর্তে উচ্চারিত কথাটা মিস জনসনের পক্ষে চিঠিতে জানানো সম্ভবপর নয়। আবার ওদিকে কথাটা শোনামাত্র হেনার রিস্রেক্স অ্যাকশন : 'আমার স্বামীর বিরুদ্ধে?' কেন? মিস পামেলা জনসন ওর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আমাকে তদন্ত করতে বলবেন কেন?

আমি বলি, হেনা একটা কথা জানে, যা আমরা জানি না।

—হ্যাঁ, কিন্তু কী সেটা? মিনতি মাইতির ধারণা, প্রীতম হুকুম করলে হেনা মানুষ খুন করতে পারে। আবার প্রীতমের ধারণা : প্রয়োজনে স্মৃতিটুকু কারও খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। সুরেশের বিবেকের বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। সবটা মিলিয়ে মনে হয়—এ ডেনমার্ক কোথাও কিছু একটা পচেছে। গছটা পাওয়া যাচ্ছে, উৎসটা বোঝা যাচ্ছে না, তাই নয়?

স্বীকার করতে হলো, আমি একমত মামু।

—তুমি কিছু বদলে যাচ্ছ কৌশিক। এ মত গোড়ায় ছিল না তোমার। বল তো, তোমার মতটা ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে বদলে গেল?

একটু ভেবে নিয়ে বলি, না। হঠাৎ ঝাঁক নেয়নি, ইটস্ আ কন্টিনিউয়াস্ কার্ভ। ধীরে ধীরে আমি আপনার সঙ্গে একমত হয়ে গেছি। বোধ করি স্থির-নিশ্চয় হয়েছি যখন হেনা ছুটে এসে তার 'গোপন কথা' বলতে চেয়েছিল—প্রীতমকে দেখে কথা ঘোরালো। মনে হলো ও একটা দারুণ আতঙ্কের মধ্যে আছে—

—আতঙ্ক! কাকে ওর ভয়? আমাকে?

—প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতেই যখন আপনি মিস জনসনের 'মৃত্যুর' কথা তুললেন, তখনই ও সাদা হয়ে গেছিল—যেন সেই মৃত্যু-রহস্য সম্বন্ধে সে কিছু একটা কথা জানে। ঠিক পরমুহূর্তেই সে স্বাভাবিক হলো, যখন দেখল—না, 'মৃত্যু' নয়, আপনি তার 'উইলট'র বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছেন। পরে আমার মনে হয়েছে, ওর আতঙ্কের উৎস—ওর স্বামী। প্রীতমকে সে দারুণ ভয় করে। আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি—পঁচিশে এপ্রিল প্রীতম যে মরকতকুঞ্জে গেছিল তা ফিরে এসে তার স্বীকে বলেনি।

—আর সুরেশ? সে কি বলেছিল টুকুকে যে, দ্বিতীয় উইলটা সে স্বচক্ষে দেখেছে?

—হ্যাঁ! এখানে স্মৃতিটুকুই মিথ্যাবাদী। সে জানতো! আর তাতেই সে বলেছিল 'ইউ ফুল'।

—ঐ 'ক্ল'-টার সাহায্য তো তোমার নেওয়ার কথা নয় কৌশিক। আড়িপাতা 'ক্রিকেট' নয়।

—'বডিলাইন বোলিং ইজ নট ক্রিকেট আইসার!'

—ই। মনে হচ্ছে আমরা ঠাই বদল করছি!

উনি নীরবে ধূমপান করতে থাকেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলি, কী ভাবছেন?

—অনেকের কথা। ইলপেস্তির রবি বোস, দারুণ স্মার্ট জয়দীপ রায়। ...

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো না, ওরা কারা। জানতে চাই, তার মানে?

—সমস্ত ব্যাপারটা পরপর সাজিয়ে দেখো কৌশিক—

বাধা দিয়ে বলি, একই কথা বারে বারে বলে কী লাভ?

—না, খুব সংক্ষেপে সারবো। প্রথম কথা : বুড়িকে হত্যা করার যে একটা চেষ্টা হয়েছিল—সিঁড়িতে একটি মৃত্যুফাঁদ পেতে—এটা তুমি এখন মনে নিচ্ছে?

—হ্যাঁ। এ সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ নেই।

—তাহলে তার অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত, একজন হত্যাপ্রয়াসীর অস্তিত্ব। যু কাট হ্যাড অ্যাটপেটেড মার্ডার, উইদাউট আ মার্ডারার! সে রায়ে কেউ ঐ মৃত্যুফাঁদটা পেতেছিল।

—মেনে নিলাম।

—প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমবার বার্থ হয়ে সে কি থেমে গেছিল? ... বাধা দিও না কৌশিক... আমি জানি, ডক্টর পিটার দত্ত বলেছেন—পামেলার মৃত্যু স্বাভাবিক। প্রথম কথা, পতনজনিত দুর্ঘটনার মৃত্যু হলে কার লাভ হতো?

—মিস্ মাইতি বাদে সকলেরই।

—ঠিক কথা! অথচ ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনাই হয়তো মূল হেতু যার জন্য মিস্ জনসন উইলটা পালটে দিলেন। যাকে বাদ দিতে চাই একমাত্র সেই হল লাভবান।

—তার মানে কাকে সন্দেহ করছেন আপনি?

—সেটা পরের কথা। এখন আমাদের বিচার্য বিষয় 'কার্য-কারণ সম্পর্ক'। পর পর চিন্তা করে দেখো। দুর্ঘটনার পরেই কী ঘটলো?

—মিস্ জনসন শয্যা নিলেন। অতিথিদের সবিনয়ে কিছু দৃঢ়ভাবে বিতাড়ন করলেন। দশমিনি তিনি চিন্তা করলেন। তাঁর অ্যাটর্নিকে আসতে বললেন আর আপনাকে চিঠি লিখলেন।

—হ্যাঁ, কিছু চিঠিখানা ডাকে দিলেন না। কেন? ভুলে গেলেন? অথচ প্রবীর চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিখানি তো ডাকে দিতে ভোলেননি।

—কী জানি। আমি তার কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না।

—আমার একটা আন্দাজ হচ্ছে। উনি চিঠিপত্র লিখে হয়তো সচরাচর গুর সহচরীকে ডাকে দিতে শিতেন। কিন্তু আমার চিঠিখানি তাকে দিতে চাননি। হেতু, উনি মিস্ মাইতিকেও জানাতে চাননি যে, পি. কে. বাসুকে তিনি একটি চিঠি লিখেছেন। বুড়ি ওর চরিত্রটা ঠিক জানতো কি না জানি না—অর্থাৎ সে নির্ভোষ না অত্যন্ত চতুর—কিন্তু একথা জানতো যে, সে পি. কে. বাসুর 'ফ্যান', 'কাঁটা সিরিজ'-এর পোকা।

—সম্ভবত আপনার ডিডাকশান ঠিক।

—সম্ভবত। বুড়ি চিঠিখানা ডোশকের তলায় রেখে দিয়েছিল, সুযোগমত ছেদিলাল বা তার বৌয়ের হাতে ডাকে পাঠাবে বলে। তারপর ভুলে যায়। যাহোক তারপর কী হলো?

—হেনা আর প্রীতম আঠারই দেখা করে গেল। সম্ভবত তিনি তাদের জানাননি প্রবীরবাবু বা আপনাকে চিঠি লেখার কথা।

—মোস্ট প্রব্রাবলি! তারপর?

—উকিলবাবুর আবির্ভাব। দ্বিতীয় উইল প্রণয়ন। একুশে এপ্রিল।

## কাটায়-কাটায়-২

—ইয়েস! পরের সপ্তাহে, ষ্ট্রিশে এল টুকু আর সুরেশ। কতী নিঃসন্দেহে সুরেশকে উইলখানি দেখিয়েছিলেন—

—সে সিদ্ধান্তের একটিই এভিডেন্স! সুরেশের স্বীকৃতি—

—না! মিষ্টির স্টেটমেন্টও! মিষ্টি কান পেতে ওঁদের কথোপকথনটা শুনছিল। না হলে তার পক্ষে কথাগুলো ভাবাটাই বলা সম্ভবপর হতো না—‘ওর বাবা আর বোনরা শান্তি পাবেন না তাঁদের রক্ত জলকরা টাকা কেউ যদি উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়’, অথবা ‘খ্রীতমের মতো ফটকাবাজি করে—’

—ও ইয়েস! মিস্ জনসন উইলটা সুরেশকে দেখিয়েছিলেন। ঐ আলোচনা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সুরেশের সঙ্গে টুকুর যে সম্পর্ক তাতে সুরেশ নিশ্চয় তার বোনকে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। অথচ মৃত্যুটুকু সে-কথা কিছুতেই স্বীকার করলো না।

—বাট হোয়াই? কেন?

—সেটা বুঝে উঠতে পারছি না।

—দ্যাটস্ আ ভাইটাল ক্লু, কৌশিক! কেন টুকু বারে বারে অস্বীকার করলো যে, সুরেশ তাকে ও-কথা বলেনি!

স্বীকার করতে হলো, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে মামু!

—ঠিক আছে। তারপর কী হলো? ঐ ষ্ট্রিশে খ্রীতম ঠাকুরও এসেছিল। ঘটনাখানেক মরকতকুঞ্জ ছিল, অথচ সে ফিরে গিয়ে সেকথা তার স্ত্রীকে বলেনি। নাকি বলেছিল? হেনা মিথ্যা কথা বলছে?

—না মামু! এখানে ডক্টর ঠাকুরই মিথ্যাবাদী। হেনা জানতো না যে, তার স্বামী ষ্ট্রিশে ঘটনাখানেকের জন্য মেরীনগর ঘুরে এসেছে। আমি নিশ্চিত।

—বরং ধরে নেওয়া যায় খুব সম্ভবত হেনা জানতো না। তারপর কী ঘটলো? শনিবারেই খ্রীতম কলকাতা ফিরে গেল। টুকু আর সুরেশ ফিরে গেল সোমবার—সাতাশে। পরদিন বসলো ম্যানচেস্টার আসর।

—পরদিনই ধরে নিচ্ছেন কেন?

—যেহেতু মিস্ উবা বিশ্বাস বলেছিলেন ‘মঙ্গলবার’। শনি-মঙ্গলই এসব ব্যাপারের প্রশস্ত বার। সুতরাং পরদিনই মঙ্গলবার। আঠাশ তারিখে মিস্ জনসন ম্যানচেস্টার আসর থেকে লুটিয়ে পড়ে লেলেন। তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। ডাক্তার এলো। পরীক্ষা করে বললো, অ্যাকিউট কেস অব জনডিস! তার তিনদিন পরে মিস্ জনসন মারা গেলেন আর মিস মাইতি হয়ে গেল—সূতপ্তির বয়ের ভাষায় ‘ছন্নড়ফোড় মালকিন’। এবং সমস্ত বিবরণটা শ্রবণান্তে সুকৌশলীর সিনিয়ার পার্টনার বললেন, স্বাভাবিক মৃত্যু!

আমার আর সহ্য হল না। বলে উঠি, সেই সিনিয়ার পার্টনারের গুরু কোন এভিডেন্স ব্যতিরেকেই সিদ্ধান্তে এলেন, বিষ-প্রয়োগে হত্যা!

মামু রাগ করলেন না। বললেন, না! বিনা এভিডেন্সে নয়, কৌশিক। মিস্ জনসনের মুখ থেকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে কিছু একটা বার হয়েছিল—‘লুমিনাস, অর্থাৎ প্রোজেক্ট, দীপ্তিময়, জোনাকির আলো হলুদরঙের হলে যেমন হয়’, তাই নয়? একথা মিস্ বিশ্বাস একা বলেননি। মিনতি মাইতি তা করবোরেট করেছে।

—তাতে কী হলো? অ্যাকিউট কেস অব জনডিসে এমন হয় না?

বাসু-সাহেব জবাব দিলেন না।

বলি, খোলাখুলি বলুন তো মামু? আপনি কি সন্দেহটা সূচীমূল করতে পারছেন না আমার মতো?

—না কৌশিক। আমার সন্দেহভাজন ব্যক্তি একজনই। কিছু আমি ভয় পাচ্ছি।

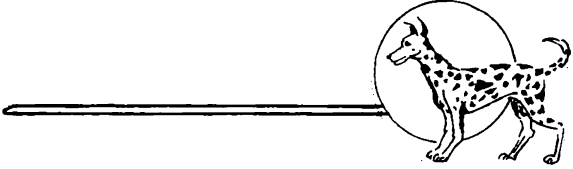
—ভয় পাচ্ছেন? সে পালিয়ে যেতে পারে বলে?

—না! মরিয়া হয়ে সে দ্বিতীয় আর একটি খুন করে বসতে পারে বলে।



—দ্বিতীয় খুন! কে? কাকে?

সে কথার জবাব না দিয়ে উনি বললেন, রহস্য উদ্ঘাটনের কথা আর আমি ভাবছি না কৌশিক, ভাবছি এই দ্বিতীয় হত্যাটা কী ভাবে ঠেকানো যায়!



বেলা তিনটের সময় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে অ্যাটর্নি প্রবীর চক্রবর্তীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই ছিল।

কিছু মামু বললেন একবার নিউ আলিপুরের ডেরায় যেতে হবে। তাঁর কিছু কাজ আছে। তাছাড়া দুপুরে বাইরে খাওয়ার কোনও কথা ছিল না। বিশু আমাদের ভাত আগলে বসে থাকবে, নিজেও খাবে না।

অগত্যা এলগিন রোড থেকে ফিরে আসতে হলো নিউ আলিপুরের বাড়িতে।

সেখানে পৌছাতেই শোনা গেল বৈঠকখানায় এক বাবু বসে আছেন বাসু-মামুর প্রতীক্ষায়। বৈঠকখানায় নয়, মামুর চেয়ারে। দুজনে তাই সেখানেই গেলাম প্রথমে।

একটু আশ্চর্য হলাম সুরেশ হালদারকে দেখে। সে নাকি বস্টাখানেক অপেক্ষা করছে।

মামু তাঁর চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কী ব্যাপার? সুরেশবাবু যে...

—জ্ঞানতে এলাম স্যার, কতদূর কী হচ্ছে এদিকে?

—আহরাদি হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, আপনারা বরং খেয়ে-দেয়ে নিন, তারপর কথা হবে।

—না। অনেকক্ষণ বসে আছো, এসো, কথাবার্তা যেটুকু আছে তা আগেই সেয়ে ফেলি।

—আপনি কিছু ফন্দি-ফিকির বার করতে পারলেন?

—উইলটাই তো এখনো দেখিনি। আজ বিকালে দেখবো। আজ সুরেশ, তোমরা কি মিনিতি মাইতির সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলেছো?

—বুধা চেষ্টা। সে রীতিমতো উকিলের পরামর্শে চলছে। ও আমাদের দুজনকে দু'চক্রে সেখতে পারে না। সোজা আঙুলে ওর কাছ থেকে ঘি বার করা যাবে না—

—তার মানে আঙুল ঝাঁকতেই হবে?

—আমার আঙুলগুলো এমনিতেই ঝাঁকা-ঝাঁকা স্যার, আপনার মদত পেলে—

—মদত পেলে? কী জাতীয় সমাধানের কথা ভাবছো তুমি?

—কিছুই মাথায় আসছে না স্যার। মিস্টিকে হুমকি দিলে কি কিছু কাজ হবে?

—হুমকি? হুমকিতে কি কাজ হয় সুরেশ? বড়পিসিকে তো দিয়ে দেখেছিলে?

সুরেশ একটু অবাক হয়ে বললে, আপনি তা কেমন করে জানলেন?

—তাহলে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বানানো নয়? সত্যি কথাটা বলবে?

—বলবো। বড়পিসিকে হুমকি দিইনি আমি। সহজ কথাটা সরল করে বলে ফেলেছিলাম শুধু। বলেছিলাম—তোমার শরীর দুর্বল, একা-একা থাকো, উইল করে যা আমাদের দেবে তার থেকে

## কাটার-কাটার-২

আগে-ভাগে কিছু দিয়ে দেওয়াই ভালো নাকি? আমাদের চারজনের অবস্থাই সঙ্গীন। মানুষ মরিয়া হয়ে উঠলে হিতাহিত জ্ঞান হারায়। শেষে তোমার কিছু ভালমন্দ না হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, এটা একটা সহজ কথা এবং সরল করেই বলা। তা শুনো তিনি কী বললেন?

—বড়পিসি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, শরীর দুর্বল হলেও সে নিজেকে রক্ষা করতে জানে। তারপর আমাকে সোজা দরজা দেখিয়ে দিল।

—বুঝলাম। আচ্ছা তুমি কি জানো যে, ডক্টর ঠাকুর ঠাট্টা, শনিবার মরকতকুঞ্জে গিয়েছিল, ঘণ্টাখানেক মাত্র ছিল?

—না। কে বললো?

—ডক্টর ঠাকুর নিজেই।

—বেচারি! সে নিশ্চয় বড়পিসির কাছে দরবার করতে গেছিল। টিড়ে ভেজেনি। বলুন স্যার, এরকম মরিয়া হয়ে গেলে মানুষ খুন করার কথা ভাবে না? আমি বড়পিসিকে ফাঁকা ছুমকি দেখিয়েছি?

—না। তবে একথাও বলবো, মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে শূণ্য 'হত্যা'র কথাই ভাবে না। তুমি ভাবো কি না, সে-কথা তুমিই বলতে পারবে।

একগাল হাসিমুখে সুরেশ। বললে, ওভাবে আমাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নিতে পারবেন না, বাসু-সাহেব। আমি কোনদিন বড়পিসির সুপে আরসে—

—সুপে?

—স্ট্রিকনিং-বিব মেশাইনি। যাক, আপনাদের লাঞ্চার দেখি হয়ে যাচ্ছে। আজ চলি।

হাসতে হাসতেই বিদায় নিল সে।

বলি, আপনি কি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন মামু? ও কিছু একটুও ভড়কায়নি।

—তাই মনে হল তোমার? ঐ কবিক বিরভিটুকু সবেও?

—কবিক বিরভি? কখন?

—‘বড়পিসির সুপে’ বলে ও হঠাৎ খেমে গেল না?

—হয়তো একটা তীব্র বিবের নাম ওর মনে আসছিল না।

—হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে সহজ নামটা ওর মনে পড়ল না। কেন?

—সবচেয়ে সহজ নাম? কী? পটাসিয়াম সায়ানাইড?

—সেটা দুর্লভ। আর কোন নাম?

—আর্সেনিক?

—আমার যেন তাই মনে হল। ‘আর্সেনিক’ বলতে গিয়েই ও খেমে গেছিল, ঘুরিয়ে নিয়ে বাকটা শেষ করলো ‘স্ট্রিকনিং’ প্রয়োগ করে। যা হোক চলো, খেয়ে নেওয়া যাক। বিশু ইতিমধ্যে বার দুই উকি মেরে গেছে।

আহারান্তে ওল্ট কোর্ট হাউস স্ট্রীট। চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্স বেশ নামকরা সলিসিটার্স ফার্ম। বর্তমানে সিনিয়র পার্টনার প্রবীর চক্রবর্তী প্রায় মানুষ। আমাদের আপ্যায়ন করে বসিয়ে মামুকে বললেন, মিস্ শ্রুতিটুকু হালদার টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে, আপনারা আমার কাছে আসছেন। ওরা ভাইবোনে নাকি আপনাকে নিয়োগ করেছে; কিন্তু কী উদ্দেশ্য নিয়ে এটা আমি বুঝে উঠতে পারিনি এখনো।

—ধরুন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটা গোপন তদন্ত করে দেখতে।

—মিস্ হালদার এবং সুরেশ ইতিপূর্বেই আমার সঙ্গে আলোচনা করে গেছে। আমি ওদের বলেছি, আইনের দিক থেকে ওদের কিছুই করার নেই। দ্বিতীয় উইলখানি প্রণয়নের বিষয়ে তদন্তের কোন অবকাশ নেই।

—বটেই তো। তা হলেও আপনি যদি আমার কিছু কৌতূহল দূরীভূত করেন তাহলে কৃতার্থ হই।  
দায়িত্বটা যখন নিয়েছি—

—আয়াম আট য়োর সার্ভিস।

—আমার খবর, মিস জনসন আপনাকে দ্বিতীয় উইলখানা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সতেরই এপ্রিল, তাই নয়?

ফাইলের কাগজপত্র দেখে নিয়ে উনি বললেন, হ্যাঁ, চিঠির তারিখ সতেরই এপ্রিল।

—উনি আপনাকে একটি নতুন উইল তৈরি করার কথা বলেছিলেন একথা আমি জানি। আপনি সেটা কোথায় বানালেন? মরকতকুঞ্জে গিয়ে?

—না। মিস জনসন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন সব কিছু তৈরি করে, স্ট্যাম্প কাগজে টাইপ করে নিয়ে যেতে, যাতে উনি সই করে দিতে পারেন। 'প্রভিশন্স' খুব সরল ছিল, নির্দেশও স্পষ্ট—মানে ঝি-চাকরদের কাকে কত দিতে হবে, চ্যারিটেবল ফান্ডে কোথায় কত—এবং বাকি সমস্ত স্বাবর/অস্বাবর সম্পত্তি ঐ গুর সহচরীকে। ফলে উইলটা কলকাতাতেই টাইপ করে ফেলতে কোন অসুবিধা হয়নি আমার।

—মাগ করবেন মিস্টার চক্রবর্তী! চিঠির নির্দেশটা পেয়ে আপনি বেশ অবাক হয়ে গেছিলেন, নয়?

—অস্বীকার করবো না, তা হয়েছিল।

—উনি এর আগে আর একটি উইল করেছিলেন, আপনার মাধ্যমেই, তাই নয়?

—হ্যাঁ, বছর পাঁচেক আগে। গুর সব আইনঘটিত কাজ আমার মাধ্যমেই হতো।

—আর সেই উইল মোতাবেক সম্পত্তিটা গুর তিন আত্মীয়ের সমান ভাগে পাওয়ার কথা ছিল।

—না, সমান ভাগ নয়। অর্ধাংশ পেতো হেনা ঠাকুর, এক-চতুর্থাংশ করে শ্যুটিটুকু আর সুরেশ।

—সেই উইলখানা কী হল?

—পেটা বরাবর আমার কাছেই ছিল। মিস জনসনের নির্দেশ মতো আমি সেখানিও নিয়ে যাই—ঐ একুশে এপ্রিল তারিখে।

—আপনি যদি সেই একুশ তারিখের ঘটনাগুলি একটু বিস্তারিত জানান তাহলে আমার খুব সুবিধা হয়।

—আপত্তি নেই। একুশ তারিখ আলি লাঞ্চ সেরে আমি কলকাতা থেকে সরাসরি আমার গাড়িতে যাই। ওখানে পৌছাই তিনটে নাগাদ। সঙ্গে ছিল আমার ল-ক্লার্ক আর ড্রাইভার। মিস জনসন নিচের ঘরে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। টেলিফোনে আমি জানিয়েছিলাম—তিনটার সময় পৌছাবো।

—ওঁকে কেমন দেখলেন? শারীরিক ও মানসিক?

—শরীর ভালোই ছিল; যদিও একটা লাঠি নিয়ে হাটছিলেন। ইতিপূর্বে ওঁকে কখনো লাঠি ব্যবহার করতে দেখিনি। মানসিকভাবে তিনি কিছু উত্তেজিত ছিলেন, কিন্তু ওঁর ভিক্টোরিয়ান স্থিতপ্রজ্ঞতা ছিল বিষ্ময়কর—সে উত্তেজনা সহজে নজরে পড়ছিল না।

—মিস মিনতি মাইতিও ছিল সেখানে?

—হ্যাঁ, যখন আমরা পৌছাই। তারপরে কস্তুর নির্দেশে সে চলে যায়।

—তারপর?

—উনি জানতে চাইলেন, উইলটা আমি তৈরি করে এনেছি কিনা। আমি 'হ্যাঁ' বলাতে সেটি উনি দেখতে চাইলেন। আশ্চর্য ধীরে ধীরে সবটা পড়ে যখন সই করতে গেলেন, তখন...

—তখন?

—না। সব কথাই স্বীকার করবো, তখন আমি ওঁকে বলেছিলাম, কাজটা কি ভাল হচ্ছে? আপনি ভেবে চিন্তে দেখেছেন তো এভাবে আপনার পরিবারের সবাইকে বঞ্চিত করাটা ঠিক উচিত হচ্ছে কিনা? জবাবে উনি বললেন, আমি কী করতে যাচ্ছি তা আমি জানি।

## কাটার কাটার-২

—উনি খুব উত্তেজিত ছিলেন, তাই নয়?

—তা ছিলেন; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যাবার মতো উত্তেজিত ছিলেন না। স্মৃতিস্রু, সুরেশ, হেনাদের আমি ওদের ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি। তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতিও আছে; কিন্তু উকিল হিসাবে আমাকে বলতেই হবে—মিস জনসন যা করেছেন তা আইনসম্মত। নিজের সম্পত্তি দেখাশোনা করার ক্ষমতা ও মানসিক স্বৈর্য তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। যে কথা বলছিলাম—উনি কলমটা বার করে সেই করতে গিয়েও একবার থামলেন, জানতে চাইলেন—‘আমি যা করছি, তা করবার আইনত অধিকার আমার আছে?’ আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। তখন উনি বললেন, ‘তাহলে আপনার ল-ক্লার্ক আর ড্রাইভারকে ডাকুন, তাদের সামনে আমি স্বাক্ষর করবো।’ আমি ওদের ডেকে আনলাম, তাদের সামনে উনি সেই দিলেন।

—তারপর? উইলটা উনি আপনাকে রাখতে দিলেন?

—না, আগের উইলখানা যদিও বরাবর আমার কাছে গচ্ছিত ছিল, তবু এখানা উনি নিজের কাছেই রাখলেন। ঠর ঘরে যে আলমারি আছে তার ভিতর।

—আর পুরোনো উইলখানা? যেটা বাতিল হলো? সেটা ছিড়ে ফেললেন?

—না। সেখানাও উনি একই আলমারিতে তুলে রাখলেন।

—এই অদ্ভুত আচরণের হেতুটা কী, তা আপনি জানতে চাননি?

—চেয়েছিলাম। উনি জবাবে একই কথা বললেন : আমি জানি, আমি কী করছি।

—আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই নয়?

—হ্যাঁ। কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম ঠর ‘ফ্যামিলি ফিলিংস’ খুব গভীর।

—সেই প্রথম উইলখানা কি ঠর মৃত্যুর পর ঝুঁজে পাওয়া যায়নি?

—না, গিয়েছিল। এক্সিকিউটার হিসাবে ঠর আলমারির একটি চাবি আমার কাছে বরাবরই থাকতো। ঠর মৃত্যুর পর সকলের সামনে আমি যখন আলমারি খুলি তখন দুটি উইলই দেখতে পাই—ঠিক যেভাবে উনি গুছিয়ে রেখেছিলেন, সেভাবেই।

—মিস মিনতি মাইতি কি জানতো যে, কতী তাকেই সব কিছু দিয়ে দ্বিতীয় একখানি উইল করেছেন?

—রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমরা কিছু একটা করছিলাম, এটুকুই সে জানতো। কী করছিলাম, তা জানতো না।

—মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি কি আপনার মক্কেলকে বলেছিলেন, দ্বিতীয় উইলের ‘প্রভিশন’ তাঁর সহচরীকে না জানাতে?

উনি হাসলেন। সংক্ষেপে বললেন, বলেছিলাম।

—কেন? এ পরামর্শ কেন দিয়েছিলেন?

ঠর হাসিটা মিলিয়ে গেল না। বললেন, হেতুটা আপনি জানেন, আপনিও আইনজীবী। এবং জানেন, এসব কথা আলোচনা না করাই ভালো। তাই মূল হেতুটা এড়িয়ে আপনার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ হিসাবে আমি বলবো, যদি আমার মক্কেল তৃতীয়বার উইলটা বলল করেন তখন মিস মাইতি মর্মান্তিক হবে। এ জন্যই আমার মক্কেলকে বারণ করেছিলাম।

—তার মানে আপনি ভেবেছিলেন যে, আপনার মক্কেলের পক্ষে অচিরেই দ্বিতীয় উইলখানা বদল করার প্রয়োজন হতে পারে?

—ঠিক তাই। আমার মনে হয়েছিল—পরিবারের প্রত্যাশিত ওয়ারিশদের সঙ্গে আমার মক্কেলের কোন কারণে কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকবে। উনি যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন তখন আমাকে ডেকে পাঠাবেন তৃতীয় উইল করবার প্রয়োজনে।

—আপনার কি একথা মনে হয়নি যে, মিস জনসন সে পদক্ষেপ করার বদলে হয়তো প্রথম উইলখানা রেখে দ্বিতীয়খানা শুধু ছিড়ে ফেলবেন?

—মিস্টার বাসু, আপনি আইনজ্ঞ—আপনি জানেন যে, দ্বিতীয় উইল করা মাত্র তাঁর প্রাথমিক উইলখানি আইনের চোখে বাতিল হয়ে গেছে।

—কিন্তু আপনার মক্কেল আইনজ্ঞ ছিলেন না। এই আইনের খুঁটিনাটি হয়তো তাঁর জানা ছিল না। তাছাড়া দ্বিতীয় উইলখানি পাওয়া না গেলে—স্বাভাবিক ওয়ারিশ হিসাবেই ওয়া তিনজন সম্পত্তিটা পেতো। নয় কি?

—দ্যাটস্ আ ডিবেটেবল্ পয়েন্ট। কিন্তু ঘটনা তো সেই খাতে বয়নি। দু'খানি উইলই যথাস্থানে রাখা ছিল।

—এমন কি হতে পারে না যে, মৃত্যুশয্যা়া তিনি প্রথম উইলখানি ছিড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন—হয়তো একটা 'ডামি-উইল' ছিড়েও ফেলেছিলেন? শেষ সময়ে, মৃত্যুসময়ে কে বা কারা উপস্থিত ছিলেন তা আপনি জানেন। তারাই হয়তো ঠর নির্দেশে দেবাজ খুলে উইল দুটি বার করে এনেছিল—

প্রবীর চক্রবর্তী বাধা দিয়ে বললেন, মাপ করবেন মিস্টার বাসু, এসব কথা কি আপনি আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন?

বাসু নীরব রইলেন। প্রবীরবাবু এবার নিজে থেকেই বলেন, এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে করেন আপনি?

—মাপ করবেন। এই পর্যায়ে আমি কিছুই বলতে চাই না। আপনাকে শুধু একথাই বলবো যে, ব্যাপারটার গভীরে একটা কিছু আমার নজরে পড়েছে। তারই তদন্ত করছি আমি।

—বুঝেছি। কিন্তু আপনার মক্কেলটি কে? মিস হালদার না সুরেশ?

—ওদের দু'জনের একজনও নয়?

—তার মানে মিসেস হেনা ঠাকুর?

—আজ্ঞে না, তাও নয়। আমার মক্কেল : মিস পামেলা জনসন। আপনাকে যেদিন চিঠি লিখে দ্বিতীয় উইলখানি বানাতে বলেন সেইদিনই তিনি আমাকে একটি চিঠি লেখেন। না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আইনঘটিত কোন কিছু নয়। তিনি আমাকে একটি বিষয়ে তদন্তের ভার দেন। আমার ক্লায়েন্ট অবশ্য মারা গেছেন; কিন্তু অসমাপ্ত কাজটা শেষ না করে আমি তৃপ্ত হতে পারছি না। আমি আপনার কাছে এসেছিলাম জানতে যে, আপনার কি মনে হয়নি—উনি অদূর ভবিষ্যতে আবার একটি উইল বানাতে চাইবেন। আপনি আমার সে কৌতূহল চরিতার্থ করেছেন।

প্রবীরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত অনুমানটা আপনাকে জানিয়েছি মাত্র। আমার ধারণার স্বপক্ষে কোনও এভিডেন্স নেই কিন্তু—

—দ্যাটস্ পারফেক্টলি আন্ডারস্টুড, মাই ডিয়ার স্যার।



আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বাসু-মামু নিতান্ত খেলালবশে কাজ করে চলেন। প্রফেশনাল কারণে নয়। পেশাগত ব্যারিস্টার নেশার বশে গোয়েন্দা হলে যা হয়। যেমন এই কেসটা। মিস পামেলা জনসন

## কাঁটার কাঁটার-২

ওঁর আইনসম্মত মক্কেল নন, ছিলেন না—ওঁর ফিজটা জানতে চেয়েছিলেন মাত্র, কোনও 'মিটেইনার' সেননি। ভদ্রমহিলা দুর্বোধ ভাষায় যে ধাধাটা তৈরি করেছিলেন তার পাঠোদ্ধার বাসু-মামু যাই করুন, আমার মনে হয়েছিল তা একটি মাত্র পংক্তিতে সংক্ষেপিত হতে পারে : পাগলা, লা ডুবাস না যেন!

বাসু। বাসু-মামু সে-কথা শুনই নৌকার গলুইয়ে দাপাদাপি জুড়ে দিলেন। যাত্রী-বোঝাই নৌকাটা পাল তুলে দিব্যি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল—ওঁর এই নাচানাচিত্রে সেটা এখন প্রচণ্ডভাবে দুলভে শুরু করেছে। যাত্রীরা আতঙ্কগ্রস্ত—ভরাডুবি না হলেও ওরা বুঝতে পেরেছে তাদের মধ্যে একজনকে উনি ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিতে চাইছেন। ওরা সবাই নিজের নিজের জান বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছে।

এক হিসাবে এই 'সারমেয় গণ্ডুক' কেসটা অনবদ্য। এতদিন অন্যান্য কেস-এ দেখেছি, অপরাধটার বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—প্রমাণ থাকতো : কে অপরাধী? এবার তা হয়নি। অপরাধ খুঁজতে বসার আগে ঠেকে খুঁজতে হচ্ছে : অপরাধটা। ওঁর অবস্থা দার্শনিকদের মতো—অন্ধকার ঘরে হাতড়ে হাতড়ে একটা কালো বেড়ালকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন উনি—অথচ নিজেও জানেন না, ঐ কালো বেড়ালটা এই নীরস্ত্র অন্ধকার কক্ষে আদৌ আছে কি না!

পরদিন সকালে দেখলাম উনি টেলিফোন করলেন মিনতি মাইতির হোটেল। কথোপকথনের এক প্রান্তের কথাই কানে এলো। তাতে বোঝা গেল উনি মিন্টি মাইতির সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় দেখা করতে চাইছেন; আর সে বলছে যে, আজ বিকালে সে মেরীনগর যাবে। বাসু-সাহেব বললেন, তাহলে তো ভালোই হয়। কথাবার্তা মেরীনগরে বলতে পারলেই ভালো হয়। আমিও যদি সেখানে যাই তাহলে ওবেলা কথা বলা যাবে?

মিনতি জবাবে কী বললো তার আভাস পেলাম বাসু-মামুর প্রত্যুত্তরে: ঠিক আছে। এই ধরো বিকাল চারটে নাগাদ!

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে উনি ঘুরে দাঁড়াতে বলি, তার মানে আমরা আজ ওবেলা আবার মেরীনগর যাচ্ছি?

—হ্যাঁ এবং না। অর্থাৎ ও-বেলায় নয়। এ-বেলাতেই। তৈরি হয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে। বলি, আমার যেন মনে হলো আপনি বিকেলবেলা মিনতির সঙ্গে সেখানে কথা বলবেন বললেন।

—তাই বলেছি। কিছু সে মেরীনগরে পৌঁছানোর আগেও আমাকে কিছু ইনভেস্টিগেট করতে হবে। নাও, উঠে পড়, কুইক!



এবার আমাদের দেখে ফিসি চিংকার চেঁচামেচি একটুও করলো না। বার দুই শূঁকে নিয়েই সে নিশ্চিন্ত হলো। স্বরণ অবাক হলো শান্তি। বললে, মিন্টি আসনি আপনাদের সঙ্গে?

—না তো। শুনছি, সে নাকি বিকালে আসবে এখানে।

—হ্যাঁ, তাই তো। আপনারা আসবেন তাও টেলিফোন করে জানিয়েছে। আমি ভেবেছি যে, আপনারা এ বেলাতেই একসঙ্গে এসেছেন।

—না, শান্তি। মিস্ মাইতি বিকালেই আসবে। তখন তার সঙ্গে আমি এসে কিছু আলোচনাও করবো। কিন্তু তার আগেও আমার কয়েকটা কথা জানার দরকার—

শান্তি একটু যেন অবাক হলো। সামলে নিয়ে বললে, যা হোক এসে যখন পড়েছেন, তখন এখানেই দুটি খেয়ে নেবেন দুপুরে—

—না! কাঁচড়াপাড়াতে আমাদের একটা লাক্সের নিমন্ত্রণ আছে। আমার এক মাসিমার বাড়ি।

ওরা বৈঠকখানাতে এসে বসলেন। দুজনেই। শান্তিও একটা মোড়া নিয়ে এসে বসলো।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে বলটা মুখে নিয়ে ফ্রিস এসে দাঁড়িয়েছে আমার মুখোমুখি। তুরতুর করে লেজটা নাড়ছে। বেচারির বোধহয় অনেকদিন খেলা হয়নি। আমি তাই মামুকে বলি, আপনারা কথা বলুন, আমি ততক্ষণ ফ্রিসিকে একটু খেলাই—

মামু হৃক্ষেপ করলেন না। বার কতক বল ছোঁড়াছুড়ি করে আমার বিবেক-দংশন শুরু হয়ে গেল। মামু কী ভাবছেন? ডুইং কমে ফিরে এসে শূনি ওরা দুজন মিস্ জনসনের চিকিৎসার বিষয়ে তখনো কথাবার্তা বলছেন। শান্তি দেবী বলছিল, হ্যাঁ, ছোট ছোট সাদা ট্যাবলেট—নাম জানি না। দিনে তিনটে করে খেতেন। ডক্টর দস্তুর প্রেসক্রিপশান মতো। এছাড়া একটা ক্যাপসুলও খেতেন। অর্ধেক সাদা, অর্ধেক হলুদ—মানে বাইরের রঙটা।

—সেটা কার প্রেসক্রিপশানে?

—ঐ ডক্টর দস্তুরই প্রেসক্রিপশান। আর কারও প্রেসক্রিপশানে কোনো ওষুধ উনি কখনো খাননি। এসব বিষয়ে উনি খুব সতর্ক ছিলেন। একবার—

হঠাৎ মাঝপথেই থেমে পড়ে শান্তি। বাসু-মামু বলেন, জানি। ডক্টর ঠাকুর কী একটা ওষুধ নিয়ে এসেছিল, তা উনি খাননি। হেনা বলেছে আমাকে।

শান্তি আর গোপন করার প্রয়োজন দেখলো না। বললে, তবে তো আপনি জানেনই। কিন্তু ম্যাডাম যেভাবে হেনাদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেটা ওয়াশ-বেসিনে ঢেলে ফেলেছিলেন—তা আমার ভালো লাগেনি। হেনাদির বর কিছু বিষ নিয়ে আসেনি—

—বটেই তো! বটেই তো! তা সেসব ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল কি দু-একটা এখনো আছে?

—না! মিনতি সব বাতিল ওষুধ ফেলে দিয়ে ঘরটা সাফা করেছে।

—কোথায় থাকতো ঐ ওষুধগুলো?

—ম্যাডামের ঘরের লাগোয়া বাথরুমের কাবার্ডে।

—শেষদিকে ডক্টর দস্তুর একজন নার্সকে বহাল করেছিলেন—তার নাম বোধহয় আশা, নয়?

—হ্যাঁ, আশা পুরকায়স্থ। কেন বলুন তো?

মিথ্যা ভাষণের কী পারদর্শিতা! বাসু-মামু দিব্য এক আঘাতে গল্প ফেঁদে বসলেন। কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর যে বৃদ্ধা মাসিমা আছেন—ঐ যার বাড়িতে আজ দুপুরে আমাদের অলীক নিমন্ত্রণ, তিনি নাকি জনডিসে ভুগছেন। ওঁর মাসতুতো ভাই ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর তার বউ বৃষ্টি কাঁচড়াপাড়াতেই কী-একটা চাকরি করে। উনি তাই একজন স্থানীয় নার্সকে খুঁজছেন। ডক্টর পিটার দস্তুর কাছে আশার কথা শুনে উনি ভাবছেন তার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবেন। কাঁচড়াপাড়ায় সে ডে-টাইম নার্স হিসাবে কাজটা নিতে পারে কিনা।

শান্তি খুব সহানুভূতি নিয়ে সেই বৃদ্ধা মাসিমার কল্পিত রোগের বিবরণ শুনলো। আশার বিষয়ে খুব প্রশংসাও করলো। সে নাকি ‘নমিতা মেডিকেল স্টোর্স’-এর দ্বিতলে থাকে। আশা বিধবা। বাবার সঙ্গে থাকে। সোকানটা ওর বাবাই চালান—ঐ ডিসপেনসারিটা। আশা ট্রেড্‌ নার্স। কথার মাঝখানেই বন্ধন করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। শান্তি গিয়ে ধরলো।

—হ্যালো? হ্যাঁ, মরকতকুঞ্জ। ...না, আমি শান্তি, মিস্টি এখনো আসেনি। আপনি কে বলছেন? ...ও! মাসিমা! বলুন? ...হ্যাঁ, সাদা রঙের অ্যাম্ব্যাসাডার। ...নম্বর? তা তো জানি না। আচ্ছা ধরুন, জিজ্ঞাসা করে বলছি।

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে শান্তি আমাদের দিকে ফিরে প্রহ্ন করে, আপানাদের গাড়িটার নাম্বার কি 4437?

বাসু-মামুর চোখ কপালে উঠলো। সোজাসুজি জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রহ্ন করেন, মাসিমাটি কে?

—উষা মাসিমা। উনি পোস্ট অফিস থেকে ফোন করছেন। জানতে চাইছেন, একটা সাদা অ্যামবাসাডারে চেপে মিষ্টি এসেছে কিনা।

—তা ঠুকে বলে দাও না যে, আসেনি।

—তা তো বললাম। তারপর উনি আপনার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন। আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলছেন, ‘নামটা মনে পড়ছে না, সে ভদ্রলোক কি এসেছেন? W.B.F. 4437 গাড়িতে চেপে?’

বাসু-মামু বাধা হয়ে উঠে গেলেন। শান্তির হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বললেন, গুড মর্নিং সিঁদি। ...হ্যাঁ, আমিহি। তা আমি এসেছি কী করে টের পেলেন?

সে সময়ে আমি এক প্রান্তের কথাই শুনতে পেয়েছিলাম, তবে পরে বাসু-মামুর কাছ থেকে পুরো কথোপকথনটাই জেতে নিজেছিলাম। পাঠক-পাঠিকাকে বঞ্চিত করবো না, এখানেই দু-পক্ষের ‘বাংচিত’ ভার্ভাটিম লিপিবদ্ধ করে যাই। উষা বিশ্বাস ঠুর গুডমর্নিং শুনই বলেছিলেন, ‘মিস্টার টি. পি. সেন?’ আমাদের আগমনবার্ভা কী করে টের পেলেন এ প্রহ্নের জবাবে বলেছিলেন, ‘পোস্টাপিসে এসেছিলাম, দেখলাম তোমার গাড়িটা মরকতকুঞ্জের দিকে চলে গেল, তাই ভাবলাম মিষ্টিকে নিয়ে তুমি বোধহয় মেরীনগরে এসেছো। তা এখন শুনছি মিষ্টি আসেনি। তা যাগগে, মরুগগে, শোনাে ভাই!—তোমার জন্যে একটা দারুণ খবর আমার কাছে লুকানো আছে। কখন আসছো?’

বাসু বলেছিলেন, কী জাভের খবর?

—টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। তুমি হারল্ড দস্তের নাম শুনছো?

—না। কে তিনি?

—একটা পরিচয়: তিনি মেরীনগরের একজন আদি বাসিন্দা। ত্বিতীয় পরিচয়: তিনি যোসেফ হালদারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তৃতীয় পরিচয়: তিনি পিটার দস্তের বাবা।

—ও বুঝছি। তা, তার কথা কেন?

—তোমার কাছে কোমাগাতামারুর্কর গল্পো শুনো পিটার তার পুরনো কাগজপত্র হাতড়ে দেখেছে। ওর বাবার একটি অতি পুরাতন ডায়েরি উদ্ধার করেছে। তাতে যোসেফ হালদারের বিষয়ে নানান গোপন তথ্য লেখা আছে। আমার মনে হয়, তোমার অনুমান ঠিকই—যোসেফ গুরুজিৎ সিংয়ের সহকর্মী ছিল। কোমাগাতামারুর্ক জাহাজে চেপেই সে মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে আসে।

টেলিফোনে আচমকা এই বিচিত্র বার্ভা শুনো বাসু-মামুর কী আন্তরিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তিনি আমাকে জানাননি। বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছিল উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মামুর কাছে

কথাটা শুনো আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ত্রৈলোক্যানাথের একটি অনবদ্য আষাড়ে গল্প: ‘লো লুলু!’

বেগম-সাহেবাকে ভয় দেখাতে আমীর-সাহেব বলেছিলেন, এ রকম বে-আদবি করলে লুলুকে ধরিয়ে দেবো। ‘লুলু’ আমীর-সাহেবের কোঁদো পোষা বা পরিচিত ভৃত্রপ্রত নয়; কথার-কথো হিসাবে তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতায় ঐ অভুত নামটা পয়দা করেছিলেন। গিরি যখন তাতেও ঘাবড়ালেন না, তখন আমীর চিকুড় পাড়েন: লো লুলু!

বাসু! সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেল!

লেখক ত্রৈলোক্যানাথের উর্বর কল্পনায়, “আশ্চর্যের কথা এই যে, লুলু একটি ভৃত্রের নাম ছিল। আবার, দেবের কথা শুন, লুলু সেই মুহুর্তে, আমীরের বাড়ির ছাদের আলিশার উপর পা খুলাইয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল? সে চমকিয়া উঠিয়া শুনিল—কে তাহাকে কি একটা লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুলুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে সেবতারাও তদ্রূপে নিকা করিয়া ফেলে, তা ভৃত্রের কথা



ছাড়িয়া দিন। চকিতের মধ্যে, দুর্ভাগ্য রমণীকে লুলু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিক নাই।”

বাসু-মামু অবশ্য ‘লে-লুলু’ বলেননি। বলেছিলেন: ‘লে কোমাগাতামারু!’

টেলিফোনের দিকে যে দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন তাতে মনে হইছিল কোমাগাতামারু-জিন রানী মামিমাকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাচ্ছে—আর সেটাই দেখতে পাচ্ছেন উনি, টেলিফোনের মাউথ-পিসে!

বাসু-মামু সামলে নিয়ে বলেছিলেন, ভেরি ইস্টারেস্টিং। ডায়েরিটা কোথায়? আপনার কাছে?

—না। পিটারের কাছে। পিটার বাড়িতে আছে। চলে এসো না ওর বাড়ি। আমিও যাই তাহলে। বেশ গল্পগাছা করা যাবে। তোমার সেই সাকরেন্দটিকেও সঙ্গে এনেছো তো?

মামু স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু তখনই ডক্টর পিটার দস্তের বাড়িতে যেতে পারবেন না, এ-কথাও জানিয়েছিলেন। বললেন, আপনি শাস্তিদেবীকে জানালেন যে, আমার নামটা মনে পড়ছে না, অথচ আমার কণ্ঠস্বর শুনেই আমার নামটা উচ্চারণ করলেন। ব্যাপারটা কী?

ঊষা বিশ্বাস সরাসরি জবাব দেননি। তাঁর নিজস্ব চঙে প্রতিপ্রশ্ন করে বলেন, তুমি মিস্ মার্পলকে চেনো?

—না। কে তিনি?

—কিছু মনে করো না ভাই, ছোটভাই মনে করে বলছি—সাংবাদিকতাকে তোমরা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছো, একটু বই-টাই পড়া অভ্যাস করো। মিস্ মার্পল হচ্ছেন অগাথা ক্রিস্টির এক অনবদ্য চরিত্র। তা আমি হিচ্ছি তাঁর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মেরীনগরী সংস্করণ। কখন আসছো আমার ডেরায়? ভালো কুকি বানিয়েছি কিছু।

বাসু-মামু প্রতিজ্ঞিত দিলেন, কলকাতা ফেরার আগে দেখা করে যাবেন। বিকাল তিনটে নাগাদ ফিরে আসবো জানিয়ে আমরা শান্তি দেবীর কাছে বিদায় নিলাম। গেটের কাছে দেখা হয়ে গেল ছেদিলালের সঙ্গে। মন্ত সলাম করলো সে।

মামু বোধহয় ঐ নীতিতে বিশ্বাসী : ‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখে ভাই?’

ছেদিলালের সঙ্গে জুড়ে দিলেন খেজুরে আলাপ। লোকটা তিন-পুরুষের মালি। গাছের যত্ন নিতে জানে। মামু তাকে এভাবে জেরা শুরু করলেন যে, মনে হিচ্ছিল আমরা মেরীনগরে এসেছি গুর উদ্ভিদ-বিদ্যার রিসার্চটার জটা সংগ্রহে। ছেদিলাল কথা শ্রসঙ্গে বললে, ম্যাডাম ছিলেন সত্যিকারের পুষ্পদরদী, বাগিচা-রসিক। নানান ফুলের গাছ লাগাতেন, নানান বীজ, সার, ডাকযোগে আসতো। নীতের মরশুমে ফুলের কেয়ারিগুলো কীভাবে বানানো হবে তা বুঝিয়ে দিতেন ছেদিলালকে। কোথায় ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কোথায় পপি, জিনিয়া, ডায়াক্সাস, ফ্লক্স, মেরিগোল্ড। ছেদিলালকে তিনিই শিখিয়েছিলেন ‘বনসাই-শিল্প’, অরেঞ্জি কিভাবে পড়ে পড়ে। মনে হলো, ছেদিলালই সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছে ম্যাডামের প্রয়াণে। ‘জব স্যাটিসফ্যাকশান’ নষ্ট হয়ে গেছে তার। শিল্প রসিকের প্রয়াণে শিল্পীর যে হাল হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সত্যিকারের বাগিচা-রসিক সত্যিই দুর্লভ।

যেন ইয়ারবকুর সঙ্গে খোশগল্প করছেন, মামু বললেন, তুমি এই শায়েরটা শুনো?

“হাজারো সাল নার্সিস/ আপনা বে-নুরী পর রোতী হৈ!

বড়ি মুশকিলসে হোতী হৈ/ চমন্মে দিদার পৈদা।”

ছাপরা-জিল্লার বাগান-রসিকের বোধগম্য হলো না কাবারস। ভাষাটা বড়ই উর্দুধেবা। তাই বাসু-সাহেবকে অস্বয়-ব্যাখ্যা দাখিল করতে হলো। “হাজার বছর ধরে নার্সিস-ফুল তার অনিন্দ্য সৌন্দর্য পসরা নিয়ে কাঁদছে। ও জানে, বাগিচার দরদী সমঝদার এক অতি সুদুর্লভ বস্তু।”

শাকরভাষা শুনেও কিছু বুঝলো কিনা তা আমার মালুম হলো না। পাকাচুলে ভরা মাথাটা দুলিয়ে বলল, ও তো সহি বাহা!

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

আমি উসখুশ করছি। এই অহৈতুকী বেজুরে আলাপ কতক্ষণ চলবে কে জানে!

হেদীলাল স্বীকার করলো, বর্তমান মালকিন বাগানের দিকে নজরই দেয় না। সব আগাছায় ভরে যাচ্ছে।

মামু বলেন, তা আগাছা নিড়ানোর দায়িত্ব তো তোমার, মালকিন কী করবে?

—ক্যা কিয়া যায় সা'ব? দাওয়াই বতম্ হো গয়া!

—দাওয়াই! কিসের দাওয়াই?

হেদীলাল জানালো, আগাছা নির্মূল করতে এক জাতের 'উইড-কিলার' ব্যবহার করতে হয়। ম্যাডাম কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতেন। মুশকিল কি বাৎ, ওটা হচ্ছে জ্বর, বিষ, তাই কিছুতেই একসঙ্গে বেশি আনতেন না। সার আমদানি করতেন বস্তা বস্তা, বীজ প্যাকেট-প্যাকেট—কিন্তু ঐ 'উইড-কিলার' আসতো দু-মাস অন্তর এক ডিক্বা। ওর স্টক ফুরানোর পর বর্তমান মালকিনকে সে জানিয়েছিল—মিনতি মাইতি কিছুতেই রাজি হয়নি—ঐ বিষ কিনতে।

'বিষ'-এর প্রসঙ্গ উঠে পড়া মাত্র মামুর উর্বর মস্তিষ্কে গজিয়ে উঠলো আর একটি আবারে গল্পের আগাছা—শান্তিনিকেতনে ঠুর একটি বাগান-ঘেরা বাড়ি আছে। একজন ওড়িয়া মালি সে বাগানের সেখভাল করে। তার নির্দেশমতো নানান-জাতের 'উইড-কিলার' উনি পাঠিয়ে দেখেছেন, কোন কাজ হয়নি। 'উইড-কিলার' মাটিতে মিশিয়ে আগাছা নির্মূল করা যায় না আদৌ। এই নাকি ঠুর অভিজ্ঞতা।

অর্থাৎ সেই একই ট্যাকটিক্স—প্রতিবাদের ইন্ধন জোগানো।

হেদীলাল দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানায়, না স্যার, আপনি কী-জাতের 'জ্বর' ব্যবহার করেছেন জানি না, কিন্তু আমি দেখছি, মেমসাহেব যা আনতেন তা খুবই কার্যকরী।

—কী 'জ্বর'? তোমার তো স্টক ফুরিয়েছে, কিছু খালি ডিক্বা কি আছে এক-আধটা?

হেদীলাল জানালো, একটি ডিক্বার সিল খোলেনি সে, সরানো আছে। এই সাতবিধা বাগানকে আগাছার হাত থেকে বাঁচানো যাবে না এটা ও বুঝে নিয়েছে। তাই একটি কৌটা আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে 'সিমেটরি'র জন্য। সেটা ছোট বাগান, সেখানেই শূয়ে আছেন ওর প্রাক্তন মালকিন এবং তাঁর স্নিহেদারেরা। হেদীলালের মনে হয়েছে, আগামী বর্ষায় সেই কবরগুলি আগাছায় ভরে গেলে ওর ম্যাডাম-সাহেবা কবরের নিচেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন না—তাই একটি ডিক্বা সে সতর্ক সুরিয়ে রেখেছে সিল না খুলে। মামুর আগ্রহে ডিক্বাটা এনে সে দেখালো। বললো, এটা কিনে দেখুন স্যার, নিশ্চিত কাজ দেবে।

বাসু যত্ন নিয়ে কৌটটিকে পরীক্ষা করলেন। তার গায়ে লেখা সিটারেচার পড়লেন। নির্মাণকারী সাবধানবাণী ছাপিয়েছেন—এটি 'বিষ', আর্সেনিক বিষ আছে এতে। উনি বললেন, না এটা কখনো পরখ করে দেখিনি। তা এ বিষ কতটা খেলে মানুষ মরে যায়?

হেদীলাল হেসে ফেলল। বলে, আপনিও যে ছোটোসাবের মতো জেরা শুরু করলেন।

—ছোটোসাহেব! মানে?

হেদীলাল হাসতে হাসতেই জানালো দু-তিন মাস আগে ঠিক এক জাতের প্রঞ্জ করেছিলেন ছোটোসাব, মানে সুরেশ হালদার : কতটা দাওয়াই খেলে মানুষ গুজর যায়। হেদীলাল সুরেশকে হাফ-প্যান্ট-পরা যুগ থেকে দেখেছে। প্রাণচঞ্চল যুবকটির প্রতি তার একটা স্নেহমিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। জ্বাবে সে বলেছিল, সে খোজে তোমার কি দরকার ছোটোসাব? তুমি কি কাউকে বিষ খাওয়াবার মতলব ভাঁজছো? তাতে নাকি ওর ছোটোসাব জানিয়েছিল, 'এখন নয়। পরে হয় তো দরকার হবে। ধর আমি ভবিষ্যতে থাকে বিয়ে করবো তাকে যদি পছন্দ না হয়?' হেদীলাল নাকি তখন তাকে ধমক দেয়, অমন অলক্ষণে কথা বোলা না ছোটোসাব! যে লছমীজির সাথে তোমার সাদি হবে—এ বাড়ির বহুরাণী—তার সত্বজে অমন কথা রসিকতার ছলেও বলা উচিত নয়।

বাসু হঠাৎ বলেন, কিন্তু এ ডিক্বার সিল তো খোলা?

ছেদিলাল একটু অবাক হলো। কৌটাটি হাতে নিয়ে বললে, আরে ই্যা, তাই তো! তাহলে নিচর খুলেছিলাম কখনো অন্যমনস্কভাবে। ই্যা, তাই—এই দেখুন, অনেকটা খরচও করে ফেলেছি। কৌটার ঢাকনি খোলার পর নজর হলো বেশ খানিকটা খরচ হয়ে গেছে।

বাসু বলেন, কবে খুলেছো তা মনে পড়ছে না?

—জী না। হয়তো অন্যমনস্কভাবে—

—তোমার জেনানা খেলেনি তো?

—জী না। ও এসবে হাত দেয় না। আমি বারণ করে দিয়েছি। আমিই নিচর খুলেছি বোধহয়। এখন মনে নেই।



গাড়িতে উঠতে উঠতে বলি, এ তো কেঁচো ঝুড়তে গিয়ে ভ্যাল্যা সাপ বেরিয়ে পড়লো? বাসু-মামু শুধু বললেন, হুঁ!

—মিস্ জনসনের মৃত্যু বর্ণনার মধ্যে ‘আর্সেনিক-পয়েজনিং’-এর কোন সিমটম নজরে পড়েছে আপনার?

মামু বোধহয় অন্য লাইনে চিন্তা করছিলেন। বলেন, কী বললে? না, আর্সেনিক বিষের কোনও লক্ষণ নজরে পড়েনি আমার। আর্সেনিকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, সেকথা কেউ বলেনি। স্বর হয়, তা অবশ্য জনডিসেও হয়।

—কিন্তু আপনার মনে আছে মামু, সেদিন সুরেশ বলেছিল—‘বড়পিসির খাবারে আমি আর্সে... ‘স্ট্রিক্টিন’ বিষ মেশাইনি?

—না, ভুলিনি। অত ভুলো মন আমার নয়। কিন্তু সেই সূত্র ধরে বলা যায় না—সুরেশ ছেদিলালের ঘর থেকে উইড-কিলার চুরি করেছিল।

—কিন্তু ছেদিলাল নিজেই তো বললো, ছোট-সাহেব জানতে চেয়েছিল—কতটা ঐ বিষ খেলে মানুষ মরে যায়—

—ছেদিলালের স্টেটমেন্ট সত্যি হলে সেটা সুরেশের দিকে যায়। কাউকে হত্যা করার মতলবে সুরেশ যদি ঐ উইড-কিলার চুরি করে থাকে, তাহলে এটা কি প্রত্যাশিত যে, সে ঐ আনপড় মালিটাকেই এ প্রশ্ন করবে? কৌটার গায়েই লেখা আছে আর্সেনিকের পার্সেটেজ। কত খেন আর্সেনিক ফেটাল-ডোজ সে তথ্যটা বার করা সুরেশের মতো শিক্ষিত মানুষের পক্ষে কি এতই অসম্ভব?

আবার সব গুলিয়ে গেল আমার। বলি, তাহলে কোন্ বিষে মিস্ জনসনের মৃত্যু হলো? —বিষের প্রতিক্রিয়াতে যে হয়েছে এ-কথা মনে করার কী বৌদ্ধিকতা? হয় তো জনডিসে ভুগে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

—আমার বিশ্বাস হয় না! এ নিশ্চয় হত্যা।

বাসু-মামু হেসে ফেলেন। বলেন, ইয়া-আল্লাহ! মনে হচ্ছে আমরা ক্রমাগত ঠাই বদল করে চলেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মিস্ জনসনের হত্যা রহস্যের কিনারা না করে তুমিই গোপালপুর বেতে চাইবে না, আর আমাকে তোমার পিছু পিছু টো-টো করতে হবে।

## কাটায়-কাটায়-২

ওর এই জাতীয় রসিকতা আমার আদৌ ভালো লাগে না। কথা ঘোরাতে বলি, আর ঐ মিস্ বিশ্বাসের ব্যাপারটা? পিটার দস্তের বাবার ডায়েরিতে কোমাগাতামারকর উল্লেখ?

বাসু-মামু বললেন, সেটাও একটা দারুণ রহস্য! আমি যেটা বানিয়ে বানিয়ে বললাম সেটাই কেমন করে সত্যি হয়ে গেল?

এবার ঠ্যাঙটানার সুযোগ আমার। বলি, এমন দুর্লভ কাকতালীয় ঘটনা কি ঘটতে পারে না? ঘরশোড়া গরুর গোয়ালে দ্বিতীয়বার অমিসংযোগ? হাজারে একটা?

বাসু-মামুও প্রসঙ্গটা বদলে বলেন, যায়ে টার্ন নাও। আমরা এবার নমিতা মেডিকেল স্টোর্সে যাব।

—আপনার মাসিমার জন্যে একজন ডে-টাইম নার্সের সন্ধান?

—ঠিক তাই।



নমিতা মেডিকেল স্টোর্স একটি দ্বিতল বাড়ি। একতলায় ডিসপেনসারি, দ্বিতলে মালিকের ডেরা। শান্তি দেবীর কাছেই খবর পাওয়া গেছে, পুরকায়স্থ বিপত্নীক। তাঁর এক নাবালক পুত্র আর বিশ্ববা কন্যাকে নিয়ে ওখানে থাকেন। দোকানটা বাজারের কাছাকাছি, গির্জার বিপরীতে। কাউন্টারে বসেছিল বারো-চোদ্দ বছরের একটি বালক। তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন বাসু-মামু, তোমার বাবা দোকানে নেই?

—না নেই। কাচড়াপাড়া গেছেন। আপনি কি কিছু ওষুধ কিনতে এসেছেন? প্রেসক্রিপশান না পেটেস্ট ওষুধ?

ভবানন্দ দত্ত মশায়ের ছেলের চেয়ে এ অনেক ছোট, কিন্তু দোকানদারিতে মনে হলো অনেক বড়।

মামু বললেন, ‘রেডস্ক্রন’ আছে? আর ‘ভিস্ক ভেপোরাব’?

চট-জলদি ঐ দুটি দ্রব্য সে এনে দিল। ছোট একটি চোড়ায় ভরে দামটা জানালো।

পরসামিটিয়ে দিয়ে বাসু বললেন, তোমার দিদিও কি বাড়ি নেই? আশা?

এবার ও বললে, না দিদি আছে। দোতলায়। ডাকবো? কেন?

—হ্যাঁ, তাকে ডাকো। দরকার আছে। আমরা দোকানে আছি, তুমি দোতলায় গিয়ে স্ববর দাও।

ছেলেটি রাজি হলো না। বোধ করি অচেনা লোকের হেপাজতে দোকান ছেড়ে যাবার বিপদ সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল। তাই একটু পিছনে সরে গিয়ে উর্ধ্বমুখে ইঁকাড় পাড়লো, দিদি, নিচে এসো একবার। তোমাকে দু’জন ভদ্রলোক খুঁজছেন।

একটু পরে নেমে এল মেয়েটি। শ্যামলা রঙ, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। বেশ একটু খুলাসী। পরনে সাদামাটা মিলের শাড়ি। ভ্রুস করে পরা। অল্প প্রসাধনের আভাস। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলে, বলুন?

—তুমিই আশা পুরকায়স্থ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

—না, আমাকে তুমি আগে কখনো দেখনি। আমি কলকাতায় থাকি। ডক্টর পিটার দস্তের কাছে তোমার নাম শুনে দেখা করতে এসেছি। তাছাড়া মিস্ পামেলা জনসনও—শুনেছি, তুমি তাঁর নার্স ছিলে।

মেয়েটি স্বীকার করলো। বললে, তা আমাকে কেন খুঁজছেন?

ইতিমধ্যে একজন খন্দের দোকানে এসেছে। মামু বললেন, কোথাও বসে আলোচনাটা হতে পারে? আশা বললো, তাহলে ওপরে আসুন। দাঁড়ান, ইনি কী চাইছেন আগে দেখি।

আগভুক্ত খরিদারকে বিদায় করে আশা আমাদের দ্বিতলে নিয়ে এসে বসালো। মনে হয় দোতলায় দু'খানি শয়নকক্ষ—একটি বাপ-বেটার, একটি আশার। ঘরটা পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। সস্তা আসবাব, ছাপানো শাড়ির পর্দা, দেওয়ালে দু-একটি ফটো ও ক্যালেন্ডার, কিন্তু কেয়েসিন কাঠের টেবিলের টেবল-ক্লথে সুন্দর সূচীশিল্পের নমুনা—মাটির ঘটে স্থলপদ্ম। আশা বললে, এবার বলুন?

মামু তাঁর কাঁচড়াপাড়াবাসী মাসিমার কথা বিস্তারিত জানালেন। তাঁর বয়স, রোগ, মেজাজ দেখা গেল প্রয়াত মিস্ জনসনের অনুরূপ। শোনা গেল, তাঁর বাড়িতে চাকর আছে, ঠিকে ঝিও আছে—কিন্তু বৃদ্ধার পুত্র-পুত্রবধু দুজনেই চাকরি করেন। তাঁরা নিঃসন্তান। তাই দুপুরে একজন কাউকে বাড়িতে রাখতে পারলে ভালো হয়। চাকর অবশ্য থাকে—কিন্তু বৃদ্ধাকে ধরে ধরে বাধকমেও নিয়ে যেতে হয়। মামু তাঁর কাহিনীর উপসংহারে বললেন, তোমাকে খোলাখুলিই সব কথা বলবো, আশা। মাসিমা লোক ভালো, কিন্তু ইদানীং তাঁর মেজাজ খুব তিরিক্ষে হয়ে গেছে। এর আগেও আমরা দু-একটি নার্সকে রেখেছি—পাশ করা নার্স নয় তোমার মতো, কিন্তু তারা টিকতে পারেনি। উনি আসলে চান না ঠর বৌমা চাকরি করে; কিন্তু...

আশা বললে, বুঝছি। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। এমন কেস আগেও পেয়েছি অনেক। মিস্ জনসনের কাছে সে দৈনিক কত পেতো সেটা মামু জানতে চাইলেন। এ কথাও বললেন, তার সঙ্গে আশার ক্ষেত্রে রিক্সাভাড়াটাও যোগ করতে হবে।

কথাবার্তা স্থির হলো। আশা জানালো, তার হাতে এখন আর কোনও রোগী নেই। সে কাল বাদে পরশু থেকেই জর্যন করতে পারে। মামু বললেন, আমার মাসতুতো ভাই আর তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি তাহলে। যদি ওরা রাজি হয় তাহলে কাল সকালে আমি বা অন্য কেউ এসে তোমাকে খবর দেবো। কাল যদি কেউ না আসে তাহলে বুঝতে হবে ওরা রাজি হলো না। কেমন?

আশা সম্মত হলো। মামু এবার কথাগ্রস্বে মিস্ জনসনের অসুখের কথা তুললেন। সেই সাদা-সাদা ট্যাবলেটের নাম, ক্যাপসুলের পরিচয় জানা গেল। আশা জানালো, ঔষধ ও পথ্য শেষ সপ্তাহে—অর্থাৎ সে বহাল হওয়ার পরে—সে নিজেই খাইয়েছে। আরও জানালো, বছর দেড়েক আগেও একবার মিস্ জনসনের বাড়াবাড়ি রকম অসুখ হয়েছিল—ঐ একই অসুখ, জনডিস।

মামু বললেন, শুনছি সে-কথা। স্মৃতিটুকু বলছিল—

—টুকুকে আপনি চেনেন? সে তো এখানে থাকে না।

—না, কলকাতায় থাকে। তা আমিও তো কলকাতার বাসিন্দা। তুমিও তাকে চেনো দেখছি।

—কেন চিনবো না? ও তো মেরীনগরেরই মেয়ে, না হয় কলকাতাতেই থাকে। স্মৃতিটুকুকে মেরীনগরের সবাই চেনে। দারুণ হ্যান্ডসাম মেয়ে।

মামু বললেন, হ্যান্ডসাম, তবে সুন্দরী নয়। বড় রোগা! একটু কাঠি-কাঠি ঢং।

আশা বুশি হলো। বললো, হ্যাঁ, ও একটু বেশি রোগা। আজকাল মেরো রোগাই থাকতে চায়।

মামু মাথা নেড়ে বললেন, বেচারি একবারে ভেঙে পড়েছে—ঐ স্মৃতিটুকু—সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার বড়পিসি তাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে যাবে।

আশা বললো, সে-কথা ঠিক। সারা মেরীনগর স্তম্ভিত হয়ে গেছিল বৃড়ির উইলের বস্তান্ত শ্রুনে। কেন যে উনি শেষ সময়ে সব কিছু মিস্টিকে দিয়ে গেলেন...

—তোমার কী বিশ্বাস? এমনটা কেমন করে ঘটলো? বৃড়ি কি শেষ সময়ে তোমাকে কিছু বলেছিল?

—না। সেটা ম্যাডামের স্বভাববিরুদ্ধ—আই মিন, ঘরের কথা পরকে বলা। মন খুললে তিনি হয়তো একমাত্র উষা-মাসিমাকে কিছু বলতেন—তিনিই একমাত্র ঠর বন্ধুস্বানীয়া। কিন্তু উষা-মাসিমাকেও তিনি নাকি কিছু বলে যাননি।

## কাঁচা-কাঁচা-২

—‘উইল’ প্রসঙ্গে শেষদিকে তিনি কি কিছুই বলে যাননি?

—কী জানি! একটা ঘটনায় অবশ্য আমার মনে হয়েছিল উনি উইলের কথাই বলেছেন। গুর মৃত্যুর ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায়। তবে ‘উইল’ শব্দটা উনি উচ্চারণ করেননি।

—কী বলেছিলেন তিনি? কাকে?

—মিস মাইতিকে। উনি মিষ্টিকে বলছিলেন কী একখানা কাগজ নিয়ে আসতে। আর মিষ্টি বলছিল, ‘সে কাগজ তো এখানে নেই। আপনি উকিলবাবুকে রাখতে দিলেন, মনে নেই?’ আমি তখন ঘরেই ছিলাম। মনে হলো, ম্যাডাম সে-কথার জবাবে কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁর একটা বমির বেগ এলো। আমি মিষ্টিকে সরিয়ে তাঁর কাছে বসলাম। ঘটনা এটুকুই। ঐ ‘কাগজ’ আর উকিলবাবুর সূত্র ধরে আমার মনে হয়েছিল—উনি উইলটার কথাই কিছু বলতে চেয়েছিলেন! অবশ্য সবটাই আমার আন্দাজ।

মামু বলেন, মিনতি মাইতিকে উনি বোধহয় খুব ভালবাসতেন, তাই নয়?

—আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। মিষ্টি একটা গবেট। গবেট বলেই পাক্সা তিন বছর সে টিকে থাকতে পেরেছিল। ম্যাডাম তাকে প্রায়ই বকাবকি করতেন, ও গায়ে মাখতো না।

—শেষ সময়ে উনি চীন দেশের মাটিতে ভাল ফুল হয় না—না কি—যেন বলেছিলেন, নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু সে তো ঘোর বিকারে।

নিচে থেকে আশার ছোট ভাই ইঁকাড় দিল : দিদি! প্রেসক্রিপশান।

আমরা তিনজনে নিচে নেমে এলাম। মামুকে ইঙ্গিত করি—‘এবার কেটে পড়া যাক?’ উনি ‘না’-এর ভঙ্গি করলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাইপে টোব্যাকো ভরতে থাকেন। প্রেসক্রিপশান সার্ভ করা শেষ হলে মামু বলেন, ভাল কথা মনে পড়লো। ডক্টর ঠাকুর, মানে হেনার স্বামী মিস্ জনসনকে একটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলেন শুনলাম। ওষুধটা গুর খুব কাজে লাগে। তার একটা কপি পেতে পারি?

আশা একটু অবাক হলো। বললে, আমি তো শুনিনি। কে বললো?

—মিস্ জনসনই আমাকে বলেছিলেন। স্থানীয় ডিসপেনসারিতে সার্ভ করিয়ে নিয়ে যায়। এখানে হয়তো আরও ডিসপেনসারি আছে...

—না। মেরীনগরে এই একটাই ডিসপেনসারি। অবশ্য কাঁচড়াপাড়া থেকে যদি সার্ভ করিয়ে এনে থাকেন তাহলে অন্য কথা।

মামু বলেন, তুমি একটু রেজিস্টারটা দেখে বলবে? তাহলে তার একটা কপি করিয়ে নিয়ে আমার ডাক্তারকে দেখাডাম—মানে মাসিমাকে সেটা খাওয়ানো চলে কিনা। একই অসুখ তো?

—কিন্তু তারিখ না জানলে আমি কেমন করে ঝুঁজে বার করবো?

—তারিখটা মনে আছে আমার। সম্ভবত আঠারই এপ্রিল, অথবা তারই কাছাকাছি।

আশা রেজিস্টারটা খুলে ঝুঁজতে থাকে। হ্যাঁ পাওয়া গেল। আঠারই এপ্রিল তারিখে ডক্টর শ্রীতম ঠাকুরের প্রেসক্রিপশান মোতাবেক সার্ভ করা হয়েছে—না, কোনও তৈরি করা ওষুধ নয়, ঘূমের ওষুধ: ‘কামপোজ’।

কিন্তু ‘পেশেন্ট’-এর নামে ‘মিস্ পামেলা জনসন’ নয়, হেনা ঠাকুর। দৈনিক একটি ট্যাবলেট সেব্য—তিন সপ্তাহ ধরে।

মামু বলেন, না এটা নয়, ...

পরের পাতাতেই পাওয়া গেল শ্রীতমের দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশান। মামু সেটা টুকে নিলেন।

নমিতা মেডিকেল স্টোর্স থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখে বলেন, চলো, এবার সুতৃপ্তিতে যাওয়া যাক।

আমি বাধা দিই—কেন মামু? আজ আবার সুতৃপ্তি কেন? কাঁচড়াপাড়ার দিদা যে আমাদের ভাত আগলে বসে আছেন?

—বুঝেছি। তা বেশ, চলো, কাঁচড়াপাড়াতেই কোনও রেস্টোরাঁয় আজ দ্বিপ্রাহরিক আহরটা সারা যাবে।



কিন্তু তাও আমাদের বরাতে নেই। বাধা পড়ল। ডক্টর দত্তের চেয়ারের কাছাকাছি একটি বিপরীতমুখো ফোর্ড গাড়ির সঙ্গে খান্কা লাগতে লাগতে কোনক্রমে ব্রেক কব্বি। দুটো গাড়ি ঝাঁড়িয়ে পড়েছে মুখোমুখি—যাকে বলে, 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী'।

কিন্তু আমার পোড়া কপাল। ওদিকের গাড়ি থেকে যিনি নেমে এলেন তিনি 'লাবণ্য' নন, স্ক্যাপা মোষ!

গাড়ি চালানোর দোষ হয়ে থাকলে তা আরোহীর নয়, চালকের। কিন্তু আমাকে তিনি আক্রমণ করলেন না আদৌ। সোজা এসে বাসু-মামুকে চার্জ করলেন, আহ! হিয়ার যু আর! মিস্টার টি. শি. সেন, অ্যালায়াস ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু! এবার বলুন মশাই—কেন সেদিন আমার বাড়ি বয়ে এক গঙ্গা মিছে কথা বলে গেলেন—গুরুজিৎ সিং, কোমাগাতামার, যোসেফ হালদার!

মামু দরজা খুলে নেমে এলেন। বলেন, ইয়েস ডক্টর। একটা কৈফিয়ৎ আমার পেওয়ার আছে। আপনার কাছেই আসছিলুম। চলুন, আপনার ঘরে গিয়ে বসি। তার আগে গাড়ি দুটো সরিয়ে পথটা ফাঁকা করুন।

ওর ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা। মামু বলেন, আমার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলুন তো—কেমন করে জানলেন যে, আমি সাংবাদিক নই, ব্যারিস্টার?

—শুধু ব্যারিস্টার নন। গোয়েন্দা।

—বেশ তাই সই। কিন্তু কেমন করে জানলেন?

—আপনি কি ভেবেছেন আপনিই দুনিয়ার একমাত্র গোয়েন্দা? মেরী নগরেও গোয়েন্দা আছে! সে প্রথম থেকেই চিনতে পেরেছে আপনাকে—আমি উবার কথা বলছি—উবা বিশ্বাস।

আমি সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করি : মিস মার্পল্ অব মেরীনগর!

কথাটা কানে গেল ডক্টর দত্তের। আমার দিকে ফিরে বলেন, কারেক্ট। উবা হচ্ছে মেরীনগরের মিস্ মার্পল্। দারুণ বুদ্ধি তার। আপনার ছবি দেখিনি, কিন্তু চিনেছে ঠিকই!

—কিন্তু কেমন করে?

—গোয়েন্দা যে। নানান কার্যদা-কানুন করে। সেসব কথা তার কাছেই শুনবেন। এখন বলুন তো মশাই—কেন সেদিন এক গঙ্গা মিথ্যা কথা বলে গেলেন?

মামু একটি মাত্র শব্দে কৈফিয়ৎ দাখিল করলেন : অ্যাটেন্‌পটেড-মার্ডার।

—কী? কী বললেন? 'অ্যাটেন্‌পটেড-মার্ডার' মানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ: খুনের চক্রান্ত! মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে মিস্ জনসন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন—মানে আছে নিশ্চয়...

—আলবৎ। ওর সেই হতভাগা কুকুরের বলটায় পা-পড়ায়...

—আজ্ঞে না। ওর পদশব্দলনের হেতু—সিঁড়ির মাথায় কেউ গোপনে আড়াআড়িভাবে একটা কালো রঙের টোন সুতো টান-টান করে বেঁধে দিয়েছিল। 'সারমের গেম্বুর' সম্পূর্ণ নির্দোষ!

ডক্টর দত্ত নির্বাক তাকিয়ে রইলেন। সিলিং ফ্যানটার দিকে। ঠাঁর তী বর্তমান কি না জানি না। কিন্তু ওর সেই হতভাগ্য দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল মিসেস দত্তকে কেউ চুলের মুঠি ধরে সিলিং ফ্যানটার সঙ্গে

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

বোধে দিয়েছে। ধর্মপট্টকে আকাশপথে ঘূর্ণ্যমাণ অবস্থায় দেখছেন উনি! লুটু নয়, কোমাগাতামার নয় — এবার সারমেয়-গেণ্ডুক!

আত্মস্থ হয়ে অক্ষুটে বললেন, এ-কথা কে বললে আপনাকে?

—আমাকে কে বললো সে-কথা উহা থাক, আপনাকে বলছেন, পি. কে. বাসু, গোয়েন্দা—  
টি. পি. সেন, সাংবাদিক, নন!

কুণ্ঠিত ভূতসে উনি বললেন, তাহলে পামেলা আমাকে সে-কথা বলেনি কেন?

—তার হেতুটা সহজবোধ্য। রাত দশটার পর মরকতকুঞ্জে যে ক'জন ছিল তারা সবাই ঊরনিকট-  
আত্মীয়, পরিবারের লোক! এবং ঊর ওয়ারিশ!

মিনিটখানেক নীরব থেকে উনি বললেন, তা সত্ত্বেও! আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সে  
আমাদের দুজনের মধ্যে অন্তত একজনকে বলতো! আমি অথবা উহা। আপনি সম্পূর্ণ বাইরের  
লোক...

মামু গম্ভীরভাবে বলেন, ডক্টর দত্ত! নিজের দেহে ক্যান্সারের লক্ষণ আশঙ্কা করলে মানুষে নিকট-  
আত্মীয়ের কাছে তা গোপন করে, অকুণ্ঠভাবে জানায় সম্পূর্ণ বাইরের লোক, ডাক্তারকে। ঠিক তেমনি,  
নিজের পরিবারের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের লক্ষণ দেখলে মানুষ তা ডাক্তারের কাছে গোপন করে, জানায়  
গোয়েন্দাকে!

আবার বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন ডক্টর দত্ত। তারপর বললেন, পামেলা আমার  
বাল্যবান্ধবী, আমার ছোট বোনের মতো। আমার দুরন্ত কৌতুহল হচ্ছে সব কিছু জানতে। কিন্তু না, তা  
আমি জানতে চাইবো না। শুধু একটা কথা বলুন, কে সেই দড়িটা খাটিয়েছিল তা কি আপনি আদ্যজ  
করতে পারেননি?

—আমাকে মাপ করবেন ডক্টর দত্ত। আমার মক্কেলের নির্দেশ ছিল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে  
হবে!

—কিন্তু আপনার মক্কেল—যদি পামেলাই হয়—সে তো মৃত।

—মৃত্যুর পর আপনি কি জানাতে পারেন আপনার কোন্ রুগী সিকির্সিঙ্গে ভুগছিল?

—আই সী! না, প্রফেশনাল এথিক্সে তা আমাকে গোপন রাখতে হয়। কিন্তু তদন্তটা তাহলে এখনো  
চালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনার মক্কেল তো মৃত।

—একজ্যাস্টিস ডক্টর, একজ্যাস্টিস! ওখানেই আপনার প্রফেশনের সঙ্গে আমার প্রফেশানের সাদৃশ্য  
এবং পার্থক্য। আপনার জীবিকার পূর্ণচ্ছন্দ রোগীর মৃত্যুতে, আমার জীবিকার প্রারম্ভ—ক্ষেত্রবিশেষে,  
মক্কেলের মৃত্যুতে। প্রফেশনাল এথিক্সের নির্দেশে তদন্তটা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে—মক্কেল  
পেমেন্ট করুক না বা করুক। মৃত্যুর পরে ডাক্তারের সঙ্গেও রোগীর যে একটি গোপনতার সম্পর্ক থাকে  
তা তো এইমাত্র আপনি স্বীকার করলেন!

—বুঝলাম। ওয়েল, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

—আমার জিজ্ঞাসা: প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে কি দ্বিতীয়বার সে-চেষ্টা করেনি সেই অজ্ঞাত আততায়ী?

—মানে, পামেলার মৃত্যু অস্বাভাবিক, কিনা? না ব্যারিস্টার-সাহেব। পামেলার মৃত্যু নিতান্ত  
স্বাভাবিক—দীর্ঘদিন-জনডিস রোগে ভুগে।

বাসু-মামু একটু ঝুঁকে এলেন। ছেদিজালের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। মনে  
হচ্ছিল, সমস্ত কথোপকথনটা যেন ঊর মস্তিষ্কে কোনও থ্রে-সেলের ক্যাসেটে রেকর্ড-করা আছে!

আদ্যন্ত শূনে বৃদ্ধ বললেন, বুঝেছি, কী বলতে চাইছেন। হ্যাঁ, এমন নজির আছে বটে—পারিবারিক  
চিকিৎসক 'আর্সেনিক পয়েজনিং' ধরতে পারেনি! ভেবেছে 'অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক এন্টেরাইটিস'। কিন্তু  
একেক্ট্রে তা হয়নি। দু-একবার বমি করেছিল বটে, কিন্তু শেটে যন্ত্রণা ছিল না। আর্সেনিকের লক্ষণ কিছু



পাইনি। নাঃ! আমি নিশ্চিত—পামেলার মৃত্যু হয়েছিল ‘জনডিস’-এ; আরও পরিষ্কার ভাষায় : ইয়ালো অ্যাম্পি অব দ্য লিভার’। আর্সেনিক নয়।

বাসু-মামু তাঁর সেই ম্যাজেশিয়ানি ঢঙে পকেট থেকে বার করলেন এক খণ্ড কাগজ। বললেন, দেখুন তো—এতে আপত্তিকর কিছু আছে?

ডক্টর দত্ত ঝুটিয়ে দেখলেন। বলেন, ডক্টর শ্রীতম ঠাকুরের প্রেসক্রিপশন দেখছি। আশ্চর্য। পামেলা তো আমাকে একথা কিছু বলেনি—

—বলেননি সঙ্গত কারণেই। যেহেতু এ ওষুধ তিনি আসৌ খাননি। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন তো—এতে আপত্তিকর কিছু আছে?

ডক্টর দত্ত আবার প্রেসক্রিপশনটা ঝুটিয়ে দেখলেন। বললেন, না নেই। আমি অবশ্য এই জাতের আসুরিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী নই—বিশেষত বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে, ক্রনিক কেস-এ। কিন্তু আমি হিচ্চ ওল্ড স্কুলের চিকিৎসক। রাতারাতি ব্যক্তিমাং করা আমার হাতে নেই। তরুণ চিকিৎসকেরা আশু ফল পাওয়ার আশায় এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকেন—রোগীর সিস্টেমে তা দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নে ক্ষতি করলেও। যা হোক, এতে আপত্তিকর কিছু নেই—আ্যাট লিস্ট আর্সেনিকের নামগন্ধ নেই।

—সকেভলি, আপনি যদি মনে করেন আপনার কোনও ইনসমনিয়া রোগীকে দৈনিক একটা করে ‘কামপোজ’ যেতে হবে তিন সপ্তাহ ধরে, তাহলে আপনি কি একুশটি ট্যাবলেটের প্রেসক্রিপশন একসঙ্গে করেন?

দত্ত সাহেব বললেন, এখন সেই কথাই বলেছি। ঐ জাতীয় আসুরিক চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই। ইনসমনিয়ার ক্রনিক রোগীকে তিন-সপ্তাহ ক্রমাগত একটি করে ‘কামপোজ’ খাবার পরামর্শ আমি দিই না। এতে সেখা যায়, এরপর সৈনিক দুটো করে খাবার দরকার হয়। তাছাড়া একসঙ্গে দু-পাতা ঘুমের ওষুধ কিনে বাড়িতে রাখাও বিপদজনক। ঘুম-না-আসার যন্ত্রণায় রোগী কখনো কখনো একসঙ্গে বেশি ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে—হয়তো ভুল করে—আপনি নিশ্চয় জানেন ওভারডোজ হলে রোগীর ঘুম আসৌ ভাঙে না। তা এই অল্পট প্রয়োগ করলেন কেন?

—ধরুন জ্ঞানবুদ্ধিমানসে।

—বুঝছি। এটাও আপনার প্রফেশনাল সিক্রেসি। যা হোক আরও কোনওভাবে আপনার প্রচেষ্টায় আমি কি সাহায্য করতে পারি? আমি সর্বাঙ্গিকরণে আপনার সাক্ষ্য কামনা করছি, মিস্টার বাসু। পামেলা চিরশান্তির সেশে চলে গেছে। তার মৃত্যু স্বাভাবিক। কিছু তাকে মরণের পথে ঠেলে দেবার ঐ জঘন্য চক্রান্ত যদি কেউ করে থাকে—সে বার্থ হোক না হোক—তাহলে তাকে আপনি ঝুঁজে বার করুন! তার প্রাণ্য শাঙিটা পাওনা আছে! পামেলা আমার বাল্যাব্যবহীই শুধু নয়, তাকে... ওয়েল, স্বীকারই করি... আমি ভালোবাসতাম!

—থ্যাঙ্কস্ ফর য়োর ক্যানডিড কনফেশান ডক্টর! তাহলে আপনাকে আর একটি উপকার করতে হবে। আমার অনুসন্ধান কার্যের একটি অন্তরায়কে সরিয়ে দিতে হবে।

—বলুন?

—আপনাদের ঐ ‘মেরীনগরী মিস্ মার্গল’কে রুখতে হবে। গোয়েন্দার পিছনে তিনি ক্রমাগত গোয়েন্দাগিরি করে গেলে আমার পক্ষে কাজটা কঠিনতর হয়ে উঠবে।

—আই সী! ই্যা, উহা মাঝে মাঝে খুব বাড়াবাড়ি শুরু করে। কেন যে সে আপনার পিছনে লেগেছে আমি জানি না—

—তার তিনটি সম্ভাব্য হেতু। এক: বৃদ্ধার হাতে কাজ নেই, তাই খই ভাজতে বসেছেন। একা মানুষ, সময় কাটে না, তাই শৌখিন-গোয়েন্দার ভূমিকাটা গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় সময় কেটে যাচ্ছে। দ্বিতীয়: মেরীনগরে তাঁর একটা সুখ্যাতি আছে—বুদ্ধিমতী বলে, ধূর্ত বলে। ‘মিস্ মার্গল অব মেরীনগর’

## কীটার-কীটার-২

তার মুকুটে একটি নতুন পালক লাগাতে উদগ্রীব হয়েছেন। তিন: একুনি আপনি যে কথাটা বললেন, সেটা তিনিও বলতে পারতেন আপনার সম্বন্ধে...

—ঠিক বুঝলাম না। তৃতীয় যুক্তিটা কী?

—কিছু মনে করবেন না ডক্টর দত্ত—এ শূধু অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান: মিস্ বিশ্বাস, মিস্ জনসন আর আপনি বাল্যসহচর। আপনি মিস্ পামেলা জনসনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হয়তো তার চরিত্রিক দৃঢ়তা দেখে, হয়তো তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে। মিস্ উবা বিশ্বাসের অবচেতনে তাই পামেলার প্রতি একটা স্বর্বা, আপনার প্রতি একটা অভিমান অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে। এ অবশ্য আমার নিছক অনুমান! তাই হয়তো শূধু আপনাকে মোহিত করার জন্যই মিস্ মার্পল্ তার বুকির সৌড় দেখাচ্ছেন। বাই দ্য ওয়ে—আপনার বাবার কোনও ডায়েরি কি আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

মনে হল, ডক্টর দত্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। কী যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন। মিনিটখানেক আত্মসমাহিত অবস্থায় নিচুপ বসে থেকে হঠাৎ যেন সজিত ফিরে গেলেন। বলেন, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন?

—আমি সেবার চলে যাবার পর আপনি কি আপনার কোনও ডায়েরি...

হঠাৎ হে-হে করে হেসে ওঠেন দত্ত-সাহেব। বলেন, ও নো নো! এটাও ঐ মিস্ মার্পল্-এর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। আপনি চলে যাবার পর সে আমার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। আমাকে—কী বলবে—যা নয় তাই বলে গালমন্দ করলো। আমি গবেট, আমার মাখায় গোবর পোরা ইত্যাদি। আমার নাকি প্রথম থেকেই বোকা উচিত ছিল, আপনি বোসেক হালদারের জীবনী লিখতে আসৌ আসেননি। আপনি টুক, সুব্রেশ বা হেনা নিয়োজিত একজন গোয়েন্দা। এসেছেন, পামেলার মৃত্যু অথবা উইল সম্বন্ধে কোনও রহস্য উদ্ঘাটনে। সে নিজেই ঐ টোপটা ফেলতে চেয়েছিল—যাতে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন সেও উপস্থিত থাকবে। আমরা দুজনে গোয়েন্দার মুখোসটা খুলে আপনাকে বেইজ্ঞত করবো।

মামু বলেন, কিছু আমার পরিচরটা মিস্ বিশ্বাস কেমন করে গেলেন?

—সহজেই। মিষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাকে নাকি আপনি আপনার প্রকৃত পরিচর্যই দিয়েছিলেন।

ঠিক তখনই ডাক্তার-সাহেবের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। উনি বসেছিলেন যে চেয়ারে তার পাশেই টেলিফোন রিসিভারটা। তুলে নিয়ে উনি আত্মপরিচয় দিলেন।

এবারও সে সময় আমরা এক প্রান্তের কথাই শুনতে পেয়েছিলাম। কিছু আলাপচারির পর ডাক্তার-সাহেব অদৃশ্য কথোপকথনটা আমাদের জানিয়েছিলেন। এবারেও পাঠককে বঞ্চিত করবো না। দু-প্রান্তের কথাই পরপর সাজিয়ে দেওয়া যাক।

—হ্যালো? ডক্টর দত্ত বলছি!

—টিক্‌টিক্‌ কি তোমার বাড়িতে?

—কে, উবা? 'টিক্‌টিক্‌' মানে?

—'ডিটেকটিভ' শব্দটার বাংলা পরিভাষা 'টিক্‌টিক্‌' তাও জানো না? তোমার বাবার ডায়েরির খোঁজে কি টিক্‌টিক্‌-সাহেব ওখানে যায়নি?

—হ্যাঁ, এসেছিলেন তো। এই একটু আগে চলে গেলেন।

—ইস্! নাটকীয় দৃশ্যটা আমার দেখা হলো না। তা তুমি ওর নাকে ঝামা ঘবে দিয়েছো তো?

—ঝামা! মানে? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমার কথা তো পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি বুঝতে পারলে না পিটার। সে আবার আজ নতুন করে কী বুঝবে। ও কী বললো? মিস্টার কোমাগাতামার?

—শোনো উবা! তুমি পার্টিলি কারেক্ট। ভদ্রলোক স্বীকার করেছেন, ঠুং নাম শি. কে. বাসু।  
টি. পি. সেন নয়। ছদ্মনাম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে—

—হু! কিছু কোন ব্যাপার? 'মৃত্যু' না 'উইল'?

—আরে না, না! মিস্টার বাসু আঙ্কল যোসেফের জীবনীটা সত্যই লিখছেন—

—এই যে বললে, 'ব্যাপারটা গোপন রাখতে'?

—তাই তো বলছি। মানে, মিস্টার বাসু চান না যে, কথটা জানাজানি হয়ে যাক—আই মিন, উনি যোসেফ হালদার আর কোমাগাতামার ওপর একটা রিসার্চ করছেন—

—টিকটিকিটা বুঝি তাই বুঝিয়ে দিয়ে গেল তোমাকে? তোমার মাথায় নিরেট ঝড়ের গোবর। ও এই নতুন টোপটা ফেললো আর তুমি কপাৎ করে গিলে ফেললে? তা আঙ্কল হ্যারল্ডের ডায়েরির কথায় তুমি কী বললে?

—কী আবার বলবো? ডায়েরিটা ঠুং হাতে দিয়ে দিলাম।

—ডায়েরিটা! মানে?

—বাবার ডায়েরিটা—সেই যেটায় আঙ্কল যোসেফ আর কোমাগাতামার কথা আছে।

—মানে!! এবার যে তোমাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে হয় পীটার! ফিজিশিয়ান, হিল দাইসেলফ! সকাল থেকে ক-পেগ টেনেছো?

—ও হো! আমারই ভুল! তোমাকে বলা হয়নি। আশ্চর্য কোয়েলিডেল, উবা! তুমি সেদিন বলার পর আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। কোনটা ঠিক—তোমার কথা না কি সেই সাংবাদিক ভদ্রলোকের কথা। আমি পুরনো কাগজপত্র হাতড়াতে বসলাম। কী অদ্ভুত কোয়েলিডেল দেখে—খুঁজে পেয়ে গেলাম বাবার একটা অতি জীর্ণ ডায়েরি—নাইনটিন ফোর্টিন-এর। তাতে যোসেফ-কাকার বিষয়ে অনেক কথা লেখা আছে, গুরুজিৎ সিং আর কোমাগাতামার কথাও! তুমি কেমন করে এটা আদালত করলে উবা? যু আর এ জুরেল অব আ মুথ! অ! জিনিয়াস!

এরপর নাকি মিনিটখানেক ও ব্রান্ড সম্পূর্ণ নীরব।

—হ্যালো, উবা? হ্যালো? আর যু স্টিল দেয়ার?

মিস্ বিশ্বাস কোনক্রমে বলেন, সত্যি কথা বলছো? পীটার? ডায়েরিটা কোথায়?

—মিস্টার বাসু নিয়ে গেলেন। বললেন, কয়েকটি পৃষ্ঠার ফটো-কপি করে ডায়েরিটা আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন। তখন দেখাবো তোমাকে।

আবার কিছুটা নীরবতা। তারপর মিস্ বিশ্বাস ব্রান্ডভাবে বলেন, সন্ধ্যাবেলা একবার আমার কাছে এসো দিকিন। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। মাথাটা কেমন যেন... আই মীন রীল করছে!

লুই এবার মিস বিশ্বাসের চুলের মুঠি খামচে ধরেছে।



মধ্যাহ্ন আহ্বার সেরে আমরা স্বর্জন দুজন কাঁচড়াপাড়া থেকে মরকতকুঞ্জে ফিরে এলাম তখনও রোদের তেজ কমেনি। বেলা সাড়ে তিনটে। একটু আগেই নাকি কলকাতা থেকে মিনতি মাইতি, এসে পৌছেছে। আমাদের দেখে সে যথারীতি পাগলামো শুরু করলো। কীভাবে আমাদের যথোচিতভাবে

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

আপায়ায় করা যায়, তা সে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। প্রথমেই বললো, একটা কথা বাসুমা! কাল আমার একটা দারুণ ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করতে হবে। বলুন, আমাকে ক্ষমা করেছেন?

—তোমার অপরাধটা কী আগে বলো? তারপর তো ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠবে।

—আজ রাতে আপনারা এখানে খেয়ে যাবেন। যাবারই বা দরকার কী? রাতে এখানেই থাকবেন। কাল সকালবেলা ফিরে যাবেন। আপনার জন্য সব কিছু কলকাতা থেকেই বাজার করে এনেছি। শান্তি রান্না চড়িয়েও দিয়েছে—কিন্তু আমার এমন ভুলো মন, আপনাকেই বলা হয়নি। আমার উচিত ছিল রান্না মামিমাকে আর সুজাতা বৌদিকেও নৈমন্ত্য করা। সবই ভুল হয়ে গেছে আমার।

মামু বললেন, ও! এই কথা! শোন মিনতি। আমরা দুজন তোমার নিমন্ত্রণ নিছি। রাতে এখানেই থাকো। তবে আজই আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে। উপায় নেই। তাই ডিনারটা যেন একটু আলি হয়, ধর সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তোমার রান্না মামি আর সুজাতা বৌদি এখন কলকাতায় নেই—তুমি কাল তাদের নিমন্ত্রণ করলেও তাদের আনা যেতো না। কিন্তু আমরা এখনো তোমার দোরগোড়াত্তই দাঁড়িয়েই আছি। আমাদের বসতে বলবে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আসুন। বসুন! কী অন্যায় আমার! দোরগোড়াত্তই আটকে রেখেছি! আমরা বৈঠকখানায় এসে বসি। মামু জানতে চান—শান্তি কোথায়?

সে রান্নাঘরে ব্যস্ত শূনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলেন, তুমি এখানে বসো। তোমাকে যে কথাটা বলবো বলে এসেছি, তা এবার বলে ফেলি।

মিনতি এমনভাবে বসলো যেন সে শিবরাত্রির ব্রতকথা শুনতে বসেছে।

—তোমাকে সেদিন আমি বলেছিলাম যে, মিস পামেলা জনসনের একটি চিঠি আমি পেয়েছি। তুমি ধরে নিয়েছিলে সেই পাঁচখানা একশ টাকার নোট চুরি যাওয়ার বিষয়ে তিনি আমাকে তদন্ত করতে বলেছিলেন। সেটা ঠিক নয়। উনি আমাকে লিখেছিলেন অন্য একটি বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে—উনি কেমন করে সিঁড়ি দিয়ে উলটে পড়লেন।

—হ্যাঁ, সে-কথাও তো সেদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন। তাতে আমি বলেছিলাম—‘তাতে তদন্ত করার কী আছে? সে তো ফ্লিসির সেই বলটাতে পা পড়ায়।’

আমি একটু অবাক হলাম। মিনতির এ জাতীয় স্মৃতিশক্তি আমি আশা করিনি। চকিতে আমার আবার সেই একই কথা মনে হলো—মেয়েটা কী? হাবাগোবা না ধৃত?

মামু এটা লক্ষ্য করলেন কি না জানি না। বললেন, না মিনতি! ফ্লিসির বলে পা পড়ায়, তাঁর পদাঙ্কলন হয়নি। হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে—

—কিন্তু আমি যে দেখলাম, বলটা ম্যাডামের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

—কিন্তু কেমন করে এলো? রাতে সবাই শূতে যাবার সময় বলটা সিঁড়ির নিচে ছিল, অথবা ড্রয়ারের ভিতর—তাই নয়?

—না, ড্রয়ারে ছিল না। সিঁড়ির নিচেই ছিল। ম্যাডাম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সেটা নজর করেছিলেন। আমাকে বলেও ছিলেন ওটা তুলে রাখতে। আমি ভুলে গেছিলাম।

—তবেই দেখ। বলটা সিঁড়ির নিচে স্থির ছিল, উপরে নয়। বলটা কেমন করে একতলা থেকে সোতলায় উঠে গেল?

—ফ্লিসি-ই নিশ্চয় মুখে করে তুলে এনেছিল।

—তা কি সম্ভব? তোমার যখন সোতলায় উঠে যাচ্ছ তার আগে সদর দরজা বন্ধ হয়েছে। ফ্লিসি তার আগেই বাড়ির বাইরে গেছে। সে ফিরে এসেছিল ভোর রাতে। তাই নয়? তুমি চুপি চুপি তাকে দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে এসেছিলে। মনে পড়ছে? তার মানে বলটা ফ্লিসি মুখে করে উপরে নিয়ে যায়নি। যেতে পারে না। ফ্লিসির অ্যালোবাই প্রতিষ্ঠিত।

যুক্তিটা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু বেশ কিছুটা সময় লাগলো ওর ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিতে। যেন

ধাপে ধাপে পিথাগোরাস থিয়োরেমের প্রমাণটা প্রণিধান করল। তারপর বললে, তাহলে বলটা কেমন করে দোতলায় এলো? তাতে পা পড়েই...

—না মিস্টি! তাতে পা-পড়ায় ম্যাডাম হড়কে যাননি। তাঁর পদস্খলন হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কেউ একজন সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপে আড়াআড়ি একটা কালো রঙের টোন সূতো বেঁধে দিয়েছিল। একদিক বাঁধা ছিল সিঁড়ির রেলিং-এ; অন্যপ্রান্ত একটা পেরেকো। দেওয়ালের দিকে পেরেকটা কেউ গেঁথে দিয়েছিল। তার মাথাটা ভাঙিশ করা।

এটা পিথাগোরাস থিয়োরেম নয়। দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির অঙ্গই নয়, ফেরিকেল ট্রিগনোমেট্রি। ওর বোধগম্য হলো না। শান্তি রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে কিনা পরখ করে নিয়ে আমরা তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলাম। স্কাটিং-এর গায়ে পেরেকটা দেখিয়ে উনি বলেন, এই দেখো তার প্রমাণ! এ পেরেকটা কতদিন আছে ওখানে?

বক্না বাছুরের সেই দৃষ্টিটা ফিরে এল। ওর গলকণ্ঠটা বার কতক ওঠানামা করলো। তারপর বললে, আসুন, ঐ ঘরে গিয়ে বসি।

সেটা মিনতির শয়নকক্ষ। এখন সে এ ঘরে শোয় না। কিন্তু ম্যাডামের জমানায় সে এই ঘরেই শূতো। ঘরে একটি জনক-খাট, একটি আলনা, আর একটি কাঠের আলমারি, তার গায়ে প্রমাণ সাইজ আয়না। আমরা কোথায় বসলাম সেটা ও ভ্রূক্ষেপ করল না। নিজে খাটে বসে রীতিমতো হাঁপাতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে মনস্থির করে বলে, আপনি বলতে চাইছেন... মানে কেউ ম্যাডামকে এভাবে...

—হ্যাঁ। সূতোটা যে খাটিয়েছিল সে জানতো—মাঝরাতে মিস জনসন উপর-নীচ করেন। তাঁর বয়স হয়েছে, চোখে ভালো দেখেন না। সূতোটা কালো রঙ করা, যাতে চট করে নজরে না পড়ে। সে লোকটা চেয়েছিল উনি যাতে উলটে পড়েন—মারা যান।

—মারা যান! তার মানে এটা তো খুন!

—মারা গেলে তাই বলা হতো। এখন একে আইনের ভাষায় বলা যায় 'অ্যাক্টিব্‌স্‌ টু মার্ডার'—খুনের চক্রান্ত।

—কিন্তু... কিন্তু কে এমন কাজ করবে? সবাই তো ঘরের লোক, বাইরের লোক তো কেউ ছিল না।

—তা ছিল না। তবে সে রাতে ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনায় যদি ঠং মৃত্যু হতো, তাহলে তিনি দ্বিতীয় উইল করার সুযোগ পেতেন না। ঐ ঘরের লোকেরাই তাঁর সম্পত্তিটা পেত—যে লোকটা মৃত্যুকান্দ পেতেছে সেও সম্পত্তির ভাগ পেতো। নয় কি?

বজ্রহত হয়ে গেল মিনতি। অন্তত তার মুখভঙ্গি দেখে তাই মনে হলো, যদি না সে অতিদৃষ্টি অভিনেত্রী হয়।

—এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এটাই আমাকে তদন্ত করে দেখতে বলেছিলেন মিস জনসন। তিনি জানতেন—ঐ চারজনের মধ্যে একজন ঠকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সে স্মৃতিটুকু, সুরেশ, হেনা অথবা প্রীতম—ঠিক কে, তা তিনি স্থির করে উঠতে পারেননি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওদের মধ্যেই আছে সেই শয়তানটা। আর সেই জন্যেই তিনি উইলটা পালটে ফেলেন। মিনতি জবাব দিলো না। স্ক্যালফ্যাল করে তাকিয়েই থাকলো।

—এখন বলো তো আমাকে, ঐ পেরেকটা কবে তোমার প্রথম নজরে পড়ে?

মিনতি এবারও জবাব দিল না। নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করল শূন্য।

—যে পেরেকটা গুঁতেছে সে সম্ভবত মাঝরাতে কাজ করেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে। তুমি কি কোনও রাতে কাঠের গায়ে পেরেক ঠোকার আওয়াজ শুনিয়েছিলে?

## কাটায়-কাটায়-২

এবার ও গ্রীবাভঙ্গিও করলো না। মুখটা ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে তার। সে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে।

—অথবা কোনও রাতে কি ভার্নিসের গন্ধ পেয়েছিলে? টাটকা ভার্নিসের গন্ধ?

হঠাৎ মনস্থির করলো মিনতি। চট করে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আমি জানি বাসু-মামু—কে... কে এভাবে মৃত্যুফাঁদটা খাটিয়েছিল!

—তুমি জান? কী জান? কেমন করে জান?

—আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি চিনতে পেরেছিলাম। আমি জানি।

—কী? কী দেখেছিলে নিজের চোখে? বলো, সব কথা খুলে বলো আমাকে।

এবার আর হড়বড় করলো না আদৌ। মোটামুটি গুছিয়েই বক্তব্যটা শেষ করলো :

তারিখটা সে মনে করতে পারলো না। তবে একটু মনে আছে তখন ভতিথিরা সবাই মরকতকুঞ্জ এসে গেছেন—আর ঘটনাটা ঘটে ম্যাডামের পদত্বলনের আগে। সে রাতে ওর নিজেরও ঘুম আসছিল না। জেগে জেগেই বিছানাতে শুয়ে ছিল। ওর ঘরের দরজাটা খোলাই থাকে—যাতে ম্যাডাম ডাকলে ও শুনতে পায়। মাঝরাতে—কত রাত্রি সে জানে না—ও একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায়: ঠকঠক... ঠকঠক... ঠকঠক... ও প্রথমটা ভেবেছিল দোতলার কোন ঘরে মশারি টাঙানোর দড়িটা আচমকা খুলে গেছে। কোন ঘরেই খাট-পালঙ্কের সঙ্গে ছত্রি নেই। দেওয়ালে পেরেক খাটানো। মিনতির মনে হলো—কোন ঘরের পেরেক অসাবধানে উপড়ে এসেছে। ঘরের বাসিন্দা সেটা নতুন করে দেওয়ালে গুঁতছে। যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্ত। তাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না মনে নেই—একটু পরেই—কত পরে তা ও বলতে পারে না—একটা অদ্ভুত গন্ধ শেল। বালাকালে সে নাকি অগ্নিদাহের কবলে পড়ে। তখন ওর বাবা-মা বৈঠে। ওদের খড়ো ঘরে আগুন লেগে যায়। সেই থেকেই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে ওর অবচেতনে একটা 'অবসেশন' আছে। প্রায়ই মাঝরাতে ও পোড়া-পোড়া গন্ধ পেয়ে উঠে বসে। সেদিনও ও উঠে বসলো খাটে। ভালো করে গুঁকে দেখল—না পোড়া-পোড়া গন্ধ নয়—রঙের গন্ধ। রঙও নয়, বছর খানেক আগে ম্যাডাম তাঁর সেগুন কাঠের কিছু ফার্নিচার পালিশ করিয়েছিলেন—সেই গন্ধটাই! মিনতি অবাক হল—মাঝরাতে এমন গন্ধ কোথা থেকে আসছে? তখনই তার নজর পড়ে আলমারির গায়ে আটকানো প্রমাণ-সাঁইজ আয়নার দিকে। আয়নার ভিতর দিয়ে খোলা দরজার ওপাশে সিঁড়ির ল্যান্ডিংটা দেখা যায়। একটা বালব সারারাতই জ্বলো। সেই আলোয় ও স্পষ্ট দেখতে পেল—

—কী? কী দেখলে তুমি?

—ওকে! সিঁড়ির চাতালে নিচু হয়ে সে কিছু একটা জিনিস কুড়িয়ে নিচ্ছে। ঠিক এখন যখনে পেরেকটা ঠোঁতা সেখানেই। আমি কিছু অবাক হইনি। আমার মনে হল, ওর হাত থেকে কিছু পড়ে গেছে, তাই কুড়িয়ে নিচ্ছে। হয়তো বাথরুমে গেছিল...

—কাকে দেখলে তুমি?

—দোতলায় একমাত্র ম্যাডামের ঘরে সংলগ্ন বাথরুম আছে। আর কোনও ঘরে তো নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন। ঠিক সে সময়ে আমার মনে পড়েনি যে, কোন ঘর থেকে বাথরুমে যেতে হলে সিঁড়ির দিকে আসার দরকার পড়ে না। কমন বাথরুমটা বারান্দার একেবারে উলটো দিকে...

—বুঝলাম। কিন্তু কাকে দেখলে তুমি? কে নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিচ্ছিল?

—টুকুদিকে।

—স্মৃতিটুকুকে?

—হ্যাঁ।

—মিনতি। তুমি যা বলছ তার গুরুত্ব বুঝতে পারছো? প্রয়োজনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে একথা বলতে হতে পারে।

হঠাৎ কী যেন হল মিনতির। বললে, প্রয়োজনে তাই বলব। ম্যাডাম স্বর্ণে গেছেন। কিন্তু কেউ যদি তাকে এভাবে খুন করতে চেয়ে থাকে তবে তার সাজা হওয়া উচিত।

—ঠিক কথা। কিন্তু ভেবে দেখো, ইলেকট্রিক বালবটা মাত্র কুড়ি ওয়াটের। সিঁড়িতে আবহা আলোই ছিল। তুমি ওকে দেখেছিলে ঘুম-ঘুম চোখে। তুমি আদালতে হলপ নিয়ে শুধু একথাই বলতে পারো যে, একটি নারীমূর্তিকে তুমি দেখতে পেয়েছিলে। সে স্মৃতিটুকু, হেনা বা শান্তি যে কেউ হতে পারে...

—না। শান্তি অমন নাইটি পরে না। তাছাড়া ওর ব্রোচটার আলো পড়ায় চিকচিক করে উঠেছিল। হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওর কাঁধের ব্রোচে দুটো অক্ষর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমি : T.H. ! টুকু হালদার। ছি-ছি-ছি! শেষকালে টুকুদি—

—উত্তেজিত হয়ে না মিষ্টি। আগে আমাকে ব্যাপারটা সমঝে নিতে দাও। নাও, তুমি সরে এসো দিকিন। আমি এ খাটে শোবো। কোন দিকে মাথা করে শুয়েছিলে তুমি? এইদিকে? বেশ আমি শুছি। তুমি এ সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ চলে যাও তো। ঠিক যে ভঙ্গিতে ওকে কিছু কুড়িয়ে নিতে দেখেছিলে সেইভাবে কুড়িয়ে নেবার ভঙ্গি করো। আমি নিজে পরীক্ষাটা করে দেখতে চাই।

মিষ্টিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর সে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় কিছু কুড়িয়ে নেবার অভিনয় করে ঘরে ফিরে এলো। বাসুসাহেব দেওয়ালের দিকে মুখ করে আয়নার ভিতর দিয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। তারপর বলেন, চল, এবার সবাই নিচে যাই। কিন্তু তার আগে আর একবার ভেবেচিন্তে বলো দেখি মিষ্টি—তুমি সত্যিই স্মৃতিটুকুকে চিনতে পেরেছিলে? অত কম আলোয়?

—পেরেছিলাম। টুকুদিকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। আমার ভুল হয়নি।



কেরার পথে মামু একেবারে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। আমার দু-একটি প্রশ্নের জবাবে হু-হা দিয়ে গেলেন। শুধু একবার উনি মন খুলে দু-চার কথা বললেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, “আপনার কি মনে হল—মিনতি মাইতি অত কম আলোয় ঠিকমতো চিনতে পেরেছিল স্মৃতিটুকুকে?” তার জবাবে উনি বললেন, ঐ কথাটাই ভাবছি আমি। শোনামাত্র আমার মনে হয়েছিল কোথায় কী যেন একটা অ্যাপারেন্ট ফ্যালাসি আছে...

—‘অ্যাপারেন্ট ফ্যালাসি’ মানে?

—আপাত-অসঙ্গতি—যা হবার নয়, তাই।

—একটা উদাহরণ দিন। তাহলে বুঝবো।

—ধরো কেউ যদি বলে, ‘এ বছর গুড ফ্রাইডের ছুটিটা রবিবারে পড়ায় একটা ছুটির দিন কমে গেল’, কিংবা ‘জুলিয়াস সিজারের একটা স্বর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে, যাতে সালটা ছাপা আছে 55 B.C.’—যেটা হবার নয়। হয় না! তাই! তোমারও এমনটা মনে হয়নি?

—না তো! কোথায় দেখতে পেলেন সেই আপাত-অসঙ্গতি। কী জাতের অসঙ্গতি?

উনি অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠেন, কোথায়, কী জাতের মনে করতে পারলে তো বুঝেই ফেলতাম। মিষ্টির ঐ স্বরটায়, মিষ্টির ঐ স্টেটমেন্টে—

## কাটায়-কাটায়-২

সমস্ত ঘটনা আর কথোপকথনটা আমি খতিয়ে দেখতে থাকি। অসম্ভব কিছুই মনে করতে পারলাম না।

নিউ আলিপুরে যখন এসে পৌঁছলাম তখন রাত দশটা। রাস্তায় বেশ জ্যাম ছিল। বেল দিতে দরজা খুলে দিল বিলু। কিন্তু তখনো নিস্তার নেই। বললে, এক দাড়িঅলা বাবু এসে ষষ্ঠাখানেক অপেক্ষা করছেন। কী যেন জরুরি দরকার। আজ রাতেই কথাটা বলতে হবে। বিলু তাঁকে বসিয়ে রেখেছে বৈঠকখানায়। তাঁর নাম বলেছেন ডক্টর শ্রীতম ঠাকুর।

মামু সেদিকে একপা এগিয়ে যেতেই বিলু পথরোধ করে বললে, আরও একটা কথা বাবু। সাতকের বেলা আরও একজন দিদিমনি এসেছিলেন। কিছুতেই তাঁর নামটা জানালেন না। আপনি নেই শুনে চলে গেছেন। বললেন, পরে আসবেন। মনে হলো, তিনি খুবই চনমন করেছিলেন—যেন তাঁকে পুলিশ কুকুরে ভাড়া করেছে। বারে বারে ইতি-উতি চাইছিলেন। চোর-চোর ডাবখানা!

বিশুর বয়স বছর তের-চৌদ্দ। কিন্তু গোয়েন্দাদের বাড়িতে থাকতে থাকতে দারুণ শেয়ানা হয়ে উঠেছে। মামু জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটির বর্ণনা দে—

নিখুঁত বর্ণনা দিল বিশু: বয়স দিদিমণির কাছাকাছি (অর্থাৎ সুজাতার, আমার স্ত্রীর)। পরনে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। বেশ মোটা-সোটা। ঝাঁকুর উপরে একটা কাটা দাগ। রঙ মাজা, ফর্সা নয়, যদিও মুখে কীসব হাবিজাবি মেখে ফর্সা হয়েছে।

মামু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিলেন। মুখে শুধু বললেন, একসেলেস্ট। নে—

এক গাল হাসল বিশু। মামু আমার দিকে ফিরে বললেন, দ্বিতীয়বার ওর গোপন কথাটা শোনার সুযোগ হলো না, বুঝেছো নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। ঝাঁকুর উপর কাটা দাগেই শুধু নয়, মুখে হাবিজাবি মাখা থেকেই বোঝা যায় হেনা ঠাকুর আপনাকে সেই গোপন কথাটা বলতে এসেছিল।

আমরা প্রবেশ করতেই ডক্টর ঠাকুর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি।

মামু আসন গ্রহণ করে বললেন, বিলম্ব! বলুন কী ব্যাপার? কফি খাবেন?

—না। কাজের কথাটা সেরেই চলে যাব। অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি... মানে... হেনাকে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

—হেনাকে নিয়ে? কেন কী হয়েছে?

—আপনার কাছে আজ সে এসেছিল নিশ্চয়?

—না, আজ তো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার বাড়িতে আপনার সামনেই তাকে শেষ দেখেছি। কেন বলুন তো?

এবার উনি একটুও মিথ্যা বলেননি। টুথ, হোলটুথ, নাথিং বাট দ্য টুথ!

—ও! আমি ভেবেছিলাম, ও বুঝি আপনার কাছেই ছুটে এসেছে।

—কেন? বিশেষ করে আমার কাছে আসার কোনও কারণ আছে নাকি?

—না, মানে ওর মানসিক অবস্থায়... ব্যাপারটা কী জানেন বাসু-সাহেব, আজ মাস-দুয়েক ওর একটা দারুণ মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। ও এমনটা ছিল না, হঠাৎ কী-জানি কেন সে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে। সব সময় দারুণ ভয়ে ভয়ে থাকে। একটু শব্দ হলে চমকে ওঠে। ও যে মানসিক অসুখটায় ভুগছে তাকে বলে ‘পারসিকিউশন ম্যানিয়া’। ও কল্পনা করছে—কেউ সুপারিকন্ডিতভাবে ওকে গোপনে হেনস্তা করছে। বিপদে ফেলতে চাইছে।

মামু যে শব্দটা করলেন তার ধ্বনিরূপ ‘স্ত্, স্ত্’—সহানুভূতির দ্যোতক।

—তাই আমার মনে হয়েছিল ও বুঝি আপনার কাছে ছুটে এসেছে, না এসে থাকলে হয়তো কালই



সে এসে দেখা করবে, আমার বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল কিছু বলবে—আমাকে সে ভয় পাচ্ছে, আমি তার ক্ষতি করতে পারি এইসব আর কি।

—কিন্তু আমার কাছে কেন?

ডক্টর ঠাকুর মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, আপনি একজন স্বনামখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। সাধারণ লোকের ধারণা আপনি গোয়েন্দা। আপনি নিজে থেকে ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন—এটাকে সে ইশ্বরের একটা আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছে। ওর এই মানসিক অবস্থায় একজন প্রখ্যাত গোয়েন্দার সঙ্গে এরকমভাবে পরিচিত হওয়াটাকে সে তার দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করছে। আমার মনে হয়, আজ যদি না এসে থাকে, কাল নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু হড়বড় করে বলে যাবে। ‘পার্সিকিউশান ম্যানিয়া’ অসুখে এই রকমটাই হয়। রোগীর সবচেয়ে কাছের মানুষের বিরুদ্ধেই অবচেতনে সবচেয়ে সোচ্চার প্রতিবাদ জন্মায়।

মামু মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, কী দুঃখের কথা।

—হ্যাঁ, দুঃখের। অত্যন্ত দুঃখের! মিস্টার বাসু, আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি। প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাও আছে আমার। সে ভালবেসে আমাকে বিবাহ করেছে—স্বজাতি নই আমি, তবুও। কিন্তু আমি চিকিৎসক—এ রোগের লক্ষণ জানি, তাই বিচলিত হইনি। আমি জানি, চিকিৎসা করলে এ রোগ সারে। একটাই পথ আছে...

—কী পথ? কী চিকিৎসা?

—শান্ত পরিবেশে ওর মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করা। আমার একজন বিশ্বস্ত সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু আছে। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। ও বিদেশ থেকে মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট করে এসেছে—একটা মেটাল হোম খুলে বসেছে। হিমাল প্রদেশে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসা হয় সেখানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাস তিনেকের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে।

—আই সি!—এমনভাবে কথাটা বললেন যাতে বোকা গেল না তাঁর মনের ভাব।

—তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—ও যদি আপনার কাছে আসে তাহলে তুলিয়ে ভালিয়ে ওকে আটকে রাখবেন, আর আমাকে খবর দেবেন।

—তার মানে? মিসেস ঠাকুর এখন কোথায়?

—আমি জানি না। সকালবেলাই সে বেরিয়ে গেছে। দুপুরে খেতে আসেনি। জানি না, কোথায় সে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—বাচ্চা দুটো?

—আমার বোনের কাছে। ও যদি আপনার কাছে আসে আর আমার বিরুদ্ধে উলটো-পালটা কথা বলে তাতে কান দেবেন না, প্লিজ। সেটা ওর রোগের একটা লক্ষণ।

—বুঝেছি। না, সেবো না।

ডক্টর ঠাকুর বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালেন। মামু ফস করে বললেন, হেনার কি ইনসমনিয়া আছে? রাতে ঘুমায় না?

—না। ঘুমের তো ব্যাঘাত হয় না। তবে মাঝে মাঝে দুঃশ্বপ্ন দেখে...

—আপনি কি ওর জন্যে ইদানীং কখনো ‘কামপোজ’ প্রেসক্রাইব করেছেন?

আমার মনে হল প্রীতম রীতিমতো চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলে, না তো! ঘুমের কোন ওষুধই ও কোনকালে খায় না। ইদানীং আমার দেওয়া কোন ওষুধই খায় না।

—বুঝেছি। আপনাকে বিশ্বাস করে না বলে! ভাবে, আপনি বিষ খাওয়াতে চান!

তৎক্ষণাৎ বদলে গেল ওর চেহারা। বলে, মানে! কী বলতে চান আপনি?

—‘পার্সিকিউশান ম্যানিয়া’য় সে রকমটাই হবার কথা নয় কি? রোগী মনে করে তার অতি প্রিয়জন তাকে বিষ খাওয়াতে চাইছে!

## কাটার-কাটার-২

ডক্টর ঠাকুর শান্ত হলো, ও হ্যা, তাই বটে! আপনি রোগটার বিষয়ে জানেন দেখছি।

—তা জানি। আমার প্রফেশনেও এমন কেস তো মাঝেমধ্যে আসে দু-একটা। কিন্তু আপনাকে আর ধরে রাখবো না। হয়তো বাড়ি ফিরে দেখবেন আপনার জন্যে মিসেস ঠাকুর প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

—ধ্যাক্ষ! গুরুজি তাই করুন।

শ্রীতম ঠাকুর আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মামু তৎক্ষণাৎ তাঁর মনিব্যাগটা বার করলেন। একটা টুকরো কাগজ দেখে টেলিফোনে ডায়াল করলেন : হ্যালো, হ্যালো... ইয়েস... ডক্টর ঠাকুর অথবা মিসেস ঠাকুর কি আছেন? ...ও আই সি!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, শ্রীতমের বোন ফোন ধরেছিল। বললে, মিসেস ঠাকুর রাত আটটার সময় এসেছিল। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে, একটা সুটকেস সমেত ট্যাক্সি করে কোথায় বেরিয়ে গেছে। বোধহয় ডক্টর ঠাকুর এখনো সে-কথা জানে না।

আমি বলি, মামু, শ্রীতম কি তার স্ত্রীকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে দিতে চাইছে? দুনিয়া থেকে যখন সরানো যাচ্ছে না, তখন অন্তত পাগলা-গারদে আটকে রাখা?

—খুব তাই নয়, কৌশিক। হেনা 'পাগল' বলে প্রমাণিত হলে তাকে সাক্ষীর মঞ্চে তোলা যাবে না। তার সেই 'গোপন কথা'—যেটা সে বলবার জন্য বারে বারে আমার কাছে ছুটে আসছে—সেটা হয়ে যাবে 'পাগলের প্রলাপ'!

এদিকটা আমার খেয়াল হয়নি। বলি, কিন্তু শ্রীতম জলজ্যান্ত মিথ্যাকথাটা বললো কেন? এ 'কামপোজ' প্রেসক্রিপশান ব্যাপারে? সে কিন্তু জানতে চায়নি 'এ-কথা মনে হল কেন আপনার?' অথবা 'কামপোজের কথা উঠছে কোন সূত্রে?' স্পষ্টতই সে আলোচনাটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কেন?

মামু গম্ভীরভাবে বললেন, মুশকিল কী জান কৌশিক, আমি স্থিরভাবে সবগুলো 'ক্ল'-কে বিচার করতে পারছি না—আমার সবসময় মনে হচ্ছে, খুনীটা দ্বিতীয় খুনের চেষ্টা করছে—এডিভেলগুলো নষ্ট করতে। আমি এখন সেইদিকেই সমস্ত ইন্ড্রিগ্রামকে সজাগ রেখেছি—কী করে দ্বিতীয় হত্যাটাকে ঠেকানো যায়।

এ আশঙ্কার কথা উনি আগেও বলেছেন। জানতে চাই, খুলে বলুন তো আমাকে—কাকে সন্দেহ করছেন আপনি? কে কাকে খুন করতে চাইছে?

—একটু চিন্তা করলেই জো বুকবে। তুমি আমার কাছে শিক্ষানবিশ, তোমার অঙ্ক তুমিই কষবে, আমি তোমার হয়ে কবে দিতে পারবো না। এখন তো কেসটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। শুধু মিনতি মাইতির ঐ আপাত-অসঙ্গতিটা—জুলিয়াস সিজার কেমন করে তার মুদ্রায় ছাপ মারে 'SS' বি.সি. ? আমরা জানি, জুলিয়াস সিজার জীবিত ছিলেন পঞ্চম বি.সি.-তে; কিন্তু সিজার নিজে তো জানতেন না যে, তাঁর পঞ্চম বছর পরে খ্রীস্টীয় জন্মগ্রহণ করবেন!



পরদিন সকালে সাদার্ণ অ্যান্ডিনুর অ্যাপার্টমেন্টে যখন 'বেল' দিল্লাম তখন শ্মুতিটুকু নিজেই দরজা খুলে দিল। মনে হল, সে কোথায় বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সাত সকালেই দারুণ সাজের বাহার। ম্যাঞ্জেটা রঙের মুশিদাবাদী, ম্যাচ করা ব্লাউজ, চোখে ম্যাস্কারা, পায়ে হাই-হিল, হাতে ফুটানির বটুয়া।

মামু বললেন, অসময়ে বিরক্ত করছি মনে হচ্ছে। কোথাও বেরুচ্ছে?

টুকু মিষ্টি করে হাসল। বললে, আপনার ‘ডিডাকশান’ ভুল হয় না। তবে ঘণ্টাখানেক দেবী করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার একটা বদনাম আমার আছেই; সেটা সওয়া-ঘণ্টা হলে কেউ মুছা যাবে না। আসুন, বসুন।

ড্রইং-রুমে দেখা গেল বসে আছে ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্ত। স্যুটেড-বুটেড। হয়তো দুজনে মিলে কোথাও যাক্ষিল। স্মৃতিটুকু তার দিকে ফিরে বললে, ইনট্রোডাকশান বাহুল্য মনে হয়। মেরীনগরে ঐকে দেখেছি। তখন অবশ্য উনি সাংবাদিকতা করতেন। আমার পূজ্যপাদ পিতামহের জীবনী লিখতেন। নির্মল, তুমি বরং চলে যাও! ওদের গিয়ে বলো, আমি আধঘণ্টা পরে আসছি—একটা ট্যাক্সি নিয়ে।

নির্মল সংক্ষেপে বলল, আয়াম সরি, টুকু। এ আলোচনা আমারও শোনা দরকার।

দুজনে দু’জনের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপর টুকু একটু রাগত স্বরেই বললো, বেশ, থাকো। তুমি তো আমার কোন কথাই কখনো শোনো না।

টুকু এবার বাসু-মামুর দিকে ফিরে বলে, বলুন স্যার, এদিকে কদুর কী হলো? উইলটা দেখেছেন শুনছি। কিছু আশা আছে?

মামু নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন, আশা নেই, একথা বলবো না। তবে এখনই সব কথা বলতে পারছি না। দু’পক্ষই তো সবে ‘কাসলিঙ’ শেষ করলো। আরও দু-চার চাল খেলাটা এগিয়ে যাক।

স্মৃতিটুকু আশ্বাজ্ঞ করলো নির্মলের সামনে বাসু-মামু রেখে-ঢেকে কথা বলবেন। বললে, তাহলে আজ এ আবির্ভাবের হেতু?

—একটা কথা জানতে এসেছি। একটু ভেবে নিয়ে সঠিক করে বলো তো মিস হালদার—এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তোমরা মেরীনগরে যাবার পরে এবং তোমার বড়পিসির পদব্রলনের আগে, কোনো একদিন রাত্রে—সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর, তুমি কি সিড়ির ল্যান্ডিং-এ নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিয়েছিলে?

স্মৃতিটুকু নির্বাক তাকিয়ে রইলো সেকেন্ড দশেক। তারপর বললো, প্রবীণ আর একবার করবেন?

মামু দ্বিতীয়বার প্রবীণটা পেশ করলেন খেমে-খেমে।

ও অবাক হয়ে বললে, এমন অদ্ভুত প্রশ্নের অর্থ?

—অর্থ যাই হোক। ভেবে নিয়ে বলো তো, এমন ঘটনা ঘটেছিল?

—না। নিশ্চয় নয়। আমি বড়পিসির মতো ইন্সমনিয়ায় ভুগছি না। বিছানার শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিছু এর কি কোনও গুরুত্ব আছে?

—আছে। একজন বলছে যে, মাঝরাতে সে তোমাকে দেখেছে সিড়ির ল্যান্ডিং-এ নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিতে।

স্মৃতিটুকু ক্রমে ওঠে, যে বলছে সে ডাহা মিথ্যুক। আর যদি কুড়িয়ে নিয়েই থাকি, তাতে হলোটা কী? শিবচাঁকুরের আপন দেশেও এমন আইন নেই যে মাঝরাতে সিড়িতে নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিলে তিন মাসের জেল হবে!

মামু গম্ভীর হয়ে বললেন, প্রিজ. ডোন্ট বি ফ্রিভলাস মিস হালদার। আমি রসরসিকতা করতে আসিনি তোমার সঙ্গে। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দাও—‘গভীর রাত্রে সিড়ির ল্যান্ডিং-এর মাধ্যম তুমি নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিয়েছিলে?’ জবাবে কী বলবে? ‘হ্যাঁ, না, অথবা মনে পড়ছে না।’

—টুকু প্রায় ধমকে ওঠে, না-না-না! না, টুকু পাওয়ার ইনফিনিটি।

নির্মল নড়ে চড়ে বসলো। বললে, মিস্টার বাসু, আপনি সওয়াল করেছেন, জবাবও পেয়েছেন। এবার কি দয়া করে জানান—কেন এই অদ্ভুত প্রশ্নটা করছেন?

—জানাবো। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, মরকতকুঞ্জে সিড়ির ল্যান্ডিং-এ কাঠের স্ক্যাটল্ডের গায়ে একটা পেরেক পোঁতা আছে। তার মাথাটা ভাণ্ডি করা, যাতে নজরে না পড়ে।

—কেন! ওখানে কেউ পেরেক পুঁতেত যাবে কেন? কোনও তুক-তাক?

—না! মিস্ জনসনের বাহ্যন্তরতম জন্মদিনের পূর্বরাত্র—সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর কেউ একজন একটা কালো সুতো টান-টান করে বেঁধে দিয়েছিল সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপে—নয় ইঞ্চি উচুতে।

—তাই বা কেন?

—যে দড়িটা খাটায় সে জানতো মিস জনসন রাত্রে উপর-নিচ করেন, তিনি চোখে ভালো দেখেন না! জানতো যে, ঠাচ বছর আগে মিস জনসন যে উইল করেছেন তার সে অন্যতম ওয়ারিশ।

—মাই গড! কী বলছেন এসব? উনি তো ফ্লিসির সেই হতভাগা বলটায়...

—আয়াম সরি! সে খিওরিটা ভুল। 'সারমেয় গেশুক' নির্দোষ। ইট ওয়াজ আ ডেলিবারেট অ্যাটেম্পট অন হার লাইফ!

পুরো এক মিনিট ঘর নিস্তব্ধ। শুধু সিলিং ফ্যানটার শব্দ। সবার আগে নির্মল কঠোর ফিরে পায়। বলে, আপনার এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কী যুক্তি!

বাসু-মামু সংক্ষেপে সবকিছু বর্ণনা করলেন—মিস্ জনসনের চিঠি, তাতে গোপনীয়তার বিষয়ে নির্দেশ, ফ্লিসির বলটা কোন যুক্তিতে সিঁড়ির মাথায় থাকতে পারে না। পেরেকের অস্তিত্ব, তার মাথায় ডার্নিশ করা। গাছটা দু'মাসেও যায়নি। পকেট থেকে মিস্ জনসনের চিঠিখানা বার করে তিনি ওদের দেখতে দিলেন।

স্মৃতিচুকুর মুখটা সাদা হয়ে গেল। কথা যোগালো না তার মুখে। নির্মলই বললে, কিছু আপনি হঠাৎ টুকুকে ঐ প্রশ্নটা করলেন কেন? ঐ সিঁড়িতে নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নেবার কথা।

মামু এবার অকপটে বললেন, মিস্ মাইতি তোমাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল।

—শি ইজ্ঞ আ লায়ার। ডাম্‌ড লায়ার। আমি সিঁড়িতে পেরেক পুঁতিনি।

—তাহলে নিচু হয়ে কী কুড়িয়ে নিচ্ছিলে? পেরেক পোঁতোনি যখন।

আগুনজ্বালা চোখে টুকু মামুর দিকে তাকিয়ে বললে, মিস্টার বাসু! ডোন্ট আন্স মি লীডিং কোয়েস্টেনস্। আমি সিঁড়ির মাথায় আদৌ নিচু হইনি—কোনোদিন নয়, কোনো রাত্রে নয়।

—কিন্তু মিনতি তোমাকে চিনতে পেরেছিল। তুমি নীল নাইট পরেছিলে, তোমার কাঁধে একটা ক্রোমিয়াম-প্রেটেড ব্রোচ ছিল, তাতে T.H. লেখা!

—মাই গড। আপনি বিশ্বাস করলেন? আমি গোপনে মৃত্যুফাঁদ পাডতে যাচ্ছি! আর পাছে আমাকে ক্রীমডী মাইতি চিনতে না পারেন তাই নিজের নাম-লেখা ব্রোচ কাঁধে স্টেটেছি।

—তোমার কাছে এমন একটা ক্রোমিয়াম-প্রেটেড ব্রোচ আছে?

—আছে। দেখতে চান? ঠিক আছে, দেখুন—

দুম দুম করে স্মৃতিচুকু পাশের ঘরে উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এসে সে ব্রোচটা প্রায় ছুঁড়ে দিল বাসু-মামুকে লক্ষ্য করে। উনি সেকেন্ড-ফ্লিপি কোনোদিন ফিল্ড করেছেন কিনা জানি না। ব্রোচটা ঠিক লুফে নিলেন। মিনতির বর্ণনা মোতাবেক ক্রোমিয়াম-প্রেটেড ব্রোচ : T.H. লেখা। অস্বীকার করে লাভ নেই, এই মাপের একটি ব্রোচ অত অল্প আলোয় চকচক করে নির্ভুলভাবে সনাক্ত হতে পারে।

মামু সেটা নেড়েচড়ে দেখলেন। ফেরত দেবার উপক্রম করতেই টুকু বলে ওঠে, থাক ওটা আপনার কাছে। ওটা আর আমি পরি না। এ জাতীয় ব্রোচ এখন 'ফ্যাশন'-এ ঠাঁড়িয়ে গেছে।

—'ফ্যাশন'-এ ঠাঁড়িয়ে গেছে। তার মানে?

—সবাই পরে। আমি 'স্টাইল'-এ বিশ্বাস করি। 'ফ্যাশন'-এ নয়। ওটা যখন কিনেছিলাম তখন সেটা কেউই পরতো না—একমাত্র অনারবল এক্সেপশান মিস্ উষা বিশ্বাস। তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে ঐ রকম একটা ব্রোচ পরেন। তাই এই পুরাতন স্টাইলটা আমি ফিরিয়ে আনি। তারপর আমার দেখাদেখি খেপি-পুটি-হেনা সবাই ঐ জাতের ব্রোচ কিনেছে।

—হেনাও?

—হ্যাঁ! হেনাও। সে আমার নকল করেই সাজগোজ করে, লক্ষ্য করেননি?

—তা হবে। তা আমি এটা নিয়ে কী করব?

—রেখে দিন। আমার বিরুদ্ধে যদি ‘কেস’ সাজান তাহলে ওটাই হবে জবর এভিডেন্স। যা হোক, আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। —টুকু উঠে দাঁড়ায়।

—আছে। মাদমোয়াজেল! ‘একজিউমেশান’-এর একটা কথা উঠেছে। সেটার বিষয়ে—

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ে টুকু। বলে, এটা কি আপনার কীর্তি? কিন্তু কবর থেকে মৃতদেহ তুলতে হলে তো নিকটতম আত্মীয়দের অনুমতি লাগে—

—না! স্বরাষ্ট্র বিভাগের নির্দেশে নিকট-আত্মীয়ের আপত্তি সত্ত্বেও কবর থেকে মৃতদেহ তোলা হয়। এমন নজির আছে।

—মাই গড! —টুকুর মুখখানা শাদা হয়ে গেল।

মিনিটখানেক কী ভেবে নিয়ে বললে, কিন্তু কেন? কী হেতুতে?

—কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেছেন, মিস্ পামেলা জনসনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

—কর্তৃপক্ষ, না আপনি নিজে?

মামু নীরব রইলেন। নির্মল বললে, অত উতলা হচ্চো কেন টুকু?

—যু শাট আপ। তুমি কী বুঝবে? যু আর নট আ রোমান ক্যাথলিক! তারপর মামুর দুটি হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে সে কাতরভাবে বললো, প্লীজ স্যার! এটা যেমন করে হোক বন্ধ করতে হবে! বুড়িটাকে সারা জীবন অনেক অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে! আমরা... আমরা সবাই নীচ, স্বার্থপর... কিন্তু মৃত্যুর পর বুড়ির কঙ্কালটাকে টেনে তুলবেন না! তাকে শান্তিতে ঘুমোতে দিন!

—এটাই তোমার অনুরোধ?

—অনুরোধ নয়, নির্দেশ। মাই ইন্সট্রাকশাল। তাতে যদি আপনার ‘কাসলিঙ’ বিঘ্নস্ত হয়ে যায় তো যাক! কবরের শান্তিকে কিছুতেই নষ্ট করা চলবে না।

—অল রাইট! তাই যদি তোমার নির্দেশ হয়।

\* \* \*

নিচে নেমে এলে বলি, মামু, আমি ভাবছিলাম—

মামু আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দেন, ভাবো ভাবো ভাবতে থাকো। বাট প্লীজ ডোন্ট ডিসটার্ব মাই ঔন থট-প্রসেস। আমার চিন্তাধারায় বাধা দিও না। নাও সরে বসো। আমি গাড়িটা চালাবো। তুমি ভাবতে থাকো।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—নিউ আলিপুরে।

পিছনের সিটে বসলাম এবার। মনে হচ্ছে সমাধানে পৌঁছে গেছি। মামুর আশঙ্কাই ঠিক—মিস্ জনসনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর সেটা স্মৃতিটুকু জানে! না হলে কবর থেকে মৃতদেহকে ওঠানোর প্রস্নে সে অমন শাদা হয়ে যেতো না। কৈফিয়ৎ যোটা দিয়েছে সেটা গোপে টেকে না। মিস্ হালদার আধুনিকা—পিটার দস্ত, উষা বিশ্বাস বা মিস্ জনসনের মতো সে-আমাদের মানুষ নয়। রোমান ক্যাথলিক ও নামেই—হয়তো সাতজন্মে চার্চে যায় না! তাহলে মৃতদেহের উৎপাটনে সে কেন এত বিচলিত? কবরের শান্তি! সেটা আর যে কেউ বলুক—মিস্ টুকু হালদারের মুখে বেমানান। টুকু জানে—বড়পিসিকে কেউ খুন করেছে। সম্ভবত এটাও জানে—‘কে’ খুনটা করেছে। কে? সুরেশ? তাই কি তার ঠিকানা চাওয়াতে সে মিথ্যে করে বলেছিল সুরেশ বোঝাই চলে গেছে? নাকি এটা নির্মল দত্তগুপ্তের কীর্তি? ডক্টর পীটার দস্তের পাঠানো ওষুধে কি সে এক পুরিয়া বিষ মিশিয়ে দেবার সুযোগ পায়নি? নির্মলের টাকার প্রচণ্ড দরকার—ওর সেই পেটেকটা নেবার ব্যাপারে। ওরা দুজনে মিলে কি এই কাজটা করেছিল? সিড়ির মাথায় মৃত্যুকান্দটা খাটিয়েছিল নিশ্চয় টুকু। তাকে মিনতি স্বচক্ষে দেখেছে। পামেলা সে বাধা অতিক্রম করেছিলেন। তখন নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল

## কাটার-কাটার-২

নির্মল—টুকুর যোগসাজসে। আর তাতেই ওদের দৃঢ় আপত্তি মৃতদেহটা কবর থেকে খুঁড়ে বার করে পরীক্ষা করানোতে! কিন্তু আমরা আবার নিউ আলিপুরে ফিরে যাচ্ছি কেন? প্রশ্নটা করাতে মামু বললেন, আজ সকালেই হেনা আবার আসতে পারে। এবার যেন তাকে মিস্ না করি—

হ্যাঁ! হেনা! হেনা ঠাকুর! কী তার গোপন কথা? স্বামী তাকে পাগল বানাতে চায়? কেন? কোন তথ্যটা হেনা জানে, যাতে তার স্বামী তাকে পাগলা-গারদে আটকে ফেলতে চাইছে? হঠাৎই একটা কথা মনে হলো! বলি, মামু! সবাই মিলে কিছু একটা করেনি তো?

—মিটিং করে সর্বসম্মতিক্রমে হত্যার সিদ্ধান্ত? না, কৌশিক! এক্ষেত্রে তা হয়নি। একটি মাত্র মস্তিষ্ক কাজ করেছে এক্ষেত্রে—এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত! সর্বসম্মতিক্রমে তো নয়ই, এমনকি যৌথ প্রচেষ্টাও নয়।

—টুকু পেয়েকটা পুততে পারে—কিন্তু বিব প্রয়োগ—

—শোনো কৌশিক! মিনতি মাইতির গল্পটার তিন-তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক : মিনতি আদ্যন্ত সত্যি কথা বলেছে। দুই : মিনতি কোন স্বার্থ চরিতার্থ করতে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। তিন : সে যা বিশ্বাস করে তাই বলেছে—অর্থাৎ সে মিথ্যা বলেনি, কিন্তু তার ধারণাটিই মিথ্যে।

—আপনি তো ন্যূতিটুকুকে জিজ্ঞাসা করলেন না—মেরীনগরে যাওয়ার সময় সে ঐ ব্রোচটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল কি না?

—কী লাভ হতো? সে হয় সত্যি কথা বলতো, অথবা মিথ্যা! প্রমাণ তো নেই!

নিউ আলিপুরে পৌঁছে শোনা গেলো ইতিমধ্যে কেউ আসেনি।

মামু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে প্রীতমের বাড়িতে ফোন করলেন:

—হ্যালো, ডক্টর ঠাকুর? আমি বাসু বলছি... কোনো খবর পেলেন?... বলেন কী?... কাল রাত আটটায়?... বাচ্চাদের নিয়ে গেছে?... তা তো বটেই... আমি কি কোনও চেষ্টা করে দেখবো?... ও আল্লা আল্লা! উইশ যু বেস্ট অফ লাক!

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, হেনা কাল রাত্রেই বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেছে সে তো জানেই। প্রীতম এখনো তার সন্ধান পায়নি। তবে সে আমার সাহায্য চাইছে না। সে নিজেই খুঁজে বার করতে পারবে বলছে। মিসেস ঠাকুরের কাছে টাকাকড়ি সামান্যই আছে—অর্থাৎ বেশিদিন সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

—আপনার কি মনে হয় হেনার সামান্য মস্তিষ্ক বিকৃতি সত্যিই হয়েছে।

—সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে এটা বোকা যাচ্ছে। পাগল হয়নি।

—তাহলে এখন আমরা কী করবো?

—খেয়ে নিয়ে কিছু বিজ্ঞান। বিকালে মিনতির কাছে যেতে হবে।

—আবার মিনতি? ঐ তিনটে বিকল্প পথের কোনটা ঠিক যাচাই করতে?

—চলো খেয়ে নেওয়া যাক। বিকেল চারটায় আমরা বের হবো।



বাসু-মামুর সঙ্গে কাজ করতে হলে ঘড়ির কাটার দিকে নজর রাখতে হয়। ঠিক চারটায় সময় ঠর ঘরে গিয়ে দেখি উনি তৈরিই, তবে টেবিলে বসে কী-যেন লিখছেন তখনো।

—কী লিখছেন মামু? চিঠি?

উনি ঝাঁপটো তুলে আমাকে গোল করতে বারণ করলেন। চুপচাপ বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে থাকি। আরও মিনিট পনেরো লাগলো ওর চিঠিটা শেষ করতে। তারপর ডায়েরি থেকে একটা বড় খাম বার করে চিঠিখানা ভরলেন। নজর হলো, চিঠিটা বেশ বড়—পাঁচ-ছয় পাতা। তার মানে দ্বিপ্রহরে উনি আদৌ বিখ্যাম নেননি। আশ্চর্য! খামটায় কাগজগুলো ভরে আঠা দিয়ে বন্ধ করলেন, কিন্তু উপরে ঠিকানা লিখলেন না, টিকিটও সাঁটলেন না। পকেটে ভরে ফেলে বললেন, চলো, এবার যাওয়ার যাক।

আমি বলি, আপনি কিন্তু চিঠির উপর প্রাপকের নাম লেখেননি!

—আই নো হোয়াট অয়াম ডুইং! —হেসে বললেন উনি।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, ও-কথা মিস্ জনসনও বলেছিলেন। তিনি কিন্তু খামের উপর নাম-ঠিকানা লিখেছিলেন, টিকিটও সঁটেছিলেন। শুধুমাত্র ডাকে দিতে ভুলে যান।

—দ্যাটস্ আ গুড ওয়ান! চলো!

মিনতি আমাদের পেয়ে যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এবার অবশ্য তার উত্তেজিত হবার যথেষ্ট হেতু আছে। দোরগোড়ায় আমাদের ঝুঞ্জে দেবার। বললে, আপনি এসে পড়েছেন, খুব ভালো হয়েছে। আপনাকে ফোন করবো কিনা ভাবছিলাম। ইতিমধ্যে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়েছে।

বাসু ওকে সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চোয়ারে বসতে বসতে বলেন, ভীষণ কাণ্ড! কী?

মিনতি দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে ফিরে এলো। ফিস্‌ফিস্ করে বললে, ইয়ে হয়েছে... হেনা আমার কাছে পালিয়ে এসেছে!

—হেনা! পালিয়ে এসেছে? কোথায় সে?

শেষ গ্রন্থটাই আসল। স্টোকে এড়িয়ে মিনতি বাকি দুটো গ্রন্থের উপর একটা থিসিস রচনা করতে বসলো; হেনা তার স্বামীকে ভয় পায়... পাওয়ার কথা। কাবুলিওয়ালাকে সবাই ভয় পায়! ও যে কেমন করে অমন একটা দাড়িয়ালো বণ্ডামার্কাকে বিয়ে করেছিল এটাই আশ্চর্য!... তবে এটা সে ভালোই করেছে... ঐ ডিভোর্স নেবার সিদ্ধান্ত। একথা ঠিক যে, হেনা নিজের, তার উপার্জন নেই—তা হোক, অমন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দেখে না মিনতি!... ই্যা, লোকটা যদি কাবুলিওয়ালো না হতো, বাঙালি হতো...

বাসু-মামু ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না যে, প্রীতম ঠাকুর কাবুলিওয়ালো নয়, বললেন, হেনা এখন কোথায়?

—এই হোটেলের। একতলার চার নম্বর ঘরে। আমরা বুদ্ধি করে হোটেলের খাতায় ওর নাম-খাম সব বদলে দিয়েছি। যাতে সেই কাবুলিওয়ালোটা না খোঁজ পায়।

—ও কি কাল রাতে এসেছে? রাত সাড়ে-আটটা নটায়? ছেলেমেয়ে নিয়ে?

—না তো! সে এসেছে আজ সকালে। ছেলেমেয়েদের আনেনি। আজ ওবেলা নিয়ে আসবে। তারা আছে ওর এক বাচ্চবীর বাড়ি। ভবানীপুরে, পদ্মপুকুর রোডে।

—তার মানে তুমি হেনাকে সাহায্য করবে বলে স্থির করেছে?

—করবো না? এ তো আমার কর্তব্য। আপনি সেদিন যা বললেন—ম্যাডাম যদি সেজ্ঞনাই তাঁর সর্বস্ব আমাকে দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে হেনা বেচারি অহেতুক শাস্তি পাচ্ছে। ঈদ পাতলো টুকু, টাকা হাতালো সুরেশ আর দু-দুটো সজ্ঞানের জ্ঞানী বন্ধিত হলো তার ন্যায্য পাওনা থেকে! আর বেচারীর কী কপাল দেখুন—ওর স্বামী এখন ওকে পাগলা-গারলে পাঠাতে চায়।

—তাই নাকি! ও বলছে?

—চলুন! ওর নিজ মুখেই শুনুন।

## কাটায়-কাটায়-২

আমরা একতলায় নেমে আসি। চার নম্বর ঘরের রুদ্ধদ্বারে 'নক' করতে ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। মিনতি ইতিউত্তি দেখে নিয়ে অনুচ্চস্বরে বললে, হেনা ভয় নেই, দোর খোল, আমি মিষ্টিদি—

এবার দরজাটা খুলে গেল। হেনাকে যেন চেনাই যায় না। চুল উসকো-খুসকো! প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। প্রায় পাগলির মতো দেখতে হয়েছে তাকে। চোখে উদগ্রাস্ত না হলেও আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টি। মিনতির পিছনে আমাদের দুজনকে দেখে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠলো। মিনতি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বললে, ভয় নেই হেনা, বাসু-মামু তোমাকে ধরিয়ে দেবেন না। তিনি আমাদের দলে। পারলে উনিই তোমাকে বাঁচাতে পারেন। উনি উকিল— বিবাহ-বিচ্ছেদের সুলুক-সন্ধান দিতে পারবেন।

মামু একটা চেয়ারে বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। তারপর মিনতির দিকে ফিরে বললেন, তুমি বরং তোমার ঘরে যাও মিনতি। শ্রীতম হেনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে তোমার ঘরে খোঁজ নিতে আসতে পারে। হোটেলের বয়টা তোমাকে নিচের চার-নম্বর ঘরে আসতে দেখেছে...

মিনতি ত্রিং করে লাফ মারে: ঠিক কথা! আমি যাই। আপনারা কথা বলুন। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কিন্তু।

মিনতির প্রস্থানের পরে বাসু-মামু দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে ফিরে এসে বসলেন। বললেন, হেনা, তুমি কাল বিকালে আমার কাছে এসেছিলে...

—হ্যাঁ! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য আপনি বাড়ি ছিলেন না। তাই... তাই নিজে নিজেই সিঁকাস্তটা নিতে হলো...

—কী সিঁকাস্ত? শ্রীতমকে ছেড়ে পালিয়ে আসা?

—হুঁ।

—তুমি সেদিন আমাকে কী-একটা কথা বলতে এসেছিলে—সেই যেদিন আমি তোমাদের বাড়ি প্রথম যাই। তুমি বলবার সুযোগ পাওনি, শ্রীতম এসে যাওয়ায়। কথাটা এখন বলো—

হেনা আঙুলে তার আঁচলের খুঁটটা একবার জড়াচ্ছে, একবার খুলছে! সুস্থ-মস্তিষ্কের লোক এমনটা সচরাচর করে না। সে জবাব দিল না আদৌ।

—কী হলো? বলো? কী? তোমার সেই গোপন কথা?

—না! আমার সাহস হচ্ছে না! আমি... আমি বলতে পারবো না...

—কেন? বললে কী হবে?

—ও যদি জানতে পারে... তাহলে... তাহলে আমার ভীষণ বিপদ হবে!

—কেউ তা জানতে পারবে না। এখানে তো আর কেউ নেই।

—ও ঠিক টের পেয়ে যাবে! ও যে কী ভীষণ, আপনি জানান না।

—‘ও’ মানে? তোমার স্বামী?

—আবার কে?

মামু একটু টুপ করে ওকে দেখতে থাকেন। তারপর বললেন, কাল বিকালে তুমি চলে যাবার পরেই শ্রীতম আমার কাছে এসেছিল।

স্পষ্টতই শিউরে উঠলো মেয়েটা। বললে, কী বললে? আমি... আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

—শ্রীতম বললে, তুমি খুব মানসিক উত্তেজনার মধ্যে আছো।

—না! আপনি রেখে-ঢেকে বলছেন! ও বলেছে, আমি বন্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি। ছলে-বলে-কৌশলে ও আমাকে ওর বন্ধুর পাগলা-গারদে আটকে রাখতে চায়। যাতে সেই কথাটা আমি কাউকে বলতে না পারি। বললেও সবাই ভাববে পাগলের প্রলাপ! তাই নয়?

—কোন কথাটা হেনা! কী এমন কথা?

—না! আমার সাহস হচ্ছে না।



—লুক হিয়ার হেনা! কথাটা বলে ফেললে আর তোমার ভয় নেই। তখন আর সেটা গোপন কথা থাকবে না—এখন যদি তুমি আমাকে বলো, তাহলে তাতো আর পাগলের প্রলাপ হবে না। এখনো তো কেউ তোমাকে পাগল প্রমাণিত করেনি!

—আমি কেমন করে জানবো যে, আপনি ওর দলে নন? ও আপনার সঙ্গে দেখা করেছে বললেন—হয়তো ও আপনাকে এমপ্লয় করেছে, ওর স্বার্থে...

বাসু-মামু দুটো করে বললেন, শোন হেনা। এই কেস-এ আমার মকেল মৃত্যু পামেলা জনসন। আর কেউ নন। তাঁর কোনো স্বার্থের প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু 'সত্য'র পক্ষে, ন্যায়-ধর্মের পক্ষে।

হেনা মাথা ঝাকিয়ে বললো, সে তো আপনি বলছেন। প্রমাণ কী? আপনি জানানো না, এই কয় বছর কী যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমার কেটেছে! না, আমি ওর কাছে ফিরে যাবো না। বাচ্চাদেরও দেবো না! আমি নিঃশ্ব, কিন্তু মিষ্টিদি আমাকে সাহায্য করবেন! তিনি কথা দিয়েছেন!

মামু বলেন, উত্তেজিত হলো না হেনা। খোলাখুলি বলো তো—মিস্ পামেলা জনসনের মৃত্যু যে স্বাভাবিকভাবে হয়নি, তা তুমি জানো। নয়?

হেনা মুখটা তুলতে পারে না। গ্রীবা সঙ্কলনে স্বীকার করে।

—বিশ্বের ক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঠিক?

এবারও সে নীরব। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—তুমি কি সন্দেহ কর এর পিছনে তোমার স্বামী, শ্রীতমের হাত আছে?

হ্যাঁ মুখ তুলে তাকালো মেয়েটা। যেন দম্প করে স্বপ্নে উঠলো। সন্দেহ করবো কেন? আমি তো জানিই!

—কী জানো? কেমন করে জানো? খুলো বলো আমাকে—

আবার নীরবতা।

—ব্যাপারটা কি ঘটে সেই শেষ রবিবারে, যেদিন তোমাকে না জানিয়ে শ্রীতম ঘটনাস্থানের জন্য মরকতকুঞ্জে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ! সে গোপন করতেও চেয়েছিল তার মেরীনগরে যাবার কথাটা।

—কিন্তু তুমি কেমন করে তা জানতে পারলে?

—সেটা এখনি আপনাকে বলতে পারবো! না।

বাসু-মামু একটু ডেবে নিয়ে বললেন, কিন্তু সেটা যদি আমি তোমাকে এখন বলে দিই, তুমি কি সেটা স্বীকার করবে, অথবা অস্বীকার?

—আগে বলুন—

—বলছি। তার আগে আমাকে বলো তো—মীনা আর রাকেশকে তুমি যে বান্ধবীর বাসায় রেখে এসেছো সে কি জানে তুমি শ্রীতমকে ছেড়ে এসেছো?

—না। সে কিছুই জানে না।

—তাকে কি শ্রীতম চেনে? তোমার বান্ধবীকে? তার বাড়ি চেনে?

—হ্যাঁ, তা চেনে। কিন্তু শ্রীতম সেটা সন্দেহ করবে না।

—করবে। সে অত্যন্ত দুর্ভ। তাছাড়া কলকাতায় তোমার বান্ধবী খুব কম, তাই নয়? তুমি পটিনার মানুষ হয়েছে। কলকাতায় তোমার যে পাঁচ-সাতটি বান্ধবী আছে শ্রীতম পর্যায়ক্রমে তাদের বাসায় যাবে। তোমার বান্ধবী জানে না যে, তুমি চিরকালের জন্যে শ্রীতমকে ত্যাগ করে এসেছো—ফলে শ্রীতম যদি মীনা আর রাকেশকে নিয়ে যেতে চায়, তোমার বান্ধবী বাধা দেবে না। শ্রীতম যদি ছেলেমেয়েকে আটকে রাখে তখন তোমার পক্ষে আর পালিয়ে বেড়ানো সম্ভবপর হবে না।

—কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমি তো এখনি গিয়ে ওদের নিয়ে আসবো?

—বুঝলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি দেখো শ্রীতম বসে আছে?

## কাটার-কাটায়-২

হেনা শিউরে উঠলো। বিহুলের মতো মামুর দিকে তাকিয়ে দেখলো। মামু বললেন, তার চেয়ে এক কাজ করো, একখানা হাত চিঠি লিখে দাও আমার সঙ্গে সে বাচ্চাদের আসতে দেয়। লেখো, তোমার শরীরটা ঠাণ্ডা রাখা হয়েছে তাই নিজে যেতে পারছো না।

হেনা যুক্তির সারবস্তা গ্রহণ করলো। রাজি হলো। একখণ্ড কাগজে সেই মতো চিঠি লিখে দিল বাচ্চাবীকে। বললো, ওদের নিয়ে এখনই চলে আসুন।

—না। বাচ্চাদের আমার বাড়ি নিয়ে যাবো। আমার কাছে এক রাত্রি রাখবো। এখানে ওদের নিয়ে আসা ঠিক হবে না। কাল সকালে অন্য কোনও হোটেলের তোমার জন্য ঘর বুক করে বাচ্চাদের নিয়ে আমি সেখানে অপেক্ষা করবো। এই কৌশিক এসে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। বাচ্চারা সেখানেই থাকবে তোমার কাছে।

—কেন? এখানে কী আপত্তি?

—বুঝছো না কেন? তুমি নিজে এখানে ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকতো পারো, বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখতে পারবে না। প্রীতম জানে, তোমার কাছে টোকাফড়ি বিশেষ নেই। সে স্বতই ভাববে, তুমি মিনতির দ্বারস্থ হবে। তাই এই হোটেলটায় বারে বারে খোঁজ করবে। তুমি মিষ্টির কাছে যাতায়াত করছো কি না জানতে। যে কোন সময়ে তুমি বাচ্চাদের জন্য ধরা পড়ে যাবে।

এবারও যুক্তির সারবস্তা গ্রহণ করলো হেনা। রাজি হলো।

—তাহলে বাচ্চাদের আমার হেপাজতে রেখে তুমি নিশ্চিন্ত হলে তো?

—কেন হবো না? রাকেশ কিছু কাল ধেতে পারে না। রাত্রি ও দুখ কটী যায়।

—ও আচ্ছা। এবার মন দিয়ে শোনো আমি কি বলছি—

হেনা প্রায় আতর্জন করে ওঠে : না! আমি তো বলেছি, আর কিছু বলতে পারবো না।

—আমি তোমাকে শুনতে বলছি হেনা, কিছু বলতে নয়। শোনো—ধরে নাও আমি জানি—আমি জানি, কী করে মিস্ জনসন যারা যান। মানে যুক্তির খাতিরে তোমাকে এটা ধরে নিতে বলছি। ধরো, তুমি যে কথাটা জানো, তোমার 'গোপন কথা' সেটা আমি জানি। আমি সেটা অনুমান করতে পেরেছি। তা যদি ঘটে থাকে তাহলে পরিস্থিতিটা একটু বদলে যায়। যায় না কি?

হেনা সন্দেহ চোখে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—বিশ্বাস কর হেনা, কথার প্যাচে তোমাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নিচ্ছি না আমি। প্রতিটি কথার উত্তর ভেবেচিন্তে দিও। তোমার 'গোপন-কথা'র বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত না দিয়ে। এবার বলো, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, আমি সব কিছু জানি, তাহলে পরিস্থিতিটা অন্যরকম হয়ে যায়। তাই না?

হেনা একগুঁয়ের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, আপনি কিছুতেই সেটা অনুমান করতে পারবেন না—এ হয় না! প্রীতম কী ভাবে... না, না, আমি কিছু বলবো না!

মামুর পেশাই হচ্ছে সওয়াল-জবাব করা। মৈত্রী ধরে একই কথা বললেন আবার, তোমাকে বলতে তো কিছু বলছি না। শুধু স্বীকার করতে বলছি: যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, আমি সব কিছু জানি, তাহলে তোমাকে আবার সব কিছু নতুন করে ভাবতে হবে—যেহেতু পরিস্থিতিটা বদলে যাচ্ছে। নয়?

হেনা এবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো, হ্যাঁ, তাই।

—গুড। এবার শোনো: আমি পি. কে. বাসু, এ রহস্যের কিনারা সম্বেহাভীতভাবে করেছি! এটাই আমার পেশা। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। আমি সব কিছু জানি—মায় তোমার ঐ 'গোপন-কথা'টা... না, না, কথা বোলো না। শুধু শুনো যাও। তুমি যে কথাটা আমাকে বলতে পারলে না, কখনো কাউকেই বলতে পারবে না—সেটা আমি জানি এনেছি। এই নাও এটা ধরো—

পকেট থেকে সেই মুখবন্ধ খামটা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, আমরা চলো যাবার

পর ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এটা পড়ে। তারপর পুড়িয়ে ফেলো! যদি মনে করো, আমি যা লিখেছি তা ঠিক নয় তাহলে কাল সকালে আমাকে তা জানিও। না, কাল সকালে নয়। আজ রাত্রেই আমাকে টেলিফোন কোরো। আর যদি মনে করো আমি ঠিকই লিখেছি...

—তাহলে?

—সে কথা কাল হবে। চিঠিটা আগে পড়ে দেখো।

হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মামু বললেন, মানুষের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তা আমরা করছি। বাকিটা করুণাময় ঈশ্বরের হাতে!

আমি বলি, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

—করি, আই হ্যাভ ইম্পেক্বেন্স ফেইথ ইন হিজ ইনয়েক্সপ্রেবল্ জাস্টিস!

বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের প্রতীক্ষায় বাস আছে ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্ত।

—কী ব্যাপার? ডক্টর দত্তগুপ্ত কী মনে করে?

—আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না স্যার। আমার নিজেরও তাড়া আছে। কাঁচড়াপাড়ায় ফিরতে হবে। দু-একটি কথা জানতে এলাম।

—বলো?

—আপনি আসলে কী চাইছেন, বলুন তো? আপনার ভূমিকাটা কী? কে আপনার মক্কেল?

—কেন? তুমি তো জানোই—মিস্ স্মিটটুকু হালদার।

নির্মল গম্ভীরভাবে বললে, এজ্জকিউজ মি স্যার, আমি নির্বোধ নই। দুজনই সময়ের দাম আছে। কথাবার্তা খোলাখুলি হলেই ভালো হয়। প্রথম কথা, আপনি ছদ্ম পরিচয়ে যখন প্রথম মেরীনগরে যান তখনো আপনি টুক বা সুরেশকে চিনতেন না। কিন্তু তার আগেই আপনি মিস্ জনসনের চিঠিখানা পেয়েছেন। সেকেন্ডলি, আপনার সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমি খোজখবর নিয়েছি—প্রতিটি সূত্রই বলছে, আপনার 'ইন্টিগ্রেটিভ ইম্পেক্বেন্স'! অসত্যের সঙ্গে মিথ্যার হাত মেলানো আপনার ধাতে নেই। টুককে যেভাবে মিথ্যার লোভ দেখিয়ে বিশ্বাসভাজন হয়েছেন সেটা আপনার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। আই রিগিট। আপনি কী চাইছেন?

মামু বললেন, যদি বলি, আমার মক্কেল মিস্ পামেলা জনসন, তাহলে তুমি বিশ্বাস করবে না। তাই বলছি: আমার মক্কেল একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাইউ—তুথ! আমি সত্যাক্ষেপণ করছি।

—কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থটা কী? ঘরের খেয়ে কেন বনের মোষ তাড়াচ্ছেন?

—বলছি। তার আগে বলতো ডক্টর দত্তগুপ্ত—তোমার স্বার্থটা কী? তুমি কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এই এখন নিউ আলিপুরে ছুটে এসেছো? কাকে বাঁচাতে চাইছো? সুরেশকে না টুককে?

নির্মল হাসলো। বললো, আমি ডাক্তার আর আপনি ব্যারিস্টার। বাকযুদ্ধে আপনার সঙ্গে পারবো না। হ্যাঁ, আমাকে বলতে হবে যে; দুটোর একটাও নয়। সুরেশ বা টুককে বাঁচাবার জন্যে আমি ছুটে আসিনি। এ শুধু দুরন্ত কৌতূহল। আর সে কথাটা বললেই আপনার যুক্তিটা মেনে নেওয়া হয়—আপনিও ঐ চিঠিখানা পেয়ে দুরন্ত কৌতূহলে মেরীনগরে ছুটে গেছিলেন।

—না, নির্মল, ভুল হলো তোমার। শুধুমাত্র আকাদেমিক কৌতূহল নয়। মিস্ পামেলা জনসনের চিঠিখানা পড়েই আমি মনচক্রে দেখতে পেয়েছিলাম তাঁকে—দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমতী, পরমশ্রদ্ধেয়া একটি বৃদ্ধাকে। পারিবারিক কৌলিন্য সম্বন্ধে যার কঠোর দৃষ্টি, কিন্তু যিনি আত্মরক্ষা করতে জানেন। তিনি আমার বুদ্ধির উপর আস্থা রেখেছিলেন—সেই আস্থার মর্যাদাটুকু আমাকে কড়ায়-গুণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে। আমার মক্কেল—বিলিভ ইট, অর নট: আমার বিবেক।

—অর্থাৎ ঐ 'সুবি-ট্র্যাপটা' যে খাটিয়েছিল তাকে আপনি খুঁজে বার করবেনই?

—না। সেটা আমি জানি। আমি খুঁজে বার করছিলাম—কে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছে।

## কাটায়-কাটায়-২

—এটাই আপনার অনুমান?

—না। আবার ভুল হলো তোমার—অনুমান নয়, স্থির সিদ্ধান্ত। শুষু তাই নয়, আমি এ-কথাও জানি—কে তাকে হত্যা করেছে।

—তাও জানেন? তবে তাকে গ্রেপ্তার করছেন না কেন? প্রমাণের অভাবে?

—ঠিক তাই। তবে আশা করছি আগামীকালই প্রমাণটা আমার হাতে আসবে।

নির্মল আবার হাসলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে: আহ! টুমরো! 'আগামীকাল'! দ্য লাস্ট সিলেবল্ অফ রেকর্ডেটাইম। আমার অভিজ্ঞতা বলে, 'আগামীকাল' বস্তুটা মরীচিকার মতো—কেবলই পিছিয়ে যায়।

—তুমি ক্রমাগত ভুল বলে যাচ্ছে। নির্মল! আমার জীবনে 'আগামীকাল' বস্তুটা আরও কয়েক হাজার বেশিবার এসেছে—আই মিন, তোমার চেয়ে। আমি বরাবর দেখেছি, 'আগামীকাল'টা অনিবার্যভাবে আজকের ঠিক পরেই আসে!

নির্মল দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে, আগেই বলেছি, আপনার সঙ্গে আমার মতো লোকের তর্কযুদ্ধ শোভা পায় না। তাহলে পরশুই আসবো—

—এসো। তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।

—থাক্স। গুড নাইট স্যার! আগামী পরশুটাও অনিবার্যভাবে আসবে আগামীকালের পরেই। তখনই জানা যাবে কে আপনার টার্গেট—টুকু, সুরেশ, হেনা অথবা প্রীতম?

—বাস্! লিস্ট খতম? সন্দেহভাজন আর কেউ নেই?

—আপনার তালিকায় আছে কি না আমি জানি না। কিন্তু মিনিতি মাইতিকে আমি লিস্ট থেকে বাতিল করেছি অনেক আগেই—

—না, মিনিতির কথা বলছি না আমি; কিন্তু আর একটি পঞ্চম সন্দেহজনক লোকের নাম তো নেই তোমার তালিকায়?

—পঞ্চম নাম? কী সেটা?

—ডক্টর নির্মল দত্তগুপ্ত।

একটু হকচকিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই হেসে ওঠে। বলে, আয়াম রিয়ালি সরি স্যার! ই্যা, সে নামটা আমার মনে পড়েনি। দশমক্কমসি! কারেক্ট! তার হবুপত্নীর অর্থলোভে সেও লাভবান হতো বটে! তাছাড়া সে ছিল ডক্টর শীটার দস্তের সাকরেন। আচ্ছা চলি। অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম আপনার।

—নট অ্যাট অল! নট অ্যাট অল!



নৈশাহারের টেবিলে এসে দেখি একটিমাত্র খাবার প্লেট সাজিয়েছে বিশু। তার দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাতেই সে কৈফিয়ৎ দিল—বড়সাহেব রাতে খাবেন না বললেন।

শুয়ে পড়েছেন?

—আজ্ঞে না। আজ আবার বোতলটা বার করেছেন।

ইদানীং মামু প্রত্যহ সন্ধ্যার মদ্যপান করেন না। আগে তাঁর দৈনিক বরাদ্দ ছিল এক পেগ বিলাইতি। ইদানীং মাঝে মাঝে বোতলটা বার করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, আজ তাঁর চিন্তাচঞ্চল্যের কোনও

হেতু হয়েছে। এটাও বুঝতে পারছি, সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে। হেনার সেই 'গোপন কথা'—যেটার কোনও আঁচ আমি করতে পারছি না, সেটা কোনও না কোনও সূত্রে উনি জেনে ফেলেছেন। কিন্তু কেমন করে তা হলো? উনি যা জানেন, যেটুকু জানেন, আমিও তো তাই জানি। আমার চোখের আড়ালে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যা শুধুমাত্র ঠর জানা। তাহলে? প্রীতম এ এক ঘটনার মধ্যে কীভাবে কাজ হাসিল করে এলো? যদি হেনার কথাটা সত্যি হয় অবশ্য। না হলে, কী তার গোপন কথা? আর তাহলে মিনতি কেমন করে স্মৃতিটুকুকে দেখলো সিঁড়ির মাথায়? তাহলে কি ধরে নেবো—দুটো কাজ দুজনের? ঈদটা পেতেছিল টুকু, আর বিবটা মিশিয়েছে প্রীতম? কিন্তু তাও তো হবার নয়—মামু আমাকে স্পষ্টই বলেছেন, এটা একই হাতের কাজ। হত্যাকারী এবং হত্যার যে চেষ্টা করেছিল তারা এক এবং অভিন্ন। তাহলে? কে সে?

আহারান্তে গুটিগুটি এগিয়ে গেলাম বাসু-মামুর শয়নকক্ষে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম উনি একটা নিষ্কের গাউন পরে ইঞ্জিচেরারে অর্ধশয়ান। পাশের টিপয়ে রাখা আছে 'শিভাস রিগাল'-এর বোতলটা, একটা গ্লাস, বরফের প্লেট! চোখ দুটি বোজা। পাইপটা ঝর ঠোট থেকে ঝুলছে। জেগেই আছেন।

মামুর শয়নকক্ষ একতলয়। রানীমামিমা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন না। আমাদের শয়নকক্ষ দ্বিতলে। পা টিপে টিপে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। খাটে শূয়েও ঘুম এলো না। আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। রাতে পৌনে এগারোটার সময় হঠাৎ বনবন করে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। নিচে মামুর ঘরে রাখা আছে সেটা—একটা এক্সটেনশান দ্বিতলের লাউঞ্জেও আছে। নিচে যে ইঞ্জিচেরারে মামু বসে আছেন সেখান থেকে হাত বাড়ালেই উনি ফোনটার নাগাল পাবেন। তাই ব্যস্ত হইনি। কিন্তু বার পাঁচ-ছয় বাজার পরে মনে হলো, উনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলাম।

—হ্যালো?

—মিস্টার পি. কে. বাসু, স্যার?—মহিলার কণ্ঠস্বর।

—না, আমি কৌশিক বলছি। আমি কে? মিসেস ঠাকুর?

—হ্যাঁ বাসু-সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

—সম্ভবত। ডেকে দেব?

—না, দরকার নেই। কাল সকালে ঠুকে খবরটা দিলেই চলবে।

—কী খবর? বলুন?

—ঠুকে বলবেন, তিনি চিঠিতে যা লিখেছেন তাই ঠিক।

—বলবো। আর কিছু?

—মীনা আর রাকেশ ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়?

বুঝতে পারি, ও ধরে নিয়েছে ওর বাচ্চা দুটো এ বাড়িতেই আছে। আমরা যে এখনো ওদের নিয়ে আসিনি তা ও জানে না! কিন্তু মামুর শাকরেদি করে করে এটাও অভ্যাস করে ফেলেছি। রাত পৌনে এগারোটায় হেনার বাজবীর বাড়িতে বাচ্চা দুটো নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফলে এটা টুথ, হোলটুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য টুথ!

বলি, খুব সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা আমার ঘরে শোয়নি। আর কিছু?

—হ্যাঁ। বাসু-সাহেবকে বলবেন কাল সকালেই এখানে চলে আসতে। জরুরি দরকার আছে। বাচ্চা দুটোকে তখন আনার দরকার নেই। বুঝেছেন? তাদের পরে আনলেই চলবে।

—বলবো। আর কিছু?

—না।

—গুড নাইট!

হেনা নিঃশব্দে টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রাখল। 'শুভরাত্রি' না বলেই।

বারান্দায় গিয়ে উকি দিলাম। মামুর ঘরে বাতিটা জ্বলছে। বাতি জ্বলেই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নীচে। ঠুঁর ঘরের সামনে এসে পর্দাটা সরিয়ে দেখতে পেলাম—ঠিক একই ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারে বসে আছেন উলি টেলিফোন-রিসিভারটা তখনো তাঁর কানে ধরা আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে যেন সবিং ফিরে গেলেন। যন্ত্রটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখলেন। অর্থাৎ এক্সটেনশন-লাইনে উনি দু'পক্ষের কথাই শুনছেন। আমার কোনও কিছু বলা নিতান্ত বাহুল্য। তখনই নজর হলো উনি হাত নেড়ে আমাকে স্থানত্যাগ করতে বলছেন। মনে হলো, নেশাটা বেশ জমেছে তাঁর।

দ্বিতলে উঠে আসি। ঘুম আসতে দেরি হলো। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙলো বেলায়। টেলিফোনের শব্দে। প্রথমেই নজরে পড়লো ঘড়ির দিকে। পৌনে আটটা। টেলিফোনটা কতক্ষণ বাজছে কে জানে। উঠে গিয়ে ধরলাম!

—হ্যালো? বাসু-মামু? ও, আপনি কৌশিকদা? শুনুন! আমি যে কী বলবো ভেবেই পাচ্ছি না।

কণ্ঠস্বরেই শৃঙ্খল নয়, বাচনভঙ্গিতেও বোকা যায় ও প্রান্তে মিনতি মাইতি। আর কেউ সাত সকালে টেলিফোন করে বলতে পারে না—সে কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

—শুনুন কৌশিকদা। এদিকে একটা সামাজিক ব্যাপার হয়ে গেছে কাল রাতে।

—কী 'সামাজিক ব্যাপার'? প্রীতম খোঁজ পেয়ে গেছে?

—না, না, সেসব কিছু নয়! প্রীতম কিছুই জানে না। ওর ফোন নাম্বারটা আমি জানি না। ওকে কি এখন জানানো উচিত? আমাকে এরা নাজেহাল করছে—হেনার মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার জন্য। হেনা তো ধরা-ধোঁওয়ার বাইরে—এখন এরা 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' করছে। বলছে, আপনিই তো ওর মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। দোষ তো আপনারই। বলুন, দাদা, আমার কী দোষ? আমি ওকে প্রীতমের হাত থেকে বাঁচাতেই তো এই মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার আর কী স্বার্থ থাকতে পারে?

এ ভদ্রমহিলা কি একটা কথাও সহজ করে বলতে পারে না? ধমকে উঠি: কী হয়েছে আগে জানি। হেনা হোটেল ছেড়ে পাליয়ে গেছে?

—না, না, সে তো এখনও ওর ঘরেই শুষে আছে। ঘটনাক্রমে আগে ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে।

—কোন ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে? আসল কথাটা যে এখনো জানি না আমি?

—কালরাতে হেনা ভুলের বশে বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। আজ সকালে বেড-টি নিয়ে যে যায় সে প্রথম টের পায়—ও প্রথমটায় ভেবেছিল...

—হেনা মারা গেছে?

—তাই তো বলছি তখন থেকে। ভুল করে বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে! এখন কী হবে? মীনা আর রাকেশ এতটুকু বয়সে মাতৃহীন হয়ে গেল! অবশ্য আমি ওদের বেশ কিছু টাকাকড়ি দেব—ম্যাডামের তাই ইচ্ছে ছিল—কিন্তু মায়ের অভাব কি পূরণ করা যায়? আপনিই বলুন? তাছাড়া টাকাটা যদি সেই কাবুলিওয়ালা কেড়ে নেয়? আচ্ছা কৌশিকদা... আপনার কি মনে হয়—

আমি ঠক করে যন্ত্রটা রিসিভারে নামিয়ে রাখি। চটিটা পায়ে গলিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসি নিচে। মামুর ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখতে পাই—কাল রাতের ভঙ্গিতেই একইভাবে অর্ধশয়ান অবস্থায় বসে আছেন ইজিচেয়ারে। টেলিফোন যন্ত্রটা এখনো তাঁর কানে ধরা। আমাকে দেখতে পেয়েই সেটা নামিয়ে রাখলেন।

উনি নিশ্চয় সারারাত এখানে ঐভাবে বসেছিলেন না। কিছু নয় ঘটনা আগে যে দৃশ্য দেখেছিলাম হুবহু সেই দৃশ্য, একই ভঙ্গি, একই অবস্থানে। পরিবর্তনের মধ্যে ঘরে এখন বিজলি বাতি নয়, দিনের আলো। পরিবর্তনের মধ্যে ব্যতলটা শূন্যগর্ভ। উনি এবার আমাকে চলে যেতে বললেন না। বসতে বললেন। ঠুঁর খাটের প্রান্তে বসে বলি, কী মনে হল? অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ? সত্যিই ভুল করে?

—না, কৌশিক, ভুল করে নয়।

—আত্মহত্যা হতে পারে না। কাল রাতে পৌনে এগারোটায় হেনা টেলিফোনে আমাকে বলেছিল আজ সকালেই যেন আপনি ওর হোটেলে যান। ওর কী একটা জরুরি কথা বলার আছে। ফলে আত্মহত্যা হতেই পারে না। হয় অ্যাকসিডেন্ট, না হলে শ্রীতম কোনও ছল ছুতোয়...

—রাত এগারোটায় পর শ্রীতম ওর নাগাল পাবে কেমন করে? চল, যাওয়া যাক।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তার আগেই শ্রীতম সেখানে পৌঁছেছে। পুলিশের জেরায় মিনতি তার নাম-ঠিকানা জানাতে বাধ্য হয়েছিল। দেহ তখনো অপসারিত হয়নি। পুলিশ-ফটোগ্রাফার ছবি নেওয়া সবে শেষ করেছে। মিনতি আমাদের দেখেই হাঁউমাউ করে উঠল। শ্রীতম ঠাকুর হয় সতাই উটু দরের অভিনেতা, অথবা সে সত্যিই একবারে ভেঙে পড়েছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল—বাজে পোড়া তালগাছ।



দিন দুই পরের কথা।

বাসুমামুর ব্যবস্থাপনায় সকলে সমবেত হয়েছে মেরীনগর মরকতকুঞ্জে।

মিনতি মাইতি প্রথমটা আপত্তি করেছিল—এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করতে। বিশেষ, শান্তি দু'দিনের ছুটি নিয়ে তার ভাইয়ের বাড়ি গেছে। বাসুমামু তাতে দমেননি। বলেছিলেন, আহাযের নিমন্ত্রণ তো তুমি করছো না মিনতি। একটি শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেত করা হচ্ছে নিতান্ত অন্য উদ্দেশ্যে। হেনার বাচ্চা দুটোর ব্যবস্থা করতে। তুমি চাও তাদের কিছু টাকা দিতে—কিছু সে টাকা যেন শ্রীতম উড়িয়ে-পুড়িয়ে না দিতে পারে। তাই নয়? তাছাড়া ওরা সবাই জানতে চায়—কীভাবে হেনা মারা গেল? সেটা অ্যাকসিডেন্ট, আত্মহত্যা না হত্যা? পুলিশ তা ধরতে পারছে না, আমি জানি। তাই সবাইকে ডেকে সে-কথা বলতে চাই। আমি ওদের খবর দিচ্ছি। তুমি ব্যবস্থা করো।

ফলে মিনতিকে সেই মতো ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

মরকতকুঞ্জে বৈঠকখানা ঘরে সেদিন সবাই এসেছে। স্মৃতিটুকু, সুরেশ, নির্মল, শ্রীতম, ডক্টর পিটার দত্ত এবং গৃহবাসিনী। প্রত্যাশিত একজন অতিথি শূন্য অনুপস্থিত—মিস্ মার্পল অব মেরিনগর। ডক্টর দত্ত জানান, বড়ির 'ফু' হয়েছে—গরম-ঠাণ্ডায়। একেবারে শয্যাশায়ী। বুড়ি একা-একা থাকতো—তাকে বাধ্য হয়ে অপসারিত করা হয়েছে পীটার দত্তের বাড়িতে। সাময়িকভাবে। আশা-পুরকায়স্থ তার সেবা-শুল্ভা করছে। এতদিনে জানা গেল—ডক্টর পীটার দত্তও অববাহিত—কনফার্মড ব্যাটিলার। এক ভাইঝি তাঁর সংসারের দেখভাল করে।

বাসুমামু দর্শকদের দিকে মুখ করে একটু দূরে বসে আছেন। তাঁর মুখে পাইপ।

এমন দৃশ্যে আমি অভ্যস্ত। অনেক-অনেকবার দেখেছি। একদল সুবেশ ভরুণ-ভরুণী, শ্রৌট-শ্রৌটা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মুখেই ভদ্রতার মুখোশ আঁটা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় জানি, ওদের মধ্যে একটি মানুষের মুখোশ টেনে খুলে ফেলবেন মামু। আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে বলবেন, এই সেই নৃশংস হত্যাকারী।

হ্যাঁ। সম্ভবতঃ কোনও অবকাশ নেই। এই এতগুলি আপাতভদ্র মানুষের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে একজন পিশাচ। যে শয়তানটা বৃদ্ধার গমনপথে মাঝরাতে ফাঁদ পাততে দ্বিধা করে না—আর্ত মানুষের

পানীয়ে বিষ মেশাতে সংকোচ বোধ করে না। হেনার মতো দু-দুটি সন্তানের জননীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে তার বুক কাঁপে না।

বাসু-মামু গলাটা সাফা করে বললেন, আপনারা জানেন, কেন আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।<sup>১</sup> আমাদের এ কাজটার দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বর্গগতা মিস্ পামেলা জনসন—এই মরকতকুঞ্জে প্রাক্তন মালিক। আমার অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য খুঁজে বার করে দেখা—কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো। প্রসঙ্গত অন্যান্য কথায় আসবে। মিস জনসনের মৃত্যু চারটি সম্ভাব্য হেতুর একটি কারণে। এক: তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণই করেছিলেন। দুই: তিনি দুর্ঘটনায় মারা যান। তিন: তিনি নিজের জীবন নিজেই নিয়েছেন—অর্থাৎ আত্মহত্যা। চতুর্থ সম্ভাবনা: তিনি কোনও অজ্ঞাত আততায়ীর চক্রান্তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন!

—মৃত্যুর পরে তাঁর বিষয়ে কোনও 'ইনকোয়েস্ট' হয়নি—অর্থাৎ পুলিশী তদন্ত। কারণ তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক—যিনি রোগিণীকে দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন—ধরে নিয়েছিলেন: মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি 'ডেথ-সার্টিফিকেট' দিতে দ্বিধা করেননি।

—মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললে যেটা সম্ভবপর নয়, ক্রিস্টিয়ান অথবা মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবপর। সন্দেহের বশে মৃতদেহকে কবর থেকে খুঁড়ে বার করা হয়—'এক্সহিউম' করা হয়। নানা কারণে আমি সে পথে যেতে চাইনি—মুখ্য হেতু আমার মক্কেলের সেটা অভিপ্রেত ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস।

নির্মল বাধা দিয়ে বললে, আপনার মক্কেল বলতে?

মামু তার দিকে ফিরে বললেন, মিস্ পামেলা জনসন। আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর তরফেই কথা বলছি। তাঁর অন্তিম বাসনার মর্যাদা দিতে। তাঁর শেষ চিঠিতে দুটি নির্দেশ ছিল পরিষ্কার: 'সারমেয় গেথুকে'-এর রহস্য উদ্ঘাটন এবং এ অনুসন্ধান কার্যের গোপনীয়তা রক্ষা। তাই এখানে কোনও বাইরের লোক নেই। সকলেই তাঁর পরিবারভুক্ত, একজন অচিরেই তা হতে চলেছেন—একজন তাঁর ওয়ারিশ এবং একজন তাঁর আকৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাঁর লেখা চিঠিখানা প্রথমে পড়ে শোনাই। এটা উনি জিখেছিলেন তাঁর পতনজনিত দুর্ঘটনার দশদিন পরে। শুনুন—

এর পরের মিনিট-দশেকের ভাষণ আমি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারি—তাঁর পত্রপ্রাপ্তি এবং প্রথম অনুসন্ধানের আসার বৃত্তান্ত। কীভাবে ধাপে-ধাপে তিনি সিঁড়ির মাথায় পেরেকটা দেখেন এবং বুঝতে পারেন মিস জনসন কী ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন। তারপরে উনি আবার শুরু করেন, আমি বুঝতে পারি—আপাত আবোল-তাবোল চিঠির ভিতর দিয়ে মিস জনসন আমাদের কী বলতে চেয়েছিলেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন—সারমেয় গেথুকে পা পড়ায় তাঁর পদাঙ্কলন হয়নি। উনি বুঝতে পেরেছিলেন—মৃত্যুফাঁদ পেতে কেউ ঝুঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

—কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? মরকতকুঞ্জে সে রাত্রে ছিল নয় জন ব্যক্তি। তার ভিতর তিনজন ছিল রুদ্ধদ্বার সৌধের বাইরে, আউট-হাউসে—ছেদীলাল, তার স্ত্রী এবং ড্রাইভার। শান্তিকে তিনি সন্দেহ করেননি, যদিও উইল মোতাবেক—তাঁর পাঁচবছর আগে করা উইলের কথা বলছি—সে কিছু পেতো। কিন্তু শান্তি এ পরিবারে আছে দশ-পনের বছর। আরও একজনকে তিনি সন্দেহ করেননি—কারণ পতনজনিত মৃত্যু হলে তার কোনও লাভ হতো না। সুতরাং বাকি রইল মাত্র চারজন। ওঁর মৃত্যুতে এই চারজনই লাভবান হতো—তিনজন প্রত্যক্ষভাবে, একজন বিবাহসূত্রে।

—মিস জনসন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়লেন। একথা পুলিশে জানানো যায় না—তাতে পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য, কিন্তু যে ওঁর প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছিল তাকে ক্ষমাও করতে পারেন না। উনি মনস্থির করলেন। দু-দুটি দৃঢ়পদক্ষেপ করলেন। প্রথম: আমাদের তদন্ত করতে আহ্বান



জানালেন—গোপনীয়তার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয়: উনি ঠর অ্যাটর্নিকে একটি নতুন উইল প্রণয়ন করে নিয়ে আসতে বললেন।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তবে আততায়ী যেই হোক, উনি সন্দেহ করেছিলেন একজনকেই। কারণ তিনি জানতেন তার চারিত্রিক দুর্বলতার কথা। ইতিপূর্বেই সে একবার ঠর টাকা চুরি করেছে, চেক জাল করেছে। অপরাধপ্রবণতা হয়তো তার রক্তে—সেটা সত্যমিথ্যা যাই হোক—মিস পামেলা জনসনের মতে সে অপরাধপ্রবণ। ঘটনাক্রমে, দুর্ঘটনার পূর্বে তার সঙ্গে ঠর একটি জনান্তিক আলোচনাও হয়েছে। তাতে সেই সন্দেহজনক ব্যক্তি ঠকে শাসিয়ে রেখেছে—বৃদ্ধা ঠার টাকা আকড়ে বসে থাকলে ঠার 'ভার্লমন্ড' কিছু হয়ে যেতে পারে। বাস্তবে অপরাধী যেই হোক না কেন—মিস পামেলা জনসন সিদ্ধান্তে এলেন: মৃত্যুফাঁদটা সেই পেতেছিল।

—আর তাই প্রথম সুযোগেই তিনি সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে বলেছিলেন দ্বিতীয় একটি উইল করার কথা। পাছে সে মনে করে এটা একটা ফাঁকা হুমকি তাই তাকে উইলটা দেখিয়েও দিয়েছিলেন। উনি প্রকারান্তরে সেই সম্ভাব্য হত্যাকারীকে বুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন—ঠার মৃত্যুতে তার কোন লাভ হবে না।

—বৃদ্ধা ভালভাবেই জানতেন—দ্বিতীয় সম্ভাব্য আততায়ী ঐ ব্যক্তির নিকটজন। আশা করেছিলেন—এ ঠকে জানাবে।

—কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বচক্ষে উইলটা দেখেছিল সে তার নিকটতম আত্মীয়কে সেকথা জানায়নি। প্রথম সন্দেহভাজন ব্যক্তি...

এখানে সুরেশ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু। ব্যাপারটা এমনিতেই জটিল—আপনি আর তাকে ক্রমাগত ভাববাচ্যে জটিলতর করে তুলবেন না। সরাসরি 'প্রপার নেম' ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বাসু সকলের দিকে ফিরে বলেন, আমি সৌজন্যরক্ষা করতেই আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলছি। আপনারা যদি অনুমতি দেন...

আবার সুরেশই বলে ওঠে, ওটুকু নলচের আড়ালে সৌজন্য আসৌ রক্ষিত হচ্ছে না বাসু-সাহেব। উপস্থিত পঞ্চজন জানেন, কোন হতভাগ্য মিস জনসনের চেক জাল করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, জানে—এক্সকিউজ মি পীটার কাকা ফর বিইং ক্যান্ডিড—আপনার অনুমান-মোতাবেক কোন বৃদ্ধ পারিবারিক চিকিৎসক বুদ্ধুর মতো ভুল ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—

মামু এবার ডক্টর দত্তের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কী বলেন? আমি খোলাখুলি আলোচনা করবো?

১। বন্দু গলাটা সাফা করে নিয়ে বলেন, আমি সুরেশের সঙ্গে একমত। সৌজন্যের নলচের আড়ালে কিছুই ঢাকা পড়ছে না। আপনি খোলাখুলিই সব কথা বলুন। তবে এই সুযোগে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাখছি—পামেলার মৃতদেহ 'এক্সহিউম' করে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না—আসেনিক প্যুজিনিং-এ তার মৃত্যু হয়েছিল। আমি অবশ্য খুবই মর্মান্বিত হবো কবরের শাস্তি বিদ্রিষ্ট হলে—কিন্তু আমি বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আমি তা সহ্য করবো।

—না ডক্টর দত্ত, আমি মিস জনসনের দেহ কবর থেকে তুলবার প্রস্তাব করিনি, করছি না। দুটি কারণে, প্রথমত আমার মঞ্চল—যদি পরলোক থাকে—তাহলে এটা কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। দ্বিতীয়ত—মৃতদেহকে নাড়াচাড়া না করেই আমি আত্মীয়কে চিহ্নিত করেছি, প্রমাণ পেয়েছি। সে কথাই বলবো। ঐ কথা বলছিলাম: মিস জনসন সন্দেহ করেছিলেন, ঠার ভাইপো সুরেশকে। তাই তাকে দ্বিতীয় উইলখানি দেখতে দেন। আশা করেছিলেন—সে মিস হালদারকে সে কথা জানিয়ে দেবে।

—এখানে অমর অনুসন্ধান দুটি ধারা দেখা দিল। সুরেশ বারে বারে বলেছিল সে এ-কথা তার

## কাঁটায়-কাঁটায়-২

বোনকে জানায়, আর শ্রুতিটুকুও দুটম্বরে জানায় যে, সুরেশ তাকে বলেনি। স্পষ্টতই একজন মিথ্যা কথা বলেছে। কে বলেছে? আমি সিদ্ধান্তে এলাম—মিথ্যাভাষণ করেছিল সুরেশ। যুক্তি? টুকুর মিথ্যা কথা বলার কোনও যৌক্তিকতা নেই। বরং সে যদি বলতো; যে সুরেশ তাকে জানিয়েছিল, তাহলে তার সুবিধা হতো। তাকে আমি জানিয়েছিলাম যে, আমার মতে মিস জনসনের মৃত্যু অস্বাভাবিক—ঠার দেহ 'এক্সহিউড' করার কথা হচ্ছে। সে নিজে দাবী হলে বরং মিথ্যা করেও বলবে যে, সুরেশ তাকে জানিয়েছিল দ্বিতীয় উইলটার কথা। সেটা টুকুর জানা থাকলে তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। ফলে টুকু মিথ্যা কথা বলেনি। এখন দুটি সম্ভাবনা—সুরেশ মিথ্যা কথা বলেছে নিশ্চয়, কিন্তু কোনটা মিথ্যা? সে দ্বিতীয় উইলটা দেখেছে বোনকে বলেনি অথবা আদৌ দেখেনি, আমাকে মিথ্যা করে বললে যে, দেখেছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা বাতিল করতে হলো মিনতির স্টেটমেন্ট থেকে। মিস জনসন যে—ভাষায় কথা বলেছিলেন ঠিক সেই ভাষাতেই মিনতি আমাকে ঘটনাটা জানিয়েছিল। অর্থাৎ মিনতি কথোপকথনটা স্বকর্ণে শুনছে। হয় ঘটনাচক্রে অথবা আড়ি পেতে। তার মানে সুরেশ উইলটা দেখেছে, কিন্তু টুকুকে সে কথা জানায়নি।

কেন? একটাই হেতু। 'গিল্ট কনশাস'—অপরাধী মনোভাবাপন্ন। সে বুঝতে পেরেছিল, তার জন্যে বড়পিসি উইলটা পালটে ফেলেছে। ফাঁদটা সে পাতুক না পাতুক তাকে সন্দেহ করাই—নোট সরানো, চেক জাল করা অথবা 'ভালমন্দ' বিষয়ে হুমকি দেওয়ায় বড়পিসি দ্বিতীয় উইল করে সবাইকে বঞ্চিত করেছেন। লজ্জায় সে কথা সে বোনের কাছে স্বীকার করতে পারেনি।

—কিন্তু মৃত্যুফাঁদটা তাহলে কে খাটালো? যে কয়জনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা গেছে তার মধ্যে একমাত্র মিনতি মাইতির কোন লাভ হতো না সে রাতে মিস জনসনের মৃত্যু হলে। অথচ ঘটনা এমন যে, মৃত্যু না হলেও ঐ পতনজনিত দুর্ঘটনার ফলে একমাত্র সেই লাভবান হলো। যদি ধরে নিই মিনতিই ফাঁদটা পেতেছিল...

আর সহ্য হল না মিনতির। সে গর্জে ওঠে: থামুন। কী যা তা বলছেন...

—একটু ধৈর্য ধরে শোনো মিনতি, আমি কী বলতে চাই—

—কী শুনবো? বলি, শুনবোটা কী? আপনি ক্রমাগত যা নয় তাই বলে যাবেন...

মামু ওর কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলেন, তাহলে তার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে—মিস জনসনের মন ঠার পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে বিধিয়ে তোলা। সেক্ষেত্রে সে কিছুতেই ঐ তথ্যটা তার ম্যাডামের কাছ থেকে লুকাতে চাইতো না—অর্থাৎ ফ্রিসি সে রাতে বাইরে ছিল। খবরটা জানলেই কত্রীর মন ঠার পরিবারভুক্তদের বিরুদ্ধে বিধিয়ে উঠতো। আমি একাধিক সূত্র থেকে জেনেছি—মিনতি বরং খবরটা গোপন রাখতেই চেয়েছে। ফলে, মিনতি ঐ ফাঁদটা পাতেনি। মিনতি নির্দোষ।

যুক্তির সারবস্তা ও গ্রহণ করতে পারলো কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সন্দেহ-পঙ্ক্তির অগ্রগ্রহণ হলো তার। সংক্ষেপে বললে, ধন্যবাদ।

—এইখানে আর একটা 'সাইড-ইস্যু' এসে যাচ্ছে: আর্সেনিক প্রসঙ্গ।

উনি ছেদিলালের সঙ্গে কথোপকথন, তার কাঁটার সিল খোলার কথা বিস্তারিত কল্লেন, এবং সুরেশ যে 'আর্সেনিক' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে হঠাৎ 'স্টিকনি' বলেছিল তাও।

এবার ভেঙে পড়লো সুরেশ নিজেই। বললে আমরা... আমরা বোধহয় সবাই কমবেশি পাশও! অন্যের কথা জানি না—নিজের কথা বলি—ছেদিলালের কৌটোটা দেখে আমার লোভ হয়েছিল। কতটা 'উইড-কিলার' খেলে মানুষের মৃত্যু হ'ল তাও ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম—কিন্তু বিশ্বাস করুন... না, আয়াম সরি... এ পর্যন্ত আমার যে চরিত্রচিত্রণ হয়েছে, তাতে 'বিশ্বাস করুন', শব্দটা উচ্চারণ করার অধিকার আমার নেই!

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে সুরেশ।

এবার হঠাৎ শ্রুতিটুকু বলে ওঠে, তোর ঐ কথাটা খাটি—আমরা বোধহয় সবাই পাওঁ। আমার যে

চরিত্রচিত্রণ হয়েছে, তাতে আমিও নিজেকে বিশ্বাসভাজন বলে দাবি করতে পারি না। কিন্তু মিথ্যা অপরাধ তোর স্বক্ষেও চাপতে দেশ না রে সুরেশ!... হ্যাঁ, ছেদিলালের সিলড-টিন খুলে ঐ 'আর্সেনিক বিধ' আমিই সরিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন... আয়ামম্মরি! কথটা আমারও নাগালের বাইরে।

এবার বাসু-মামু বলে ওঠেন, আমি তোমাদের দুজনের কথাই বিশ্বাস করেছি। কারণ—মু আর পার্ফেক্টলি রাইট ডক্টর দস্ত—আর্সেনিক বিধে মিস জনসনের মৃত্যু হয়নি।

সুরেশ আর টুকুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। আমার স্পষ্ট মনে হলো, ওরা দুজনেই দুজনকে সন্দেহ করছিল। তাই টুকু বলেছিল—সুরেশ বোম্বাই চলে গেছে। আর তাই সুরেশ ভাবছিল—টুকুকে দ্বিতীয় উইলটার কথা না-বলা চূড়ান্ত মর্খামি হয়েছে তার।

মামু তাঁর বিশ্লেষণে ফিরে এলেন: এবার মিস জনসনের মৃত্যুর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সচরাচর দেখা যায়, প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আততায়ী দ্বিতীয়বার সে চেষ্টা করে। এখানে বলি, একটি তথ্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম একাধিক সূত্র থেকে। মৃত্যুর তিন দিন আগে মিস জনসন প্ল্যানচেটে বসেছিলেন। মিনতি বিশ্বাসী—সে একটা স্বর্গীয় আভা দেখতে পায়। কিন্তু মিস উষা বিশ্বাস অবিশ্বাসী—তিনি অতি ধূর্ত, বিচক্ষণ। তাঁর বর্ণনা মোতাবেক—কোট 'প্রথমত রিবনদুটি স্পষ্টতই ওর মুখ থেকে বার হয়েছে। দ্বিতীয়ত ধূপের ধোয়া হয় নীলচে-সাদা রঙের। এ দুটি হলুদ-রঙের। তৃতীয়ত রিবনদুটি লুমিনাস, আই মীন, প্রোজেক্ট, দীপ্তিময় ঝলমলে বা চকচকে নয়। স্নিগ্ধ, দ্যুতিমান, প্রভাময়—জোনাকির আলো হলুদরঙের হলে যেমনটা দেখাবে' আনকোট। মিস বিশ্বাস খুলে বাংলা আর ইতিহাস পড়াতে। তার বদলে যদি তিনি বিজ্ঞানের ছাত্রী হতেন তাহলে ঐ বিস্তারিত বর্ণনা একটি মাত্র বাক্যে সংক্ষেপিত করতেন: 'মিস জনসনের নিশ্বাস ছিল ফসফোরেসেন্ট'।

নির্মল একটু নড়েচড়ে বসলো: মামু তার দিকে ফিরে বলেন, হ্যাঁ তুমি ঠিকই ধরেছ নির্মল—আর্সেনিক নয়, ফসফরাস। ফসফরাসের টল্লিক এফেক্টকে অনেক সময় মনে হয় ইয়োলো অক্ট্রাশি অথবা দা লিভার। বিষ হিসাবে ফসফরাস দুলভ নয়, একরকম দেশলাই কাঠির মাথাতেই পাওয়া যায়। এক গ্রেনের শতভাগ থেকে ত্রিশভাগ হচ্ছে 'ফেটাল ডোজ'। অর্থাৎ বিঘটা যে প্রয়োগ করেছে সে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

—সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে দু'দুজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু নিতান্ত ঘটনাক্রমে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো অন্য একজনের উপর। বি-এস-সি-তে রসায়নে অনার্স নিয়ে সে দু'বাবর পরীক্ষা দিয়েছে। তার বাবা ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক। আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথম দর্শনেই মনে হল সে আতঙ্কগ্রস্ত। কেন? মিস জনসনের 'মৃত্যু' সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছি শুনে সে খণ্ডমুহূর্তের জন্য শিউরে উঠেছিল। যে মুহূর্তে আমি বুঝিয়ে বললাম—না মৃত্যু নয়, তাঁর উইলের প্রসঙ্গে আমি আলোচনা করতে এসেছি, অমনি তার অন্য মূর্তি। সে ভাব দেখালে—প্রীতমকে সে দারুণ ভয় পায়। ধীরে ধীরে সে আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছিল—যাতে আমি তার স্বামীকে সন্দেহ করি। কেন?

—হেনার চরিত্রটা আমি বিশ্লেষণ করলাম। আমার মনে হল প্রীতমকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে—ভালবেসে নয়। সাজে-পোশাকে সে যাদের আকর্ষণ করতে চেয়েছিল তাদের কাউকে ও ধরে রাখতে পারেনি। মিস জনসন বা মিস বিশ্বাসের মতো অবিবাহিত জীবন কাটাতে চায় না বলেই সে বাধ্য হয়ে প্রীতমকে বিবাহ করেছিল—এটাই মনে হলো আমার। ক্রমে সে প্রীতমের উপর প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে ওঠে। মৃত্যুটুকুর মতো সাজ-পোশাক করতে চায় সে—পার্টিতে যেতে চায়, গ্ল্যামারাস হতে চায়। মজ্জফরপুরে সেসব কিছুই নেই। তাছাড়া প্রীতম শেয়ার-মার্কেটে তার প্রীতন নষ্ট করে ফেলায় ওর মনে একেবারে বিষিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে দুটি সন্তান হয়েছে তার। লেডি ম্যাকবেথের যেমন ছিল একটি কন্যাহৃদয়, ওর তেমনই ছিল একটি মাতৃহৃদয়। ও প্রীতমের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বয়ম্ভর হতে চাইলো। কলকাতায় টুকুর মতো অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে সে থাকবে। তার ঢাকার দরকার। একমাত্র পথ—মিস জনসনের আশু মৃত্যু। অনেকেই জানে না—মিস জনসনের উইল মোতাবেক হেনা সম্পত্তির

## কাটায়-কাটায়-২

এক-তৃতীয়াংশ পেতো না—পেতো অর্ধেক। এ তথ্যটা সে বোধহয় জানতো। ফসফরাস বিবের লক্ষণ যে জনডিসের অনুরূপ এ তথ্যটাও তার জানা। বিহার থেকে আসার সময়েই সে ঐ ‘ফসফরাস’ সংগ্রহ করে এনেছিল। কিন্তু মরকতকুঞ্জে পৌঁছে একটি সহজতর সমাধান ওর নজরে পড়ে; সারমেয় গোকুল। সিঁড়ির মাথায় মৃত্যুফাঁদটা সেই পেতেছিল—

মিনতি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু আমি সে-রাতে স্পষ্ট দেখেছিলাম...

বলছি সে-কথা। তুমি থামো। কথা বোলো না। মিনতি আমাকে জানিয়েছিল যে, দুর্ঘটনার রাতে বা তার পূর্বরাতে সে স্বচক্ষে দেখেছিল স্মৃতিটুকুকে ঐ পেরেকটা পৃষ্ঠতে, অথবা নিচু হয়ে কিছু করতে। ব্যাপারটা বিস্তারিত বলি—

এরপর উনি সমস্ত ঘটনাটা জানানেন, মায় টুকুর দৃঢ় অস্বীকার। বললেন, মিনতির ঐ স্টেটমেন্ট শুনেই আমার মনে হয়েছিল—জীবনবন্দির ভিতর কিছু আপাত-অসঙ্গতি আছে—যা হবার নয়, তাই বলা হচ্ছে। সেটা যে কী, তা বুঝতে পারিনি। পরে ঘটনাচক্রে একদিন আয়নার সামনে ওই ব্রোচটা ধরায় আমার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হলো। মিনতি টুকুকে সনাক্ত করেছিল তার নীলরঙের নাইটি দেখে। আর ঐ T.H. নাম লেখা ব্রোচটা দেখে। না হলে অত কম আলেয় ঘুমঘুম চোখে তার পক্ষে সনাক্ত করা সম্ভব হতো না।

—ঘটনাচক্রে আয়নার সামনে ঐ ব্রোচটা ধরতেই আমার নজর পড়লো প্রতিবিম্বে অক্ষর দুটি উলটে গেছে—T.H নয়, H.T.।

—হেনা টুকুর নকল করতো, পোশাকে-আশাকে। তারও ছিল অনুরূপ নীল নাইটি। সেও টুকুর অনুরূপে কিনেছিল অনুরূপ ব্রোচ—H.T., হেনা ঠাকুর। কিন্তু সাজসজ্জা বিষয়ে তার কোনও রুচি ছিল না। তাই নাইটি পরেও কাঁধে ব্রোচ আটকেছিল—সে ভুল কিছুতেই করতে পারে না নিখুঁত সজ্জা-পারদর্শী স্মৃতিটুকু হালদার। রাতে নাইটির উপর ব্রোচ আটকানো!

—হেনা ফাঁদ পাতলো। তাতে মিস্ জনসনের মৃত্যু হলো না। তিনি যে উইলটা বদলে ফেলেছেন তা হেনাকে জানাননি, কারণ তাঁর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না—হেনা একাজ করতে পারে। এবার হেনা তার মূল পরিকল্পনা রূপায়িত করলো। অতি সহজ পদ্ধতিতে। মিস্ জনসনের বাথরুমে ক্যাপসুলের একটি খুলে ‘ফসফরাস’ ভরে দিল—ওষুধটা ফেলে দিয়ে। হেনা জানতো। দিন পাঁচ-সাতের মধ্যেই ঐ ক্যাপসুলটা উনি খারেন। তখন সে অকুস্থল থেকে অনেক দূরে। তাই সে আর মরকতকুঞ্জে একবারও আসেনি।

—হেনা ওখানেই থামেনি। বড়মাসির মৃত্যুর পর সে মর্যাহৃত হয়ে যায়। দেখে, সে সফল হয়েও বার্থকাম! এখন সে অনাপথে চলতে শুরু করলো। মিনতি মাইতির হৃদয় জয়। লক্ষ্য করে দেখলাম—একমাত্র প্রায় সমবয়সী সেই মিনতি মাইতিকে ডাকে ‘মিচিদি’ বলে, ‘আপনি’ বলে কথা বলে—যা বলে না প্রায় সমবয়সী সুরেশ বা টুকু। আর সেজন্যই সে সুরেশ-টুকুর সনে হাত মিলিয়ে মিনতির বিরুদ্ধে উইল-সংক্রান্ত মামলায় যেতে চায়নি। ওর তখন দুটি লক্ষ্য। এক: প্রীতমের কবলমুক্ত হওয়া সন্তানের অধিকার সমেত। দুই: মিনতির সেটিমেটে আঘাত করে কিছু অংশ ফিরে পাওয়া।

—হেনা এবার পাগলামোর অভিনয় শুরু করলো। তার স্বামী তাকে ভালবাসে, তাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করতে চায়। এটাই হলো হেনার তুরুপের টেকা। সে ধীরে ধীরে আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছিল যে, বিষপ্রয়োগ করেছে প্রীতম নিজেই! তার প্ল্যানটা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। স্বামীর সই জাল করে সে বেশ কিছু ‘কামশোজ’ ট্যাবলেট কিনে নিজের কাছে রেখেছিল। আমার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে বুঝলেই সে স্বামীকে ঐ ঘুমের ঔষধটা ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাইয়ে দিতো। সবাই ধরে নিতো ডক্টর প্রীতম ঠাকুরই হত্যাকারী—পি.কে.বাসুর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

প্রীতম একটা আর্তনাদ করে দু’হাতে মুখ ঢাকে। তারপর সংযত হয়ে বলে, তাই... সেদিন আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কামশোজের কথা?

—হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনকে পৃথক করতে চেয়েছিলাম। দ্বিতীয় হত্যা ঠেকাতে চেয়েছিলাম।

শ্রীতম রুদ্ধকণ্ঠে বলল, যেদিন ও রাগ করে বাড়ি ছেড়ে সকালবেলা বেরিয়ে যায় সেদিন তুচ্ছ কারণে আমরা ঝগড়াঝাটি করেছিলাম। ও আমাকে এক গ্রাস সরবৎ খেতে দিয়েছিল, ওর মুখ দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল—ওর পাগলামির কথা জানতাম, তাই ভেবেছিলাম ও কিছু বশীকরণের শিরুড়-বাকড় খাওয়াতে চাইছে আমাকে। আমি রাগ করে সরবৎটা ফেলে দিয়েছিলাম।

—এমনটা ঘটতে পারে তা আমি জানতাম। তাই আমি একটা চিঠিতে সব কিছু লিখে হেনাকে পড়তে দিয়েছিলাম—তাকে জানতে দিয়েছিলাম যে, তার ‘গোপনকথা’ আমি জানি।

—মাই গড! তাই সে আত্মহত্যা করেছে! তাই পুলিশে বলছিল, মৃত্যুর আগে হেনা কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। কাগজ পোড়া ছাই ছিল ওর ঘরে।

বাসু শ্রীতমের কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, এটাই সব থেকে ভালো হল নাকি? আমি ওকে আত্মহত্যা করার কথা বলিনি। শুধু জানিয়েছিলাম—মীনা আর রাকেশের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সিদ্ধান্তটা হেনা নিজেই নিয়েছে। এছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এটার দরকার ছিল শ্রীতম। নাহলে একের পর এক দুর্ঘটনা-জনিত অপমৃত্যু ঘটত। প্রথমে তুমি। তারপর মিনতি—যখন ওরা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতো।

মিনতি উঠে দাঁড়ায়। বলে, বাসু-মামু, এবার আমিও আমার কথাটা বলি। সুরেশদা যে কথা বলেছে তা নির্যাস সত্যি—আমরা সবাই কম-বেশি পাষণ্ড। আমি... আমিও কিছু পাপ-কাজ করেছি।

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, জানি, মিনতি। মৃত্যুর ঠিক আগে মিস্ জনসন তোমাকে বলেছিলেন উইলখানা নিয়ে আসতে। আর তুমি মিথ্যে করে বলেছিলে, কাগজখানা উকিলবাবুর কাছে আছে। তাই নয়? তার মানে তুমি ম্যাডামের অগোচরে আলমারি খেঁটে দেখেছিল।

মিনতি দু’হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কঁদে ওঠে। বলে, আমিও ধোঁওয়া তুলসীপাতাটা নই। আমি লুকিয়ে আলমারি খুলেছিলাম, জানতাম ঐ উইলের কথা—বুঝতে পেরেছিলাম—উনি সেটা ছিড়ে ফেলতে চান। আমি জন্মদুখী... কিন্তু উইল পড়ে আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি—বিশ্বাস করুন—যে সম্পত্তিটার পরিমাণ এত! আমি ভেবেছিলাম দশ-বিশ হাজার টাকা! তারপর থেকে রাতে আমার ঘুম হয় না। আমার সব সময়ে মনে হয়, আমি তক্তকতা করেছি—সবাইকে ঠকিয়ে যা আমার হকের ধন নয়...

বাসু বলেন, তুমি কি মীনা আর রাকেশকে কিছু দিতে চাও?

—শুধু ওদেরই নয়। সুরেশদা, টুকুদি এদের কাছেও আমি অপরাধী হয়ে আছি। আপনি মধ্যস্থ হয়ে একটা বিলিব্যবস্থা করে দিন। মীনা আর রাকেশ এই মরকতকুঞ্জের মানুষ হতে পারে—শ্রীতমভাই যদি রাজি হয়। নাহলে, করেছে শুয়েও ম্যাডাম শাস্তি পাবেন না।

মামু ডঙ্কর দণ্ডের দিকে ফিরে বলেন আপনি আমার মক্কেলকে পঞ্চাল-বাট বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। বলুন, কী ব্যবস্থা নিলে মিস্ পামেলা জনসন খুশি হতেন?

পিটার দণ্ড বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—উভাও তাই বলে—পামেলা ঐ দ্বিতীয় উইলটা বানিয়েছিল অন্তিমে ছিড়ে ফেলার জন্যই। মিন্তি যখন নিজে থেকে আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছে তখন আপনি মধ্যস্থ হয়ে একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিন। নির্মলের পেটেকটা যাতে নেওয়া যায়, সুরেশ আর টুকু যাতে পামেলার ক্ষমাসুন্দর আশীর্বাদ পায়, আর শ্রীতমকে আমি একটা সাজেশান দিতে চাইছি: সুদূর মজঃফরপুরে পড়ে থাকার কী দরকার তার? আমি আর কদিন? নির্মলও মেরীনগরে থাকবে না, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। ও যদি মরকতকুঞ্জেরই এসে বসবাস করে তাহলে আমার প্র্যাকটিসটা ওর হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। অবশ্য তার বয়স কম, সে যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে...

শ্রীতম মাঝখানেই বলে ওঠে, মীনা আর রাকেশকে মানুষ করে তোলাই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য। দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রসঙ্গ ওঠে না। বাকি জীবনটা আমি আমার হতভাগিনী স্ত্রীর স্মৃতি নিয়েই

## কাটায়-কাটায়-২

কাটিয়ে দিতে চাই। এখানে সর্বসমক্ষে আমার ক্রীকে নয় করা হয়েছে—আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি—বাট যু টু ডক্টর উড অ্যাপ্রিশিয়েট—সে সত্যিকারের শয়তানী ছিল না। সে একটা অবসেশনে ভুগছিল—ইটস্ আ মেন্টাল ডিজিজ! হ্যা, সুরেশ ঠিকই বলেছে—আমরা সবাই কমবেশি পাগল—কিন্তু ‘হানি’ তা ছিল না—শি ওয়াজ জাস্ট আ পেশেন্ট!

বাসুমামু আজ অনেক অনেক ভেঙ্কি দেখিয়েছেন—কিন্তু আমার মনে হল, শেষ চমকটা দিল ঐ প্রাণবন্ত পাঞ্জাবী তরুণটি।

‘হানি’র প্রতি তার ভালবাসায় একতিলও মালিন্য স্পর্শ করেনি।



ডাক্তার পিটার দস্তুর পীড়াপীড়িতে ফেরার পথে তাঁর বাড়িতে একবার যেতে হলো।

মিস বিশ্বাস আজকের এ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি—শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায়, কিন্তু তাঁর উৎসাহ নাকি কারও চেয়ে কম নয়। মামুর অনুরোধে ডক্টর দস্ত এ কয়দিন ‘মিস মার্পল অব মেরীনগর’কে কোনক্রমে শান্ত করে রেখেছেন। এখন যদি তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমরা ফিরে যাই তাহলে তিনি মর্মান্বিত হবেন। ডক্টর দস্তুর শেষ যুক্তি: রোগীর মানসিক শান্তির জন্যও এটুকু করা দরকার।

মামু বললেন, শিওর! উনি আমার দিদির মতো, চলুন যাই।

আমাদের দেখতে গেয়ে শয্যালীন বৃদ্ধা বললেন, শেষ-শেষ এমন দিনে এলে ভাই যে, আমি বিছানায় শুয়ে। কেবু-কুকি কিছুই বানিয়ে রাখতে পারিনি।

ডাক্তার সাহেবের ভাইঝি দাঁড়িয়ে ছিল ওঁর বিছানার পাশে। বললে, তাতে কী? আমি তো আছি। ও বেলা পুর করে রেখেছি, জানতাম ওঁরা আসবেন। এখনি গরম গরম ভেজে আনিছি। কফি না চা?

মামু বললেন, কফি। কিন্তু র। দুধ-চিনি বাদ। শুধু আমারটা।

আশা পুরকায়স্থও উপস্থিত ছিল। হাত তুলে নমস্কার করলো। সেও চলে গেল ভিতর দিকে। বোধ করি সাহায্য করতে।

বৃদ্ধা বললেন, পীটার, মিস্টার টি. পি. সেনের জন্য বোটা আনিয়ে রেখেছি সেটা নিয়ে এসো।

পীটার আদেশ তামিল করতে গেলেন। মামু বলেন, আমার জন্য আবার কী আনিয়ে রেখেছেন? প্রেজেন্টেশান?

উনি জবাব দেবার আগেই ডক্টর দস্ত ফিরে এলেন। তাঁর হাতে কুকনগরী মাটির পুতুল। একজন বলিষ্ঠ গঠন নয় যুবক কজ্জিতে থুতনি রেখে কী ভাবছে। বিখ্যাত ভাস্কর্যের মিনিয়চার-কপি : দ্য থিংকার।

মিস বিশ্বাস বলেন, তুমি পেশায় সাংবাদিক, চিন্তাজগতের মানুষ। তাই তোমার জন্য বৃণী খেকে আনিয়ে রেখেছি। টেবিলে সাজিয়ে রেখে, আমার কথা মনে পড়বে।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে মামু উপহারটা গ্রহণ করলেন।

বৃদ্ধা বলেন, শুনলাম তুমি আংকল্ যোসেফের জীবনীটা লিখবে না বলে স্থির করেছ? সত্যি?

মামু হেসে বলেন, সত্যি। আংকল-হার্ডের ডায়েরিটা পড়ে মনে হল আপনি ঠিকই বলেছেন—কোমাগাতামার জাহাজের সঙ্গে যোসেফ হালদারের কোন স্পর্শ ছিল না।

দুজনই বুঝছেন। তবু কথাবার্তা চলেছে ঠারে-ঠারে! 'আউল-বাউল'-এর সাজেতিক ভাষায়। উষা বললেন, আঙ্কল যোসেফের মেয়ের দেইটা 'এক্সহিউম' না করেই যে সেটা তুমি বুঝে উঠতে পেরেছ এটাই আনন্দের। সেটা করলে আমরা সবাই মর্মান্বিত হতাম—আমি, পীটার আর প্যামেলা।... শুনলাম হেনা ভুল করে বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছিল। বেচারি হেনা! তা প্রীতম কী স্থির করল? মরকতকুঞ্জে এসে থাকবে?

শেষ প্রশ্নটা পীটার দস্তকে। মনে হলো, এ নিয়ে বুড়োবুড়ি আগেই আলোচনা করেছেন। পীটার গ্রীবা সঞ্চালনে জানালেন—প্রীতম রাজি হয়েছে।

বৃদ্ধা খুশি হলেন। বাল্যবন্ধুকে বললেন, তাহলে তোমার ছুটির ঘণ্টাও এবার বাজলো?

—তাই তো আশা করছি।

এবার বৃদ্ধা মামুর দিকে ফিরে বললেন, আই কনগ্র্যাচুলেট য়ু। কাজটা হাসিল করেছে অথচ ডাটি লিনেন সর্বসমক্ষে খাড়তে হলো না। কী করে সবার পেটের কথা বার করলে জানতে দারুণ কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু না, আমি জানতে চাইবো না।

মামু আগ বাড়িয়ে বলেন, জাতে সাংবাদিক যে! সকলের সব কথাই আমার মনে থাকে, তার ঠিক ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারি।

—নাকি? একটা উদাহরণ দাও?

—যেমন ধরুন, 'ডিটেকটিভ' শব্দটার বাংলা পরিভাষা যে 'টিকটিকি' এই সোজা কথাটা না বুঝতে পারায় একবার এক বৃদ্ধ যে ভাষায় ধমক খেয়েছিলেন তার কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন শ্রোতা করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

রীতিমতো চমকে উঠলেন উনি। আমতা-আমতা করে বলেন, মাই গড! তুমি... তুমি তা কেমন কর জানলে? সে ভো টেলিফোনে কথা—

—ঐ যে বললাম, জাতে সাংবাদিক যে। প্রায় গোয়েন্দার মতো।

—কী? কী ভাষায় ধমক খেয়েছিল সেই বৃদ্ধ?

—কোটা 'আমার কথা তো পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি বুঝতে পারলে না ডট ডট ডট! সে আবার আজ নতুন করে কী বুঝবে?' আনকোট!

ঘিয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল উষা বিশ্বাসের চোখ দুটো। বাক্যটার কী 'ইন্টারপ্রিটেশন' ঐ সাংবাদিক ভদ্রকে করেছেন তা আর জানতে চাইলেন না। মামু মিটিমিটি হাসতে থাকেন। উষা বলেন, না! তুমি সাংবাদিক নও। যু আর এ জুয়েল অব আ ম্লুথ! আ জিনিয়াস! এয়ারকুল পয়রো! চেনো তাঁকে? নাম শানেছো

মামু সে-কথার স্বাবলম্বী দিয়ে একটি প্রতিপ্রশ্ন করেন। বলেন, ক্রমাগত আপনিই বা প্রশ্ন করে যাবেন কেন? এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন দেখি, আপনি মেরি রোজ-ব্যুরের নাম শুনেন? চেনেন মেয়েটিকে?

মিস বিশ্বাস অবাক হলেন। বলেন, মেরি রোজ-ব্যুরে? ফ্রেন্ড?

—হ্যাঁ। ফরাসী মহিলা। জন্ম 1844। ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চলের বাসিন্দা।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে ভাবলেন। তারপর বললেন, আর দু-একটা ক্ল!

—অত্যন্ত সুন্দরী। মাথায় সোন-গাঠানো চুল। আনপড়। নিজের নাম সই করতে পারতেন না। প্রাপ্তি আমাকে যে মুর্তিটা দিলেন—দ্য থিংকার, তার অরিজিনাল তাঁর সম্বলনে ছিল।

মাথা নেড়ে বললেন, ফেল মারলট। বলে দাও। কে ঐ শ্বেদী রোজ-ব্যুরে?

—মৃত্যুর মাত্র উনিশ দিন আগে তাঁর পদবীটা বদলে গেছিল। মৃত্যু সময়ে তাঁর নাম ঃ মেরি রোজ-রোদ্যা। অগত্য রেনে রোদ্যার সহধর্মিণী। তাঁর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স সত্তর, রোদ্যার

## কাটায়-কাটায়-২

সাতাত্তর। পঞ্চাশ নয়, পাক্ষা তিপান্ন বছর ধরে অগুস্ত রেনে রোদ্যা সেই মহিলাটির কী একটা কথার অর্থ বুঝে উঠতে পারেননি।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল শয্যালীন বৃদ্ধার। ক্রমে সামলে নিলেন। ডাক্তার দপ্তর দিকে ফিরে বললেন, ছোকরার মুখের কোনও আড় নেই!

মামু বলেন, ছোকরা! আমার বয়স কত জানেন?

—জানি। সত্তর বছর বয়সে মেরি রোজ যদি ওয়েডিং গাউন পরতে পারেন তাহলে তোমার বয়সী চ্যাণ্ডাও দিদির হাতে পিটটানি খেতে পারে। বুঝেছো হে ছোকরা?

গরমাগরম কচুরি হাতে আশারা প্রবেশ করায় বোধ করি সেদিন ভায়ের সামনে মামুকে দিদির হাতে ঠ্যাঙানি খেতে হলো না।



